# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

দ্বিতীয় ভাগ

স্বামী গম্ভীরানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, শুঁড়িপাড়া রোড, কলিকাতা-১৫

চতুর্থ সংস্করণ

# সূচীপত্র

# নিবেদন

উপাদানের অভাবে ও গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে অনেকগুলি জীবনী পূর্ণতর করিতে এবং ইচ্ছা থাকিলেও অপর কতকগুলি জীবনী মুদ্রিত করিতে পারি নাই—ইহা আমরা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই বলিয়া আসিয়াছি। আশা করি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি পাঠকগণ মার্জনা করিবেন।

প্রথম ভাগের ন্যায় এই ভাগেরও পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদামণি দেবীর নাম শ্রীশ্রীমা, আচার্য স্বামী বিবেকনেন্দের নাম স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম মহারাজ এবং স্বামী শিবানন্দের নাম মহাপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৺সপ্তমী পূজা, ১৩৫৯ — গম্ভীরানন্দ

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

# স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পূর্ব নাম ছিল শ্রীসারদাপ্রসন্ন মিত্র। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর কৃপায় এই পুত্রটি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পিতা পুত্রের ঐরূপ নাম রাখিয়াছিলেন। ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত পাইকহাটীর নাওরা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী (১৮ই মাঘ, ১২৭১, চান্দ্র শুক্লা চতুর্থী তিথিতে) সোমবার, রাত্রি ৯টা ২৬ মিনিটের সময় সারদা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ ৺নীলকমল সরকার পাইকহাটীর বিশেষ প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতা বাবু শিবকৃষ্ণ মিত্র কলিকাতার নন্দনবাগানে বাস করিতেন। তিনি সাধুতা ও চরিত্রবলে প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিবকৃষ্ণের চারি পুত্র—বিনয়, সারদা, অনুকূল ও আশুতোষ।

বাল্যকাল হইতেই দেবতাপূজাদিতে সারদার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর প্রায় ১০৮টি স্তোত্র এবং প্রণামমন্ত্র মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং অতি সুললিত সুরে ভগবদ্গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহাকে কলিকাতায় পিতৃভবনে আনিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। বালকের স্বভাব সরল ও সুমিষ্ট; অধিকন্তু পরীক্ষায় সর্বদা প্রথম হওয়াতে তিনি শিক্ষক ও সহপাঠীদের স্নেহ ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইলেন। নিম্নবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য শ্যামপুকুরের 'মেট্রোপলিটান্-ইন্‌স্টিটিউশনের' চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। এখানে চারি বৎসর কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়নান্তে তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন।

তাঁহার নিজের আশা ছিল এবং সকলেই ভাবিতেন যে, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারপূর্বক তিনি বৃত্তিলাভ করিবেন। কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডাইবে? পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন জলখাবার খাইবার সময়ে অসাবধানতা-বশতঃ তাঁহার বড় সাধের সোনার ঘড়িটি চুরি যাওয়াতে তিনি এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, অবশিষ্ট পরীক্ষা আর ভাল করিয়া দেওয়া হইল না। সুতরাং তিনি পাশ করিলেন দ্বিতীয় বিভাগে। ইহাতে দুঃখের মাত্রা বর্ধিতই হইল। এত আশা আজ ব্যর্থ হইল! প্রত্যুত এই বিফলতাই আবার ঈশ্বরের বিধানে তাঁহাকে আর এক অপূর্ব সাফল্য আনিয়া দিল। 'কথামৃত'কার শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় তখন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রিয় ছাত্রকে মাসাধিক যাবৎ বিমর্ষ দেখিয়া একদিন (১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া গেলেন। অতঃপর ঠাকুরের আকর্ষণে তিনি স্বতই তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সারদার পিতাকে সাধুসঙ্গের বিরোধী জানিয়া ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সারদা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য সেয়ারের গাড়ি-ভাড়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে লইবেন। লজ্জাশীলা মাও সারদার আগমন বুঝিতে পারিলেই পূর্ব হইতে আবশ্যকীয় পয়সা দ্বারদেশে রাখিয়া দিতেন—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইত না।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইলে ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষাগ্রহণের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, "অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।" কিন্তু তখন তাঁহার নিশ্চয়ই দীক্ষা হয় নাই; কারণ শ্রীশ্রীমা বলিতেন যে, স্বামী যোগানন্দই তাঁহার প্রথম মন্ত্রশিষ্য। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তিনি মাতাঠাকুরানীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গগুণে সারদার জীবন কিরূপ নবভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। শৈশব হইতে স্বগৃহের ব্যবস্থা দেখিয়া সারদার ধারণা হইয়াছিল যে, ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা ইত্যাদি ঝি-চাকরদের কাজ। তাই ঠাকুর যখন একদিন আদেশ করিলেন, "কিছু জল এনে আমার পা ধুইয়ে দে," তখন লজ্জায় আরক্তিম-বদন সারদা শুধু চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর সব বুঝিয়াও যেন বুঝিতে পারেন নাই এমনভাবে পুনরায় বলিলেন, "জল নিয়ে আয়।" সারদা কি করিবেন? উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে আদেশ পালন করিতে হইল। কিন্তু সেই সংস্কার অনিচ্ছা সেইদিনই পূর্ণ ইচ্ছায় পরিণত হইল। আমরা পরে ইহার পরিচয় পাইব।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সারদা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেখানেও অল্পদিনে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে তাঁহাকে আর বিশেষ পড়াশুনা করিতে দেখা যাইত না—তখন তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাদি শ্রবণ ও ধর্মগ্রন্থ-পাঠাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ঠাকুর শ্যামপুকুরে আগমন করার পর হইতে সারদা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। কাশীপুরেও তিনি খুব যাতায়াত করিতেন এবং গৃহের কঠিন শাসন সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে সেখানে রাত্রিযাপন করিতেন।[১] কাজেই তাঁহার পিতার বুঝিতে বাকী

১। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ভাগের ৩৪ পৃষ্ঠায় যে ত্যাগীদের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহারা কাশীপুরে "সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।" অপরদের সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গ'—দিব্যভাবের ৩২৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে—"সারদা পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই-একদিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশের কয়েকদিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা যাওয়া করিত।"

রহিল না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সারদার মন ক্রমেই সংসারবন্ধন ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতের সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে। অতএব তিনি পুত্রকে সংসারে আকর্ষণের জন্য নানাবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। ঐ চেষ্টা কত ঐকান্তিক ও দৃঢ় ছিল তাহা মাস্টার মহাশয়ের এই কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, "ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন সারদা মহারাজের বাপ একজনকে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমি কালীঘাটে গিয়ে জপ করলুম, তবে তো হ'ল!' ছেলেকে তিনি কিছুতেই ঠাকুরের কাছ থেকে বাগ মানাতে পারছিলেন না।"

সারদার পিতা পুত্রকে সংসারে বাঁধিবার অন্য উপায় না দেখিয়া গোপনে বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অবশেষে সারদার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়াতে সারদা প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি স্বকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলেন। অবশেষে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহ হইতে ধীর পদবিক্ষেপে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় একখানি পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন; তাহাতে লিখা ছিল—"শ্রদ্ধেয় পিতা এবং স্নেহময়ী জননী আমার! আমি বিবাহ করতে পারব না। চোখের দৃষ্টি যে দিকে নিয়ে যায়—সেই দিকে আজ চললুম আমি। সংসারের মায়াজালে বদ্ধ হতে আমার ইচ্ছা নেই" ইত্যাদি। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী সাড়ে এগারটার সময় বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়া তিনি প্রথমতঃ কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের নিকট গমন করিলেন এবং গৃহ হইতে পলাইতেছেন ইহা না জানাইয়াই তাঁহার শুভাশীর্বাদ লইয়া পদব্রজে পুরী রওয়ানা হইলেন। কিছুদিন পর সারদা পাঁশকুড়া হইতে বাড়িতে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন—"শ্রদ্ধেয় পিতা এবং স্নেহময়ী মা আমার! আপনাদের অকৃতজ্ঞ সন্তান দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে

আপনাদের চলে এসেছে—পারেন তো ক্ষমা করবেন। আমার দেশের ভাইবোন নানাবিধ দুঃখকষ্টে হাবুডুবু খাচ্ছে—এ অবস্থায় আমি কুঁড়ের মতো বাড়িতে বসে থাকতে পারি নে। মানসিক অবস্থা পূর্ববৎই আছে। আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না—শরীর খুব ভালই। বৃথা আমাকে খুঁজতেও এখানে আর আসবেন না; কারণ এই চিঠি ডাকে ফেলেই ফের রওনা দিচ্ছি। কোথায় যে যাই, এখনও কিছু ঠিক নেই। মা ও বড় ভাইবোনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন। আপনিও নেবেন। ছোট ভাইবোনদের আমার ভালবাসাদি জানাচ্ছি। ইতি—আপনাদের অধম সন্তান সারদা।"

সারদা গন্তব্যস্থানের সংবাদ না দিলেও কাশীপুরে অনুসন্ধান করিয়া পিতা জানিলেন যে, তিনি পুরী গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য পুরী রওয়ানা হইলেন (২৭শে জানুয়ারী, ১৮৮৬)। পুরীতে উপস্থিত হইয়া জনকজননী সারদার সাক্ষাৎ পাইলেন। জননীর স্নেহময় কুশলপ্রশ্নের উত্তরে সারদা আবেগভরে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত জানাইলেন:

"পাঁশকুড়া হ'তে আপনাদের চিঠি লিখে চলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু দুদিন যাবৎ কোথাও কিছু খেতে পেলুম না। বড়ই ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়ায় চলতে বড় কষ্ট হ'ল। সন্ধ্যার পূর্বে নিশ্চয়ই কোন লোকালয় পাব—এই ভরসায় অগ্রসর হলুম। কিন্তু সন্ধ্যার সময় দেখি সামনে বিরাট জঙ্গল! ওরই মধ্যে একটি ছোট রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে। সর্বশক্তিমান্ ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে ঐ রাস্তায় চললুম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যতই যাই, ততই দেখি নিবিড় বন নিবিড়তর হয়ে আসছে। অবশেষে অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে গেলুম! কি করব? আমার গুরুদেব পরমহংস-দেবের নাম করতে লাগলুম এবং সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে প্রার্থনা জানালুম।

নিরুপায় হয়ে সামনের একটি বড় গাছে উঠে ডালের ওপর ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ কে আমায় ডাকছে শুনতে পেলুম। কে, রাত্রির অন্ধকারে চেনা দায়। কণ্ঠস্বর কানে এল, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে? এই যে বাতাসা রয়েছে, খাও।' এই ব'লে লোকটি চলে গেল এবং পুনরায় এক ঘটি জল আমাকে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! নিবিড় বনে হঠাৎ একটি লোকের আগমন এবং তার সহানুভূতিতে অভিভূত হয়ে গেলুম। কি ক'রে এ হ'ল বুঝতে পারলুম না। তবে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপা মনে ক'রে অনেকক্ষণ যেখানে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। যাক, সামান্য জিনিস দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলুম। এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হ'ল। সকালবেলা উঠে বনের এদিক ওদিক নানাস্থানে খুঁজতে লাগলুম; কিন্তু এই নিবিড় বনে লোকালয় কিংবা লোকের চিহ্নও কোথাও দেখতে পেলুম না।"

পুরীযাত্রাকালে কাশীপুরে তাঁহাকে নিঃসম্বল দেখিয়া তারক (স্বামী শিবানন্দ) পাঁচটা টাকা দিয়াছিলেন; কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি একটি পয়সাও খরচ করেন নাই। এমনি ছিল তখন তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য।

কিছুদিন তিনি পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া পুরীর মন্দিরাদি দর্শন করিলেন। অতঃপর আরও কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাইয়া সদলবলে কলিকাতা ফিরিলেন। এদিকে কলেজে এফ. এ. পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকী। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা কেহ আশা করে নাই; কারণ সারা বৎসর পড়াশুনা কিছুই হয় নাই। কিন্তু তিনি আশাতীত ভাবে পাশ করিলেন।

ইহার পর আবার সারদার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বাড়ি হইতে মাঝে মাঝে কোথায় চলিয়া যান—কেমন যেন আপনভাবে চলেন

আর সংসারের প্রতি তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়বাবু এই-সব দেখিয়া সারদাকে সংসারে ফিরাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তিনি একটি বশীকরণ যজ্ঞ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য মন্ত্রের প্রভাবে সারদা মহারাজের মন সংসারে ফিরাইয়া আনা। একমাস বারদিন ধরিয়া বারজন ব্রাহ্মণদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। পরন্তু যজ্ঞের ব্রাহ্মণগণ স্পষ্ট বলিলেন যে, তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব। ইহাতেও বিনয়বাবু হতাশ হইলেন না; পরন্তু অন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। এইজন্য তাঁহাকে নানাভাবে প্রচুর টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু কোন ফলই হইল না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি অবশেষে পরমহংসদেবের শিষ্যদের নিকট উপস্থিত হইয়া সব খুলিয়া বলিলেন এবং সারদা যাহাতে সংসারে ফিরিয়া যান, তজ্জন্য তাঁহার গুরুভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মাসখানেক পরে সারদা সব জানিতে পারিলেন এবং ইহাতে তাঁহার সংসারবিতৃষ্ণা বর্ধিতই হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর নরেন্দ্রপ্রমুখ অনেকে যখন আঁটপুরে যান, তখন সারদাও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আঁটপুরে তাঁহারা যে কয়দিন ছিলেন, সেই কয়দিন সেখানে বাবুরামের গৃহটি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারই মধ্যে আবার একদিন সারদাকে শিব ও গঙ্গাধরকে পার্বতী সাজাইয়া হরগৌরী-উৎসব করা হইল। এইরূপ অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সকলে একদিন এক পুষ্করিণীতে স্নানে গিয়াছেন, এমন সময় অনবধানতাবশতঃ সন্তরণে অপটু সারদা ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন নিরঞ্জন তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই সারদা বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন—তাঁহার নাম হইল

ত্রিগুণাতীতানন্দ, সংক্ষেপে ত্রিগুণাতীত। সাধারণতঃ তিনি সারদা মহারাজ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। স্বামীজী তখন প্রায়ই তীব্র বৈরাগ্যের কথা বলেন, আর ভগবানলাভ না হওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং প্রায়োপবেশন করিবেন বলেন। শুনিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজের মনে আগুন জ্বলিল—একদিন তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন। স্বামীজী তখন কলিকাতায় ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিলেন এবং অন্বেষণান্তে তাঁহারই নামে লিখিত একখানি পত্র পাইলেন—"আমি হেঁটে বৃন্দাবনে চললুম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। আগে বাপ-মা ও বাড়ির সকলের স্বপন দেখতুম। তারপর মায়ার মূর্তি দেখলুম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি; বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, 'তোর বাড়ির ওরা সব করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস নে।' কিন্তু সেবারে তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান; সেখানে এক রাত্রি কাটাইয়া পর দিন কোন্নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে ছিল এক-আধখানি কাপড় ও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। কোন্নগরে তিনি একদিন থাকিয়া রেলভাড়া-সংগ্রহের চেষ্টা করেন; কিন্তু অত টাকা দিতে কেহই রাজী নহেন দেখিয়া অগত্যা তিনি বরাহনগরেই ফিরিয়া আসেন।

তাঁহার পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ৯ই ডিসেম্বর তিনি কলিকাতাস্থ নিজভবনে দেহত্যাগ করেন। ইহাতে সারদা মহারাজ কয়েক দিন বিশেষ শোকগ্রস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ সন্ন্যাসী হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ জনকজননীর প্রতি ভালবাসা বিসর্জন দেন নাই। তাই তিনি স্বীয় গর্ভধারিণীর সংবাদ রাখিতেন এবং তাঁহার কল্যাণার্থে তাঁহাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া

যাইতেন। তাঁহার জননী ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৯শে নভেম্বর পরলোকগমন করেন।

বরাহনগর মঠে বাসকালে স্বামীজী একদিন স্বামী সারদানন্দকে বলিলেন, "পায়ে হেঁটে নবদ্বীপ থেকে বেড়িয়ে এস না, শরৎ।" শরৎ মহারাজ বাহির হইবেন এমন সময় মহাপুরুষ ( স্বামী শিবানন্দ ) বলিলেন, "শরৎ, আমিও যাব।" শুনিয়া শরৎ মহারাজ দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে তীর্থদর্শন-মানসে ত্রিগুণাতীতজীও রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু মহাপুরুষ ও সারদানন্দ মহারাজ রাস্তায় বাহির হইয়া আর সারদা মহারাজকে দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং তাঁহাকে ফেলিয়াই তাঁহারা গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেলা বাড়িয়া সূর্য মাথায় উঠিলে তাঁহারা বিশ্রামের জন্য এক বাগানের সম্মুখে বসিলেন। অকস্মাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দজী ঐ বাগান হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "দুপ্পুর হয়েছে কিনা, তাই স্নান ক'রে পিত্তিরক্ষা ক'রে নিলাম।" "পিত্তিরক্ষা?"—উভয়ে অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিলেন। ত্রিগুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুকুরে স্নান ক'রে ভাবলুম, কি ক'রে পিত্তিরক্ষা করি? দেখলুম কচি দূর্বা রয়েছে, তাই খেয়েছি।"

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে এমনই সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতের! একসময়ে পেটের অসুখে ভুগিতেছেন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিন ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ভক্ত ডাক্তারবাবু সাধুকে স্বগৃহে পাইয়া এবং আহারে তাঁহার রুচি আছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খাবে বল?" সাধু বলিলেন, "রসগোল্লা।" তখনকার দিনের দুই-টাকার রসগোল্লা একখানি থালায় সজ্জিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি নির্বিবাদে সমস্ত শেষ করিলেন। অতঃপর কুশল প্রশ্নাদিচ্ছলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি প্রয়োজনে এলে?"

তিনি বলিলেন, "আমার পেটের অসুখ হয়েছে, তাই মহারাজ ( স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।" ডাক্তার অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "অত রসগোল্লা খেলে কেন?" সহজ উত্তর আসিল, "তা আপনি দিলেন—আমি কি করব?" পাঠক কি ইহাকে লোভ বলিবেন? সাধারণ বুদ্ধিতে তাহাই মনে হয় বটে। কিন্তু রসগোল্লার সঙ্গে ঘাসের কথাটিও মনে রাখিতে হইবে, আর ভাবিতে হইবে সিদ্ধপুরুষ প্রেমানন্দজীর বাণী। পূর্বোক্ত চিকিৎসাপর্ব বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ওর সিদ্ধাই ছিল। আমি একবার সাড়ে সাত সের ঘন দুধ ধীরে ধীরে দিতে লাগলুম—বেশ খেয়ে যেতে লাগল। আমিও থামলুম না, ও-ও থামল না। স্বামী প্রেমানন্দই আবার বেলুড় মঠে বসিয়া এক শিবরাত্রির পরদিন বলিয়াছিলেন, "রোজ একটা ক'রে কলা খেয়ে ( সারদা ) ঐ বেলতলায় সাতদিন পড়ে রইল।"

তীর্থদর্শন ও সেবাকার্যাদির সময় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ভিক্ষালব্ধ অন্নে দিনাতিপাত করিতেন। আবার সম্ভবস্থলে প্রচুর অন্ন গ্রহণ করিয়া উদরপূর্তি করিতেন বা পরিহাসচ্ছলে ভোজ্য-পরিবেশনের দৈন্য প্রমাণ করিয়া দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত করিতেন। একদা জয়রামবাটী হইতে ফিরিবার সময় একটি ছোট হোটেলে উঠিয়া সারদা মহারাজ মালিককে জানাইলেন যে, তিনি অপরের তুলনায় অধিক আহার করেন; সুতরাং পরিবেশনে যেন কার্পণ্য করা না হয়—তিনি সাধারণ হার অপেক্ষা অধিক অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন। ধর্মভীরু মালিক অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াই যথানিয়মে অভ্যাগতকে আহারে বসাইল। সারদা মহারাজ ক্ষুধিত ছিলেন, তাই বারংবার ডালভাত চাহিয়া খাইতে লাগিলেন। ক্রমে মালিকের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায় হইল। কিন্তু সাধুকে স্বীয় চিরাচরিত বিধান অনুযায়ী আহার করাইয়া তাহার একটা আত্মতৃপ্তি

লাভ হইয়াছিল; আর সেই সস্তার দিনে খরচও তেমন বেশী কিছু হয় নাই; সুতরাং ত্রিগুণাতীত মহারাজ অধিক অর্থ দিতে গেলেও সে গ্রহণ করিল না—শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সাধুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। একবার তিনি শ্রীশ্রীমাকে লইয়া জয়রামবাটীতে যাইতেছিলেন—মা ছিলেন গো-যানে এবং তিনি চলিয়াছিলেন পদব্রজে। রাত্রে গাড়িখানি রাস্তায় এমন এক গভীর গর্তময় স্থানে আসিয়া পড়িল, যেখানে উহা উল্টাইয়া যাইতে পারে কিংবা ঝাকানিতে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে। অবস্থা বুঝিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজ রাস্তার গর্তে শুইয়া পড়িয়া তাঁহার দেহের উপর দিয়া গাড়ি চালাইতে আদেশ দিলেন। ইতোমধ্যে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে তিনি কাণ্ড দেখিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া সারদা মহারাজকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আর একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বাজার হইতে ঝাল লঙ্কা কিনিয়া আনিতে বলিলে তিনি বাগবাজার হইতে লঙ্কা চাখিতে চাখিতে পায়ে হাঁটিয়া বড়বাজারে গিয়া ঠিক ঠিক ঝাল লঙ্কা পাইয়া কিনিয়া আনিলেন। ততক্ষণে জিহ্বা ফুলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীমা যখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে ছিলেন, তখন সেবক সারদা মহারাজ সন্ধ্যাবেলায় একখানি পরিষ্কার কাপড় শেফালিকা গাছের তলায় পাতিয়া রাখিতেন, যাহাতে শেষরাত্রে-ঝরা শিউলি ফুলে মা ঠাকুরের পূজা করিতে পারেন। কলিকাতা ও জয়রামবাটীতে তিনি অন্য বহুভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁহার অদ্ভুত সাহসের কথা। কোন্ সময়ের ঘটনা জানা নাই—তবে উহা তাঁহার যৌবনপ্রারম্ভেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ভূত আছে, ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না। অথচ সকলের মুখেই ভূতের গল্প শুনিতে পান। একদিন শুনিলেন দ্বিপ্রহর

রাত্রিতে একটি পুরাতন বাড়িতে গেলে অবশ্যই ভূত দেখা যাইবে। অমনি সেখানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মধ্যরাত্রিতেও কিছু না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে এক ক্ষীণ আলো উঠিতে দেখিলেন। উহা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল এবং তাহার মধ্য হইতে একটি প্রকাণ্ড চক্ষু যেন তাঁহার দিকে ভীষণভাবে অগ্রসর হইতে থাকিল। ইহা দেখিয়াই তাঁহাব সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, আর রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। তিনি প্রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎস, যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত, সে-সব কাজ বোকাব মতো কেন কর ? আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে !"

বরাহনগর মঠে এক রাত্রে ব্রহ্মানন্দজী, সুবোধানন্দজী ও ত্রিগুণাতীতজী একশয্যায় নিদ্রিত আছেন, এমন সময় ত্রিগুণাতীতের মনে নির্জন শ্মশানে যাইয়া তান্ত্রিক সাধনা করিবার বাসনা জাগিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহের বাহিরে চলিলেন। এদিকে ব্রহ্মানন্দজী স্বপ্নযোগে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে সারদা, যাসনি, যাসনি।" সে শব্দে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তাহারা দেখিলেন যে, সারদা মহারাজ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মানন্দজী কহিলেন যে, স্বপ্নে ঠাকুর ঐভাবে ত্রিগুণাতীতকে নিষেধ করিতে বলিয়াছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের তন্ত্রসাধনার এখানেই পরিসমাপ্তি হইল।

বরাহনগরে একসময়ে ত্রিগুণাতীত মহারাজ একবার একটি ছোট ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এরূপ অবিরাম জপধ্যান আরম্ভ করিলেন যে, আহারনিদ্রাও ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং অপর সকলে তাঁহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, এমন কি জোর করিয়াও ধরিয়া আনিতে

চাহিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে তিনি বলিলেন যে, মহাপুরুষ শিবানন্দজী যদি আহারের সময় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন, তবে উহাই তাঁহার জপের সদৃশ হইবে এবং ঐ ভাবে তিনি অন্নগ্রহণ করিবেন। অগত্যা তাহাই হইল।

আঁটপুরে বড়দিনের রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ ত্যাগ-বৈরাগ্যের আলোচনায় যে অনাবিল আনন্দ পাইয়াছিলেন, উহার স্মরণার্থে এবং যীশুর প্রতি ভক্তি-নিবেদনের জন্য ত্রিগুণাতীত মহারাজ অতঃপর প্রতি বৎসর বড়দিনের পূর্ব রাত্রে একটি ছোট উৎসব করিতেন। ফলতঃ তাঁহার অনুকরণে আজও বেলুড় মঠে ও মঠের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আশ্রমে যথারীতি যীশুর এই জন্মরাত্রিটি প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

তীর্থদর্শনবাসনা তাঁহার মনে সর্বদাই ছিল। তাই তিনি সুযোগ পাইয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কোন এক দিন উত্তর ভারতের তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেইবারে তিনি কাশীধাম, চুনার, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, কানপুর, বিঠুর ( ব্রহ্মাবর্ত ) প্রভৃতি স্থানে তত্রত্য দেবদেবীর পুণ্যদর্শন লাভ করেন। প্রয়াগে তিনি দশ-বার দিন জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। ক্রমে এটোয়াতে আসিয়া তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর উভয়ে এক সঙ্গে আগ্রা ও মথুরা দর্শনানন্তর গোবর্ধনে 'দীপমালার মেলা' দেখিতে গেলেন এবং তদনন্তর যতিপুরে 'অন্নকূটের মেলা' দেখিয়া শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দর্শনান্তে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। ইহার পরে মথুরা পর্যন্ত একসঙ্গে থাকিয়া অখণ্ডানন্দজী আগ্রা যাত্রা করিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত করোরী ও জয়পুর হইয়া পুষ্করাভিমুখে চলিলেন ( ডিসেম্বর, ১৮৯১ )। পুষ্করে তাঁহাদের পুনর্মিলন হইল এবং দুই জনে একসঙ্গে আজমীরে আসিয়া তথাকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলেন। কিন্তু একদিনে সমস্ত দেখার কঠোর পরিশ্রমে ত্রিগুণাতীত মহারাজ জ্বরে শয্যাগত

হইলেন ; সে জ্বর সারিতে সতর- আঠার দিন কাটিয়া গেল। আরোগ্যান্তে তিনি একাই বোম্বাই যাইবার সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ চিতোরের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিলেন।

একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভগবানও তাঁহাকে বহু আপদ-বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন। একবার অন্ধকার রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে পথ দেখিতেও অক্ষম হইয়া তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন। নিকটেই রেলস্টেশন থাকিলেও তিনি জানিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে অচিরেই স্টেশনের দ্বারোয়ান লণ্ঠনহস্তে বাড়ি যাইবার পথে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া নিজগৃহে লইয়া গেল।

নানাস্থান ভ্রমণান্তে ত্রিগুণাতীত মহাবাজ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় মন্দিবাদি-দর্শনানন্তর জাহাজে পোরবন্দব বা সুদামাপুরী-দর্শনে চলিলেন। সেখানে ৺হাটকেশ্বব মন্দিরে একদল হিংলাজ-যাত্রী সন্ন্যাসী অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা অকস্মাৎ এই বাঙ্গালী সাধুকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ; কারণ এখন তাঁহার সাহায্যে রাজপ্রাসাদে অবস্থানকারী অপর বাঙ্গালী সাধুকে ধরিয়া রাজার নিকট হইতে আবশ্যকীয় পাথেয় সংগ্রহের পথ সহজ হইয়া গেল। কে এই দ্বিতীয় বাঙ্গালী সাধু ? সাধুদেব কথায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের অনুমান হইল, হয়তো বা ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। তথাপি সন্ন্যাসীদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি ভিক্ষাথী হিসাবেই তাঁহাদের সহিত ঐ রাজপ্রাসাদনিবাসী সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, তাঁহার অনুমান সত্য। কিন্তু স্বামীজী দৃঢ়ভাবে জানাইলেন, "পয়সার জন্য আমি কাকেও বলতে পারব না। তোর কাছে যা আছে, সব দিয়ে দে।" স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাই করিলেন এবং সাধুদের বিদায় দিয়া স্বামীজীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত

হইলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া তিনি হাটকেশ্বর মন্দিরে ফিরিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে অন্যত্র যাইবার জন্য পুঁটুলি বাঁধিতেছেন, এমন সময় স্বামীজী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নিজ আবাসস্থলে লইয়া গেলেন এবং দুই-তিন দিন পরে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ বাটীতে কয়েক দিন থাকিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজ আবার ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হন এবং তীর্থদর্শন করিতে করিতে ক্রমে কলিকাতায় উপনীত হন।

এই সময় একটি ঘটনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সদ্বংশসুলভ অমায়িক ব্যবহারের পরিচয় পাই। কালীকৃষ্ণ মহারাজ ( স্বামী বিরজানন্দ ) মঠে যোগদান করিলে তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে বাড়িতে ফিরাইবার জন্য একদিন মঠে আসেন। পরন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীতের আসন ও তামাক-প্রদান এবং মধুর আলাপনে তিনি বুঝিতে পারেন যে, নাতিটি সাধুপ্রকৃতির যুবকদের সহিতই আছে। ইহাতে তাঁহার খেদ মিটিয়া যায় এবং তিনি নির্বিবাদে গৃহে ফিরিয়া যান।

ত্রিগুণাতীত মহারাজের তীর্থভ্রমণস্পৃহা তখনও চরিতার্থ হয় নাই। সুতরাং কয়েক বৎসর পরে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের লাদাখ, কৈলাস ও মানসসরোবর-দর্শনে যাত্রা করিলেন। এই দুর্গম রাস্তায় তাঁহাকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি যেন দৈবসহায়েই উদ্ধার পাইয়াছিলেন। একদিন পথ চলিতে চলিতে ঠিক সন্ধ্যাসমাগমে এক বিস্তীর্ণ খরস্রোতা পার্বত্য নদীর তীরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, পার হইবার জন্য একটি পুরাতন বাঁধমাত্র আছে; তাহাও মধ্যে মধ্যে ভগ্ন। জ্যোৎস্নার আলোকে কোন প্রকারে উহারই উপর দিয়া চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ভগ্নস্থানগুলি উল্লম্ফনপূর্বক অতিক্রম করিতে থাকিলেন। এইভাবে চলিয়া

সবেমাত্র মধ্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় একখানি কালোমেঘ উজ্জ্বল চন্দ্রমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করায় অমানিশার মতো চারিদিক সম্পূর্ণ তিমিরাবৃত হইল। অন্ধকারে এই বাঁধের উপর দিয়া এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; মনে মনে শুধু ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "আমার অনুসরণ কর।" হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কলের পুতুলের মতো চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নদীর অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে কালো মেঘখানি সরিয়া যাওয়াতে চাঁদের আলো পরিষ্কারভাবে চারিদিকে ছাড়াইয়া পড়িল; তথাপি নদীর তীরে তিনি কোন লোকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

আর একবার পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণকালেই তিনি একদিন চলিতে চলিতে একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহার পার্শ্বেই একটি বহু পুরাতন জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরের সম্মুখে চতুর্দিকে প্রাচীরাবৃত একটি ছোট প্রাঙ্গণ। তিনি শুনিতে পাইলেন, সূর্যাস্তের পরে এই মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কেন না রাত্রিতে কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কেহ মন্দিরের মধ্যে থাকিলে মশকদংশনে তাহার জীবনসংশয় হয়। এইরূপ অদ্ভুত কথার সত্যতাপরীক্ষার জন্য তিনি গ্রামবাসীদের নিষেধ সত্ত্বেও সূর্যাস্তে মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িলেন। তাহার পর সত্যসত্যই কৃষ্ণমেঘ-সদৃশ মশকপুঞ্জ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কম্বলাবৃত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সারা রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলেন।

কৈলাস, মানসসরোবর ও লাদাখ হইতে ফিরিয়া তিনি প্রায়শঃ

কলিকাতায় থাকিতেন; কারণ প্রথমে তাঁহার জ্বর হয়; তারপর ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিতে হয় এবং অতঃপর 'উদ্বোধন' পত্র-প্রকাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রয়াসের সংবাদে আনন্দিত হইয়া স্বামীজী আমেরিকা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার বিশেষ সাহায্য করবে—সে মতলবটা মন্দ নয়।" অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পত্র-প্রকাশ তখনই সম্ভব হয় নাই—উহা বাহির হইয়াছিল কয়েক বৎসর পরে। কলিকাতায় অবস্থানের এই সুযোগে ত্রিগুণাতীত মহারাজ নানাস্থানে পর্যায়ক্রমে গীতা-উপনিষদাদি ব্যাখ্যা করিতেন এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ২২।১২।৯৫ তারিখ হইতে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' পত্রে তাঁহার তিব্বতভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারই মধ্যে তিনি আবার যুবকদের চরিত্রগঠনের জন্য কলিকাতার তিনটি পাড়ায় তিনটি 'ব্রহ্মচর্য কেন্দ্র' স্থাপনপূর্বক তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতে থাকেন। তিনি তখন খুব পড়াশোনা করিতেন। অথচ অবকাশ বেশী ছিল না। তাই গুছাইবার সময়াভাবে তাঁহার শয্যার চারিপার্শ্বে বহু শাস্ত্রাদি গ্রন্থ স্তূপাকার হইয়া থাকিত।

কলিকাতায় ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের বাড়িতে থাকার সময় স্বামী ত্রিগুণাতীতের ভগন্দর হয় এবং ক্লোরোফর্ম-সংযোগে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন দেখা যায়; কিন্তু তিনি সজ্ঞানে অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে পারিবেন বলায় ডাক্তার উহাতেই স্বীকৃত হন। তদনুসারে তাঁহার দেহে প্রায় অর্ধঘণ্টা অস্ত্রচালনা করা হয় এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমাণ কাটা হয়; তথাপি তিনি কোন যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের করালমূর্তি প্রকটিত হইলে অখণ্ডানন্দজী মহুলায় সেবাকার্যে ব্রতী হন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট

লেভিঞ্জ সাহেব ঐ কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া একটি সভা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। ঐ উপলক্ষ্যে মিশনের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের জন্য ত্রিগুণাতীত মহারাজ মহুলায় প্রেরিত হন। মহুলা হইতেই তাঁহাকে সাহায্যকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দিনাজপুরের নিকটবর্তী বিরোল গ্রামে যাইতে হয়। সেখানে তিনি নিজে ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করিতেন এবং গৃহে গৃহে যাইয়া চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিতেন। সাফল্য ও সুনামের সহিত কার্যসমাপনান্তে তিনি কলিকাতায় আসেন।

এদিকে স্বামীজী প্রথমবারে (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) স্বদেশে ফিরিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য একখানি সাময়িক পত্র-পরিচালন আবশ্যক। দৈনিক পত্র স্বামীজীর মনঃপূত হইলেও অর্থাভাবে পাক্ষিক পত্র-প্রকাশের প্রস্তাবই গৃহীত হইল। উহার নাম রাখা হইল 'উদ্বোধন'। স্বামীজী উহার জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন মিত্র আর এক সহস্র ধার দিলেন। অতঃপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ (১৮৯৯ খ্রীঃ, জানুয়ারী) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পরিচালনায় 'উদ্বোধনের' নিজস্ব ছাপাখানা[৩] হইতে ঐ পত্র বাহির হইল। এই কার্যে তাঁহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বামীজীর আদেশ ছিল যে, মূলধন ভাঙ্গা চলিবে না। এদিকে অর্থাভাবে কর্মচারী নিয়োগ করা চলে না, নিজের আহারাদিরও সুব্যবস্থা অসম্ভব। পরিস্থিতি এইরূপ প্রতিকূল হইলেও অক্লান্তকর্মা ত্রিগুণাতীত মহারাজ কখনও ভক্তগৃহে ভিক্ষা করিয়া, কখনও অনশনে থাকিয়া অথবা পদব্রজে পাঁচ ক্রোশ পথ চলিয়া একাই সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন। ছাপাখানায় দক্ষ কর্মচারী নাই; যাহারা আছে, তাহারাও নিয়মিত আসে

৩ স্বামীজীর জীবদ্দশায়ই ছাপাখানাটি বিক্রয় হইয়া যায়।

না। ত্রিগুণাতীত মহারাজ অনেক সময় তাহাদিগকে গৃহ হইতে ছাপাখানায় টানিয়া আনিতেন, অথবা নিজেই ছাপার অক্ষরসন্নিবেশ ও অশুদ্ধিসংশোধন প্রভৃতি করিতেন। ক্লান্ত দেহ পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, এই ভয়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তিনি কাজ করিতেন। এতদ্ব্যতীত বাড়ি বাড়ি যাইয়া প্রবন্ধ যোগাড় করা, কাগজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া, নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করা—ইত্যাদি যাবতীয় কার্যে তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। রোগের সময়েও তাঁহার অব্যাহতি ছিল না। জ্বর-গায়ে সকালে উঠিয়াই হয়তো বাহিরে গেলেন। নানা প্রয়োজনে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া যখন গৃহে ফিরিলেন তখন হয়তো জ্বর এত বাড়িয়াছে যে, শয্যাগ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই। অথচ পর দিবস আবার একই ভাবে কাজ চলিতে থাকিত।[৪]

এত ব্যস্ততার মধ্যেও বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কাহারও অসুখ হইলে তিনি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অম্লানবদনে সেবা করিতেন। যোগানন্দজীর শেষ অসুখের সময় তিনি দিনে কম্বুলিয়াটোলায় 'উদ্বোধন'-প্রেসের কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রে গুরুভ্রাতার সেবা করিতেন। ছাপাখানায় একজন কর্মচারীর হঠাৎ কলেরা হইলে তিনি তাহার চিকিৎসাদির সমস্ত ব্যবস্থা তো করিলেনই, অধিকন্তু স্বহস্তে সেবাভার গ্রহণপূর্বক তাহাকে নিরাময় করিলেন।

এদিকে তুরীয়ানন্দজী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলে স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। তদনুসারে যাইবার

---

৪ স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন কাশীধামে তপস্যা করিতেছিলেন, পরে কর্তৃপক্ষের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তিনি ত্রিগুণাতীত মহারাজের অধীনে ঐ কার্যে যোগদান করেন। তদবধি দীর্ঘকাল তিনি ঐ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং পরে সম্পাদনাদিরও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন সময়ে স্বামীজী দেহত্যাগ করিলেন। তাই আকস্মিক বিপদে সকলে মুহ্যমান হইয়া পড়ায় তাঁহার বিদেশযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রহিল। পরে ঐ বৎসর নভেম্বরের প্রারম্ভে মাদ্রাজ, কলম্বো ও জাপান হইয়া তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো অভিমুখে চলিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, আমেরিকায় দেশী পোশাক ব্যবহার এবং নিরামিষ আহার করিবেন। এমন কি, সে দেশে শাক-সব্জি পাওয়া যাইবে কি না ইহা জানা না থাকায় শুধু রুটি ও চিনি খাইয়াই থাকিবার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হইলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী জাহাজ সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরে পৌঁছিলে স্থানীয় বেদান্ত-সমিতির সভ্যগণ তাঁহাকে সাদরে সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম্. এইচ. লোগানের গৃহে লইয়া গেলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে সি. এফ. পীটার্সন-দম্পতির গৃহ তাঁহার প্রধান কার্যকেন্দ্র হইল এবং সেখানে পুরাতন ও নূতন ছাত্রদিগকে লইয়া নিয়মিতভাবে বেদান্তালোচনা চলিতে লাগিল। ক্রমে কার্য বর্ধিত হওয়ায় ৪০নং স্টুনার স্ট্রীটের একটি ভাড়াবাড়িতে উঠিয়া গেলেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে গীতা ও উপনিষদাদি-ব্যাখ্যার সঙ্গে একটু-আধটু ধর্মসঙ্গীতেরও ব্যবস্থা হইল। তাঁহার সুনাম প্রচারিত হওয়ায় অচিরেই দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার অন্তর্গত (৪২৫ মাইল দূরবর্তী) লস্ এঞ্জেলিস্ নগর হইতে তাঁহার নিকট বেদান্তপ্রচারের আহ্বান আসিল। অতএব ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সেখানেও তিনি বক্তৃতাদি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একা উভয় কার্য চালানো অসম্ভব জানিয়া ঐ বৎসরের শেষে স্বামী সচ্চিদানন্দকে বেলুড় মঠ হইতে আনাইয়া তাঁহার উপর লস্ এঞ্জেলিসের কার্যের ভার দিলেন।

ঐ বৎসর সানফ্রান্সিস্‌কোর কাজ এত বৃদ্ধি পাইল যে, নিজস্ব ভূমিতে বেদান্ত সমিতির গৃহাদি নির্মিত না হইলে আর চলে না।

সেজন্য বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ভূমিসংগ্রহান্তে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট তথায় হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্ত্য জগতে ইহাই প্রথম হিন্দু-মন্দির। *কথাটা আজ যেরূপ সহজ সরল মনে হইতেছে, স্বামী ত্রিগুণাতীতের সময় সেরূপ ছিল না। পাশ্চাত্ত্যের প্রতিকূল বা উদাসীন মনোভাবের সম্মুখে এইরূপ একটা প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হওয়া তখন দুঃসাহস বা কল্পনাবিলাস ব্যতিত আর কিছুই ছিল না। অথচ ত্রিগুণাতীত মহারাজের অতুলনীয় উদ্যম ও উদ্দীপনায় আমেরিকার নরনারীই প্রচুর অর্থব্যয়ে বৈদেশিক ও অপরিচিত ভাবধারার স্থায়ী প্রতীকস্বরূপে গড়িয়া তুলিল এই হিন্দু-মন্দির, আর তাহারাই হইল ইহার পৃষ্ঠপোষক। স্বামী ত্রিগুণাতীতের কিন্তু ইহার উপর কোন দাবী-দাওয়া ছিল না। তিনি বলিতেন, "বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর এই মন্দির-নির্মাণে আমার যদি এতটুকু স্বার্থ থাকে, তবে এ নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু এ যদি ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ হয়, তবেই টিকে থাকবে।" আর বলিতেন, "এটি ভোগ করতে আমি বেশী দিন থাকবো না; পরে যারা আসবে তারাই ভোগ করবে।" ত্রিগুণাতীত মহারাজ আজ নাই; কিন্তু আজও এই মন্দির মার্কিন দেশে সগৌরবে মস্তক তুলিয়া বেদান্তের সার্বভৌমিকতা ও প্রতিষ্ঠাতার গুরুভক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী প্রায় তিন শত নরনারীর উপস্থিতিতে হিন্দুপ্রথানুযায়ী পূজা ও আরাত্রিকের পর মন্দিরটি মানবকল্যাণার্থে উৎসর্গীকৃত হয় এবং ১৫ই জানুয়ারী সর্বপ্রথম উপাসনা আরম্ভ হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীতের ইচ্ছা ছিল যে, মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজকে আমেরিকায় লইয়া যাইবেন, কিন্তু নানা কারণে মহারাজের যাওয়া হয় নাই।

মন্দির নির্মাণের পর বেদান্ত-সমিতি নিঃস্ব হইয়া গেল। তদুপরি ১৯০৮-খ্রীঃ মে মাসে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে নগরবাসী বন্ধুবান্ধব ও

সমিতির সভ্যগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সমিতির আয় হ্রাস পাইল। ত্রিগুণাতীত মহারাজ ইহাতেও দমিলেন না। এমন কি, অভেদানন্দজী সংবাদ পাইয়া নিউইয়র্ক হইতে যখন সাহায্যের প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের প্রয়োজন হইলে তোমাকে জানাইব।··· আমরা আমাদের সকল খরচ কমাইয়া দিয়াছি এবং এখানকার রিলিফ কমিটির ( সাহায্য-সমিতি ) নিকট হইতে প্রচুর খাদ্য পাইতেছি।" বস্তুতঃ আত্মনির্ভরশীল ত্রিগুণাতীত ঐ দুরবস্থার মধ্যেও সমিতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং উহার উন্নতিসাধন করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে প্রকাশানন্দজী সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহায়তা করিতে থাকিলে কার্যের সর্বাঙ্গীণ প্রসারই হইতে লাগিল।

ইহার পর তাঁহার লক্ষ্য হইল, মন্দিরের সংলগ্ন বাসকক্ষগুলিকে অবলম্বন করিয়া আশ্রম-জীবন গড়িয়া তোলা এবং তাহাতে পাশ্চাত্ত্য-বাসীকে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। ক্লাশ ও বক্তৃতাদিতে যে-সকল ছাত্র আসিত তাহাদেরই প্রায় দশজনকে লইয়া আশ্রমের সূত্রপাত হইল। এই সংখ্যা মধ্যে মধ্যে বর্ধিত হইলেও গড়ে দশজনই আশ্রমে থাকিত। সুশৃঙ্খলাপ্রিয় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ইঁহাদের জীবন হিন্দুভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করতে যত্নপর ছিলেন। ছাত্রেরা পূর্বেরই ন্যায় জীবিকা অর্জন করিত এবং আশ্রমের ব্যয়নির্বাহের জন্য যথাশক্তি অর্থসাহায্য করিত। তদুপরি আশ্রমের যাবতীয় কার্য তাহারাই সম্পন্ন করিত। প্রত্যূষে চারিটায় উঠিয়া তাহারা ধ্যানে বসিত; তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করা, ফুলবাগানে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত হইত। এই সমস্ত কার্য যাহাতে তাহারা একটা উচ্চ-ভাবের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং ঐসকল করিয়া যাহাতে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, তৎপ্রতি ত্রিগুণাতীত মহারাজ সবিশেষ দৃষ্টি

রাখিতেন। সকাল ও সন্ধ্যায় আহারের সময় তিনি তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং ব্রহ্মচারীরাও বিভোর হইয়া শুনিত। কখনও বা ধুনি জ্বালাইয়া মুক্তাকাশের নিম্নে গভীর ধ্যান চলিত। আবার সপ্তাহে একদিন উপবাস ও নির্জনে সাধনেরও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক ছিল না। ঐ সময়ে অনেকের বিবিধ অনুভূতি হইত। ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও যত্নবহুল ঈদৃশ জীবন কঠোর হইলেও ছাত্রগণ ইহা স্বেচ্ছায় বরণ করিত। এই সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতের শ্রীমুখ হইতে বহু মূল্যবান বাণী নির্গত হইয়া তাহাদিগকে সাধনপথে শক্তিপ্রদান করিত। তিনি বলিতেন;"Live like a hermit, but work like a horse" (সাধুর মতো জীবন যাপন কর, কিন্তু ঘোড়ার মতো খাট); "Do or die, but you will not die" (মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন, কিন্তু শরীর যাবে না নিশ্চয়); "Do it now" (এখনই এটা কর); "Watch and pray" (সদা সাবধান থেকে প্রার্থনা কর)—এইসব কথা লিখিয়া তিনি ব্রহ্মচারীদের গৃহের প্রাচীরে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি সঙ্গীত ভালবাসিতেন এবং মনে করিতেন যে, উহা সাধনার এক উত্তম সহায়। অতি প্রত্যূষে তিনি ব্রহ্মাচারীদের লইয়া নানাবিধ ভক্তিরসাত্মক গান ও স্তোত্রাদিতে সময় কাটাইতেন। কখনও কখনও ছাত্রদের লইয়া মঠ হইতে মাত্র অর্ধ মাইল দূরে সানফ্রান্সিস্‌কো উপসাগরতীরে উপস্থিত হইতেন এবং অরুণোদয়ের প্রাক্কালে তাঁহাদের মিলিতকণ্ঠ হইতে উত্থিত সঙ্গীতলহরী সমুদ্র-বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে দূরে প্রসারিত হইত। তখন হয়তো কোন ধীবর মৎস্য ধরিতে মাত্র যাত্রা করিয়াছে, হয়তো কোন অর্ণবপোত ঐ পথে গমনে উদ্যত হইয়াছে। প্রাতঃসমীরে সঞ্চালিত সেই মধুর বিশুদ্ধ সঙ্গীতশ্রবণে ধীবর ও নাবিকেরা ক্ষণেকের জন্য এক অলৌকিক রাজ্যের সন্ধান

পাইয়া মুগ্ধ অন্তঃকরণে শ্রবণ করিত আর মৌনবিস্ময়ে আশীর্বাদ করিত।

স্বামী ত্রিগুণাতীত শুধু কথায় নহে, নিজের জীবন দিয়া দেখাইতেন, সাধুর চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত। তিনি সকলের সঙ্গে বিবিধ কার্য করিতেন এবং ব্রহ্মচারীদের জন্য স্বহস্তে রান্না করিতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সাধুর স্পর্শে অন্নের মধ্য দিয়া অপরের হৃদয়ে সাধুভাব সঞ্চারিত হয়। সমস্ত দিন এইভাবে পরিশ্রমের পর তিনি সকলের শেষে আফিসের মেঝেতে সামান্য বিছানায় শয়ন করিতেন। কিন্তু সকালবেলা ছাত্রেরা আশ্চর্য হইয়া দেখিত যে, তাহাদের শয্যা-ত্যাগের বহু পূর্বে তিনি উঠিয়া নিত্য-কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহা একদিনের কথা নয়, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ চলিয়াছিল। কিভাবে এই নবাগত ছাত্রদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়, কিভাবে তাহাদের ভিতর প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়—এই সব চিন্তাই যেন তাঁহাকে একেবারে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের বলিতেন, "তোমাদের টেনে হিঁচড়ে সেই অমৃতসাগরের তীরে নিয়ে যেতে এবং তার গর্ভে ফেলে দিতে চাই—তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু তাতে যদি তোমাদের হাড়-গুলি এক একটি করে ভেঙ্গে ফেলতে হয়, তবুও আমি এতটুকু দ্বিধা-বোধ করব না।" কিন্তু কার্যতঃ তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না। পাছে এরূপ উচ্চ ভূমিতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে অবসাদ উপস্থিত হয়, সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে বিবিধ চিত্তবিনোদনেরও আয়োজন করিতেন এবং স্বয়ং উহাতে যোগদান দিয়া ব্রহ্মচারীদের হৃদয়ের গুরুভার দূর করিতেন। তাঁহার জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা ও রঙ্গ-প্রিয়তা মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিত। একদা তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইবে। উৎসুক জনতা

সে রহস্য ভেদ করিতে সমবেত হইয়া দেখিল যে, যথাকালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণকীর্তন করিয়া তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। তাঁহার তদানীন্তন জীবন সর্বদাই এই প্রকার ভাবসংক্রমণে ব্যাপৃত থাকিত। সন্দেহাকুল মন লইয়া যাহারা আসিত, অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিদ্বারা তাহাদের সন্দেহের নিরাস না হইলেও তাঁহার ঐকান্তিকতায় তাহারা অভিভূত হইত ; তাহারা অবাক হইয়া দেখিত যে, এই একটি জীবন সর্বতোভাবে ভগবান্-লাভের জন্য এবং অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই উৎসর্গীকৃত। অধিকারিভেদে তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেন। কেহ হয়তো আসিয়া বলিল, সে নির্জনে সাধুজীবন যাপন করিতে চায়। ব্যবস্থা হইল, ঐ ব্যক্তিকে কয়েক মাস আশ্রমের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে অবস্থানপূর্বক নির্জন বাসের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। তাহাকে হয়তো একই ঘরে অপর অনেকের সহিত থাকিতে হইল। সে ভাবিল, এ আবার কিরূপ বিধান? শুধু তাহাই নহে, দিনে দুইবার উত্তম স্বাস্থ্যপ্রদ আহারের ব্যবস্থা হইল। ফলতঃ তাদৃশ জীবনে কঠোরতার কিছু নাই দেখিয়া যখন সে বিফলমনোরথ হইতে বসিয়াছে, তখন অকস্মাৎ তাহার চিত্তে অনুভূতি জাগিল যে, সাধকজীবনের কঠিনতম সাধনা হইতেছে দশের সংসর্গে দশবিধ সংঘর্ষে আসিয়াও আপন অহমিকাকে সংযত রাখা। অপর কেহ হয়তো এতটা সহ্য করিতে না পারিয়া অভি-যোগ জানাইত। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিতেন, "তুমি না সংযম শিখতে চেয়েছিলে?" উত্তর আসিত, "ঠিক বটে ; কিন্তু এতটা নয়।" তারপর সে হয়তো মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। শেষ পর্যন্ত যাহারা টিকিয়াছিল, তাহারাই মাত্র জীবনে এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে ঐ দিনগুলির স্মৃতি সানন্দে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল।

ভোগমগ্ন পাশ্চাত্ত্যে এইরূপ উচ্চ আদর্শ কয়জন বুঝিতে বা ধরিয়া

থাকিতে পারে ? সুতরাং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নানা কারণে ব্রহ্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অবশেষে অতি অল্পমাত্রে পর্যবসিত হয় এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর ঐ বিভাগের কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। নারীদের জন্যও তিনি একটি মহিলাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ আশ্রমেও পুরুষদের ন্যায় নারীরা সাধনায় রত থাকিতেন। কিছুদিন পরে উহাও উঠিয়া যায়।

উল্লিখিত ছাত্রগণের মধ্যে একজন পূর্বে ছাপাখানায় কাজ করিত। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন ; ছোট প্রেস কিনিয়া ঐ ছাত্রের সাহায্যে রবিবারের বক্তৃতাদি ও বিজ্ঞাপনাদি ছাপাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে 'ভয়েস্ অব্ ফ্রিডম্' (মুক্তির বাণী) নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই পত্র বাহির হইতে থাকে। ইহাতে বেদান্তের আদর্শ সম্বন্ধে নানাবিধ সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি থাকিত। 'কথামৃতের' অনুবাদও তখন ঐ কাগজে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। তিন বৎসরের মধ্যেই কাগজখানি চারিদিকে খুব প্রচারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সান্ আন্টোন্ উপত্যকায় যে 'শান্তি-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, স্বামী ত্রিগুণাতীত উহাকেও ভুলেন নাই। সান্‌ফ্রান্সিসকো আগমনের অল্পকাল পরেই তিনি কয়েক জন ছাত্রকে লইয়া সেখানে গমন করেন এবং নানাবিধ উৎসব, ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রপাঠাদিতে কয়েক দিন অতিবাহিত করেন। পরে তিনি প্রতি বৎসর সেখানে যাইয়া কিছুদিন বাস করিতেন। তাঁহার একজন শিষ্য সূত্রধরের কাজ জানিত। সে তাঁহার আদেশে শান্তি আশ্রমে বাস করিতে থাকে এবং দুই-একটি নূতন বাটীনির্মাণের দ্বারা ও অন্যান্য ভাবে আশ্রমের উন্নতিসাধন করে। স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত

যাঁহাদের শান্তি-আশ্রমে বাস করার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাঁহারা উচ্চাঙ্গের সাধনার আস্বাদ পাইয়া এবং বিবিধ অনুভূতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শান্তি-আশ্রমের দিনগুলি ছিল একটানা একনিষ্ঠ সাধনায় পরিপূর্ণ। তিনি সর্বতোভাবে তুরীয়ানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

হিন্দু-মন্দিরেই হউক, কিংবা শান্তি-আশ্রমেই হউক, স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রতিকার্য ভগবদ্ভাবে ভাবিত ছিল—তিনি যাহা কিছু করিতেন সমস্তই ঠাকুরের জন্য। তিনি তাঁহার কয়েকটি শিষ্যকে প্রচারকরূপে গড়িবার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের কার্যপ্রণালীরও কতক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ধারণা ছিল এই যে, প্রত্যেকটি বক্তৃতা বা পাঠ হইবে বেদান্তকে জীবনে পরিণত করার একটি অবলম্বনমাত্র; ঐ বক্তৃতাদির সাহায্যে প্রচারক স্বীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর সেবা করিবেন; তাহার নিজের মনে কোনরূপ অহমিকা স্থান পাইবে না। প্রচারককে ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহারই দানস্বরূপে তাঁহারই নিকট হইতে প্রতিদিনের বক্তব্য শিখিয়া লইতে হইবে। ইহার উপায় হইতেছে প্রার্থনা ও শরণাগতি। পুস্তকাদির স্থান এবংবিধ প্রস্তুতির পক্ষে অতি নিম্নে। অকপট হৃদয়ে বৃত্তিশূন্য হইয়া এবং সাফল্য ও বৈফল্যে উদ্বেগ বিদূরিত করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তবেই চিত্তে যথার্থ তত্ত্বালোক উদ্ভাসিত হইবে। পূর্ণ অর্ধঘণ্টা এইভাবে ধ্যানের পর লব্ধ তথ্যগুলিকে শ্রীভগবানেরই পাদপদ্মে অর্পণান্তে তাঁহারই আশীর্বাদস্বরূপে আবার তাঁহারই নিকট উহা চাহিয়া লইতে হইবে। বিষয়নির্ধারণের জন্য এই পথই অবলম্বনীয় এবং নির্ধারিত বিষয়ে আলোকসম্পাতের জন্যও ইহাই অনুসরণীয়। সর্বশেষে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া মনে করিতে হইবে যে, ভগবানকেই শোনানো হইতেছে। ইহাই হইল স্বামীজীর

প্রদর্শিত 'কার্যে পরিণত বেদান্তে'র এই ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রায়ই বলিতেন, "বিক্ষিপ্ত মন কখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।" "চারদিকে ভগবান্‌কেই দেখতে সচেষ্ট থাক ; সর্ব বস্তু ঈশ্বরীয় রসে অনুলিপ্ত দেখ, তাহলেই তোমার মন শুধু তাঁরই চিন্তা করবে।"

১৯০৭ অব্দের মধ্যেই তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর বিদ্বৎসমাজে কিরূপ সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এক বিশিষ্ট ঘটনায় প্রমাণিত হয়। ঐ বৎসর ১১ই এপ্রিল ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্ থিয়েটারে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' অভিনীত হয়, থিয়েটারে দশ সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। গ্রীসীয় প্রথানুসারে পাহাড়ের সানুদেশে মুক্ত আকাশতলে মঞ্চের সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকারে প্রস্তরনির্মিত আসনগুলি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বেঞ্জামিন্ আইডি হুইলার দক্ষিণ দিক দিয়া এবং ত্রিগুণাতীতানন্দ ও প্রকাশানন্দ বাম দিক দিয়া ষ্টেজে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রির প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। এই থিয়েটারে প্রথমবারে অতিথি ছিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত থিয়োডোর রুজ্ভেল্ট। প্রধান অতিথি প্রবেশ করিলে সমবেত দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

এইরূপে পাশ্চাত্ত্যের আদরে এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রাণপণ উদ্যমে কার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে থাকিলেও কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং উহা নানা ব্যাধির আকর হইয়াছিল। শেষ পাঁচ বৎসর বাত প্রভৃতি কোন না কোন অসুখ লাগিয়াই ছিল। কিন্তু অসুখ হইলেও কর্মের বিরাম ছিল না। অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায়ও তিনি ছাত্রদের সংবাদ লইতে ভুলিতেন না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাঁহাকে রুগ্নদেহেও কার্য করিতে দেখিয়া জনৈক ছাত্র ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে

তিনি বলিলেন, "অত্যধিক দৈহিক যন্ত্রণার সময় ভাবি, 'এই শরীর যাক, সব শেষ হয়ে যাক!' কিন্তু শেষ তো হল না! যখনি মনে পড়ে যে মায়ের কাজ করতে হবে, তখনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে শরীরটাকে ধরে রাখি। এ শরীরটা যেন একটা খোলসের মতো হয়ে গেছে—যে-কোন সময়ে এটা খসে পড়তে পারে। গত তিন বৎসর যাবৎ শুধু ইচ্ছাশক্তি দিয়ে একে ধরে রেখেছি। যেই ছেড়ে দেব, অমনি এটা আপনা-আপনি পড়ে যাবে।"

এই বৎসর বড়দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দু-মন্দিরে সঙ্গীত, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে তিনি যত্নের ত্রুটি করেন নাই, কারণ খ্রীষ্টীয় সমাজে ইহাই প্রধানতম পর্ব। এই সময়ে তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না; তথাপি প্রত্যেক কার্যে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এদিকে বিধির বিধানে দিন ফুরাইয়া আসিল। বড়দিনের পরবর্তী রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১৪) যথারীতি ক্লাশ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিকালের বক্তৃতার সময় সকলেই উপস্থিত। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভাব্‌রা নামক এক ব্যক্তি একটি সাংঘাতিক বোমা তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারই পার্শ্বে ফেলিয়া দিল। বোমা তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া আততায়ী ভাব্‌রাকে প্রথমেই নিহত করিল। স্বামী ত্রিগুণাতীতও গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে গেলেন। ভাব্‌রা একান্ত অপরিচিত ছিল না। পূর্বে সে হিন্দু-মন্দিরে যাতায়াত করিত, কিন্তু পরে উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। অতঃপর কিয়দ্দিবস স্বামী ত্রিগুণাতীতের সান্নিধ্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবার পর সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। ইতোমধ্যে রোগের পুনরাক্রমণবশতঃ হঠাৎ হিন্দু-মন্দিরে আসিয়া উন্মত্তাবস্থায় এই অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল। ত্রিগুণাতীতজীকে

চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইবার সময় তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায়, কোথায় সে? আহা, নির্বোধ বেচারা।" শেষ সময়েও এই নির্বোধ নরঘাতীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সে যে উন্মাদ! তাহার কি দোষ! হাসপাতালে তাঁহার অশেষ যন্ত্রণার উপশমকল্পে মর্ফিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উহার ক্রিয়া কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি কিছু কিছু কথা বলিতেন। এইরূপে ২৯শে ডিসেম্বর যখন তাঁহাকে ভাব্‌রার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখনও তিনি জানাইলেন যে, তাহার সহিত কোনও মনোমালিন্য ছিল না এবং বোমা-বিস্ফোরণের কোন কারণও তিনি অবগত নহেন।

তিনি প্রায় পনর দিন হাসপাতালে ছিলেন। প্রতিমুহূর্তেই অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু কোন দিন এতটুকু কষ্টের কথা কাহাকেও বলেন নাই। বরং এই সময় তাঁহার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়িয়া উঠিবে, কিভাবে তাহারা পরার্থে সব উৎসর্গ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে—ইত্যাদি বহু উপদেশদানে তিনি তাহাদের সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। ৯ই জানুয়ারী বিকালে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত যুবক শিষ্যটিকে নিকটে ডাকিয়া নানাবিধ আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, পরদিবস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দিনে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। সত্যসত্যই পরদিন (১৯১৫ খ্রীঃ, ১০ই জানুয়ারী) বিকাল সাড়ে সাতটার সময় তিনি শ্রীগুরুপদে মিলিত হন। তাঁহার ছাত্রেরা এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে শেষ-দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। অবশেষে উপাসনাদি কার্য যথারীতি সমাপ্ত হইলে বহু লোক সমবেত হইয়া সেই পূত দেহের সৎকার করিলেন। কিছুদিন পর একদল ভক্ত ও ছাত্রেরা স্বামী ত্রিগুণাতীতের সুপবিত্র ভস্মাবশেষ লইয়া শান্তি-আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় 'সিদ্ধগিরি'তে উহা প্রোথিত করিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

# স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বনাম ছিল গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় টোলে অধ্যয়ন করিয়া 'তর্করত্ন' উপাধিলাভ করেন এবং কুলাচার্যের কাজ করিতেন বলিয়া 'ঘটক ঠাকুর' নামে পরিচিত হন। এই পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল যশোহরের নড়াইল মহকুমার ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে, কিন্তু গঙ্গাধরের জন্মের প্রায় শত বৎসর পূর্বে ইঁহারা কলিকাতা-প্রবাসী হন। তর্করত্ন মহাশয় বিশেষ শুদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গঙ্গাধরের জন্মকালে তিনি আহিরীটোলা পল্লীতে মাণিক বসুর ঘাট স্ট্রীটে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেন। এখানে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন ( ১৮৬৪ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর ), অমাবস্যা তিথিতে ( মহালয়ায় ) শুক্রবার ভাবী সন্ন্যাসী অখণ্ডানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। নিষ্ঠাবান পরিবারে জাত বালক গঙ্গাধর বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধনাদিতে রত হইলেন এবং উপনয়নের পরে স্বপাকভোজন, গীতা-উপনিষৎ-পাঠ এবং পূজা ও ধ্যানাদিতে মনোনিবেশ করিলেন।

সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি বাল্যবন্ধু হরিনাথের ( স্বামী তুরীয়ানন্দের ) সহিত বাগবাজারের দীননাথ বসু মহাশয়ের গৃহে রামকৃষ্ণের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন। ইহার পর ১৮৮৩ কিংবা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের প্রকৃত দর্শন লাভ করেন। এই কয় বৎসরে গঙ্গাধরের ধর্মভাব আরও গভীর এবং দৃঢ়মূল হইয়াছে। তিনি তখন ব্রহ্মচর্যের সমস্ত নিয়ম পালন করেন, তিনবার গঙ্গাস্নান করেন, স্বহস্তে রন্ধনপূর্বক একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন, মস্তকে তৈলমর্দন করেন না,

আর প্রাণায়াম করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গে স্বেদ ও পুলক হয়—এমন কি, গঙ্গায় ডুব দিয়া তিনি অনেকক্ষণ কুম্ভক করেন। এতদ্ব্যতীত হরিনাথের নিকট হরীতকীর প্রশংসাসূচক দুইটি শ্লোক[১] শুনিয়া ঐ বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করিতেন যে, ওষ্ঠদ্বয় সর্বদা সাদা দেখাইত।

ব্রহ্মচারী গঙ্গাধর যেদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরের সন্নিকটে গেলেন, ঠাকুর সেদিন সস্মিতবদনে তাঁহাকে বড়ই যত্নপূর্বক নিজ-সমীপে বসাইলেন এবং প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমাকে আগে দেখেছিলি?" উত্তরে গঙ্গাধর বলিলেন, "হাঁ, একেবারে খুব ছেলেবেলায় আপনাকে একবার দীনু বোসের বাড়িতে দেখে-ছিলাম।" বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে অদূরবর্তী গোপাল-দাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, শোন শোন, এ বলছে কিনা আমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল। উঃ, এর আবার ছেলেবেলায়!" ঠাকুরের নির্দেশে গঙ্গাধর সেদিন সন্ধ্যায় ৺কালী-মন্দির ও ৺বিষ্ণুমন্দিরে প্রণামান্তে পঞ্চবটীতে কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিলেন এবং তাঁহার আগ্রহে সে রাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইলেন। পরদিন গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "আবার আসিস শনিবারে।" গঙ্গাধর পরে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যাকে ভালবাসতেন, তাকে শনি-মঙ্গলবারে আসতে বলতেন, শনি-মঙ্গলবারে ধ্যানজপ অধিক করতে বলতেন। বলতেন—শনিবার মধুবার।"

---

১ হরীতকীং ভুংক্ষ্ব রাজন্ মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥
হরিং হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবীজলম্।
অন্তর্মলবিনাশায় স্মরেদ্ ভক্ষেজ্জপেৎ পিবেৎ॥

—হে রাজন্, হরীতকী ভক্ষণ কর, উহা মাতার ন্যায় উপকারী। মাতা বরং কখনও ক্রুদ্ধা হন, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কদাপি অনিষ্ট করে না। অন্তরের মলিনতা দূর করিবার জন্য শ্রীহরির স্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী জপ ও গঙ্গাজল পান করিবে।

অল্প কয়েক দিন পরেই গঙ্গাধর এক শনিবারে ঠাকুরের নিকট দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইলে তিনি গঙ্গাধরকে একখানি মাদুর দিয়া উহা পশ্চিমের বারান্দায় পাতিতে বলিলেন। পরে একটা বালিশ আনিয়া উহাতে শুইলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গাধরকে সুখাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। আসনের উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন, "একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার এমনি ( টান ) হয়েও বসতে নেই।" তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "বাড়া ভাত পেলে তুই যেমন করেই খা, পেট ভরবে।" অবশেষে গঙ্গাধরের জিহ্বায় কি যেন একটা লিখিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন এবং শয়ন করিয়া গঙ্গাধরের ক্রোড়ে শ্রীচরণ স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে পদসেবা করিতে আদেশ দিলেন। গঙ্গাধর তখন একটু একটু কুস্তি লড়েন; সুতরাং এমন জোরে চাপ দিলেন যে, ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, করিস কি? করিস কি? ছিঁড়ে যাবে যে! এমনি ক'রে, আস্তে আস্তে।" গঙ্গাধরের তখন হুঁশ হইল যে, ঠাকুরের শরীর অতি কোমল, যেন হাড়ের উপর মাখন মাখানো রহিয়াছে।

গঙ্গাধর অতঃপর প্রায়ই অপরাহ্ণে আসিয়া সকালে চলিয়া যাইতেন। তিনি তখন মালসা পোড়াইয়া হবিষ্যি করেন—বহু সাধা-সাধিতে ব্রাহ্মণের বাটীতে পর্যন্ত বিষ্ণুর প্রসাদও কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে পারে না। দ্বিপ্রহরে দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে পাছে ঠাকুরের আদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এইজন্য নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণকুমার সেরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়াইয়া চলেন। তীক্ষ্নদৃষ্টি ঠাকুর কিন্তু সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই কঠোরতার আধিক্য কমাইবার জন্য কোন দিন বলিতেন, "তুই ছেলেমানুষ, তোর অত বুড়টেপনা-ভাব কেন?" কোনদিন বা প্রাণায়ামের ফলে কঠিন রোগ হইতে পারে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে বলিতেন।

ইতোমধ্যে গঙ্গাধর গ্রীষ্মকালের কোন এক একাদশীর দিনে কোঁচার খুঁট গলায় ফেলিয়া ও একটা তরমুজ লইয়া ঠিক দ্বিপ্রহরের পরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একে বালক, তাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্রে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তরমুজটি সম্মুখে রাখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেই তিনি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আজ তুই আবার এখনি যাবি নাকি?" গঙ্গাধর বলিলেন, "আজ্ঞে না।" সেরাত্রি দক্ষিণেশ্বরেই কাটিল। সকালে উঠিয়া ঠাকুর তাঁহাকে এক গাড়ু জল লইয়া তাঁহার সঙ্গে পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে বলিলেন এবং পঞ্চবটীর পূর্বদিকে পূর্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া অসিয়া গঙ্গাধরকে সোজা করিয়া দিয়া বলিলেন, "একটু বেঁকে যাস।" তারপর উভয়ে শয়নগৃহে ফিরিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। স্নানের পর ঠাকুর মা-কালীর স্মরণান্তে বিষ্ণুঘর ও কালীঘর হইতে প্রেরিত প্রসাদাদি ধারণ করিলেন এবং বেলপানা ও অন্যান্য ফল মিষ্টি স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া গঙ্গাধরকে খাইতে দিলেন। গঙ্গাধরও আপত্তি না করিয়া সবই গ্রহণ করিলেন। ভোগারতির পরে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "যা, গঙ্গাজলে পাক, মা-কালীর প্রসাদ, মহা হবিষ্যি—যা, খেগে যা।" দ্বিরুক্তি না করিয়া গঙ্গাধর সেদিকে অগ্রসর হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুর বিষ্ণুঘরে যাইতে না বলিয়া কালীঘরে যাইতে বলিলেন কেন? সেখানে তো মাছ রান্না হয়। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর সেখানেই দাঁড়াইয়া তাঁহার গতি লক্ষ্য করিতেছেন। অগত্যা সেদিন তিনি ৺কালীর প্রসাদই গ্রহণ করিলেন—অবশ্য সবই নিরামিষ। আহারান্তে ফিরিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার হাতে পানের খিলি দিয়া বলিলেন, "খা, খাওয়ার পর দুটো একটা খেতে হয়, নইলে মুখে গন্ধ হয়। ভাখ, নরেন একশটা পান খায়, যা পায় তাই খায়।

এত বড় বড় চোখ—ভেতর দিকে টান। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যায় আর বাড়ি, ঘরদোর, ঘোড়া, গাড়ি সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার কাছে যাস।" কলিকাতায় ফিরিয়াই গঙ্গাধর নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পুনর্বার যখন ঠাকুরের কাছে গেলেন, তখন সোৎসাহে তাঁহাকে সব জানাইলেন। ঠাকুরও শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, "খুব যাবি, খুব তার সঙ্গ করবি।"

গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে যান, ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবাবেশ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করেন, অথবা শ্রীমুখের কথামৃত উৎকর্ণ হইয়া পান করেন। কোন দিন ঠাকুর "বৃন্দাবন-বিহারিণী রাই আমাদের—রাই আমাদের, আমরা রাই-এর" ইত্যাদি দীর্ঘকাল গাহিয়া নয়নজলে ভাসেন, কোন-দিন "এস মা, এস মা, ও হৃদয়-রমা" ইত্যাদি সঙ্গীত শুনিয়া সমাধিমগ্ন হন। কোনদিন গঙ্গাধর দেখেন, ঠাকুর কাহারও সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক আলোচনায় মগ্ন আছেন; কোনদিন বা শোনেন, তিনি কিরূপে সরযূতীর-বিহারী রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের দর্শন পাইয়াছিলেন।

এইরূপ গৌণ শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎ শিক্ষালাভের সুযোগও যথেষ্ট ঘটিত। গঙ্গাধরকে একদিন শৌচার্থে গঙ্গায় যাইতে দেখিয়া ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে আয়, ওরে আয়, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি! যা হাঁসপুকুরে যা।" ঠাকুর তাঁহার বুড়োপনার নিন্দা করেন দেখিয়া একসময়ে গঙ্গাধরের ভুল ধারণা হইল যে, ঠাকুরের মতে ঐসব আচার সর্বথা বর্জনীয়। এমন সময় একদিন জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন অনু-যোগ করিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালকগণের সংসারবিমুখ হওয়া অনুচিত, তখন ঠাকুর বলিলেন, "হবিষ্যি করা, তেল না মাখা, নিরামিষ খাওয়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি পূর্বজন্মের সৎকর্মের ফলে হয়" এবং গঙ্গাধরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ঐ যে ছেলেটি একটু বড় হ'তে না হ'তে সব ত্যাগ করতে চায়, তার সত্ত্বগুণ বেশী। সত্ত্বগুণের

যখন উদয় হয়, তখনই এই-সব হয়।" গঙ্গাধর সেদিন বুঝিয়া লইলেন যে, সংযম নিন্দনীয় নহে, পরন্তু আচারের মাত্রাধিক্যই অন্যায়।

একদিন গঙ্গাধর ধ্যানান্তে ফিরিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,"ধ্যান করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে তোর চোখে জল এসেছিল?" গঙ্গাধর যখন উত্তর দিলেন, "এসেছিল," তখন ঠাকুর খুশী হইয়া বলিলেন "প্রার্থনা কি ক'রে করতে হয় জানিস?" এবং ছোট ছেলের মতো হাত-পা ছুড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে ও বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি কিছুই চাইনে, মা। আমি যে তোকে ছাড়া থাকতে পারি না, মা।" যেন একটি ছোট ছেলে কাঁদিতেছে। ঠাকুর গঙ্গাধরকে আরও শিখাইয়া দিলেন "অনুতাপাশ্রু চোখের কোণ (নাকের দিক) দিয়ে আসে আর প্রেমাশ্রু চোখের প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।"

আর একদিন ঠাকুরের নিকট তিনি শিখিলেন কাঞ্চনে আসক্তি-ত্যাগ। সেদিন একটি লোক আসিয়া পয়সা চাহিলে ঠাকুর গঙ্গাধরকে কোণের দিকে তাকের উপরে যে চারিটি পয়সা ছিল, উহা লোকটিকে দিতে বলিলেন। পয়সা দিয়া ফিরিলে তিনি গঙ্গাধরকে গঙ্গাজলে হাত ধুইতে বলিলেন এবং মা-কালীর পটের সম্মুখে লইয়া গিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলাইতে ও অনেকবার হাত ঝাড়াইতে লাগিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে গঙ্গাস্নানে গিয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন যে, ঘাটে একজন ব্রাহ্মণ কালীবাড়ির খাজাঞ্চীর সহিত বৈষয়িক আলোচনা করিতেছেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ঘরে আসিয়া হরিশের খোঁজ লইলে ঠাকুর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া গঙ্গাতীরে বিষয়চিন্তার জন্য তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ব্রাহ্মণের চৈতন্য না হইয়া বিরক্তিরই উদয় হইল এবং তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বিদায় লইলে ঠাকুর গঙ্গাধরকে বিষয়ীর স্পর্শযুক্ত ঐস্থান গঙ্গাজলে ধুইতে বলিলেন।

তারপর স্বধর্মনিষ্ঠা। বিখ্যাত থিয়োসফিষ্ট কর্ণেল অল্‌কট কলিকাতায় আসিলে উক্ত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদিন ঠাকুরকে সগর্বে জানাইলেন যে, সাহেব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুর কিন্তু ইহাতে খুশী না হইয়া উপস্থিত গঙ্গাধর ও অপর সকলকে অবাক্‌ করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "তার নিজের ধর্ম সে ছাড়লে কেন?"

একবার আহারের পর ঠাকুর ছোট চৌকিখানিতে শয়নান্তে গঙ্গাধরকে পদসেবা করিতে বলিলেন। সেই সুযোগে গঙ্গাধর শ্রীগুরুর শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা নিজ কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সকৌতুকে জানিতে চাহিলেন, "কি হচ্ছে রে?" গঙ্গাধর উত্তর দিলেন, "আপনি যে বলেন, যারা সাত্ত্বিক, তারা গঙ্গাস্নান করতে করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়; আমি আজ সেই সাত্ত্বিক তিলক দিচ্ছি।" ঠাকুর তো শুনিয়া হাসিয়া আকুল।

গঙ্গাধর তখন কলিকাতায় সাধুদর্শনে ঘুরিতেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরুৎসাহ না করিয়া প্রত্যেকের ভাল দিকটার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এইরূপে কর্তাভজাসম্প্রদায়ের দিগম্বর বাউল, থিয়োসফিস্ট কর্ণেল অল্‌কট ইত্যাদি অনেকের সহিত গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ হয়।

একবার ঠাকুর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই ছ্যাখ চৈতন্যময় শিব"। গঙ্গাধরের অমনি অনুভূতি হইল, যেন চৈতন্যময় শিব নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। মৃন্ময়ে সেদিন তিনি চিন্ময়ের দর্শন পাইলেন।

গঙ্গাধরের সময় কাটাইবার এক উপায় ছিল বাল্যবন্ধু হরিনাথের সহিত অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ধর্মপ্রসঙ্গ করা। তখন তাঁহারা মাঝে মাঝে গঙ্গাতীরে ধ্যানরত নাগমহাশয়ের অবিকম্প মূর্তি সোল্লাসে দর্শন করিতেন। কোন কোন রাত্রে গঙ্গাধর বাগবাজার

খালের পোর্ট কমিশনারদের তোলা-সেতুর পশ্চিম দিককার গোল স্তম্ভের খাটালে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একবার ঐরূপ ধ্যানকালে পাহারাওয়ালার মুখে একটি প্রেমা-ভক্তির গান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং উহা লিখিয়া লইয়া নরেন্দ্রকে দেখাইলে তিনিও গানটির প্রশংসা করেন।

গঙ্গাধরের জীবনের পরবর্তী অংশে আমরা তাঁহাকে পাই পরিব্রাজকরূপে; সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানে তখন তিনি হিমালয়, তিব্বত, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠার পরে "গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন; নরেন্দ্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট)।" অবশেষে একদিন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া (ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭) বৈদ্যনাথের টিকেট কিনিয়া ট্রেনে উঠিলেন। পরন্তু বুদ্ধদেবের আকর্ষণে বৈদ্যনাথে না নামিয়া বাঁকিপুর হইয়া বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তিনি পদব্রজে রাজগৃহে যান এবং সেইভাবে বুদ্ধগয়ায় ফিরিয়া আসেন। এই পথে পায়ে চলিয়া আত্মবিশ্বাস বর্ধিত হওয়ায় অতঃপর প্রায়শঃ তিনি পদব্রজেই তীর্থভ্রমণ করেন। এইরূপে সহায়হীন, গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত গঙ্গাধর মহারাজ উত্তর ভারতের বহুতীর্থভ্রমণান্তে হৃষীকেশে পৌঁছিয়া উত্তরাখণ্ডের মাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন; আর তাঁহার মনে হইল, "উত্তরাখণ্ডের প্রারম্ভেই যদি এইরূপ, তবে না জানি অন্তে কি আছে!" হৃষীকেশে পর্ণকুটীরে (ঝাড়িতে) ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থানপূর্বক তিনি হিমালয়ের আকর্ষণে দেরাদুন ও রাজপুর হইয়া রিক্তহস্তে মুসৌরী পাহাড়ে আরোহণপূর্বক দাক্ষিণাত্যের জনৈক লিঙ্গায়েৎ জঙ্গম সাধুর মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া সাধুর স্নেহের উদ্রেক হইল এবং তিনি তাঁহাকে উত্তরাখণ্ডের পথকষ্টের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ তথাপি নিরস্ত না হইলে সাধু তাঁহার

নিকট একটি কম্বলের আলখাল্লা ও একখানি লুই ব্যতীত আর কিছুই নাই দেখিয়া অর্থ ও কম্বলাদি দিতে চাহিলেন ; কিন্তু ত্যাগী গঙ্গাধর শুধু একগাছি লাঠি চাহিয়া লইয়া ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী টিহিরীর পথ ধরিলেন। এই পথে নূতন জুতা ব্যবহারের ফলে তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়ে এবং ঐজন্য তাঁহাকে কিছুদিন টিহিরীতে অপেক্ষা করিতে হয়। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে তিনি প্রায় এক বৎসর পাদুকা-ব্যবহার করেন নাই।

টিহিরী হইতে যমুনোত্রী পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের সহিত চলিয়া অতঃপর যমুনোত্রীদর্শনান্তে উত্তরকাশীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে তখন তিব্বতভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। কিন্তু আপাততঃ তিনি গঙ্গোত্রী যাত্রা করিলেন। পথে ভাটোয়ারী গ্রামের নিকটে পথিপার্শ্বে এক মুমূর্ষু সাধুকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে বহু আয়াসে ধর্মশালায় লইয়া আসিলেন। সাধু পরদিনই দেহত্যাগ করিলেন। তখন গঙ্গাধর মহারাজকেই অগ্রণী হইয়া সাধুর দেহের সলিল-সমাধির ব্যবস্থা করিতে হইল। গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুদিন বাস করার উদ্দেশ্যে তিনি যে গুহায় আশ্রয় লইলেন, উহারই সম্মুখে একটি বৃহৎ গুহায় একজন ব্রাহ্মণ তিন দিন যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। অতএব স্বভাবতঃ সেবাপরায়ণ গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ এক সপ্তাহ পরে তাঁহারই সহিত তীর্থপর্যটনে চলিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ নিঃসঙ্গ ভ্রমণেরই পক্ষপাতী। সুতরাং ধরাসী গ্রাম পর্যন্ত একসঙ্গে চলিয়া তিনি একাকী ৺চন্দ্রবদনীর পীঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন। টিহিরী ও দেবপ্রয়াগের মধ্যবর্তী এক বনাকীর্ণ উচ্চ পর্বত-শিখরে এই মন্দির। এখানে দাক্ষায়ণী সতীর হৃদয় পতিত হইয়াছিল। উত্তরকাশী ও টিহিরী হইয়া এক সন্ধ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপনীত গঙ্গাধর

মহারাজ জানিলেন যে, সেই নির্জন দুর্গম স্থানে ভিক্ষার ব্যবস্থা নাই; সুতরাং তপস্যাদির জন্য সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান অসম্ভব। উপায়ান্তর না দেখিয়া দুই দিন মন্দির-চত্বরে থাকিয়া তিনি অন্যত্র যাত্রা করিলেন। অবতরণপথ বলিতে কিছুই নাই—যাহা আছে তাহাও বনাচ্ছাদিত। অতএব শীঘ্রই তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছ নামিতে লাগিলেন। ক্রমে উতরাই এমনই বিষম হইয়া উঠিল যে, হামাগুড়ি দিয়া কিংবা বৃক্ষলতাদি ধরিয়া অকস্মাৎ এক শস্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। সেখানে এক পাহাড়ী চাষী তাঁহাকে দেখিয়া অবাক—সাধু আসিল কোথা হইতে? আর বলিয়া উঠিল, "ধন্য মাই চন্দ্রবদনী! তিনি তোমায় বাঁচিয়েছেন—এ পথে শিকারীরাও চলে না।"

ইহার পরে শ্রীনগরে যাইয়া তিনি ৺কমলেশ্বর-মঠে আশ্রয় লইলেন। মঠের মোহান্তজী তাঁহাকে একখানি কম্বল দিলেন। তারপর তিনি অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম এবং কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের পথদ্বয়ের মিলনস্থল রুদ্রপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া অগস্ত্যমুনিতে এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত মিলিত হন। ঐ সাধুকে নিঃসম্বল দেখিয়া ধ্যানস্তব্ধ তাঁহার দেহে নিজ কম্বলখানি জড়াইয়া দিয়া তিনি উখিমঠে চলিয়া যান। এখানে মোহান্তের নিকট আর একখানি কম্বল পাইলেন। অতঃপর তিনি কেদারনাথের পথে চলিলেন। গুপ্তকাশীতে পূর্বপরিচিত এক উদাসী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধু উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া তিনি স্বীয় মোটা কম্বলখানি সাধুর স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাঁহার পাতলা কম্বলখানি চাহিয়া লইলেন। এখন হইতে উহাই হইল তাঁহার বৎসরব্যাপী পর্বতভ্রমণের সাথী। ক্রমে কেদারনাথের সন্নিকটে আগমন করিয়া তাঁহার মনে যে অপূর্ব ভাবোদয় হইল, তাহা তিনি স্বয়ং এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"শ্রীকেদারশৈলের পাদমূলে আমি যে পরমাদ্ভুত মহান্ বিরাট মূর্তি দর্শন

করিলাম, এতদিন হিমালয়ে আর কোথাও আমি সেরূপ দেখি নাই। হরপার্বতীর প্রিয় বিলাসনিকেতন শ্রীকেদারশৈলের মহত্ত্ব ও চমৎকারিতায় আমি যেরূপ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলাম এবং কেদারে পৌঁছিয়াই যেমন সহজে গিরিরাজের সহিত খোলাখুলিভাবে মিলিত হইলাম, তেমনটি আর কোথাও হয় নাই।" ৺কেদারনাথের পর ৺বদরীনারায়ণ দর্শনান্তে তাঁহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত তিব্বতভ্রমণ আরম্ভ হইল।

তিব্বতে তিনি 'মানা' গিরিবর্ত্ম হইয়া যান এবং তিন মাস পরে 'নীতি'-ঘাটের পথে ফিরিয়া আসেন। 'মানা'র মধ্যভাগে পার্বতী-দেবীর জন্মস্থান ও পিত্রালয়দর্শনে তিনি সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন। প্রথমবারে তিব্বত হইতে ফিরিয়া ৺বদরীনারায়ণদর্শনান্তে তিনি কিছুদিন তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সহিত হিমালয়ে বাস করেন এবং পরে হৃষীকেশে নামিয়া আসেন। দ্বিতীয়বারে তিব্বত গিয়াছিলেন তিনি বদরিকাশ্রম হইয়া 'ছিপ্‌ছিলাম' গিরিবর্ত্মের পথে এবং ঐ সময়ে পাঁচ মাস তিব্বতে অবস্থানের সুযোগে কৈলাস ও মানস-সরোবর দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ দ্বিতীয়বারেও তিনি 'নীতি'-ঘাটের পথে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। পরে তিনি আলমোড়া ও নৈনিতালের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণান্তর ৺কেদারনাথ দর্শন করেন। বদরীনারায়ণের পথে শ্রীনগরে (টিহিরী) স্বামী শিবানন্দজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (১৮৮৮র শেষে)। গঙ্গাধর মহারাজ তখন তিব্বতী-বেশ-পরিহিত এবং তাঁহার মুখ তিব্বতীদের ন্যায় তুষারঝলসানো; তাই অকস্মাৎ শিবানন্দজী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু 'দাদা, দাদা' আহ্বান-শ্রবণে তিনি গঙ্গাধরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর উভয়ে কিছুদিন একসঙ্গে তীর্থভ্রমণ করিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে অবতরণকালে শিবানন্দজী গঙ্গাধর মহারাজকে পুনঃ তিব্বতে যাইতে নিষেধ করিলেও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে তথায় লইয়া গেল।

প্রত্যাগমনকালে লাদাখ হইয়া তিনি শ্রীনগরে (কাশ্মীর) উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট তাঁহাকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৮৯)। সৌভাগ্যক্রমে পাঁচ দিন পরে তিনি মুক্ত পাইলেন।

তিব্বত-ভ্রমণকালে তাঁহার যে-সকল অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বৎসর তিনি থুলিং মঠে থাকিয়া তিব্বতী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু লামাদিগের ঐশ্বর্য, বিলাসিতা ও দরিদ্রপীড়নের প্রতিবাদ করার ফলে তাঁহার স্কন্ধে খাপ-সমেত তলোয়ারের আঘাত পড়ে; অধিকন্তু পাহাড়ীরা মত্তাবস্থায় লামাদিগের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে লামারা পরামর্শ দেয়, "উহার গাল বাড়াইয়া দাও"—উদ্দেশ্য, গাল কাটিয়া দিলে আর কথা বলিতে পারিবেন না। অবস্থা বুঝিয়া গঙ্গাধর মহারাজ পলাইয়া যান। দ্বিতীয়বারে তিনি লাসা যাইতে উদ্যত হইলে তিব্বতী পুলিস তাঁহাকে বন্দী করে। পরে পরিচিত তিব্বতী ব্যবসায়ীরা জামিন দিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনে। বস্তুতঃ এই-সব ব্যবসায়ীরা তাঁহাকে খুবই ভালবাসিত। ইহাদের এক ব্যক্তি একসময়ে তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র দেখিয়া এতই মুগ্ধ হয় যে, তারপর সে যতদিন তাঁহার-সহিত ছিল, ততদিন ঐ চিত্রকে বুদ্ধের সমাসনে বসাইয়া পূজা করিত। তিব্বতী পুলিসের নিকট মুক্তি পাইয়া কৈলাস ও মানস-সরোবর-দর্শনকালে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং গুড় ও চালভাজা দিয়া কোনপ্রকারে রক্ষা পান। তৃতীয়বার তিনি লাসায় যাইতে উদ্যত হইলে বন্ধুরা পর্যন্ত বিরোধী হইল; কাজেই তিনি ঐ আশা পরিত্যাগ করিলেন।

এ যাবৎ তিব্বত ও হিমালয়ের আকর্ষণে তিনি ইতস্ততঃ ছুটিতে-ছিলেন। ইহার পরবর্তী পর্বে আমরা তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের অনুসরণে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ঘুরিতে দেখিতে পাই। কাশ্মীরে

ব্রিটিশ সরকারের হস্তে লাঞ্ছনার পরে স্বামীজী তাঁহাকে গাজীপুরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। সেই আহ্বান অনুসারে কাশ্মীর পরিত্যাগপূর্বক তিনি যখন কিছুদিন পরে এপ্রিল মাসে গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন, তখন স্বামীজী সেখানে নাই। পওহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বাবাজী গঙ্গাধরকে সত্বর স্বামীজীর নিকট চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি তখনই মঠে রওয়ানা হইতে পারিলেন না। সুস্থ হইয়া জুনের প্রারম্ভে মেলট্রেনে হুগলি পর্যন্ত আসিয়া তিনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেই বালীতে নামিলেন, অমনি পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া হাওড়ায় লইয়া গেল; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য কিছু না পাওয়ায় বরাহনগরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

মঠে আসিয়া গঙ্গাধর মহারাজ যথারীতি সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন; তখন তাঁহার নাম হইল অখণ্ডানন্দ। স্বামী অখণ্ডানন্দকে মঠে ডাকিয়া আনার পশ্চাতে স্বামীজীর এই অভিপ্রায়ও লুক্কায়িত ছিল যে, তিনি তাঁহার সহিত হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইবেন। তদনুসারে তাঁহারা উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া নৈনিতালে পৌঁছিলেন। ইহার পরবর্তী বিবরণ আমরা মীরাট হইতে লিখিত অখণ্ডানন্দজীর ১৪।১১।৯০ তারিখের পত্রে পাই। নৈনিতালের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া তাঁহার বাম দিকের পাঁজরায় এক দীর্ঘকালস্থায়ী বেদনা আরম্ভ হয়। এই অবস্থায়ই তিনি স্বামীজীর সহিত আলমোড়ায় উপস্থিত হইয়া সারদানন্দজীর ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ভাগীরথীতীরে বাস করিবেন। সুতরাং তথা হইতে চারি জনে একসঙ্গে কর্ণপ্রয়াগে আসেন। এখানে স্বামী অখণ্ডানন্দের জ্বর হওয়ায় তিন দিন অপেক্ষা করিতে হয়। পরে শ্রীনগরাভিমুখে চলিয়া সলড়কাড় চটিতে আসিয়া স্বামীজী ও

অখণ্ডানন্দজী জ্বরগ্রস্ত হন। তিন দিন পরে তথা হইতে পাঁচ-ছয় মাইল নীচের দিকে চলিয়া তাঁহারা এক ধর্মশালায় উপনীত হইলেন। জ্বর তখন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে পরদিন ডাণ্ডী করিয়া শ্রীনগরে যাইতে হইল। এখানে তাঁহারা পক্ষাধিক কাল ছিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দের পুনরায় জ্বর হওয়ায় সিভিল সার্জনকে দেখানো হইল; তিনি বলিলেন যে, ব্রঙ্কাইটিস্ হইয়াছে, সমভূমিতে নামিয়া যাওয়া আবশ্যক। তদনুসারে তাঁহারা দেরাদুনে চলিলেন। পথে রাজপুরে তুরীয়ানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ইহার পরে স্বামীজী, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ হৃষীকেশে চলিয়া গেলেন; অখণ্ডানন্দ মহারাজের সহিত রহিলেন শুধু সান্ন্যাল মহাশয়।

এইরূপ তপঃক্লেশ ও ভ্রমণক্লেশের মধ্যেও আনন্দের অভাব ছিল না। একবার এক সন্ধ্যায় কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে তামাক খাওয়াইবার জন্য অখণ্ডানন্দজী গ্রামের মধ্যে আগুনের অন্বেষণে গেলেন। কিন্তু কেহই আগুন দিল না! ইহাতে সকলেই একটু চিন্তিত হইলেন—যে গ্রামে আগুনই দুর্লভ, সে গ্রামে ভিক্ষার তো কথাই উঠিতে পারে না। এমন সময়ে অখণ্ডানন্দজী বলিলেন, "এক প্রবাদ আছে, 'গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী; লঠা বগর দেতা নহী'।" (অর্থাৎ গাড়োয়ালীদের সদৃশ দাতা নাই—তবে লাঠি না দেখাইলে তাহারা কিছুই দেয় না)। প্রবাদ-বাক্যানুসারে বিকট চিৎকার-সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন, "লকড়ী লে আও, আগ্ লে আও।" অমনি দেখিতে দেখিতে কাষ্ঠ ও অগ্নির সহিত রুটি, তরকারি, তামাক—সবই আসিয়া পড়িল।

দেরাদুনে উকীল পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ অখণ্ডানন্দ মহারাজের চিকিৎসাদির ভার লইলেন। পরে ইনি সমস্ত পাথেয় খরচ দিয়া তাঁহাকে সাহারানপুরের পথে এলাহাবাদে যাইতে বলিলেন। সাহরানপুরে তিনি

দুই-তিন দিন উকীল বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ছিলেন। সেখান হইতে উকীলবাবুর পরামর্শানুযায়ী তিনি এলাহাবাদ না যাইয়া মীরাটে ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। শীঘ্রই স্বামীজী তাঁহার মীরাটে অবস্থানের খবর পাইয়া সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখানেই চারি পাঁচ মাস থাকিয়া গেলেন। পরে স্বামীজী একাকী ভ্রমণমানসে সকলকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে অখণ্ডানন্দ মহারাজ বলিলেন, "তুমি যদি পাতালেও যাও, আর সেখান থেকে তোমায় খুঁজে বার করতে না পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।" তারপর গঙ্গাধর মহারাজ বৃন্দাবনে গেলেন। তথায় চারি মাস অবস্থানের পর পুনর্বার ব্রঙ্কাইটিস হওয়ায় তিনি জুন মাসের প্রারম্ভে এটোয়ায় চলিয়া যান; সেখানেও তাঁহাকে পাঁচ মাস রোগে ভুগিতে হয়।

এই সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কিরূপে তীর্থভ্রমণোপলক্ষে এটোয়ায় আসিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হন এবং কিয়ৎকাল একত্র ভ্রমণের পর কিরূপে তাঁহারা আজমীঢ় হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন, তাহা আমরা ত্রিগুণাতীতানন্দ-প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছি। অতঃপর নিঃসঙ্গ অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর সন্ধানে আহমেদাবাদ, আবু, ডাকোর, বরোদা, বরোচ, নর্মদাসঙ্গম, জুনাগড়, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া কচ্ছভুজের অভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে স্বামীজীকে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার নিজ ভাষাতেই সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, "স্বামীজীকে এত অন্বেষণেও খুঁজিয়া না পাইয়া আমার আগ্রহ এত বাড়িয়াছে যে, এ-সকল তীর্থে দেখাশোনা কিছু না করিয়াই মাণ্ডবী যাত্রা করিলাম। সেখানে শোনা গেল, স্বামীজী নারায়ণসরোবর যাত্রা করিয়াছেন। মাণ্ডবীতে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পদব্রজে নারায়ণসরোবর গমন করিলাম।"

মাণ্ডবী হইতে নারায়ণসরোবর যাইবার গাড়ির পথটি বড়ই বিপদসঙ্কুল

ছিল—চুরি-ডাকাতি সেখানে প্রায়ই হইত। পায়ে-হাঁটা পথ অল্পতর ও নিরাপদ হইলেও তিনি ভাবিলেন, স্বামীজী যখন গাড়িতে গিয়াছেন তখন গাড়িতেই ফিরিবেন। অতএব দীর্ঘতর, জনমানবশূন্য ও ভয়াবহ পথেই তিনি অগ্রসর হইলেন—সঙ্গী পাইলেন একজন পশ্চিমদেশবাসী তৈর্থিক 'ভকত'। স্বামী অখণ্ডানন্দ নিঃসম্বল, আর তৈর্থিকের থলিতে আটা, লবণ, তাওয়া সবই আছে। ঐ পথের অর্ধেক অতিক্রম করার পূর্বেই চারিজন দস্যু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তাঁহাদের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। ভকত বিপদে সন্ত্রস্ত হইলেও অখণ্ডানন্দজী অবিচলিত রহিলেন। দস্যুরা দেখিল যে, লইয়া যাইবার মতো কিছুই নাই; সুতরাং তাহারা ফিরিয়া চলিল। তখন অখণ্ডানন্দজী স্বীয় জামা প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওরে, এগুলো নিয়ে যা, তোরা গরীব।" কিন্তু একটি লোক তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "দুয়া করো, মহারাজ; কাপড়া পিন্ধ্ লেও", এবং ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, কিছু যেন প্রকাশ না পায়। পরে নারায়ণসরোবরে উপস্থিত হইলে সেখানকার মহান্ত সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনার পুনর্জন্ম হয়েছে। সঙ্গে পাঁচটি টাকা থাকলেও আপনার আর প্রাণ থাকত না।" এত কষ্টের পরেও নারায়ণ-সরোবরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, স্বামীজী অন্য পথে আশাপুরী নামক দেবীস্থানদর্শনে গিয়াছেন। অখণ্ডানন্দজী যখন সেখানে গেলেন স্বামীজী তখন মাণ্ডবীতে ফিরিতেছেন। অবশেষে অখণ্ডানন্দজী মাণ্ডবীতে স্বামীজীর সহিত মিলিত হইলে স্বামীজী বলিলেন যে, তিনি একাকী থাকিতে চাহেন, অতএব গঙ্গাধর মহারাজ যেন পশ্চাদনুসরণ না করেন। গঙ্গাধর মহারাজ উত্তর দিলেন, "তোমার কাজের বিঘ্ন আমি করব না। তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম; সে আকাঙ্ক্ষা মিটেছে—এখন তুমি একলা যেতে পার।" ইহার পর স্বামীজী ভুজে গেলেন; গঙ্গাধর

মহারাজ সত্যবাদিতার পরিচয় দিবার জন্য একদিন পরে তথায় যাইয়া স্বামীজীর সঙ্গে এক পক্ষকাল কাটাইলেন। অতঃপর পোরবন্দর পর্যন্ত আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পোরবন্দরে পুনর্মিলনের পর অখণ্ডানন্দজী একাকী জিৎপুর, গোণ্ডাল এবং রাজকোট হইয়া জামনগরে গেলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের মতে "জামনগরে (তাঁহার) সেবাব্রতের সূচনা, রাজপুতানায় খেতড়িতে ক্রমোন্নতি এবং মুর্শিদাবাদে উহার প্রসার ও পরিণতি।" জামনগরে তিনি 'ধন্বন্তরি-ধাম' নামক ভবনে কবিরাজ মণিশঙ্কর বিঠ্‌ঠলজীর অতিথি হইয়া তিন-চার মাস ছিলেন। সেখানে তিনি চরক ও সুশ্রুত-সংহিতাদি অধ্যয়ন শেষ করেন এবং ধন্বন্তরি-ধামের সংলগ্ন এক বৈদিক চতুষ্পাঠিতে বেদপাঠ শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে এক ঐশ্বর্যপূর্ণ মন্দিরের বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী মহান্তের সহিত আলাপ হইলে ব্রহ্মচারী তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গদীনশীন হইতে বলেন; কিন্তু বৈরাগ্যবান স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহাকে জানান, "জল তো চল্‌তা ভালা, সাধু তো রম্‌তা ভালা। আমি মহান্ত হতে পারব না।" জামনগরে উদরাময় হওয়ায় তিনি মণিশঙ্করজীর চিকিৎসাধীনে একমাস ছিলেন। ঐ চিকিৎসা ও পথ্যাদির ফলে তিনি দুর্বল হইয়া পড়ায় শ্রীযুক্ত শঙ্করজী শেঠ (ব্যাঙ্কার) তাঁহাকে নিজ বাড়িতে লইয়া গিয়া প্রায় চারি মাস রাখেন।

শেঠভবনে অবস্থান বড়ই বৈচিত্র্যময় ছিল। গুণমুগ্ধ শেঠজী অখণ্ডানন্দের পথ্যের জন্য দুগ্ধের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া খাওয়াইতেন, অপরাহ্নে গাড়ি করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন এবং মূলজী নামক একজন গায়কের গান শুনাইতেন। শেঠজী প্রত্যহ একজন সাধুকে ভোজন করাইতেন। একদিন জনৈক সাধু ভোজন প্রার্থনা করিলে ভৃত্য জানাইয়া দিল যে, গৃহে অপর

সাধু আছেন, আর কাহারও ব্যবস্থা হইবে না। শুনিয়া অখণ্ডানন্দ মহারাজ নিজের ভোজ্য সাধুকে দিতে উদ্যত হইলে শেঠজী আদেশ দিলেন যে, অতঃপর কোন সাধুকে বিমুখ করা চলিবে না। শেঠভবনে তিনি বেদ ও উপনিষদাদি দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া অধ্যয়ন করিতেন। পরে চাতুর্মাস্য শেষ হইলে তিনি অন্যত্র যাইতে চাহিলেন; কিন্তু শেঠজী ছাড়িলেন না। এদিকে শেঠজীর উপর সাধুর প্রভাব ও অর্থক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বামী অখণ্ডানন্দের কফিতে জয়পাল মিশাইয়া প্রাণহরণে উদ্যত হইল। বিশেষ প্রয়োগ-জনিত ভেদ আরম্ভ হইলে চিকিৎসার্থে আগত শ্রীঝণ্ডু ভট্ট বিঠ্ঠলজীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা বিষেরই প্রতিক্রিয়া; সুতরাং তিনি সাধুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

সদাশয় ভট্জী অর্থ না লইয়া বহু রোগীর গৃহে যাইতেন, দরিদ্র-দিগকে বিবিধরূপে সাহায্য করিতেন এবং অনেককে স্বগৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার মুখে প্রায়শঃ দুইটি শ্লোক[২] শোনা যাইত; উহার ভাবার্থ এই—"এমন কি কোন উপায় আছে, যাহাতে আমি সকল প্রাণীর অন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বদা তাঁহাদের দুঃখভারের ভাগী হইতে পারি? আমি রাজ্য, স্বর্গ অথবা মুক্তি চাহি না। আমি শুধু দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তিনাশ করিতে চাই।" ভট্জীর জীবনদর্শনে ও তাঁহার আলাপশ্রবণে অখণ্ডানন্দ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, "মানুষের সেবা করা ও মানুষকে ভালবাসা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

জামনগরে প্রায় একবৎসর থাকিয়া গঙ্গাধর মহারাজ কুণ্ডলাগ্রাম, কাঠিয়াওয়াড় ও বরোদা হইয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। ভাবনগরে তিনি

---

২। কো নু স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভবেয়ং সততং দুঃখভারভাক্॥
ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

স্বামীজীর আমেরিকা-গমনের সংবাদ পান। পুনা ও বোম্বাই দেখিয়া তিনি ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীর আহ্বানে আবু রোডে গমন করেন (১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর) এবং তিন জনে এক সঙ্গে আজমীঢ়ে যাইয়া সর্দার হরিসিং লাড্‌খানির গৃহে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। ইহার পরে মহারাজের উপদেশে অখণ্ডানন্দজী খেতড়িতে যান। খেতড়ি-জীবনের কিয়দংশ আমরা তাঁহার নিজ-ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিলাম—"খেতড়িতে প্রথমবার দেড়মাস কাল রাজার অতিথিরূপে অবস্থিতি করিয়া রাজার পুস্তকাগারে থিওডোর পার্কারের সমগ্র গ্রন্থ পাঠ এবং ভারতেতিহাস ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য আলোচনা করি।···পরে খেতড়ি-রাজের জ্ঞাতি সর্দার ভুরিসিং-এর আহ্বানে মালসিসরে গমন করিয়া তাঁহার বাটীতে চাতুর্মাস্য যাপন করি এবং দুই মাস একটি জৈন সাধুর সমাধিমন্দিরে বাস ও মাধুকরী করি। চাতুর্মাস্যকালে বেদান্ত, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা আলোচনা এবং জৈন সাধুর মন্দিরে পণ্ডিত সীতারামের নিকট নিয়মিত 'শঙ্করদিগ্বিজয়'-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতাম।···এই রাজ-পুতানা প্রদেশে আট মাস বাস করিয়া নানা গ্রাম ঘুরিয়া ধনী সর্দার ও গরীব প্রজার অবস্থা প্রত্যক্ষ করি, গরীব প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকি এবং তাহাই মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই কর্তব্যসাধনে পণ করি।"

মালসিসর হইতে ফিরিয়া তিনি নিত্য খেতড়ি-রাজসভায় বেদান্ত-ব্যাখ্যা করিতেন। মালসিসরে অবস্থানের সুযোগে তিনি হিন্দী ভাষা শিখিয়া লওয়ায় তাঁহার বক্তব্য সকলেরই নিকট সহজবোধ্য হইত। ইতোমধ্যে দারিদ্র্য-মোচন সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ চাহিয়া তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী লিখিলেন, "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইঁহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।" কার্যক্ষেত্র সম্মুখেই

ছিল ; নেতার নির্দেশে উহাতে প্রবেশ করিতে তাঁহার আর দ্বিধা রহিল না। রাজ্যের একটি এন্ট্রান্স স্কুলে মাত্র আশিটি উচ্চবর্ণের ছাত্র ছিল। নানা আপত্তি সত্ত্বেও তিনি রাজার অনুমতিক্রমে গোলা (অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের ভৃত্য) জাতীয় ছাত্রদিগকেও সেখানে ভর্তি করাইলেন এবং ক্রমে ছাত্রসংখ্যা দুই শততে উঠিল।

খেতড়ি হইতে জয়পুর এবং জয়পুর হইতে উদয়পুর—ইহাই তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণের ক্রম। উদয়পুরে তিনি রামবাগ নামক বাগানে পালা-গনেশজীর মন্দিরে আশ্রয় পাইলেন। রাজদরবার হইতে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ন্যায় তাঁহারও ভোজনাদির ব্যবস্থার প্রস্তাব আসিলে তিনি জানাইলেন যে, রাজ্যের কেহ অভুক্ত না থাকিলেই তিনি মহা-রানার সিধা লইতে পারেন। বলা বাহুল্য, এরূপ উত্তরে রাজ্যের অমাত্যগণের শুধু ক্রোধবৃদ্ধিই হইল। আর একদিন এক নিরক্ষর নাগা সাধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "মহারাজ, লঙ্কায় এখন কার রাজ্য ?" অখণ্ডানন্দজী বলিলেন, "কেন, ইংরেজের।" নাগা রক্তচক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "কভী নহী ; ওহ বিভীষণ্‌কা রাজ্য হ্যায়।" নাগা ধরিয়া লইয়াছিল যে, রামচন্দ্রের বরে অমর বিভীষণ এখনও লঙ্কার রাজা! এই অকাট্য যুক্তির সম্মুখে খ্রীষ্টানী পুস্তকলব্ধ বিদ্যা পরাজয় মানিতে বাধ্য হইল। ফলতঃ তিনি উদয়পুরে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কিছুই করিতে না পারিয়া অন্যত্র চলিলেন। বিদায়কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রে পড়িলেন, "স্বামীজী সকল গুরুভাইকে জীবসেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।"

উদয়পুরের পর ৺একলিঙ্গদর্শনান্তে শ্রীনাথদ্বারায় পৌঁছিয়া তিনি রঘুনাথজী ভাণ্ডারীর গৃহে অতিথি হইলেন এবং গৃহস্বামীর পুত্রকে অশিক্ষিত দেখিয়া তাহার শিক্ষার ভার স্বহস্তে লইলেন। এই একান্ত ব্যক্তিগত অধ্যাপনাকে অবলম্বন করিয়াই অচিরে সেখানে এক মধ্য

ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি ওঁকারনাথ, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, রাথ্‌লাম, চিতোর ও জয়পুর ইত্যাদি দেখিয়া খেতড়িতে ফিরিলেন। তাঁহার খেতড়িতে অবস্থানের ফলে স্থানীয় সংস্কৃত পাঠশালার বিশেষ উন্নতি হয় এবং উহার নাম হয় 'খেতড়ি আদর্শ বৈদিক বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ে বেদের অর্থবোধের জন্য বেদাঙ্গ-পাঠেরও প্রচলন হয় এবং ছাত্রদের পুস্তকাদির জন্য তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়া দেন। রাজ্যের বাৎসরিক মহা-দরবারে এযাবৎ কেবল উচ্চ-শ্রেণীর লোকরাই স্থান পাইতেন। সাধারণ প্রজারা নিকটে আসিতে উদ্‌গ্রীব, অথচ বারংবার সাস্ত্রীদের দ্বারা দূরীকৃত হইতেছে দেখিয়া অখণ্ডানন্দ মর্মাহত হইলেন এবং অবসর বুঝিয়া রাজাকে সমস্ত জানাইলেন। সন্ন্যাসীর চক্ষে প্রজার জন্য অশ্রু দেখিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "আগামী বৎসর থেকে আমি সমস্ত প্রজাদের নিয়ে দরবার ক'রে স্বয়ং সকলের নজর নেব।" রাজ্যের এইসকল উন্নতি ব্যতীত তিনি কৃষির উন্নতিরও চেষ্টা করিতেন এবং রাজার হাসপাতালে রোগীদের লইয়া গিয়া সেবা করাইতেন। পাঁচ-ছয় মাস খেতড়িতে অবস্থানান্তে তিনি চিড়ারা গ্রামে যান এবং সেখানে একটি বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইরূপে রাজপুতানার আরও কয়েকটি গ্রামের উন্নতি-সাধনান্তে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে জয়পুরে পৌঁছিলে তথায় উপস্থিত স্বামী অভেদানন্দ ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের আগামী জন্মোৎসব দর্শনের জন্য আলমবাজারে যাইতে হইবে। তদনুসারে তিনি সেখানে চলিয়া গেলেন।

আলমবাজারে অবস্থানের সুযোগে অখণ্ডানন্দজী ও শিবানন্দজী স্বামী অভেদানন্দের নিকট ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠ করেন। পরে বঙ্গদেশে বেদবিদ্যালয়-স্থাপনের অভিলাষ প্রবল হওয়ায় ঐ বিষয়ে পরামর্শ করার ও উৎসাহ জাগাইবার জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দ ভাটপাড়া, মূলাজোড় ও

নৈহাটীর পণ্ডিতবৃন্দের নিকট গমন করেন এবং কলিকাতার বিদ্বৎ-সমাজের সহিতও আলোচনা করেন। মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু নানা কারণে তখন কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই।

এই সময়ে তাঁহার সেবাভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এক-দিন গঙ্গাস্নানান্তে মঠে ফিরিবার পথেএকটি বিসূচিকারোগগ্রস্তা বৃদ্ধাকে দেখিয়া তিনি তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরেই খড়দহে ৺শ্যামসুন্দরদর্শনার্থে যাইয়া তিনি যে বাড়িতে উঠিলেন, উহাতেই গোলোক শিরোমণি নামক এক কথক ঠাকুর রাত্রে ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে তিনি সারারাত্রি তাঁহার সেবা করিলেন এবং সকালে রোগীর দেহত্যাগ হইলে সৎকারেরও সুব্যবস্থা করিলেন।

একবার ঠাকুরকে নাগেশ্বর চাঁপাফুল দিবার আগ্রহে তিনি স্বামী সুবোধানন্দের সহিত পদব্রজে ডি· গুপ্তের বাগানে আসিয়া জানিলেন যে, উহা সেখানে নাই, মল্লিকদের সাতপুকুরের বাগানে আছে ; কিন্তু সেখানেও ফুল ফুটিবে সতর-আঠার দিন পরে। ফুল না লইয়া মঠে যাওয়া চলে না। সুতরাং আপাততঃ তিনি একাই পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতালাভের জন্য বারাসত-অঞ্চলে অবকাশকাল অতিবাহিত করিয়া যথাসময়ে পুষ্পহস্তে মঠে আসিলেন।

আলমবাজারে তাঁহার এক অপূর্ব দর্শন হয়—ইহা তাঁহার "জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা।" ম্যালেরিয়াজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন ; কিছুতেই উহার উপশম হয় না দেখিয়া তিনি অদ্বৈতচিন্তায় মনকে ডুবাইয়া দিলেন। সারা রাত্রি এই ভাবে কাটাইয়া শেষ রাত্রে যেমন একটু চোখ বুঁজিয়াছেন, অমনি দেখেন "সম্মুখে একটি হামা-দেওয়া সজীব নাড়ু গোপাল—যেন একখানি বড় নীলকান্তমণি কুঁদিয়া গঠিত। কি সুন্দর সুঠাম মূর্তিখানি! গোপালের শ্রীঅঙ্গের

বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে ঘর আলোকিত।" তাঁহার বোধ হইল তাঁহার অন্তরে অবস্থিতা ও ব্রজবাসিনীদের ন্যায় দিব্যবসনভূষণে শোভিতা মা যশোদা গোপালকে সুখাদ্য দেখাইয়া ডাকিতেছেন, "আয় বাপ গোপাল আমার, যাদুমণি, নীলমণি, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, আয়রে।" এইরূপ লীলা চলিতেছে, এমন সময় ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ দিব্য দৃশ্য দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ্ দেখি, এ কি ভাব।" অমনি অখণ্ডানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "নির্বাণে আমার কাজ নাই, প্রভু। আহা-হা! এই ভাব নিয়ে আমি শত-শত বার জন্মাতে চাই।" এই বলিয়া তিনি ঠাকুর, গোপাল ও মা যশোদাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলেন—অমনি চমক ভাঙিয়া গেল। আর একদিন দ্বিপ্রহরে সকলে ঘর্মাক্তকলেবরে বিশ্রাম করিতেছেন দেখিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ পাখা লইয়া সকলকে আধঘণ্টা ধরিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। সকলেই তখন আরামে নিদ্রিত, কিন্তু একি! স্বামী অখণ্ডানন্দেরও যে তাপিত অঙ্গ বেশ শীতল হইয়া গেল! তখন তাঁহার বোধ হইল, "দশের সুখে-দুঃখে আমারও সুখ-দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা একটু জন্মিয়াছে।" আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল।

স্বামীজীর প্রথমবার দেশে প্রত্যাগমনের কয়েক মাস পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন মাদ্রাজে যান, তখন স্বামী সদানন্দও তাঁহার সহকারী-রূপে সঙ্গে যাত্রা করেন, কিন্তু বিদায়মুহূর্তে একটি কুকুর সদানন্দকে দংশন করিলে ঔষধসংগ্রহের জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দ চন্দননগরের নিকটবর্তী গোঁদলপাড়ায় যান। ঔষধপ্রেরণান্তে তিনি তখনই মঠে না ফিরিয়া নবদ্বীপাদি দর্শন করিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে একদিন জন-কয়েক পণ্ডিত তাঁহাকে ঘিরিয়া জ্ঞানানন্দ অবধূতের নাম উল্লেখপূর্বক বলিলেন, "শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণকে পায়ের ধূলা দেওয়া যায় কি?" অখণ্ডা-নন্দজী প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার ব্রাহ্মণ না হলেও

শত শত ঋষি, মুনি ও ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবতারূপে পূজা পেলেন কি ক'রে?" পণ্ডিতরা বলিলেন, "আরে সব এস, এই আর একজনকে পাওয়া গেছে—ইনিও ঐ দলের অথবা জগবন্ধুর।" বাক্যবাণে জর্জরিত অখণ্ডানন্দজী অগত্যা রণে ভঙ্গ দিলেন। নবদ্বীপে আর এক মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে ঘটনাক্রমে তিনি একরাত্রি যাপন করেন এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন অথচ আত্মপরিচয় দিতে অসম্মত হন। ইহাতে লোকের ধারণা হইয়া গেল যে, ইনিই ছদ্ম-বেশী বিবেকানন্দ। গঙ্গাধর মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে, সেইদিন ভোরেই তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইবেন; কিন্তু বাজারে এই গুজব শুনিয়া তাঁহাকে আবার মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে ফিরিয়া ভ্রমসংশোধন করিতে হইল।

অতঃপর কাটোয়া হইয়া পদব্রজে মুর্শিদাবাদগমনকালে তিনি পথে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলেন। ক্রমে কালীগঞ্জ ও পলাশী হইয়া দাদপুর আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা স্বয়ং এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"খুব সকালে গঙ্গায় হাত-মুখ ধুইয়া বাজারের দিকে আসিতে পথে দেখিলাম অতিশয় ছিন্নমলিনবস্ত্রপরিহিতা প্রায় চৌদ্দ বছরের একটি মুসলমান মেয়ে হাপুস-নয়নে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। তাহার কাঁকালে একটি মাটির কলসী; তলাটি খসিয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, 'বাড়িতে জল তুলিবার দ্বিতীয় পাত্র নাই। মা আমাকে মারবে, সেই ভয়েই কাঁদছি।' আমি তাহাকে লইয়া গিয়া দুই পয়সার একটি মাটির কলসী কিনিয়া দিলাম এবং দুই পয়সার চিঁড়ে-মুড়কিও দেওয়া হইল। (সঙ্গে আমার মাত্র একটি সিকি অবশিষ্ট ছিল)। আমার তিন আনা পয়সা ফেরত লইতে না লইতেই সমীপবর্তী মরাদীঘি গ্রামের প্রায় দশ-বার জন ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে দোকানে আসিয়া আমার কাছে সকাতরে ভিক্ষা চাহিয়া বলিল যে, তাহারাও অকালের জন্য খাইতে

পায় না। আমি তখনই সেই দোকানীকে তিন আনার চিঁড়ে-মুড়কি প্রত্যেককে ভাগ করিয়া দিতে বলিলাম। তাহার পর আমি কপর্দকহীন সন্ন্যাসী।" এই আর্তির কোন প্রতিকার না দেখিয়া তিনি পরদিন প্রাতে অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় এক অর্ধবয়স্কা নারী তাঁহাকে বলিল, "প্রায় আশী-নব্বই বছরের বুড়ী গয়া বৈষ্ণবীর তুমি যদি একটা কিনারা ক'রে না যাও, তবে সে দু-এক দিনের মধ্যেই মারা যাবে।" সুতরাং উদরাময়-রোগগ্রস্তা বৃদ্ধার পথ্য, বস্ত্র ও সেবাদির ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ থাকিতেই হইল। এই কার্যসমাপনান্তে তিনি দাদপুর হইতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন দুর্ভিক্ষের করালমূর্তি ততই তাঁহার মনকে পীড়া দিতে লাগিল। ভারগ্রস্ত মন লইয়া রিক্তহস্ত সন্ন্যাসী ক্রমে ভাবতা গ্রামে পৌঁছিলেন। তথায় রাত্রিযাপনান্তে প্রাতে বহরমপুরের পথে চলিতে গিয়া তিনি দেখেন, কে যেন তাঁহাকে নীচের দিকে টানিয়া ধরিতেছে। তিন-চারি বার এইরূপ হইলে তিনি ঐ অঞ্চলে থাকিয়া সেবাকার্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আলমবাজার মঠে দুর্ভিক্ষের বিবরণসহ পত্র লিখিলেন। অতঃপর তিনি চৈত্র-সংক্রান্তিতে ( ১৩০৩ ) চকের মাঠ মহুলা হইতে কেদারমাটি বহুলায় যাইয়া মঠের নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামে এক শাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিছুদিন বাস করিয়া দুই-এক বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে 'দণ্ডী ঠাকুর' বলিত এবং স্বামী অখণ্ডানন্দকেও তদনুরূপ সন্ন্যাসী মনে করিয়া 'দণ্ডী ঠাকুর' নামে অভিহিত করিতে লাগিল।

১৩০৪ সালের ১লা বৈশাখ হইতে দণ্ডী ঠাকুর প্রত্যহ বৈকালে গীতা পাঠ করিয়া জনসাধারণকে শুনাইতে লাগিলেন। "কর্মপ্রেরণায় তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তখন চুপচাপ বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়।" কিছুদিন পরে 'যোগবাশিষ্ঠে'র প্রতি তাঁহার দৃষ্টি

আকৃষ্ট হইল—"কর্ম ও পুরুষকার 'যোগবাশিষ্ঠে'র মেরুদণ্ড। কর্মই মহাসাধন এবং নির্বাণমুক্তির একমাত্র উপায়।" তিনি ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্ন কিন্তু সবদিন তাঁহার রুচিত না; নিকটে উপস্থিত দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে কিছু না দিয়া তিনি তৃপ্ত হইতেন না। ভিক্ষান্তে ফিরিয়া আসিয়া অর্গলবদ্ধ গৃহে ঠাকুরকে নিঃসহায়ের সহায় হইতে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন—ঠাকুর যেন বলিতেছেন. "দ্যাখ্‌না, কি হয়?" এদিকে গুরুভ্রাতাদের সহিত পত্রবিনিময়ের ফলে স্বল্পদিনেই বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলেই তাঁহার আন্তরিকতায় আকৃষ্ট ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কষ্টে বিচলিত হইলেন। সাহায্যও আসিল। মহা-বোধি সোসাইটীর সেক্রেটারি শ্রীচারুচন্দ্র বসু মহাশয় অর্থের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বামীজী দুই জন সেবককে স্বামী অখণ্ডানন্দের সাহায্যার্থে পাঠাইলেন। ইঁহারা বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহুলা পৌঁছিলেন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে সেবাকার্য আরম্ভ হইল। ইহাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য। অখণ্ডানন্দজী বা তাঁহার সহকর্মীরা দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড হইতে নিজেদের জন্য অর্থাদি না লইয়া অন্যত্র উহা সংগ্রহ করিতেন। ঐ সময়ে আবার ভূমিকম্পের ফলে ঐ অঞ্চলের লোকের প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় তাঁহারা উহার প্রতিকারকল্পেও যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

দুর্ভিক্ষ শেষ হইল, কিন্তু মহাপ্রাণ মহাপুরুষের জীবসেবাব্রতের তখন মাত্র প্রারম্ভাবস্থা। দুর্ভিক্ষের ফলে বহু অনাথ বালককে গৃহবিচ্যুত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল; জেলাম্যাজিস্ট্রেট লেভিঞ্জ সাহেবও তাঁহাকে বলিলেন যে, এই অনাথদিগকে লইয়া আশ্রম গঠন করিলে দেশের এক প্রকৃত অভাব দূরীভূত হইবে এবং ঐ কার্যে সরকারী সাহায্যেরও অভাব হইবে না। এইরূপ একটি কার্যের জন্যই তখন তাঁহার প্রাণ

আকুল ; সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের সম্মতিক্রমে তিনি ১৮৯৭-এর শেষার্ধে দুইটি বালকের ভার লইলেন। পর বৎসর মে মাসে দার্জিলিং-এর চারিটি বালক লইয়া অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৯৮-এর শেষ পর্যন্ত আশ্রম মহুলায় ভট্টাচার্যদের চালাঘরে থাকিয়া পরে সারগাছি গ্রামের প্রশস্ত পথের উপর একখানি পুরাতন দ্বিতল গৃহে উঠিয়া আসিল। উহার ত্রয়োদশ বৎসর পরে আশ্রমটি ১৯১৩ অব্দের মার্চ মাসে সারগাছির বর্তমান নিজস্ব ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়।

প্রথমাবধিই দণ্ডী ঠাকুর আশ্রমের সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বহু অনাথ বালকের প্রাণরক্ষা, সুশিক্ষা এবং সদ্ভাবে জীবনযাত্রানির্বাহের সুব্যবস্থা হইল। আশ্রমে বালকদের বাসাহারের সহিত সাধারণ শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। এতদ্ব্যতীত পল্লীর উন্নয়ন ও সাহায্যকল্পে দাতব্য-চিকিৎসালয়, নৈশবিদ্যালয় ইত্যাদিও স্থাপিত হইল। ফলতঃ স্বামী অখণ্ডানন্দের অন্তরের আকুতি আশ্রমের বিবিধ কার্যাবলম্বনে ক্রমেই মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। এই সকল কার্যে তিনি দীর্ঘকাল একাই ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার মৌলিক চিন্তার বা কর্মোদ্যমের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। স্বদেশী আন্দোলনেরও পূর্বে তিনি আশ্রমে চরকা এবং তাঁতের প্রবর্তন করেন এবং খাদির মর্যাদাবৃদ্ধির বহু পূর্ব হইতে স্বয়ং তাঁতের মোটা কাপড় পরিতে থাকেন। আশ্রমে কার্পাসের চাষ হইতে লব্ধ তূলা গ্রামে বিতরিত হইত। পরে গ্রাম হইতে আনীত সূত্রদ্বারা আশ্রমে বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহার প্রারম্ভে স্বহস্তে একটু কাপড় বুনিয়া এই আদর্শবাদী সন্ন্যাসী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমি একজন সামান্য সন্ন্যাসী : এই সামান্য পল্লীতে চার আঙ্গুল কাপড় বুনেছি ; কিন্তু এর দ্বারা তেত্রিশ কোটী ভারতবাসীর নগ্নতা

কিঞ্চিৎ আবৃত হবে। এতদ্ব্যতীত তিনি পল্লীবাসীর শিক্ষার জন্য ছায়াচিত্রসহায়ে বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা করিতেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া আশ্রমকে প্রচুর অর্থ দিতেন। এই সকল প্রশংসা ও সাফল্যমাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অখণ্ডানন্দজী সর্বদা স্বীয় আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই তৎপর থাকিতেন। তাই কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়াও মাথায় রুমাল বাঁধিয়া তিনি অপরাহ্ণ দুই-তিনটা অবধি কৃষকের মতো অবিরাম পরিশ্রমান্তে লেবু দিয়া পান্তা-ভাতমাত্র খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন।

এরূপ নিরলস, স্বার্থগন্ধশূন্য, একনিষ্ঠ শ্রমকে সফল করিয়া ক্রমে দুইটি কক্ষযুক্ত ও উভয় পার্শ্বে বারান্দা-বিশিষ্ট একটি হর্ম্য নির্মিত হইল। উহারই একটি প্রকোষ্ঠে অখণ্ডানন্দজী বাস করিতেন; অপর কক্ষে পুস্তকাবলী রক্ষিত ও পূজাদি অনুষ্ঠান হইত। বালকগণও এই বাটীতে বাস করিত। মন্দিরনির্মাণ তাঁহার তেমন মনঃপূত ছিল না, কারণ শিবজ্ঞানে জীবসেবাই যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি কেন শুধু প্রতিমাতেই দেববুদ্ধি করিবেন? আশ্রমের বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুরকে সাজাইয়া পূজার আনন্দ প্রাপ্ত হউক; কিন্তু তিনি তো পূজা করিবেন বালক-নারায়ণদের। এই ভাবকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি একবার এক ক্ষতদুষ্ট অনাথ বালককে ঋগ্বেদোক্ত পুরুষসূক্তের মন্ত্রে স্নান করাইয়া দেবজ্ঞানে আহার করাইয়াছিলেন। আর একদিন অপর এক বালক রাত্রে লণ্ঠন লইয়া পথ দেখাইয়া চলিতে থাকিলে তিনি আপনাকে সেবাপরাধী মনে করিয়া আলোকটি স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক বালকের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবধারার সহিত মন্দিরের সামঞ্জস্য না থাকিলেও পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় অবশেষে ইষ্টকনির্মিত দ্বিতল দেবালয় আশ্রমপ্রাঙ্গণ পরিশোভিত করিল এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৺অন্নপূর্ণা পূজাদিবসে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন

হইল। ক্রমে গোশালা, বিদ্যালয়, দাতব্যচিকিৎসালয়, শিল্পশিক্ষায়তন ইত্যাদি সমস্তই নির্মিত হইয়া গেল।

এই অনাথ-আশ্রমের একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। পুঁথিগত বিদ্যার সহিত হৃদয়ের প্রসারের জন্য বালকগণ পার্শ্ববর্তী গ্রামসকলে বিবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত হইত। একবার ঐ অঞ্চলে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইলে আশ্রম-বালকগণ সেবাদ্বারা ও রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থাবলম্বনে শত শত গ্রামবাসীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

মনে রাখিতে হইবে যে, আশ্রমস্থাপনের পর স্বামী অখণ্ডানন্দের কার্য আপাততঃ একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ হইলেও তিনি অবকাশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যত্র যাইতেন এবং তাঁহার অন্তর সর্বদাই পরদুঃখে ম্রিয়মাণ হইত। বিহারের ভাগলপুর জেলায় ঘোঘা নদীর বন্যায় পার্শ্ববর্তী গ্রামসকল প্লাবিত হইলে তিনি পঞ্চদশটি গ্রামকে দশ সপ্তাহ যাবৎ বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে বহু বিসূচিকা-গ্রস্তের সেবা করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বিহারের বহু নগর যখন বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি পঞ্চষষ্টি বর্ষের বৃদ্ধ হইলেও স্বয়ং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ধ্বংসাবলী পরিদর্শন করিয়া সেবাকার্যে নিরত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। একবার পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইলে উহার বর্ণনাপাঠে তিনি এতই বিচলিত হন যে, দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের ন্যায় গাছের পাতা, শাক ও পটলসিদ্ধ প্রভৃতি আহার করিয়া প্রায় পাঁচ-ছয়মাস অতিবাহিত করেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন আদর্শবাদী নীরব কর্মী; তাই তিনি নগরের কোলাহল ও বৃথা ব্যস্ততা পরিহারপূর্বক পল্লীর শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে আপন ভাবধারাকে রূপদান করিতেই ভালবাসিতেন। কি স্বাস্থ্য, কি উচ্চপদ, কিছুই তাঁহার এই তপস্যাভঙ্গে সক্ষম হইত না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপ-সভাপতি ও

১৯৩৪-এর মার্চমাসে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদমর্যাদাসত্ত্বেও তিনি বালকদের মধ্যে অবস্থানপূর্বক আশ্রমের সর্ববিধ কার্য পর্যবেক্ষণ ও বহুযত্নে রোপিত ও বর্ধিত বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকাই অধিক গৌরবজনক মনে করিতেন। বাঁধা-ধরা নিয়মে চলা এই স্বাধীনচেতা মহাপুরুষের পক্ষে দুর্বিসহ ছিল। এই প্রকার পল্লীজীবনযাপনের পশ্চাতে তাঁহার স্বকীয় আদর্শবাদের সহিত ছিল স্বামীজীর অনুপ্রেরণা। স্বামীজীর চিন্তায় বিভোর থাকায় তিনি একরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, স্বামীজী আসিয়া আশ্রমের গাছের লঙ্কা-সহ মুড়ি চাহিয়া লইয়া খাইতেছেন। আর স্বামীজীর মহামন্ত্র, "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর," তিনি অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশপ্রেমও তাঁহার এতাদৃশ সঙ্কল্পের সহায়ক ছিল। ইটালীর দেশভক্ত ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল্ ও নিগ্রোজাতির সেবক বুকার টি. ওয়াশিংটন তাঁহার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করিতেন এবং বালগঙ্গাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বদেশসেবা ও ত্যাগ তাঁহার চিত্তে সাড়া জাগাইত।

দীর্ঘ অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান, অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এবং রসবোধের মিশ্রণে তাঁহার বাক্যালাপ অতীব চিত্তাকর্ষক হইত। তাঁহার কপর্দকহীন জীবনযাত্রা, বিপদসঙ্কুল ভ্রমণ এবং দুর্গম তীর্থপর্যটনের কাহিনী শাস্ত্রীয় বাক্য ও অনুভূতির সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে কখন রোমাঞ্চিত, কখন হৃষ্ট, কখন নবভাবে উদ্বোধিত করিয়া দীর্ঘকাল তৎসমীপে বসাইয়া রাখিত। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত 'উদ্বোধন' ও 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া পরে 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' ও 'স্মৃতিকথা' নামে গ্রন্থাকারে সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার বলার ভঙ্গী যেমন সজীব ছিল, লেখার ধারাও ছিল তেমনি সতেজ ও সাবলীল। বাগ্মী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তিনি ছিলেন না বটে;

কিন্তু সময়বিশেষে স্বীয় বক্তব্য এমনই প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিতেন যে, অভিজ্ঞ বক্তাও চমৎকৃত হইতেন। একবার নফরচন্দ্র কুণ্ডুর[৩] এক স্মৃতিসভায় দধীচির ত্যাগমাহাত্ম্য-অবলম্বনে তিনি এমন একটি ভাষণ দিয়াছিলেন যে, গুণমুগ্ধ স্বামী সারদানন্দ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ভাই, তোমাকে আর সারগাছিতে যেতে দেওয়া হবে না—এখানে তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে।" অখণ্ডানন্দজী সর্বোপরি ছিলেন রসিক—গুরুগম্ভীর নীরস পরিবেশের মধ্যেও তিনি অকস্মাৎ কোনও হাস্যোদ্দীপক ঘটনার অবতারণা করিয়া আনন্দের স্রোত বহাইতে পারিতেন। একবার একজন যুবক সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে সাধুর বুক-পকেট হইতে পয়সাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সাধু ভাবিলেন, এখনই ভৎর্সনা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু অখণ্ডানন্দ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "ও প্রণামী পড়েছে, ছুঁয়ো না।" গঙ্গাধর মহারাজের এই দিকটার সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া গুরুভ্রাতারাও তাঁহার সহিত রঙ্গরস করিতেন। ইহার একটি ঘটনা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহাকে সস্নেহে গঙ্গার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'গ্যাঞ্জেস' নামে সম্বোধন করিতেন।

মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহাকে অনেককে দীক্ষা দিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি বিনয়বশতঃ ইহাতে সম্মত হন নাই; কিন্তু পরে যখন সম্মত হইলেন, তখন শিষ্যদিগকে একটা গতানুগতিকতা অনুসরণপূর্বক মন্ত্র না লইয়া ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র ও সুসংযত থাকিবার উদ্দেশ্যেই উহা গ্রহণ করিতে বলিতেন। ফলতঃ মন্ত্রদীক্ষা তাঁহার মতে

৩ কলিকাতার নর্দমার ভিতর ঢুকিয়া ময়লা পরিষ্কার করার কালে জনৈক ধাঙ্গড় বিষাক্ত বায়ুতে অজ্ঞান হইয়াছে জানিয়া ইনি তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য নর্দমায় প্রবেশ করেন, কিন্তু নিজেও প্রাণ হারান। ঐ পথ এখন তাঁহারই নামে পরিচিত।

শুধু একটা বাহ্য সংস্কার নহে; উহা জীবনের আমূল পরিবর্তনের অমোঘ উপায়।

মহাসমাধির একবৎসর পূর্বে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর বেশীদিন তিনি ইহজগতে থাকিবেন না। শেষ কয়টি দিন ভগবচ্চিন্তায় ব্যয় করার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রমে রামায়ণপাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৺বাসন্তীপূজা করার স্বপ্নাদেশ তিনি পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইত, যেহেতু পূর্ববর্তী অধ্যক্ষদ্বয় ৺বাসন্তীপূজার অসম্পূর্ণ সঙ্কল্প লইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটিতে পারে। কাজেই ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত মণ্ডপটি দেখাইয়া আশ্রমবাসীদিগকে বলিতেন, "পূজা দেখার সৌভাগ্য যদিই বা না ঘটে, তবু মায়ের জন্য এই মণ্ডপ করেছি ভেবেই আমার আনন্দ হয়। বাকী সব তোমরা করবে।" বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেও আজীবন স্বাধীনচেতা স্বামী অখণ্ডানন্দ দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকার কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতেন—তিনি অপরের সেবা করিবেন, সেবা লইবার অধিকার বা অভিপ্রায় তাঁহার নাই। অথচ বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ও যুবক ভক্তদের আগ্রহনিবন্ধন তাঁহাকে শেষ বয়সে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ সেবাগ্রহণ করিতেই হইত। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘর্ষে তিনি ব্যথিতহৃদয়ে অনেক সময় বলিতেন, "এই সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমি নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিজন দেশে ঘুরে বেড়াব।" সারগাছিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন; অথচ ইহাও তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, গুরুভ্রাতাদের সহস্রস্মৃতি-বিজড়িত এবং বিবেকানন্দাদির পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত বেলুড় মঠে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতীরে তাঁহার দেহপাত হয়। মহাসমাধির পূর্ব রাত্রে তাঁহাকে বেলুড়ে লইয়া আসায় এই বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বহুমূত্রাদি রোগে তাঁহার শরীর অতীব পীড়িত হইয়া পড়ায় সুচিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে

কলিকাতায় লইয়া আসা হয়; কিন্তু পথে ট্রেনেই তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং কলিকাতায় পৌঁছিলে চিকিৎসক বলেন যে, অবস্থা প্রতিকারের অতীত। সুতরাং দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহাকে বেলুড়ে লইয়া আসা হয়। এখানে পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারি ( ১৯৩৭ ) বিকালে তিনটা সাত মিনিটের সময় তাঁহার লীলাবসান হয়।

# স্বামী সুবোধানন্দ

সার্ধশতাধিক বৎসর পূর্বে কলিকাতার তদানীন্তন বৃক্ষলতাগুল্মাদি-আচ্ছাদিত এক বিজন অঞ্চলে জনৈক ব্রহ্মচারী ৺সিদ্ধেশ্বরী-কালীমাতার মূর্তিস্থাপনপূর্বক সাধনায় রত ছিলেন। এদিকে মহানগরীর কলেবর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চল লোকাকীর্ণ দেখিয়া ব্রহ্মচারী জগদম্বাকে জানাইলেন, "মা, আমি তো আর এখানে থাকতে পারি না।" ঠিক এমনই সময়ে মায়ের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট শ্রীযুক্ত শঙ্কর ঘোষ ৺কালীমাতার সেবাভার গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মচারীকে অব্যাহতি দিলেন। ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধা ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী তদবধি ঘোষবংশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ অঞ্চলের শঙ্কর ঘোষ লেন এখনও সেই বংশতিলকের নাম বহন করিয়া ধন্য হইতেছে। স্বামী সুবোধানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ ছিলেন শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র; আর তাঁহার মাতার নাম ছিল নয়নতারা। ২৩নং শঙ্কর ঘোষ লেনে ইঁহাদের ভদ্রাসন অবস্থিত। কৃষ্ণদাসের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়ত ছিল এবং সময়সময় তিনি পুত্রদিগকেও তথায় লইয়া যাইতেন। অধিকন্তু উত্তম ধর্মগ্রন্থ আনিয়া তিনি সন্তান-দিগকে পড়াইতেন। সুবোধানন্দ মহারাজ বলিতেন, "ছেলেবেলায় সাধুদের জীবন-চরিত বেশী পড়তুম, দেখতুম কেমন করে কার জীবনের গতি ফিরে গেল।" ভক্তিমতী মাতা নয়নতারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সন্তানদিগকে পৌরাণিক কাহিনী শুনাইতেন ও ধর্মে উৎসাহ দিতেন। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে সুবোধানন্দ শেষ বয়সেও বেলুড় মঠের দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় দীর্ঘকাল অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি পাঠে নিরত থাকিতেন এবং জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন, "বেশ একটা সদ্ভাব নিয়ে থাকা যায়।"

স্বামী সুবোধানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দের পিতৃদত্ত নাম সুবোধচন্দ্র ঘোষ। বয়সে তিনি অনেকেরই কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া গুরুভ্রাতাদের নিকট তাঁহার আদরের নাম ছিল খোকা ; শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'খোকা মহারাজ' নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার গর্ভধারিণীর বিশ্বাস ছিল যে, দেবতার আশীর্বাদরূপেই এই পুত্রটি তাঁহার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছে, এইজন্য তিনি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ডাকিতেন। সুবোধের জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর (২৩শে কার্তিক, ১২৭৪), শুক্রবার, চান্দ্র কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশীতে রাত্রি সাড়ে দশটায়। তাঁহার জন্মের পূর্বে কলিকাতায় প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছিল বলিয়া বাড়িতে কেহ কেহ তাঁহাকে 'ঝড়ো' বলিয়াও সম্বোধন করিতেন।

শৈশব হইতেই সুবোধের প্রতি আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একটা সরলতা ও তেজপূর্ণ মাধুর্য প্রকাশ পাইত, যাহা সমবয়স্ক ও গুরুজনদিগের চিত্ত সহজেই জয় করিত। অধিকন্তু ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বীয় মেধার জন্য শিক্ষকদিগের প্রশংসা-অর্জনেও সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠসমাপনান্তে তিনি এ্যালবার্ট কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন ; পরে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে পড়িতে থাকেন। বিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি দেখা গিয়াছিল।

এই সময়ে সুবোধের পিতা তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেন এবং কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের কিরূপে মিলন হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করেন। কেশবের পত্রিকা পড়িয়াও সুবোধ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারেন। পরে পিতার আনীত পুস্তকাবলীর মধ্যে সুরেশচন্দ্র দত্তের প্রণীত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামক পুস্তক-পাঠান্তে ঐ মহাপুরুষকে দর্শনের আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হওয়ায় তিনি পিতাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। পিতা সম্মত হইলেন, কিন্তু সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। সুবোধের কিন্তু

বিলম্ব অসহ্য ; সুতরাং সহপাঠী ও প্রতিবেশী বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে একযোগে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।[১] পথ উভয়েরই অজ্ঞাত ; অতএব গন্তব্যস্থান অতিক্রমপূর্বক আরিয়াদহে আসিয়া জানিলেন যে, পুনঃ দক্ষিণাভিমুখে যাইতে হইবে। নগরনিবাসী সুবোধের এই প্রথম পল্লীগ্রাম ও ধান্যক্ষেত্রের সহিত পরিচয়। ইহাতে আনন্দ-প্রাচুর্য থাকিলেও বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া পিতামাতার উদ্বেগ ও ক্রোধবৃদ্ধির ভয়ে সুবোধ বলিলেন, "ক্ষীরোদ, চল ফিরে যাই ; বেলা দুপুর হল রাত হবার আগে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।" কিন্তু ক্ষীরোদ ধৈর্য ধরিতে বলিলেন এবং তাঁহারা শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগত সুবোধ ক্ষীরোদকে আগে ঘরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। ক্ষীরোদ প্রবেশান্তে প্রণাম করিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছ?" ক্ষীরোদ কহিলেন, "কলকাতা থেকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বাবুটি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে এস না।" সুবোধ নিকটে যাইয়া পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। ইহার পরবর্তী ঘটনা স্বামী সুবোধানন্দের ২৩।৬।২৫ তারিখের পত্রে লিপিবদ্ধ আছে—"ঠাকুর আমায় হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন। আমি বলিয়াছিলাম, রাস্তায় কত লোককে ছুঁইয়াছি, এই কাপড়ে আর আপনার বিছানায় বসিব না। ঠাকুর আমাকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন ; বলিলেন,—তুই এখানকার ; কাপড়ে কি আসে যায়! পরে ঠাকুর ভাবে অচৈতন্য হইলেন ও আপনা-আপনি হাসিতে

---

১ আমরা 'শ্রীশ্রীস্বামী সুবোধানন্দের জীবনী ও পত্র'-অবলম্বনে ইহা লিখিলাম। 'কথামৃতের' মতে (৪র্থ ভাগ, ২৯১ ও ৩২৬ পৃষ্ঠা ; ১ম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠা) খোকা মহারাজ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন।

লাগিলেন। আরও কত কথা হইল। ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন, 'তুই এখানকার', তার মানে আমি তাঁর।···আমি একজনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম; কিন্তু এখন ঠিক জানিয়াছি, অন্য লোক উপলক্ষ্য মাত্র। যার জিনিস, যার লোক—সে-ই টানিয়া লয়।" সেদিন ঠাকুর সুবোধকে বলিয়াছিলেন, "যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তোদের ৺সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে, তোদের বাড়িতে কতবার গেছি। তুই তখন জন্মাস নি। তুই এখানে আসবি, জানতুম। যাদের হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন।" সুবোধ জানিতে চাহিলেন যে, তিনি যদি তথাকারই হন, তবে মা আরও আগে আনিলেন না কেন? ঠাকুর কহিলেন, "দেখ, সময় না হলে হয় না।" অতঃপর সুবোধ ও ক্ষীরোদ বিদায় চাহিলে ঠাকুর শনি কি মঙ্গলবারে আসিতে বলিয়া দিলেন।

পরবর্তী শনিবারে সুবোধ ও ক্ষীরোদ পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলে স্বকক্ষে ভক্তসহ উপবিষ্ট ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইঙ্গিতে বাহিরে অবস্থান করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে লইয়া গেলেন। সুবোধ ও ক্ষীরোদ সেখানে তাঁহার উপদেশানুসারে সুখোপবিষ্ট হইলে ঠাকুর সুবোধের বুকে ও মুখে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং অতঃপর জিহ্বায় মন্ত্রবিশেষ লিখিয়া দিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যানে বসিয়া সুবোধের মনে হইল, যেন মেরুদণ্ড অবলম্বনে কি একটা তাঁহার মাথায় উঠিয়া তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞালোপ করিতেছে। ক্রমে তিনি দেখিলেন, ঠাকুর নাই—তৎস্থলে রহিয়াছে বহু দেবদেবীর মূর্তি; আবার ইঁহাদের মধ্যে কখন কখন ঠাকুরের মূর্তিরও প্রকাশ হইতেছে। অবশেষে সমস্তই অসীমে বিলীন হইয়া এক অপূর্ব আনন্দসাগরে তাঁহাকে ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে মাথায় ও বুকে হাত

বুলাইয়া ঠাকুর সুবোধকে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং কহিলেন, "খুব কি ভয় হয়েছিল ?" সুবোধ উত্তর দিলেন, "হাঁ।" ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "তুই কি বাড়িতে ধ্যান-ট্যান করতিস ?" সুবোধ কহিলেন, "বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার বিষয় যা শুনেছিলাম, তাই একটু-আধটু ভাবতুম।" ঠাকুর বলিলেন, "তাই তোর এত শীগগির হল।"

ইহার পর হইতে সুবোধ স্বীয় অধ্যাত্মজীবন পরিচালনের ভার শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে অর্পণপূর্বক নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বিপ্রহরে ঘর্মাক্ত-কলেবরে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীগুরুকে বীজন করিতে করিতে দেখিতেন যে, তাঁহার নিজের শ্রান্তি বিদূরিত হইতেছে। কোন দিন বা সুবোধের দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে শয্যায় বসাইয়া পাখা করিতে বলিতেন এবং পরমুহূর্তেই পার্শ্বে শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাখা লইয়া সুবোধকে বাতাস করিতেন—ইহা এক অদ্ভুত স্নেহসিক্ত লীলা। অন্যান্য সময়ে ঠাকুর তাঁহাকে ক্রীড়া বা গল্পচ্ছলে জপ, ধ্যান, ব্রহ্মচর্য এবং অন্য উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সুবোধের ভক্তি-বিশ্বাস কিরূপ বর্ধিত হইতেছে। সুবোধ ঠাকুরকে প্রথমে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুর যখন একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয় ?" তিনি বলিলেন, "লোকে কত কি বলে। আমার এখনও ওসব মনে নেয় না। আমি নিজে না বুঝা পর্যন্ত ওসব বিশ্বাস করছি নি।" এতদপেক্ষা উচ্চতর ধারণা ঠিক কবে তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল জানা যায় না। তবে পূর্বোদ্ধৃত পত্রেই আছে, "তাঁরা (শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর) যদি ধরা না দেন, কার সাধ্য তাঁদের ধরতে পারে, কিংবা তাঁদের চিনতে পারে ?... আমাদের ভাল-মন্দ সমস্তই তাঁদের হাতে।" আর ২৫।২।২৮ তারিখের পত্রে আছে, "ঠাকুর আমাদের সকলের জন্য—ইহকাল ও পরকাল।"

বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে যিনি যখন যে ভাবেই অধিরূঢ় হইয়া থাকুক না কেন, শ্রীগুরুর উপর একান্ত নির্ভরতা তাঁহার ধর্মজীবনের প্রারম্ভেই মুকুলিত হইয়াছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একবার যখন তাঁহাকে ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "ধ্যান-ট্যান করতে পারব না। ওসব যদি করতে হবে তো অপরের কাছে গেলেই তো চলত—আপনার কাছে আসবার কি দরকার ছিল?" ঠাকুর তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলেন, "আচ্ছা, যা ওসব তোকে কিছুই করতে হবে না; তুই দুবেলা একটু স্মরণমনন করে নিস।" এই সঙ্গে ছিল তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মীয়তাবোধজনিত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার। ঠাকুর একদিন বলিলেন, "তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাস্টার আছে। সে এখানে আসে, বেশ লোক। তার কাছে যাস্, আর এখানে মাঝে মাঝে আসিস। সুবোধ দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁহার কাছে যাইবেন না; কারণ তিনি কি শিখাইবেন? তিনি শিখাইবার লোক হইলে নিজে ওরূপ এলোমেলো সংসার করিতেন না। তিনি সংসার ছাড়িয়া দিতেন। কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও রাখাল, শুনছিস খোকাশালা কি বলছে? ওরে, সে-কি আর নিজের বানানো কিছু বলবে? এখানকার কথাই সব বলবে।" অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ পালন-পূর্বক তিনি মাস্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে মুগ্ধ হইলেন এবং বিনা দ্বিধায় পূর্বধারণা পরিত্যাগ-পূর্বক মাস্টার মহাশয়কে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিলেন। নিরভিমান মাস্টার মহাশয় সব শুনিয়া সেদিন বলিয়াছিলেন, "তাই তো, সমুদ্রে যায় লোকে—কেউ জালা নিয়ে, কেউ কলসী নিয়ে, কেউ ঘটি নিয়ে। যার যার পাত্র ভরে জল নিয়ে আসে, আর সবাইকে সেই জলের একটু একটু দেয়।···লেখাপড়া শিখে মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সব তত্ত্বই জেনে

ফেলেছি। ওমা, তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখলুম, সব বিদ্যা অবিদ্যা। যে বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অবিদ্যা-অন্ধকার দূর হয়, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। তাঁর একটি কথায় সব ভেসে গেল, মনে হল—কি আশ্চর্য, এই বিদ্যা নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার!"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে আকৃষ্ট হইবার পর সুবোধ ভ্রূমধ্যে একটি জ্যোতি দর্শন করিতেন। তাঁহার মাতা উহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন, তিনি যেন উহা কাহাকেও না বলেন। কিন্তু সুবোধ ইহাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ না দেখিয়া সহজভাবে কহিলেন, "এতে আমার কী অপকার হবে, মা? আমি তো এ আলোটা চাই না, আমি চাই আলোর মূল যে তাঁকে।"

ঠাকুরের নিকট তিনি ঈশ্বরদর্শন ও প্রার্থনা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পরে ৬।১২।২৬ তারিখে জনৈকা ভক্তিমতী শিষ্যাকে লিখিয়াছিলেন, "একবার আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কত পুস্তক পড়িয়াছি ও কত লোকের নিকট গল্প শুনিয়াছি; ঠাকুর-দেবতা দেখিতেপাওয়া যায় কি না?' তিনি বলিলেন, "যেমন দুই জনে এক সঙ্গে বসে গল্প করে, বেড়াইয়া বেড়ায়, এই রকম দেখিতে পায়। তবে ঠিক ঠিক অন্তরের সহিত ডাকিতে হয়। ঠাকুরকে কাঁদাকাটি করিয়া ডাকিতে হয়; তাঁর কাছে আবদার করিতে হয়—যেমন ছোট ছেলেমেয়ে মার কাছে কাঁদাকাটি করিয়া কোন জিনিসপত্র চায়, সেই রকম ডাকিতে হইবে। মন হইতে অন্য পাঁচরকম বাসনা-কামনা সমস্তই তাড়াইতে হইবে—'শুধু আমার মা আছেন, আমি আছি'।" অন্যান্য বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন (২২।২।২৮ তারিখের পত্র)—"ঠাকুর বলিতেন, 'যাহাদের ধর্ম-সম্বন্ধে কিছু হইবার, এখানকার হাবভাব তাহাদের সমস্তই ভাল লাগিবে।' আমি ঠাকুরের কাছে ঐসমস্ত কথা শুনিয়াছি।…ঠাকুর আরও

বলিতেন, 'যার হেথায় আছে, তার সেথাও আছে ; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই'।"

সরল সুবোধের মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি দ্বিধাশূন্য-হৃদয়ে প্রশ্ন করিয়া বসিতেন এবং ঠাকুরও বিরক্ত না হইয়া যথাযথ উত্তর দিতেন। এক সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের ঘরে কীর্তন জমিয়াছে। অনুপম রসমাধুর্যে বিভোর ভক্তবৃন্দের সেদিন অপূর্ব হাবভাব—কেহ অনুভূতিপ্রাচুর্যে আত্মহারা হইয়া উন্মাদপ্রায় ক্রন্দন করেন, কেহ আনন্দে তন্ময় হইয়া হাস্য করেন, কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া পুত্তলিকাপ্রায় স্তব্ধভাবে অবস্থান করেন, কেহ বা অর্ধবাহ্যদশায় ভক্তদের পদতলে লুটাইয়া চরণরজঃ গ্রহণ করেন। সুবোধও সে কীর্তনোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এরূপ ভাববিহ্বলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিগ্ধ ছিলেন ; তাই ভক্তগণ চলিয়া গেলেও ঠাকুরকে প্রশ্ন করিবারই জন্য তিনি বসিয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই এখনও বসে রইলি যে ?" সুবোধ অমনি বলিয়া বসিলেন, "আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল ?" ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর দিলেন, "আজ লেটোরই (লাটু মহারাজের) ঠিক ঠিক ভাব হয়েছে—আর সব অল্পস্বল্প।"

কণ্ঠরোগের নিরাময়ার্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন কাশীপুরে আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং চিকিৎসক, সেবক ও ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার আহারাদি সর্ববিষয়ে সতর্ক আছেন, তখন সরল সুবোধ একদিন পরমহংসদেবকে বলিলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্বরে যে স্যাঁৎসেঁতে ঘরে থাকতেন তাই আপনার গলা-ব্যথা হয়েছে। আপনি চা খান। আমাদের গলা-ব্যথা হলে আমরা চা খাই, আমাদের গলা-ব্যথা সেরে যায়।" ততোধিক সরল ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিলেন, "তবে চা-ই খাই। ও রাখাল, এ বলছে চা খেলে নাকি গলা-ব্যথা সেরে যাবে।"

রাখাল উত্তর দিলেন, "সে কি আপনার সহ্য হবে? সে যে গরম জিনিস।" পরমহংসদেব অমনি কহিলেন, "না বাবু, তাহলে আবার উলটে গরম হয়ে যাবে।" আর সুবোধকে প্রবোধচ্ছলে বলিলেন, "ওরে, সইল না।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বালভক্তদের অনেকেই গৃহত্যাগপূর্বক বরাহনগর মঠে সমবেত হইলেন। সে আকর্ষণ সুবোধকেও নিশ্চয়ই চঞ্চল করিয়াছিল; কারণ বৈরাগ্য ছিল তাঁহার স্বভাবগত জিনিস। জানিতে পারা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্বেই যখন তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন তিনি পিতাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। যদি বলপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়, তথাপি সংসারের দায়িত্ব লইয়া গৃহে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। পিতা অবশ্য ইহা ছেলেমানুষি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন, "কেন বিয়ে করবি না? ভাল করে লেখাপড়া কর, খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে।" পিতা হয়তো এই কথা পাঠে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। সুবোধের ধারণা হইল যে, পাঠে উৎকর্ষ দেখাইলে এই অবাঞ্ছিত বিবাহ অনিবার্য হইয়া পড়িবে; কাজেই তিনি অতঃপর পাঠে অমনোযোগী হইলেন। তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন; ঐ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যান। অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে সে কুমার-বৈরাগ্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঠাকুরের দেহত্যাগে সংসার তাঁহার নিকট শূন্যপ্রায় প্রতিভাত হইল। অতএব ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পরে কোনও এক সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। যাত্রার পূর্বে ঠনঠনিয়ার ৺কালীমাতাকে প্রণাম করিলে তাঁহার মনে হইল, যেন বরাভয়করা জগদম্বা স্মিতহাস্যে বলিতেছেন, "ভয় কি? আমি তোর সঙ্গে আছি। তোর কোন ভয় নাই।"

এই পরিব্রাজক-জীবনের বিবরণ তিনি একখানি পত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "আমি যখন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, মন কি করিয়া স্থির করিব। সেইজন্য টাকা-পয়সা হাতে না রাখিয়া হাঁটিয়া পশ্চিমদেশে চলিয়া গেলাম। রাস্তায় কিংবা অন্য জায়গায় যদি কথাবার্তা হইত, শুধু ধর্মসম্বন্ধে। সুতরাং মনে বাজে কোন রকম চিন্তা আসিতে পারিত না: কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব, কিছুই স্থির নাই। কখনও গাছতলায়, কখনও কোন নদীর ধারে, কখনও ফাঁকা ময়দানে—এই রকম রাত্রি কাটিত। দুপুর বেলায় ভিক্ষা যাহা মিলিত, খাইতাম। বৃষ্টি পড়িলে ভিজা কাপড় গায়ে শুকাইত। জামা, জুতা, ছাতি কিছুই ব্যবহার করিতাম না। সুতরাং এ অবস্থায় কোন রকম রিপু আর প্রশ্রয় পাইত না।"

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড ধরিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে তিনি ক্রমে কাশীধামে উপনীত হইয়া গঙ্গাস্নান এবং ৺অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন। কিন্তু তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—আত্মীয়-স্বজন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া স্বগৃহে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু মন যাঁহার গৃহছাড়া, গৃহ তাঁহাকে বাঁধিবে কিরূপে? অতএব কিয়ৎকাল পরেই সুবোধ বরাহনগর মঠে যোগদানপূর্বক সন্ন্যাসী হইলেন।

স্বামী সুবোধানন্দ বরাহনগরে কিয়ৎকাল অবস্থানানন্তর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তীর্থদর্শন ও তপস্যায় নির্গত হন। ইহা আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মহারাজের সহিত বৃন্দাবনে কিয়ৎকাল তপশ্চর্যার পর তিনি ৺কেদার-নাথ ও ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনে নির্গত হন। অতঃপর কিছুদিন হিমালয়ে কাটাইয়া মঠে আসেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যের তীর্থপর্যটনে নিষ্ক্রান্ত হন। এই তীর্থদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন দেব-দেবী ও মন্দিরাদির সহিত

সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তরকালে ধর্মপ্রসঙ্গমধ্যে ঐগুলির সন্নিবেশ করিয়া উহা অতীব চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন।

তাঁহার তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের দুই-একটি চমকপ্রদ ঘটনা জানিতে পারা গিয়াছে। একবার তিনি ভাদ্র মাসে ফল্গুনদী পার হইতেছিলেন। নদীতে তখন কোমর জল। একজন পার হইল দেখিয়া তিনিও অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে আর এক ব্যক্তি চলিলেন। স্বামী সুবোধানন্দ সন্তরণপটু নহেন। নদী অতিক্রমের সময় অকস্মাৎ জলবৃদ্ধিনিবন্ধন তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। তখন তিনি পশ্চাদ্বর্তী ব্যক্তিকে গুরুভ্রাতাদের নিকট সংবাদপ্রেরণের অনুরোধ জানাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "এই নাও, ঠাকুর, শেষ প্রণাম।" ততক্ষণে তিনি জলমগ্ন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু পরে দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে টানিয়া নিরাপদ স্থলে উপস্থিত করিয়াছে।

আর একবার হরিদ্বারে তপস্যার সময় তিনি দুইমাস জ্বরে ভুগিতেছেন। একদিন এমন হইয়াছে যে, কমণ্ডলুটি ধরিয়া জল খাইবেন এমন সামর্থ্যও নাই—কমণ্ডলু ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। তাই অভিমানভরে ঠাকুরকে বলিলেন, "তাই তো এমন ভুগছি।—এমন কেউ নেই যে, একটু খোঁজখবর করে।" ক্ষীণদেহে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখেন, ঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন, "কি চাস? লোকজন চাস না টাকা-পয়সা চাস?" সুবোধানন্দ বলিলেন, "কিছুই চাই না। শরীর থাকলে রোগ হবেই; কিন্তু তোমায় যেন না ভুলি।" পরদিন হইতে এক সাধু তাঁহার দেখাশোনা করিতে লাগিলেন; অপর এক সাধুর নিকট পঞ্চাশ টাকার মণিঅর্ডার আসিলে তিনি উহা তাঁহার সেবার জন্য দান করিলেন। স্বামী সুবোধানন্দ উভয় সাহায্যই প্রত্যাখ্যান করিলেও সাধুদ্বয় তাঁহাদের সঙ্কল্প ছাড়িলেন না ('উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৩৯)। রোগ যন্ত্রণামধ্যে

এইরূপ অলৌকিক দর্শন তাঁহার জীবনে বিরল নহে। প্রসঙ্গক্রমে জানা যায় যে, তিনি যখন জামতাড়া আশ্রমে আমাশয়রোগে ভুগিতেছিলেন, তখনও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও মহারাজ প্রভৃতির দর্শন পাইয়া পার্শ্বস্থ সেবককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শরীর আর কিছুকাল থাকিবে ('উদ্বোধন', আষাঢ়, ১৩৪৫)। যাহা হউক, উত্তর ও দক্ষিণে পরিব্রাজক-জীবন সমাপনান্তে তিনি ইং ১৮৯৮ সনের ২৩শে মার্চ মাদ্রাজ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন।

ইতোমধ্যে স্বদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে নবযুগের নবমন্ত্র-প্রচারের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। আলমবাজার মঠে বক্তৃতা-শিক্ষার জন্য তখন প্রতিসপ্তাহে অধিবেশন হইত এবং সন্ন্যাসীদিগকে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইতে হইত। স্বামী সুবোধানন্দ তখন মঠে ছিলেন। একদিন তাঁহার পালা আসিলে তিনি অব্যাহতি পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্বামীজীর মত পরিবর্তিত না হওয়ায় নিরুপায় হইয়া কম্পিতহৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু একি! পদতলে ভূমি কম্পমান কেন? আর দূরে ঐ শঙ্খধ্বনিই বা উত্থিত হইল কেন? ক্রমে পুষ্করিণীর জল পর্যন্ত তীর অতিক্রম করিয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ততক্ষণে কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না যে, ইহা প্রচণ্ড ভূমিকম্প (১২ই জুন, ১৮৯৭)। সভা ভাঙ্গিয়া গেল এবং খোকা মহারাজ নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ইহাতেও গুরুভ্রাতারা আনন্দোপভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কম্পান্তে স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন, "খোকার বক্তৃতায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল।" সে মন্তব্যে খোকা মহারাজ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল হইলেন।

স্বামীজী তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহাকে লইয়া কৌতুকাদিও করিতেন। সরল খোকা মহারাজেরও স্বামীজীর সহিত ব্যবহারে কোন সঙ্কোচ দেখা যাইত না। স্বামীজীকে গম্ভীর, চিন্তান্বিত

কিংবা বিরক্ত দেখিলে তাঁহার নিকট অপরে অগ্রসর হইতে না পারিলেও খোকা মহারাজ নিঃসঙ্কোচে যাইতেন এবং স্নেহপাত্রের সন্দর্শনে স্বামীজীর ভাবও সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইত। অতএব বয়োজ্যেষ্ঠেরা অনেকক্ষেত্রে 'খোকার' সাহায্যে কার্যোদ্ধার করিতেন।

একবার খোকা মহারাজের সেবায় প্রসন্ন হইয়া স্বামীজী বর দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "এমন বর দিন যাতে কোন দিন আমার সকালের চা বাদ না পড়ে।" স্বামীজী ইহাতে সহাস্যে কহিলেন, "তাই হবে।" সে অমোঘ বর নিষ্ফল হয় নাই। চা-এর প্রতি তাঁহার একটা সহজাত প্রীতি ছিল—ইহা যেন ক্ষুদ্র শিশুর লজেঞ্জ প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণেরই অনুরূপ; আর এই ভালবাসা তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। চা ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বরোগহর মহৌষধি সদৃশ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ঠাকুরকে পর্যন্ত তিনি চা খাওয়াইতে চাহিয়াছিলেন। কোন বিলাস-দ্রব্য তিনি চাহিতেন না; কিন্তু চা না হইলে তাঁহার চলিত না।

মঠে অবস্থানকালেও খোকা মহারাজ প্রায়ই তীর্থভ্রমণাদিতে নির্গত হইতেন। আলমোড়া হইতে তাঁহার লিখিত ১০।৮।৯৯ তারিখের পত্রে জানা যায়, "পুনরায় কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে এবং পাহাড়ে (মায়াবতীতে) আমাদের যে মঠ আছে, সেখানেও গিয়াছিলাম।" ঐ বৎসর ২৫শে অক্টোবর তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবৎসর স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত তিনি নবদ্বীপে যান এবং সম্ভবতঃ উহার পরে দার্জিলিং-এ গমনান্তে তথা হইতে ৺কামাখ্যা দর্শন করিয়া আসেন। পুরাতন পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ কালাজ্বরের প্রতিকারকল্পেই তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন-স্থাপনের পর অপর গুরু-

ভ্রাতাদের ন্যায় স্বামী সুবোধানন্দও নবপরিকল্পিত কার্যধারার সাহায্য করিতে অগ্রসর হন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি বেলুড় মঠের ট্রাস্ট ডিড্ সম্পাদন করিয়া স্বামীজী যে একাদশজন গুরুভ্রাতাকে[২] ট্রাস্টি নিযুক্ত করেন, স্বামী সুবোধানন্দও তন্মধ্যে একজন ছিলেন। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন বিশিষ্ট অঙ্গরূপে তিনি নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার মুখে প্রায়ই উচ্চারিত হইত—

"মন করো না কাজে হেলা ;
সঙ্গী জোটে বা না জোটে—একাই করো মেলা।"

তাঁহার ২১।৮।২৫ তারিখের পত্রেও আছে, "সৎকর্ম করিতে কখন পেছ-পা হইবে না। ভাল কাজের বাধা-বিঘ্ন অনেক। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কাজ করা ভাল। মনের মতো সঙ্গী জোটে ভাল, না জোটে একলাই ভাল। যাহার মন সন্দেহপূর্ণ, তাহার দ্বারা ভাল কাজ হইবার আশা নাই।" শুধু কথায় নহে, কার্যেও শ্রীভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন সৎকার্যে ব্যয় করিয়াছিলেন।

পরদুঃখমোচনে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন; কারণ তাঁহার কথাই ছিল এই—"লোকের আপদে-বিপদে একটু দেখা ভাল!" ১৯০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে চিল্কাহ্রদ-অঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ ও ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজের সহিত তথায় গিয়া সেবাকার্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময় কোঠার হইতে একটি দুঃস্থ বালককে কলিকাতায় আনিয়া তাহার লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরে বেলুড়ের একটি নিঃস্ব পরিবার তাঁহার নিয়মিত সাহায্যে অনশন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বস্তুতঃ আর্তের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে সহজেই আঘাত দিয়া উহাকে সক্রিয় করিয়া তুলিত।

---

২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অখণ্ডানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, সুবোধানন্দ।

রোগ-শয্যা-পার্শ্বে তাঁহার আবির্ভাব প্রায়ই হইত এবং রোগীও তাঁহার দর্শনে অশেষ সান্ত্বনা পাইত। এই বিষয়ে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পাচক-ভৃত্য কেহই বঞ্চিত হইত না ; তাহাদের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থার জন্য তিনি সর্বদাই তৎপর হইয়া থাকিতেন। একবার এক যুবক ছাত্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অপর সকলে যখন প্রাণভয়ে দূরে সরিয়া গেল, তখন খোকা মহারাজ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সযত্নে সেবাদি-দ্বারা তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন। দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের জন্য তিনি অপরের নিকট ভিক্ষার্থী হইতেন। বেলুড় গ্রামের অনেকে চাল ও অর্থাদির জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী থাকিত। ভক্তদের অসুখের সময়ও তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক করিয়া দিতেন।

তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনদর্শনে সহসা কেহ তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাইত না। ইহাতে লাভ ছিল এই যে, সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত এবং নিজ নিজ জাগতিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ-লাভে চরিতার্থ হইত। অথচ স্বীয় অধ্যাত্মশক্তি-গোপনের কোন বৃথা প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনে ছিল না। তাই সাধারণ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যেও অধ্যাত্মস্তরের যে দ্যোতনা আপনা হইতেই স্ফূরিত হইত তাহাতেই আগন্তুকগণ ধন্য হইত। ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় যে, এইরূপ উচ্চশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ কিরূপে বালক-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই সহিত সমভাবে মিশিতে পারিতেন—তখনকার মতো বয়স, বুদ্ধি ও অনুভূতির পার্থক্যাদি যেন মুছিয়া যাইত।

মঠজীবনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার এক প্রধান কার্য ছিল স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত উদ্যানের তত্ত্বাবধান করা। অধিকন্তু অন্যান্য কর্মেও তাঁহাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইত। কখনও তিনি হয়তো

অখণ্ডানন্দজীর সহিত ঠাকুরপূজার জন্য নাগেশ্বর চাঁপার সন্ধানে ফিরিতেন, কখনও শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবের আয়োজনে ঘুরিতেন, কখনও রুগ্ন গুরুভ্রাতাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, আবার কখনও এটোয়ায় যাইয়া গুরুভ্রাতা হরিপ্রসন্নকে (বিজ্ঞানানন্দজীকে) মঠের অবস্থা বুঝাইয়া অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন।

উত্তরকালেও মঠের সর্ববিধ বিভাগের সহিত তাঁহার একটা প্রাণের সংযোগ ছিল। একদিন অপরাহ্ণে দেখা গেল, তিনি একটা বালতি লইয়া হন হন করিয়া চলিয়াছেন, উহাতে আছে কিছু নারিকেল-ছোবড়া, পাটের দড়ি ও একখানি ছুরি। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ (ব্রহ্মানন্দজী) অনেক কষ্ট করে নানা জায়গা থেকে এইসব গাছ যোগাড় করেছেন। কলম করে এদের চারা রাখলে, নানা জায়গায় বসানো যাবে। এই সব গাছ যদি মরেও যায়, তাদের কলমগুলি থাকবে।" কলম তিনি স্বহস্তে বাঁধিতেন এবং তজ্জন্য অনেক সময় গাছেও উঠিতেন। বয়স তাঁহার তখন ষাটের উপর।

তাঁহার কর্মজীবনে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, তিনি সর্বদা আপনাকে 'খোকা' বলিয়াই ভাবিতেন এবং সকলের সহিত তদনুরূপ অকপট ও নিরভিমান ব্যবহার করিতেন; আর তাঁহার প্রত্যেক আচরণের সহিত মিশ্রিত থাকিত একটা হৃদয়স্পর্শী সরসতা। তিনি নিজের ব্যক্তিগত সমুদয় কার্য নিজেই করিতেন—অপর কেহ সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেও সরিয়া দাঁড়াইতেন না। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রেই ইহার অন্যথা হইত। একদিন অন্যত্র বস্ত্রাদিতে সাবান দেওয়ার পরে উহা পুষ্করিণীতে ধুইতে গিয়া তিনি দেখেন, স্বল্পপরিসর ঘাটে একজন ব্রহ্মচারী সাবান দিয়া বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে। তাই তিনি ব্রহ্মচারীকে স্বীয় কাপড়গুলিও ধুইয়া দিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি রেখে যান, আমি

ধুয়ে দেব।” কিন্তু খোকা মহারাজ বলিলেন, “না হে, আমি নিজেই ধুতে পারতাম; কিন্তু তুমি কাপড়ে সাবান দিয়েছ। আমি ঘাটে নামতে গেলে তুমি পথ ছেড়ে দেবে; আর তার ফলে তোমার সাবান নষ্ট হবে, কাজও মাটি হবে। তাই তোমাকে ধুতে বলেছি। এখন তোমার কাছে কাপড় ফেলে গেলে তুমি গেরুয়া রঙ করা প্রভৃতিরও ভার নেবে—আমি তা চাই না।”

তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদাদিতে একটা স্বভাবসুলভ ত্যাগের ভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার পায়ে চটি ভিন্ন কিছু দেখা যাইত না; একটি গেঞ্জী গায়ে দিয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন; পরনের কাপড় দুই-চারিখানি মাত্র থাকিত। ময়লা হইলে বস্ত্রাদি নিজেই পরিষ্কার করিতেন। কোথাও যাইতে হইলে এই সামান্য পোশাকের উপর একটি জামা ও চাদর শোভা পাইত। শয্যাও ছিল অনুরূপ অতি সামান্য। কিন্তু মুখখানি ছিল তাঁহার সদা হাস্যময় ও সারল্যমণ্ডিত।

খোকা মহারাজের ছেলেমানুষির একটি দৃষ্টান্ত এই—তিনি নৌকায় উঠিতেন না, পাছে উহা জলমগ্ন হয়। অতএব পূর্বতীরবর্তী কলিকাতার কোনও স্থানে যাইতে হইলে শালকিয়া পর্যন্ত পদব্রজে যাইয়া ট্রামে উঠিতেন এবং ঐভাবেই প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে চারি পাঁচ মাইল হাঁটিতে হইত; কিন্তু পরিশ্রমে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না।

বৃদ্ধকালে তাঁহার মঠপ্রীতি বহুভাবে প্রকটিত হইত। তিনি বলিতেন, “শাকভাত খেয়ে মঠে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না।” স্বামীজীর সমাধিস্থল ও বেলতলার প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ ছিল। অত্যন্ত দুর্বলশরীরেও তিনি একবার সেখানে ঘুরিয়া আসিতেন; আর স্বামীজী সম্বন্ধে বলিতেন, “ঠাকুর বলেছেন, স্বামীজী হচ্ছেন সাক্ষাৎ শিব।”

শেষবয়সে তিনি মঠের দোতলায় মহাপুরুষ শিবানন্দজীর গৃহের পার্শ্বে

এক ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিতেন। মহাপুরুষজীকে তিনি এতই সমীহ করিয়া চলিতেন যে, পাছে তাঁহার কোন অসুবিধা হয় এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতেন ও কথাবার্তা বলিতেন; মঠ হইতে স্বল্পক্ষণের জন্যও কোথাও যাইতে হইলে শুধু জানাইবার জন্য নহে, পরন্তু যথাবিধি মঠাধ্যক্ষের আদেশগ্রহণার্থে তিনি মহাপুরুষজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কোথায় যাইবেন, কেন যাইবেন, কখন ফিরিবেন ইত্যাদি সমস্ত নিবেদন করিতেন এবং যেরূপ নির্দেশ পাইতেন, বিনা আপত্তিতে সেরূপ করিতেন; অধিকন্তু নিজে যাহা যেরূপ করিবেন বলিয়া যাইতেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইতে দিতেন না। মহাপুরুষজীও এই ছোট ভাইটিকে অতি স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার সুখ-সুবিধাদি বিষয়ে সংবাদ রাখিতেন। একবার খোকা মহারাজের জ্বর হইয়াছে। মহাপুরুষজীর শরীর তখন ভাল নহে; তাই ডাক্তার আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছোঁড়াকে দেখেছ? ও কেমন আছে?" গৃহে সমবেত সকলে অবাক —কাহার কথা ইনি বলিতেছেন? অবশেষে তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া মহাপুরুষজী কহিলেন, "ঐ যে পাশের ঘরে আছে, খোকা ছোঁড়া। ও নেহাত খোকা। নিজের শরীরের যত্ন নিতে পারে না। ওকে দেখে পথ্যাদি সম্বন্ধে ভাল করে বলে যেও।" খোকা মহারাজের বয়স তখন একষট্টি; সুতরাং মহাপুরুষের কথার রকম দেখিয়া কেহ হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। খোকা মহারাজ কিন্তু সবই শুনিয়াছিলেন; অতএব ডাক্তার উপস্থিত হওয়ামাত্র সুবোধ বালকের মতো ডাক্তারকে বলিলেন যে, তিনি যেন মহাপুরুষজীর কথানুসারেই পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন, ঐ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোনও বক্তব্য নাই।

পরিণত বয়সেও তিনি দীক্ষা দিতেন না; দীক্ষার্থী আসিলে বলিতেন, "আমি কি জানি? আমি যে খোকা। তোমরা রাখাল

মহারাজের কিংবা মায়ের কাছে নিও—তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব উঁচু।" শ্রীশ্রীমা অবশ্য বলিয়াছিলেন, "খোকা কেন মন্ত্র দেয় না? যে কদিন তাঁর (ঠাকুরের) ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক।" তথাপি খোকা মহারাজ সহজে স্বীকৃত হন নাই। তবে অতি আগ্রহবান কেহ ধরিয়া বসিলে বিরল স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইত। এইরূপে ১৯১৫-১৬ খ্রীঃ হইতে দুই-চারিটি ক্ষেত্রে হৃদয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে দিতে সম্মত ছিলেন না। এমন কি, ইহারও অনেক পরে দীক্ষার্থী আসিলে শিবানন্দজী বা সারদানন্দজীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন; তাঁহারা তাঁহাকেই দীক্ষা দিতে বলিলেও ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া বা কোন উত্তর না দিয়া সরিয়া পড়িতেন। অবশেষে শিবানন্দজী মঠাধ্যক্ষ হইবার পরে খোকা মহারাজ যেবারে পূর্ববঙ্গে যান (১৯২৫), সেবারে শিবানন্দজী বলিয়া দিলেন, "ও অঞ্চলের লোকেরা ঠাকুরের নাম শুনবার জন্য লালায়িত—খুব নাম দেবে; লোকদের বঞ্চিত করো না।" অধ্যক্ষের আদেশ পাইয়া খোকা মহারাজ পূর্ববঙ্গের প্রার্থীদিগকে মুক্তহস্তে কৃপা করিয়া যখন মঠে ফিরিলেন, তখন একটি অল্পবয়স্ক বালক দীক্ষিত হইয়াছে জানিয়া মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট ছেলেরা ধ্যান-জপ করবে কি ক'রে?" খোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, "আপনি আদেশ দিয়েছেন, তাই তাদের বঞ্চিত করিনি।"

দীক্ষা-দানকালেও তিনি আপনাকে গুরু মনে করিতে পারিতেন না। দীক্ষার্থীকে প্রথমে বিরত করিবার জন্য বলিতেন, "বাবা, আমি মূর্খ, জানি না। মুখ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হবে না—ভয় হবে দেখলে।" অনেক কাকুতি-মিনতির ফলে দীক্ষালাভে সমর্থা কোন শিষ্যা হয়তো বলিলেন, "মহারাজ, আমি গায়ত্রী জানি না, আহ্নিক জানি না, স্তব জানি না। লোকে ন্যাস করে, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা করে।

আমায় সব বলুন।” অকপট খোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, “মায়ী, আমি ওসব কিছুই জানি না—আমি যে খোকা! তবে আমি যা পেয়েছি, জেনেছি ও যাতে আনন্দে আছি, তাই তোমায় দিয়েছি। শুধু ধ্যান, জপ, মনঃসংযম করে যাও।”

পূর্বে তিনি মহিলাদের সহিত কথাবার্তা বলা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেন। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “খোকা, মেয়েরা ঠাকুরের কথা শুনতে আসে, তুমি বলবে। তোমরাও যদি এরূপ এড়িয়ে চল তবে তারা কার কাছে যাবে? এরা ৺জগদম্বার রূপ, মা ও মেয়ের মতো এদের সঙ্গে মিশবে।” তদবধি তিনি এই বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা উদারতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং মাতা অথবা কন্যাজ্ঞানেই তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ বা পত্রবিনিময় করিতেন। মহিলাদিগকে লিখিত তাঁহার প্রতিপত্রের আরম্ভে থাকিত মধুর ‘মায়ী’ সম্বোধন।

কাজে ছিল তাঁহার অতীব সুশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। মঠবাটীর দ্বিতলে স্বামীজীর ঘরের পার্শ্বে যখন তিনি থাকিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অবতরণপূর্বক মঠভবন হইতে অতিথিশালা পর্যন্ত গঙ্গার তীরে কয়েকবার পদচারণ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে ভোগের ঘণ্টা পড়িতে দেরি হইতেছে দেখিয়া তিনি ভঁাড়ারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেদিন বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে; অমনি বলিলেন, “ঠাকুর রাক্ষসী বেলায়—বারটার পরে—খেতে ভালবাসতেন না। তাঁকে ঠিক সময়ে ভাতে-ভাত যা কিছু হয় দিয়ে তার পর বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করলেই পার।”

নবাগত ব্রহ্মচারীরাও তাঁহার সহিত অবাধে মিশিতে পারিত। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত শুনিতেন,

প্রয়োজনস্থলে তাহাদের বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে জানাইতেন এবং সাধ্যানুসারে অসুবিধাদির প্রতিবিধান করিতেন। একবার এক ব্রহ্মচারীকে তাহার অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হয় যে, তাহাকে মঠের বাহিরে থাকিয়া ভিক্ষান্নে উদর-পালন করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী ভিক্ষায় যাইয়া শুধু দুইটি ডালভাজা ছাড়া আর কিছুই পাইল না। অভুক্ত অবস্থায় সে মঠের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল; কিন্তু দ্বার অতিক্রম করিতে সাহসে কুলাইল না। খোকা মহারাজ সব জানিতে পারিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন এবং ঐরূপে তাহাকে পুনঃ মঠে লইয়া আসিলেন। নবাগতদের উপর বহু কর্তব্য ন্যস্ত হইত। কিন্তু সেরূপ কার্যে অনভ্যস্ত অনেকের পক্ষে উহা এক সমস্যা হইয়া পড়িত। তখন খোকা মহারাজ সস্নেহে অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের জন্য পান-সাজা, তামাক-সাজা, তরকারি-কোটা ইত্যাদি শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাহাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, সমস্ত মঠটি ঠাকুরের এবং সমস্ত কার্যই তাঁহার সেবা।

আহারবিহার বা সাজসজ্জাদি বিষয়ে প্রয়োজন তাঁহার অল্পই ছিল; অতএব কাহারও নিকট তিনি কিছু চাহিতেন না; অযাচিতভাবে যাহা আসিয়া পড়িত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। আহারকালে পাত্রে যাহা পড়িত তাহাই সানন্দে খাইতেন। এই অস্পৃহার সঙ্গে আবার ছিল তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা। এই বিষয়ে তাঁহার মুখে প্রায়ই গীতা-ভাগবতের টীকাকার পরম ভক্ত শ্রীধর স্বামীর জীবনের এই ঘটনাটি শোনা যাইত:

একটি কন্যাপ্রসবান্তে শ্রীধরগৃহিণী গতাসু হইলে শ্রীধরের মনে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। অথচ তাঁহার ভাবনা হইল সদ্যোজাত শিশুকে পালন করিবে কে? অতএব সঙ্কল্প আপাততঃ গোপন রাখিয়া কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেন। কিন্তু অচিরে বুঝিতে পারিলেন

যে, তাঁহার সমস্যার অন্ত নাই—একটির পর একটি জটিলতার আবির্ভাবে তাঁহার সঙ্কল্প চিরপ্রতিহত হইতে বসিয়াছে। শ্রীধর চিন্তাক্লিষ্ট-হৃদয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি টিকটিকির ডিম পড়িয়া ফাটিয়া গেল এবং উহা হইতে এক শাবক নির্গত হইল। তখনই একটি পোকা উহার সম্মুখে উপস্থিত হইল আর সেও তাহা গলাধঃকরণ করিল। তদ্দর্শনে শ্রীধরের অনুভূতি হইল যে, সৃষ্টির পশ্চাতে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং জন্মের পূর্ব হইতে ভগবান সকলের সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। দুশ্চিন্তানির্মুক্ত শ্রীধর তখনই সংসার ছাড়িয়া চলিলেন।

খোকা মহারাজের পূর্বাশ্রমের অবস্থা তখন বেশ সচ্ছল। একবার তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, সম্পত্তির আয়ের একটা অংশ খোকা মহারাজকে দিবেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী, আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। ঐ টাকা দিয়ে সাধু-গরীব-দুঃখীর সেবা করো।"

সুবোধানন্দজীর জীবনাপরাহ্ণ ব্যয়িত হইয়াছিল জনসাধারণকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুনাইতে এবং বিশেষ আগ্রহবান ভক্তদিগকে ধর্মপথে পরিচালিত করিতে। ভগবৎ-প্রেরণায় অঙ্গীকৃত এই কঠিন বর্ত্মে চলিয়া তাঁহাকে উৎসবাদি উপলক্ষে পূর্বভারতের বহু স্থানে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিতে হইয়াছিল এবং সেবাবুদ্ধিতে বহু প্রাণে শান্তিবারি-সিঞ্চনব্যপদেশে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইয়াছিল। বলিতে গেলে প্রায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এই কর্মধারার সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসরের শেষে তিনি রাঁচিতে যাইয়া প্রায় চারি মাস ছিলেন। অতঃপর কাশী হইয়া মঠে ফিরেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষেও তিনি রাঁচিতে গিয়াছিলেন। ঐ সময়ের একখানি পত্রে (২১।১।১৬) আছে—"সন্ধ্যা থেকে রাত্রি আটটা অবধি শরৎবাবুর (শরৎ চন্দ্র চক্র-

বর্তীর) বাসায় ঠাকুরের সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়, যেমন তোমাদের বৈঠকখানায় হইত।" এইবারে তিনি মিহিজাম হইয়া মঠে ফিরেন। ইহার পরেও তিনি অনেক বার রাঁচি গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রাঁচির সহিত তাঁহার একটা বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অধিকন্তু সুযোগ বুঝিয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে কাশী, ভুবনেশ্বর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানেও যাইতেন।

জীবনসন্ধ্যার কয় বৎসর পূর্ববঙ্গবাসীদের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি ঐ অঞ্চলে গিয়া কিছুদিন বাসও করিয়াছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঢাকা যাইবার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ বৎসরের শেষে তিনি পাঁচজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে লইয়া ঢাকা হইতে বালিয়াটী গ্রামে গিয়াছিলেন। পরবৎসর জানুয়ারি মাসে তিনি সোনারগাঁ গ্রামে যান এবং মার্চ মাসে বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন।

অধিক পরিশ্রম ও অনিয়মাদির জন্য এই সময় হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। সোনারগাঁ হইতে তিনি ৩১।১।২৬ তারিখে লিখিতেছেন, "শরীর ভাল নহে।" ইহারই পরে ২১।৩।২৬ তারিখে বেলুড় হইতে লিখিতেছেন, "পূর্বাপেক্ষা আমার শরীর ভাল, এখন দুইবেলা ভাত খাই। ডায়াবেটিস্, পরে আমাশয় হইয়াছিল। তাহাও সারিয়াছে। শারীরিক দুর্বলতা আছে।...আমার অসুখের কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম। এমন কি, একটু বেড়াইবার সময় পাইতাম না। স্নান, আহার ও রাত্রে নিদ্রা—সেই সময় বিশ্রাম। সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যন্ত লোকের সহিত কথাবার্তা, কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে পুস্তক পড়িয়া শোনানো—মেয়ে-পুরুষ সমানভাবে দলে দলে অনেকে আসিত।" পাঠকের বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে, এরূপ পরিশ্রমের পরিণতি কোথায়? কিন্তু খোকা

মহারাজের কার্য মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—এখন বিশ্রামের অবকাশ নাই। সুতরাং পরিণাম জানিয়াও তিনি আরব্ধকার্য-সমাপনেই নিরত রহিলেন। একদিকে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে অসুস্থ শরীরের চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে কাশী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে গতায়াত হইতে থাকিল, অন্যদিকে তেমনি চলিতে লাগিল দীক্ষা ও উপদেশদান—বঞ্চিত কেহ হইল না। ইহারই মধ্যে ১৯২৭-এর দ্বিতীয় পাদে কাশীতে একবার জ্বর ও পৃষ্ঠে ব্যথার দরুন কিছুদিন শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে ভাল-মন্দ লইয়াই শরীর চলিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, মূল রোগ ক্রমেই দেহকে দুর্বলতর ও কৃশতর করিয়া ফেলিতেছে। অতএব এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়িয়া আয়ুর্বেদমতে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা আরম্ভ হইল এবং কিছুদিন উহাতে বেশ সুফলও দেখা গেল। কিন্তু ১৯২৯ ইং-তে পুনর্বার আমাশয়ের আবির্ভাব হওয়ায় বায়ুপরিবর্তনের জন্য তিনি রথযাত্রার পরে ভুবনেশ্বরে গমন করিলেন।

এবারে ভুবনেশ্বর হইতে তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়াই ফিরিলেন এবং কিছুকাল মঠে বেশ আনন্দে কাটিল। কিন্তু ১৯৩০ ইং-এর শেষভাগে তাঁহার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইল এবং ১৯৩১ ইং-এর প্রারম্ভ হইতে ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিল। সব বুঝিয়াও তিনি নির্বিকার-চিত্তে লিখিলেন (৫।২।৩১), "আরও কতদিন এই শরীরের দ্বারা কাজ করাবেন, তিনিই জানেন। শরীর থাক বা যাক—আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।" ইহারই আড়াই মাস পরে (১৮।৪।৩১) তিনি পুনঃ লিখিলেন, "গত শনিবার হইতে আমার গলা দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।" বেলুড়ে রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে একবার জামতাড়ায় পাঠানো হয়। সেখানে তিনি

অন্তরে আনন্দে ভরপুর ছিলেন এবং একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনও পাইয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার আমাশয় সারিয়া যায়। কিন্তু ক্ষয়রোগের অবনতি হওয়ায় তাঁহাকে প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে বেলুড়ে লইয়া আসা হয়।

দিন যতই নিকটতর হইতে লাগিল, খোকা মহারাজ ততই যেন অন্তরে ডুবিয়া যাইতে থাকিলেন—একেবারে মায়ামুক্ত পুরুষ! মহাসমাধির কিয়দ্দিবস পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "মহাপুরুষ (শিবানন্দজী) বলছিলেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আরো অনেক দিন থাক।' আমার কিন্তু আর থাকতে ইচ্ছা হয় না। সেদিন ভোর রাত্রে স্বপন দেখছিলুম, দেহটা ছেড়ে গেছি। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ—এঁদের সব দেখলুম। কেবল স্বামীজীকে দেখলুম না। ওঁরা বললেন, 'বসো বসো।' আমি বললুম—'না, আগে বল স্বামীজী কোথায়?' ওরা বললেন, 'তিনি এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দূরে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে আছেন।' 'তা হোক অনেক দূরে, আমি চললুম তাঁর কাছে'—এই বলে রওনা হলুম। এর মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেখানে দেখলুম কেবল আনন্দ। আনন্দ নগরে তাঁরা বাস কচ্ছেন, মহা আনন্দে আছেন সব। সেখান থেকে আর আসতে ইচ্ছা হয় না। যত কষ্ট এখানে—এই পৃথিবীতে।" এই কষ্টবোধ অবশ্য তাঁহার অল্পই ছিল; কারণ তিনি বলিতেন, "তাঁর কথা যখন স্মরণ করি তখন সব দেহযন্ত্রণা ভুলে যাই।" আর সে স্মরণ-মনন অবিরাম চলিত। এই সময়ে তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে উপনিষৎ-পাঠ হইত। উহা শুনিতে শুনিতে ভগবৎ-প্রেরণায় তিনি স্বতঃই বহু আধ্যাত্মানুভূতির কথা বলিতে থাকিতেন। এইরূপ এক মুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "জগতে যতই সুখ থাকুক না কেন, সব একটা ছাই-এর গাদা বলে মনে হয়। এ-সবের জন্য মনে

কোন আকর্ষণ নেই।” ফলতঃ দেহরক্ষাকাল সমাগত জানিয়াও এই মায়ামুক্ত পুরুষপ্রবরের আচরণে কোনও উদ্বেগ দেখা গেল না; বরং মনে হইল, তিনি যেন প্রস্তুত হইয়াই আছেন। শেষক্ষণের পূর্বরাত্রে তিনি কহিলেন, “আমার এই শেষ প্রার্থনা—ঠাকুর চিরকাল সঙ্ঘে অধিষ্ঠিত থাকুন।” অনন্তর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর (১৩৩৯ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ) শুক্রবার বিকাল ৩টা ৫ মিনিটে তিনি প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন।

# স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্ব নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪-পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়ায়। কর্মব্যপদেশে তিনি যখন এটোয়াতে বাস করিতেছিলেন, তখন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, শুক্রবার (১৫ই কার্তিক, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে) হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কাশীধামে পিতৃগৃহে থাকিয়া তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন; পরে (১৮৭৮?) বেলঘরিয়ায় আদি পিতৃগৃহে আসেন। তাঁহার পিতা ইংরেজ সরকারের কমিশারিয়েটে কাজ করিতেন; দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় (১৮৮১ খ্রী:) কোয়েটাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাল্যে পিতৃবিয়োগে হরিপ্রসন্ন বিশেষ কাতর হইলেও আত্মীয়স্বজনের যত্নে সান্ত্বনা লাভ করিয়া বেলঘরিয়া হইতে কলিকাতায় ট্রেনে গমনাগমনপূর্বক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে রত থাকেন। তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং উহার তিন বৎসর পরে সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাস করেন। এই কলেজে স্বামী সারদানন্দ, কুমিল্লার বরদাসুন্দর পাল এবং 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

বি. এ. পড়িবার জন্য হরিপ্রসন্নকে পাটনায় যাইতে হইল। তথায় পাঠ শেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য তিনি পুনায় গমন করিলেন। পুনায় ব্যয়বাহুল্য ছিল না বলিয়া তখন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র তথায় মেসে অবস্থানপূর্বক অধ্যয়ন করিতেন। হরিপ্রসন্ন অপর ছয়টি ছাত্রের সহিত সেখানে থাকিয়া জ্যেষ্ঠতাতের প্রেরিত মাসিক পঁচিশ টাকায় ব্যয়নির্বাহ করিতেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার ধর্মভাব বিশেষ লক্ষিত

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

হইত। তিনি প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিতেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় ছাত্রগণ স্থির করেন যে, তাঁহারা নিজ প্রয়োজনে যখন যে পুস্তক বা যন্ত্রাদি ক্রয় করিবেন তাহা মেসের অপর সকলেও ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং কেহ চলিয়া গেলে পরবর্তী ছাত্রদের জন্য উহা রাখিয়া যাইবেন।

বাল্যে তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন। একবার তাঁহার মাতা নকুলেশ্বরী দেবী তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জানাইলেন। ইহাতেও মাতার প্রত্যয় হইল না দেখিয়া ক্ষোভ-সহকারে কহিলেন, "আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণ নই" এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিলেন। মাতা ইহাতে ভীত হইয়া বলিলেন, "কি মহা অকল্যাণ করলি ?" দৈব-দুর্বিপাকে ইহার পরদিবসই পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। তখন সদ্যোবিধবা মাতা দারুণ শোকে বলিলেন, "তোর অভিশাপেই এমনটি হল।" আর এক ঘটনায় তাঁহার আস্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শুনিয়াছিলেন, বানর মৃত্যুকালে 'রাম'-নাম করে। একদিন তিনি বাড়ির বাঁশঝাড়ের দিক হইতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, গুলিতে আহত এক বানর নীচে চীৎ হইয়া পড়িয়া করজোড়ে কাঁদিতেছে। তাঁহার মনে হইল, বানর সত্যই 'রাম'-নাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।

পুনা কলেজের এই নিয়ম ছিল, যে দুই জন ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন, তাঁহারা যথাক্রমে বোম্বাই ও ভারত সরকারের চাকরি পাইতেন। মেধাবী ছাত্র হরিপ্রসন্ন প্রথম না হউক অন্ততঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সহপাঠী রাধিকাপ্রসাদ একান্ত দরিদ্র ও তাঁহার চাকরির বিশেষ প্রয়োজন আছে দেখিয়া হরিপ্রসন্ন তাঁহাকে বলিলেন,

"ভাই, আমি এ বৎসর পরীক্ষা না দিয়ে আগামী বৎসর দেব।" রাধিকাপ্রসাদ দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার না করিতে পারিলেও হরিপ্রসন্নের সহৃদয়তায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উহা স্মরণ রাখিয়া পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। পরবর্তী বৎসরের (১৮৯২) পরীক্ষায় হরিপ্রসন্ন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম না হইবার কারণস্বরূপে জানা যায় যে, তাঁহাদের কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী হিন্দু-ধর্মের নিন্দা করিতে বেশ পটু ছিলেন। একদিন তিনি জন্মান্তরবাদের বিদ্রূপ করিলে হরিপ্রসন্ন সমুচিত উত্তর দিলেন। ইহাতে অধ্যাপক নিরস্ত হইলেন; কিন্তু ছাত্রের এই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইলেন প্রশ্নোত্তর-পরীক্ষার কালে। ভূতত্ত্বে কম নম্বর পাইয়া হরিপ্রসন্নকে দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করিতে হইল।

বাল্যে বেলঘরিয়ায় পিতৃগৃহে বাসকালেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেইদিন বিকালে চারিটার সময় তিনি সমবয়স্কদের সহিত এক পরিচিত বালকের বাটীতে খেলা করিতেছেন, এমন সময় একটি সঙ্গী সংবাদ আনিল, পরমহংস মহাশয় বেলঘরিয়ার উদ্যানে আসিয়া (১৮৭৯ খ্রীঃ, ১৫ই সেপ্টেম্বর) কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ক্রীড়ারত হরিপ্রসন্নের পরিধানে একখানি মাত্র ধুতি। ঐ অবস্থায়ই তিনি 'নূনকোট' খেলা ত্যাগ করিয়া সঙ্গীদের সহিত পরমহংসকে দেখিতে চলিলেন। তখন পরমহংস সম্বন্ধে কৌতুক ব্যতীত তাঁহার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না; আর গেরুয়ার প্রতি একটু ভীতিও ছিল। তাই এই দর্শনের স্মৃতি তাঁহার মনে অতি অস্পষ্ট ছিল এবং বর্ণনাকালে অন্যান্য দর্শনের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িত। তাঁহার দ্বিতীয় দর্শন হয় দেওয়ান গোবিন্দ মুখার্জির গৃহে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩)। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি

বলেন, "গিয়ে দেখি, ঠাকুর সাদা কাপড় পরা, দাঁড়িয়ে আছেন। এক অদ্ভুত দৃশ্য! মুখের ভাব যেন কিরকম! পাকা ফুটি যেমন ফেটে যায়, এ যেন সেই রকম। মুখ বিকৃত বলা চলে না। শরীরের সব শক্তি যেন উপরের দিকে উঠে গেছে। মুখে দিব্যভাব আর ধরছে না। দাঁত সব বেরিয়ে পড়েছে। চোখ যেন কি দেখছে আর বিভোর হয়ে গেছে।... ঠাকুর রামপ্রসাদী গান গেয়েছিলেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐরকম ভাব দেখে মনে হল, তিনি যেন মা কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন আর আনন্দেতে মেতে আছেন। ...কিছু পরে ঠাকুর বসলেন। ঠাকুর যখন দাঁডিয়ে ছিলেন, তখন যেন মা কালীর ভাব, কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণের ভাব।" সেই দিন সন্ধ্যার পরে তাঁহারা বাড়িতে ফিরিলেন।

অতঃপর ১৮৮৩-র নভেম্বর মাসে তিনি সহপাঠী সারদানন্দ ও বরদা পালের সহিত নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি জানাইলেন যে, তিনি তখনই কলিকাতা যাইতে উদ্যত—গাড়ি আনিতে গিয়াছে। ঘরের মেজেতে মাদুরের উপর বসিয়া তাঁহারা তথায় উপস্থিত বাবুরামের নিকট হইতে গন্তব্যস্থানের ঠিকানা জানিয়া লইলেন এবং ঠাকুরের নিকট ইহাও অবগত হইলেন যে, তাঁহাদের তথায় যাইতে আপত্তি নাই। তদনুসারে তাঁহারা নৌকাযোগে মণি মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটির বাড়িতে অপরাহ্ণ চারিটায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের লীলাবিলাস-দর্শনে তৃপ্ত হইলেন। সেদিন গৃহে ফিরিতে দেরি হইল; তাই জননী হরিপ্রসন্নকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমহংসদেবের নিকট গিয়েছিলেন শুনিয়া মাতা ভর্ৎসনাপূর্বক বলিলেন, "সেই পাগলার ওখানে গিয়েছিলে, যে সাড়ে তিনশ ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?" গর্ভধারিণীর এই কথার উল্লেখ করিয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজ পরে বলিতেন, "সত্যই মাথা খারাপ বটে—এখনও মাথা গরম আছে!"

তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে আগত হরিপ্রসন্ন গৃহকোণে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও তাঁহার বচনসুধা পান করিতে থাকেন। ক্রমে ভক্তগণ উঠিয়া গেলেন—শুধু এক কোণে হরিপ্রসন্ন, আর ছোটখাটটিতে উপবিষ্ট ঠাকুর মৃদুহাস্যে হরিপ্রসন্নকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হরিপ্রসন্নও বিদায় লইতে উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, "তুই কুস্তি লড়তে পারিস? আমার সঙ্গে লড়তে পারবি? দেখি, লড়তো এক হাত!" এই বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিপ্রসন্নের তখন পালোয়ানের মতো চেহারা—সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। তিনি খুব ব্যায়াম করিতেন—২০০ ডন ও ২৫০ বৈঠক দিতে পারিতেন। আর কুস্তি-লড়াটাকে তাঁহার ন্যায় যুবকেরই কর্ম মনে করিতেন। তাই অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ভাল রে ভাল, এ কেমন সাধু দেখতে এলাম—সাধু কুস্তি লড়তে চায়!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "লড়তে জানি!" ততক্ষণে ঠাকুর হাস্যসহকারে পালোয়ানের মতো তাল ঠুকিতে ঠুকিতে ক্রমেই হরিপ্রসন্নের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার দুই হস্ত স্বীয় করদ্বয়ে গ্রহণপূর্বক ঠেলিতে লাগিলেন। অগত্যা হরিপ্রসন্নও তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ঘরের দেওয়ালে চাপিয়া ধরিলেন। ঠাকুরের মুখে তখনও মৃদু হাসি আর হস্তে হরিপ্রসন্নের করদ্বয়। হরিপ্রসন্নের মনে হইল, যেন কি একটা অলৌকিক শক্তি ঠাকুরের দেহ হইতে সিড়সিড় করিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেছে! তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত ও অবশপ্রায় হইল। ঠাকুর তখন তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বলিলেন, "কেমন, হারিয়েছিস তো?" তারপর নিজের খাটটিতে গিয়া বসিলেন। এক অজ্ঞাত শক্তির নিকট পরাজিত হরিপ্রসন্ন তখন অননুভূত আনন্দে বিভোর। স্বল্পক্ষণ পরে ঠাকুর আসিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "মাঝে মাঝে এখানে আসিস। একদিন এলে কি হয়?" ইত্যাদি।

আরও কয়েকবার হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন—দুই-

একবার সেখানে রাত্রিবাসও করিয়াছিলেন। রাত্রে ঠাকুর অল্পই আহার করিতেন, দুই-একখানি প্রসাদী লুচি, একটু পায়েস ও একটি সন্দেশ। কেহ উপস্থিত থাকিলে সেও উহার কিয়দংশ পাইত। প্রথম রাত্রে হরিপ্রসন্ন আহারের এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া খুবই চিন্তিত হইয়াছিলেন—ভাবিয়াছিলেন, সে রাত্রি উপবাসেই কাটিবে। কিন্তু ঠাকুর নহবত হইতে রুটি ও তরকারি আনাইয়া তাঁহাকে দিলেন; অবশ্য হরিপ্রসন্নের মতো কুস্তিগিরের পক্ষে উহাও যথেষ্ট ছিল না।

হরিপ্রসন্ন মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকট যান; আসিতে দেরি হইলে ঠাকুরও শরৎ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। একদিন সংবাদ পাইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "কিরে, কেমন আছিস? আজকাল আসা-যাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছিস—ডেকে পাঠালেও কেন আসিস না?" উত্তরে হরিপ্রসন্ন সরলভাবে জানাইলেন যে, ইচ্ছা হয় না বলিয়াই আসেন না। ঠাকুর ইহাতে হাসিলেন মাত্র এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্যান-ট্যান করিস তো?" হরিপ্রসন্ন জানাইলেন যে, ধ্যানের চেষ্টা করেন বটে, ধ্যান হয় না। ঠাকুর তখন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া জিহ্বায় কি একটা লিখিয়া দিলেন এবং পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। ঠাকুরের স্পর্শে সেদিন যেন তিনি বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন, পা যেন আর চলে না। কোনপ্রকারে তিনি পঞ্চবটীতে গিয়া বসিলেন, তাহার পর আর কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান হইল দেখেন ঠাকুর পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছেন ও মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। তারপর ঠাকুর তাঁহাকে নিজের ঘরে লইয়া আসিলেন এবং সাধন সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলেন। সেদিন সেখানে আর কেহ ছিল না—শুধু ঠাকুর ও হরিপ্রসন্ন। ঠাকুর সেদিন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, অতঃপর প্রত্যহ ধ্যান হইবে। অধিকন্তু স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া

বলিয়াছিলেন, "ছাখ, তোরা হলি মায়ের লোক ; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। কাকে ঠোকরানো ফল মায়ের পূজায় লাগে না রে। তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি।··· সোনার মেয়েমানুষ ভক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবি না।"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট জন্মাষ্টমীর দিনে হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গিরিশবাবু সদলবলে আসিয়া সন্ধ্যার পর স্বরচিত "কেশব কুরু করুণা দীনে" ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের ভাব হয় এবং দুই নয়নে প্রেমাশ্রু বহিতে থাকে। তিনি ভাবাবস্থায় গিরিশবাবুকে আলিঙ্গন করেন ও তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। গিরিশবাবু চলিয়া গেলে অনেক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর হরিপ্রসন্নকে বলিলেন, "রাত অনেক হয়েছে ; আর যেয়ে কাজ নেই। আজ এখানেই থেকে যা।" হরিপ্রসন্ন সেরাত্রি কালীবাড়িতেই থাকিয়া গেলেন। মাঝ রাত্রে জাগিয়া দেখেন, ঠাকুরের ঘুম নাই, 'মা-মা' করিতেছেন আর মশারির চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছেন। হরিপ্রসন্ন ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি কি পাগল হলেন নাকি ? ঘুম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল 'মা মা' করছেন। লোকে যে বলে পাগলা বামুন, এতো দেখছি সত্যই।" পরদিন বাড়ি যাইতেই তাঁহার এক দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কোথায় ছিলি ?" কালীবাড়িতে ছিলেন শুনিয়া বলিলেন, "ঐ পাগলা বামুনটার কাছে বুঝি ? ওরে, তার কাছে যাসনি, যাসনি। সে লোকটা পাগল। আমি প্রায়ই ঐ ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যাই। তার সব দেখেছি, সব জানি।" হরিপ্রসন্ন সব শুনিয়া শুধু হাসিলেন।

হরিপ্রসন্ন প্রথম যেদিন ঠাকুরের মুখে শুনিলেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এ শরীরে রামকৃষ্ণ"—সেদিন তাঁহার তেমন বিশ্বাস হয় নাই। মনে বরং এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল, "তা একটু আবোলতাবোল

বললেই বা, লোকটি তো ভাল, সরল!" পরে একদিন স্বকক্ষে দণ্ডায়মান ঠাকুর গম্ভীরভাবে রাসলীলা ও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যাচ্ছলে যখন বলিলেন, "যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিল, সে-ই এই শরীরটাতে আছে," সেদিন ঠাকুরের মুখ-চক্ষুর ভাব ও কথার ভঙ্গিতে এমন একটা সংক্রামক দৃঢ়প্রত্যয়ের ছাপ ছিল যে, হরিপ্রসন্ন উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে আদিষ্ট হইয়া হরিপ্রসন্ন এরূপ সবলে টিপিতে লাগিলেন যে, ব্যথিত স্বরে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আস্তে আস্তে।" সম্ভবতঃ ঐ দিনেই কোন্নগর হইতে আগত এক ভদ্রলোক প্রসঙ্গান্তে চলিয়া গেলে ঠাকুর বলিলেন, "আমি সকলের অন্তর কাঁচের আলমারির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখতে পাই।" কথা শুনিয়া ভীতমনে হরিপ্রসন্ন ভাবিলেন, "তা হলে তো আমার ভেতরও কি সব আছে দেখতে পাচ্ছেন।" এরূপ চিন্তা বড়ই অস্বস্তিকর; তবে হরিপ্রসন্নের এইটুকু ভরসা ছিল যে, ঠাকুর প্রত্যেকের ভালটাই বলিতেন, মন্দটা বলিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করিতেন না।

যুবক হরিপ্রসন্নের মনে প্রশ্নের অবধি ছিল না। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?" শ্রীগুরু উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর সাকারও নিরাকারও—আবার সাকার নিরাকারের পারও। যা কিছু দেখছিস, সবই ঈশ্বর।" সেই অপূর্ব বাণী শুধু শব্দরাশিরূপেই শিষ্যের কর্ণে প্রবেশ না করিয়া একটা অজ্ঞাতশক্তি-মিশ্রিত হইয়া তাঁহার মনোরাজ্যে প্রবেশপূর্বক সেখানে আবাস স্থাপন করিল। এই জ্ঞানকে তিনি পরে অতি উচ্চ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতেন এবং ঘটনাটি এইরূপ আবেগভরে বর্ণনা করিতেন যে, স্বতই মনে হইত যেন উহা শুধু পুনরুল্লেখমাত্র নহে, পরন্তু অনুভূত সত্যের কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ। মনে

রাখিতে হইবে যে,হরিপ্রসন্ন কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতবাদ অবগত ছিলেন এবং স্বয়ং তর্ক করিতে ভালবাসিতেন। একদিন ঠাকুরকে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি কি জানেন? আপনি কি এসব বই পড়েছেন?" ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "তুই কি বলছিস? বই-টই সব ফেলে দে—ওতে জ্ঞান নেই,ওগুলো সব অবিদ্যা।"

হরিপ্রসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে শেষ দর্শন করেন এক রাত্রে। তখন ঠাকুরের গলরোগের প্রারম্ভাবস্থা। অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে পড়িতে চলিয়া যান এবং সেখানেই ঠাকুরের লীলাবসানের সংবাদ প্রাপ্ত হন। খবর বাঁকিপুরে পৌঁছিবার পূর্বদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, ঠাকুর সশরীরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। অবশ্য তখন তিনি এই দর্শনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পরদিবস সংবাদপত্রে সবিশেষ জানিতে পারিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীজীর দেহত্যাগকালেও তাঁহার অনুরূপ দর্শন হইয়াছিল। হরিপ্রসন্ন তখন এলাহাবাদে গুড্‌স্‌শেড রোডের উপর 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে' থাকেন। ঠাকুর-ঘরে ধ্যানকালে তিনি দেখিলেন, স্বামীজী ঠাকুরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট। দেখিয়া ভাবিলেন, "এ আবার কি!" যথাসময়ে বেলুড় হইতে সংবাদ আসিল, স্বামীজী মহাসমাধিলাভ করিয়াছেন।

পুনা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া হরিপ্রসন্ন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন। গাজীপুরে অবস্থানের সুযোগে তিনি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করেন। গাজীপুর ব্যতীত এটোয়া, বুলন্দ্‌শহর, মীরাট ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি স্থলেও তিনি কার্যোপলক্ষে অবস্থান করেন। যখন যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন। এইরূপে একবার এটোয়াতে তিনি স্বামীজীর দর্শন পান। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ছুটির শেষে বাঁকিপুর হইতে কর্মস্থলে ফিরিবার পথে বক্সার স্টেশনে তিনি অকস্মাৎ

শিবানন্দজীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং পরে কাশীধামে বংশী দত্তের বাটীতে পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে যান। গাজীপুরে একবার অভেদানন্দজী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। এটোয়াতে এক সময়ে সুবোধানন্দজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঠের আর্থিক অবস্থা বুঝাইয়া দিলে তিনি তদবধি মঠের সাহায্যকল্পে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে ৬০৲ টাকা করিয়া পাঠাইতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরজানন্দজী ব্রঙ্কাইটিস্ ও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া বৃন্দাবন হইতে এটো শহরে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। পরে প্রেমানন্দজীও সেখানে যান। হরিপ্রসন্ন স্বভাবতই অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে বিরজানন্দ এক মাসের মধ্যেই পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

ইহার স্বল্পকাল পরেই হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। মাতার ভরণপোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পাঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাকে এতদিন চাকরি করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে এই দুই প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় তিনি সাংসারিক কর্তব্যভার হইতে মুক্ত হইলেন। আলমবাজার মঠে তিনি অতি নম্র ও দীন ব্রহ্মচারিবেশে থাকিতেন—হঠাৎ দেখিলে কেহই মনে করিতে পারিত না যে, ইনিই একদা উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মঠের আবশ্যকীয় কর্মসমাপনান্তে তিনি নিজের ঘরে নিবিষ্টমনে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ১৮৯৭ অব্দে স্বদেশপ্রত্যাগত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রসন্ন মহারাজ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দেরাদুন, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। অতঃপর মঠে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে স্বামীজীর নির্দেশানুসারে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে যথাবিধি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন।

আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানান্তরিত হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দও তথায় আগমনপূর্বক স্বামীজীর আদেশে মঠের জন্য ক্রীত ভূমিতে গৃহনির্মাণকার্যের ভার গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে জমির মাপ, বাড়ির নক্সা, আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ-নির্ধারণ ইত্যাদি সমস্ত কার্যই স্বহস্তে করিতে হইত; অতএব গল্প-গুজবের বড় একটা সময় পাইতেন না, আর তিনি উহা ভালও বাসিতেন না। নীলাম্বরবাবুর বাটীতে অবস্থানকালে তাঁহার জননী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে শিশুপ্রায় সরল বিজ্ঞান মহারাজ বড়ই বিব্রত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে মা না জানি কি একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন; কাজেই আত্মগোপনই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার সহিত মাতার প্রতি শৈশবোচিত ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের চরিত্রকে সেদিন গুরুভ্রাতাদের নিকট বড়ই চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে সকলের একান্ত আগ্রহে তিনি এক নিভৃত স্থানে জননীকে প্রণতি জানাইলেন।

স্বামীজীকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন। স্বামীজীকে বিরক্ত দেখিলে তিনি নিকটে না যাইয়া দূরে দূরে থাকিতেন—আহ্বান করিলে বলিতেন, "এখন মশায় কাজে খুব ব্যস্ত আছি, পরে আসব।" বেলুড়ের নবনির্মিত মঠের দ্বিতলে স্বামীজীর পাশের ঘরেই তাঁহার শয়ন-স্থান ছিল। রাত্রে পদশব্দে পাছে স্বামীজীর অসুবিধা হয়, এই ভয়ে তিনি পা-টিপিয়া চলিতেন। তাঁহারই ঘরের সম্মুখে গঙ্গার দিকের বারান্দায় স্বামীজী ভ্রমণ করিতেন। এক রাত্রে তিনি এইভাবে পদচারণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল গুনগুন করিয়া গাহিয়াছিলেন, "মা ত্বং হি তারা; তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা" ইত্যাদি। এই সকল স্মৃতি বিজ্ঞান মহারাজের মনে এতই জাগরূক

ছিল যে, পরবর্তী কালেও তিনি ঐ স্থানগুলিতে স্বামীজীর উপস্থিতি অনুভব করিয়া বলিতেন, "স্বামীজী এখনও তাঁর ঘরে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব পা-টিপে টিপে চলি, যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়; আর তাঁর ঘরের দিকে বড় একটা তাকাই নে, পাছে চোখা-চোখি হয়ে যায়।" অমনি কৌতূহলী কোন শ্রোতা যদি প্রশ্ন করিতেন, "এখনও স্বামীজীকে দেখতে পান?" তবে নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর আসিত, "তিনি রয়েছেন, আর দেখতে পাব না?"

এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের পশ্চাতে ছিল আরও বহু অনুভূতি। এক রাত্রে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যেন স্বামীজীর কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইল, হয়তো স্বামীজী নিশীথে অধ্যয়নাদি করিতে-ছেন। ঔৎসুক্যবশতঃ দ্বারের মধ্য দিয়া অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাতপূর্বক তিনি দেখিলেন স্বামীজী ধ্যানস্থ, আর তাঁহারই অঙ্গের আভায় কক্ষ উদ্ভাসিত। আর একটি ঘটনার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও স্থাপত্যকৌশলে মঠের মূল বাটী এবং পূজাগৃহ সমাপ্ত হইলে তাঁহার প্রস্তাবে স্বামীজী গঙ্গার ধারে পোস্তানির্মাণের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে এক দ্বিপ্রহরের ভাঁটার সময় রৌদ্রে দণ্ডায়মান বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গলদঘর্ম হইয়া নিবিষ্টমনে কার্য পরিচালনা করিতেছেন, যাহাতে জোয়ার আসিবার পূর্বেই আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত হইয়া যায়; তাই জল-পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলেও স্থানত্যাগ অসম্ভব। উপরে দ্বিতলে অসুস্থ স্বামীজী চিকিৎসকের বিধিমত বরফ দিয়া দুধ পান করিতেছিলেন; পাত্র নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় পোস্তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সেবকের হস্তে শূন্য পাত্রটি দিয়া বলিলেন, "পেসনকে দিয়ে দে।" গ্লাসটি পাইয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজ দুঃখিতমনে ভাবিলেন, "এই অবস্থায়ও স্বামীজী ব্যঙ্গ করিতেছেন!" তথাপি আদেশপালন

ও প্রসাদধারণ করা উচিত, এই বিবেচনায় অবশিষ্ট দুই-চারি ফোঁটা যাহা ছিল তাহাই পান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, মুখে যেন কে সুধা ঢালিয়া দিল—পিপাসা তখনই দূর হইয়া গেল এবং শরীর স্নিগ্ধ হইল।

বিজ্ঞান মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা প্রথমে তত অনুভব করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর নিকটই উহা শিক্ষা করেন। ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন—"আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বেশী যেতাম না। তা স্বামীজী কি করে জানতে পারেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'না, মশায়।' স্বামীজী বললেন, 'এক্ষুণি যাও, প্রণাম করে এস।' আমি তো মাকে প্রণাম করতে চললাম। মনে মনে ভাবছি কোন প্রকারে একটা ঢিপ করে প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বললেন, 'সেকি পেসন! সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর—মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।' আমি আবার সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে চলে আসি। আমি কিন্তু ভাবতেই পারি নি যে, স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন।"

স্বামীজীকে এতটা সমীহ করিয়া চলিলেও উভয়ের মধ্যে সহজ সরল রসিকতারও অভাব ছিল না। একদিন স্বামীজী বলিলেন, "পেসন, দেশকালের উপযোগী করে নূতন স্মৃতি লিখতে হবে. বুঝলে? পুরাণো স্মৃতি আর চলবে না।" হরিপ্রসন্ন মহারাজ অমনি উত্তর দিলেন, "মশাই, আপনার স্মৃতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন?" স্বামীজী যেন অভিমান-ভরে ছোট ছেলেটির মতো মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাখাল, শোন শোন! পেসন বলে, আমার কথা নাকি দেশ নেবে না।" মহারাজ উপযুক্ত মধ্যস্থের মতো বলিলেন, "পেসন কি জানে? ও ছেলেমানুষ। তোমার কথা দেশ একদিন নিশ্চয়ই

নেবে।" স্বামীজীর তখন কত আনন্দ! বলিলেন, "শুনলে, পেসন? দেশ আমার কথা নেবেই।"

মঠের কার্য-সমাপনান্তে স্বামীজীর আদেশে তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে তীর্থরাজ প্রয়াগে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মুঠিগঞ্জে তাঁহারি বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের অতিথি হন। কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত হইলে শরৎ চন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন যুবকের অনুরোধে গুড্‌সেড রোডের উপর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে' চলিয়া যান। ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে তাঁহার যে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, উহা তপস্যা ও সাধনায় পরিপূর্ণ। রন্ধন ও পাত্রাদি পরিষ্কার প্রভৃতি দৈনন্দিন গৃহকর্ম তাঁহাকেই করিতে হইত; বাটীতে জলের কল না থাকায় প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল আনিতে হইত। ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বেই শয্যাত্যাগান্তে তিনি কয়েক ঘণ্টা ধ্যানে কাটাইয়া পূর্বাহ্ণের অবশিষ্টাংশ পূজা ও অধ্যয়নাদিতে ব্যয় করিতেন। অধ্যয়নে তিনি এতই তন্ময় হইতেন যে সময়ের জ্ঞান থাকিত না বা কাহারও আগমনে উহার ব্যাঘাত হইত না। ইহারই এক সময়ে তিনি পণ্ডিত ভগবৎ দত্তের নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। গ্রন্থাদির জন্য শ্রীশচন্দ্র বসুর পুস্তকাগার তাঁহার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অপরাহ্ণও প্রধানতঃ ধ্যানেই কাটাইয়া তিনি সন্ধ্যায় ক্লাবের কার্যে মন দিতেন এবং ঐ সময়ে আগন্তুক বালকদিগকে গীতা পড়াই-তেন। ক্লাব তখন তাঁহারই যত্ন ও ভিক্ষালব্ধ অর্থে পরিচালিত হইত। উপদেশ চাহিলে স্বল্পভাষী বিজ্ঞান মহারাজ দু-চার কথায় উত্তর দিতেন কিংবা নীরব থাকিতেন। পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "ছেলেবেলায় 'বর্ণপরিচয়ে' যা যা পড়েছ, তাই জীবনে সাধন কর—অর্থাৎ 'সদা সত্য কথা কহিবে,' 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়'—এই দুইটি নীতি যদি সাধন করতে পার, আর সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে।"

আপনাতে ডুবিয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য। তিনি প্রতি কার্যে ছিলেন নীরব, নিয়মানুবর্তী ও একনিষ্ঠ। বৃথা গল্পগুজবে তিনি সময় নষ্ট করিতেন না, কিংবা বিনা-প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের বা ভক্তদের গৃহে যাইতেন না। ক্লাবে তাঁহার তিন বৎসর বাসের পর গৃহস্বামী উহা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হইয়াছেন জানিয়া বিজ্ঞানানন্দজীর অকৃত্রিম বন্ধু মেজর বামনদাস বসু তাঁহার প্রয়াগবাস নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং গৃহখানি ক্রয় করিয়া সামান্য ভাড়ায় ক্লাবকে ব্যবহার করিতে দেন এবং জলের কলের অভাব আছে দেখিয়া তাহাও দূর করেন। পরে ইহা স্মরণ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, "শ্রীশবাবুরা ( শ্রীশবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা রামদাসবাবু ) এলাহাবাদে না থাকলে আমার এখানে থাকা অসম্ভব হত।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্বদাই অতি সাবধান ছিলেন। আশ্রমের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। একবার তাঁহার সহোদরা তাঁহাকে দেখিতে আসিলে আশ্রমের বাহিরে ধর্মশালায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আর একদিন আশ্রম-কর্মে নিযুক্ত মেথর স্বয়ং না আসিয়া তাহার কন্যাকে পাঠাইলে তিনি মেয়েটিকে বলিয়া দিলেন, সে যেন তাহার পিতাকে জানাইয়া দেয় যে, আশ্রমে আর মেথরের আবশ্যক নাই। পরে মেথর আসিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন যে, অতঃপর হয় সে নিজে কাজ করিবে কিংবা পুরুষ কাহাকেও পাঠাইবে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই কঠোর নিয়ম তিনি বৃদ্ধ বয়সেও পালন করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের স্বল্পকাল পূর্বে জনৈকা ভক্তিমতী মার্কিন মহিলা প্রয়াগে আসিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার জন্য আশ্রমেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে উক্ত মহিলা বৃদ্ধ স্বামীজীকে আনিবার জন্য রেল স্টেশনে উপস্থিত হইতেই তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তিনি আশ্রমে

থাকিতে পাইবেন না। লোকাচারে এইরূপ অনমনীয় মনোভাব প্রকাশিত হইলেও মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না; এমন কি, ভগবানের মাতৃভাবেই তিনি সমধিক আকৃষ্ট হইতেন। আশ্রমে তিনি বহুবার ৺কালী, ৺দুর্গা, ৺জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর প্রতি তাঁহার যে প্রীতি ছিল, তাহা তদীয় ভক্তদের প্রতিও প্রসারিত হইত। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব হইতেই (১৯০৮) ভক্তরাজ মহারাজকে (স্বামী সদাশিবানন্দ) রাত্রিতে আশ্রমে থাকিতে দিয়া বিজ্ঞান মহারাজ বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর কোন চেলা যদি আরামে থাকতে পারে, তা দেখা আমার একান্ত কর্তব্য।" স্বামী সদাশিবানন্দ পরে অসুস্থ হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পদব্রজে প্রায় দুই মাইল দূরে কর্ণেলগঞ্জে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী মঠ-স্থাপনের জন্য চারি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে মুঠিগঞ্জে একটি বাড়ি করা হয় এবং উহারই সম্মুখে সদর রাস্তার অপর দিকে এক খণ্ড পতিত জমিও সেবাশ্রম-স্থাপনের জন্য তিন শত টাকায় ক্রয় করা হয়। পরে উহার উপর দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে উক্ত নিজস্ব ভবনে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই বিজ্ঞানানন্দজীকে কনখল সেবাশ্রমে গৃহনির্মাণাদির জন্য তথায় যাইতে হয়।

১৯১৬-১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রক্তামাশয়ে খুব ভুগিয়াছিলেন। অপরকে কষ্ট দিতে পরাঙ্মুখ ও সর্বদা আপনভাবে থাকিতে অভ্যস্ত বিজ্ঞান মহারাজের ঐ সময়ের অবস্থা যেমন কষ্টদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণায় ভুগিতে থাকিলেও তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ না করিয়া নিজ কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতেন। কাহাকেও আসিতে দেখিলে ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্বক ইঙ্গিতে জানাইতেন, "কথা

কহিও না।” আবার অল্প পরেই হস্তসঞ্চালনপূর্বক আদেশ দিতেন, “চলিয়া যাও।” আহার প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঘরে এক কুঁজা জল থাকিত; পিপাসা পাইলে নিজেই জল গড়াইয়া পান করিতেন। প্রথমে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে আরোগ্য না হওয়ায় হোমিওপ্যাথি আরম্ভ হয় এবং উহাতেই রোগের উপশম হয়। তদবধি হোমিওপ্যাথির' উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। তবে অসুখ হইলেও তিনি সহজে ডাক্তারের সাহায্য লইতেন না। এই ভাব তাঁহার চিরকালই ছিল। শেষ বয়সে তাঁহার পা ফুলিয়াছে দেখিয়া বেলুড় মঠে জনৈক সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “একজন ডাক্তার দেখালে ভাল হয়।” তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “আমার ডাক্তারের উপর মোটেই বিশ্বাস নেই।” সাধুটি জানাইলেন যে, একজন খুব বড় ডাক্তার মঠে যাতায়াত করেন, তাঁহাকেই ডাকা হইবে। বিজ্ঞানানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আছে?” উত্তর হইল, “নীলরতনবাবু তাঁর চেয়ে বড।” আবার প্রশ্ন হইল, “তাঁর চেয়ে বড়?” উত্তর, “তাঁর চেয়ে বড় এখানে আর কেউ নেই।” বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন বলিলেন, “একজন আছেন, তিনিই হচ্ছেন ঠাকুর; তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।” বস্তুতঃ ঠাকুরের উপরই তিনি সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতেন এবং কথাবার্তায় উহাই প্রকাশ করিতেন।

তিনি পূর্বে আশ্রম হইতে বড় একটা বাহিরে যাইতেন না। কিন্তু আরোগ্যলাভান্তে তাঁহার ভ্রমণের মাত্রা এতই বাড়িয়াছিল যে, সুস্থ হইবার কয়েক মাস পরে তিনি যখন বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশী-ধামে যান, তখন একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সারনাথে উপস্থিত হন। সারনাথের মিউজিয়ামে গাইড্ (প্রদর্শক) বিভিন্নবস্তু-প্রদর্শন-ব্যপদেশে তাঁহাকে একটি বিশেষ বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে লইয়া আসিলে

তিনি সেখানে এক দিব্যদর্শন লাভ করেন। সেই মূর্তিতে বুদ্ধের জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত ছিল। বৃত্তান্তটি স্তরে স্তরে অনুধাবন করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত লইয়া গেল এবং তিনি নিজে যেন একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় এক নিরাকার জ্যোতিসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া ঐ জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সত্তা যেন সেই সমুদ্রে বিলীন হইল—রহিল শুধু শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ। এই ভাব কতক্ষণ ছিল তাহা তিনি জানেন না। গাইড্ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলে তিনি যন্ত্রবৎ চলিলেন বটে ; কিন্তু তখন তিনি এক নেশায় বিভোর। এই ভাবের নেশা তাঁহার তিন দিন ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, অন্যত্র তীর্থাদিতে বহু অনুভব হইয়া থাকিলেও এই রকমটি পূর্বে কখনও হয় নাই। আর একবার তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, সারনাথ দেখিয়া পরে ৺বিশ্বনাথদর্শনে যাইবেন। কিন্তু সারনাথ হইতে ফিরিবার পথে মনে হইল, "কি হইবে যাইয়া ? বিশ্বনাথ তো এক পাথরের ঢেলা ছাড়া আর কিছুই নন।" যাহা হউক, পূর্ব অভিপ্রায়ানুসারে শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথমন্দিরে যাওয়া হইলে তিনি দেখিলেন, সেখানে বিশ্বনাথ-লিঙ্গ নাই, জীব জগৎ কিছুই নাই—এক নিরাকার সত্তা মাত্র বিদ্যমান।

কাশীতে আর এক সময়ে তিনি ৺বিশ্বনাথের দর্শন পান। সেবারে সেবাশ্রমের বাটীনির্মাণের জন্য তিনি এলাহাবাদ হইতে কাশীতে যান এবং স্টেশন হইতে এক্কা করিয়া সেবাশ্রমের দিকে অগ্রসর হন। পথে এক মোড়ে গাড়ি উলটাইয়া তিনি পড়িয়া যান। তাঁহার এক পা চাকার মধ্যে ঢুকিয়া যায় ও উহার উপর একটি ভারী বাক্স পড়ে। আঘাত খুবই লাগিয়াছিল। তিনি কোনপ্রকারে সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার দেখাইলেন। আঘাতের ফলে তাঁহার জ্বর হইল এবং

বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হা বিশ্বনাথ, ঠাকুরের কাজের জন্য তোমার রাজত্বে এলাম—নিঃস্বার্থ কাজ। তা এরকম হল? কাজের ক্ষতি হচ্ছে।" পরে দ্বিপ্রহর রাত্রে স্বপ্নে দেখেন, জটাজুটমণ্ডিত শিব মৃদুমন্দ-হাস্যসহকারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ভাবিলেন শিব তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তাই বলিলেন, "কি শিবঠাকুর, আমাকে কি নিতে এসেছেন? এখন আমি যাব না, ঠাকুরের কাজ আছে, তাই আগে করতে হবে।" কিন্তু সে কথা কে শুনে? শিব হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সে হিমস্পর্শে তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। শিবকে তিনি বলিলেন, "এখন তবে এস; ঠাকুরের কাজ করতে হবে।" পরদিন উঠিয়া দেখেন জ্বরও নাই, পায়ের ব্যথাও নাই, সব সারিয়া গিয়াছে।

এই সঙ্গে এলাহাবাদের একটি দর্শনের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাইব। তখন শীতকাল। প্রত্যহ শেষ রাত্রে উঠিয়া তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন। সেই দিনও ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানান্তে গঙ্গার স্তব করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন এক দিব্য-শ্রীমণ্ডিতা বালিকা তিনটি বেণী দুলাইয়া তাঁহার সম্মুখে চলিতেছেন। প্রথমে তিনি উহা স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ সেই মূর্তি অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, ইনিই ত্রিবেণী-মায়ী—অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়া গেলেন।

১৯১৮ অব্দে তাঁহার মাতা প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভস্নান করিতে আসেন। সেইবার পুত্রের সেবায় প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করেন। মায়ের আশীর্বাদ কত দুর্মূল্য তাহা বিজ্ঞানানন্দজী জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "গর্ভধারিণী খুশী থাকিলে ঠাকুরও

শীঘ্র কৃপা করেন।" কুম্ভ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরেই, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জননী দেহত্যাগ করেন।

বেলুড়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কেবল বিশেষ কার্যোপলক্ষেই আসিতেন এবং ঐ ভাবেই কাশী ও কনখলে যাইতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রয়াগে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে জীবনে বৈচিত্র্য না থাকিলেও গভীরতা ছিল—ধ্যান, জপ, তপস্যা ও বিদ্যানুশীলনে উহার প্রতিমুহূর্ত পরিপূর্ণ ছিল। প্রয়াগের গরমে দ্বিপ্রহরে 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে'র দোতলার এক কক্ষে বসিয়া তিনি বাঙ্গলাতে 'জলসরবরাহের কারখানা' ও 'সূর্যসিদ্ধান্ত' লিখিয়াছিলেন। ঐ সময়েই সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'-এর হিন্দী অনুবাদ এবং উহার কয়েক বৎসর পূর্বে 'দেবী ভাগবত' ও 'বৃহজ্জাতক' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। শরীর-ত্যাগের দশ-বার দিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'রামায়ণের' ইংরেজী অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন এবং উহার কিয়দংশ প্রকাশিতও হইয়াছিল। কার্যটি অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এই অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন আমি রামায়ণ লিখতে বসি, তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়; আর সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।"

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে তিনি স্বামীজীর মন্দির-নির্মাণার্থে বেলুড়ে আগমন করেন। স্বামীজীর প্রতি অসীম ভক্তির সহিত মহারাজেরও প্রতি অনুপম শ্রদ্ধা-ভালবাসা মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে এই কার্যে প্ররোচিত করিয়াছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, মহারাজের সহিত তাঁহার ভাবগত সাদৃশ্যও ছিল—তাঁহাদের উভয়েরই বহু দর্শনাদি হইত। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আধুনিক অবিশ্বাসীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন রহস্যপ্রিয় বিজ্ঞান

মহারাজ মুচকি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "তবে কি জান, দুজনেরই রাত্রিতে ঘুম কম হত কিনা—তাই ঐ রকম দেখতাম। তোমরা Young Bengal ( তরুণ বাঙ্গালা ) ওসব বিশ্বাস করো না।"

জীবনের অন্তিমভাগে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য, সৌরাষ্ট্র, পেশোয়ার, সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলেও যাইতে হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত পূর্ববঙ্গেও তাঁহার পদার্পণ হইয়াছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি দক্ষিণভ্রমণে গমনপূর্বক ক্রমে কাঞ্চী ও মাদুরা-দর্শনান্তে ত্রিবান্দ্রম হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। সেখানে স্বামীজীর এক গভীর অনুভূতির সহিত চিরবিজড়িত ভারতের শেষ প্রস্তরখানিকে তিনি প্রায় অর্ধঘণ্টা যাবৎ নির্নিমেষনয়নে নিরীক্ষণান্তে মন্দিরে দেবীকে দর্শনপূর্বক পুনর্বার ত্রিবান্দ্রম হইয়া ৺রামেশ্বরে দর্শনে গমন করিলেন। রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি এই যাত্রায় বাঙ্গালোর, মহীশূর এবং উতকামণ্ডেও গিয়াছিলেন। পরবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকূট দর্শন করিয়া তাঁহার দীর্ঘকালের একটি সাধ মিটাইলেন। অতঃপর ঐ বৎসরই শীতকালে দ্বারকাধাম-দর্শনান্তে রাজকোট আশ্রমে গমন করেন এবং তথা হইতে বোম্বাই নগরে উপনীত হন।

১৯৩৩ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি দিল্লী ও লাহোর হইয়া পেশোয়ার ও লাণ্ডিকোটালে গমন করেন। তিনি সিংহলভ্রমণেও গিয়াছিলেন ঐ বৎসরই। সিংহলে অবস্থানকালে তিনি কেলানিয়া মন্দির, কাণ্ডির দন্ত-মন্দির এবং অনুরাধাপুরমের বোধিবৃক্ষ—বৌদ্ধদের এই তিনটি প্রধান তীর্থ, সিংহলের গ্রীষ্মাবাস নুয়ারা ইলিয়া এবং বাটিকালোয়া ও ত্রিনকোমলীতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী দর্শন করেন।

১৯৩৫ অব্দের মার্চ মাসে তিনি প্রয়াগ হইতে বেলুড় হইয়া ভুবনেশ্বরে গমন করেন এবং তথা হইতে মোটরে কোণারকের সূর্যমন্দির

দেখিয়া আসেন। এতদ্ব্যতীত ঐ বৎসর তিনি দিনাজপুর, তমলুক, কামারপুকুর, জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই ২৭শে অক্টোবর নিজস্ব ভূমিতে কানপুরের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। ঢাকা, বরিশাল ও পাটনায় ১৯৩৫ অব্দেই তাঁহার শুভ পদার্পণ হয়। এই সমস্ত স্থলে দীক্ষা ও উপদেশাদি দ্বারা তিনি বহু ভক্তকে কৃপা করেন। পরবৎসর তিনি ঘাটশিলা ও জামশেদপুরে গমনপূর্বক অনুরূপ কৃপা বিতরণ করেন। ঐ বৎসরের বিশেষ ঘটনা রেঙ্গুনগমন। রেঙ্গুন হইতে তাঁহাকে পেগু শহরে শায়িত বুদ্ধমূর্তি দেখাইতে লওয়া যাওয়া হয়। সেই মূর্তিসমক্ষে তিনি বিহ্বলচিত্তে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে সকলেই ফিরিতে উদ্‌গ্রীব; কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ তখন কালাতীত! অতঃপর তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "চল, চল, তাড়াতাড়ি যাই।" মোটরে উঠিয়া তিনি আপনমনে নীরবে বসিয়া রহিলেন; অপর এক বুদ্ধমূর্তি দেখিতে লইয়া গেলেও গাড়ি হইতে নামিলেন না। রেঙ্গুনের পথে অনেক পীড়াপীড়িতে বলিলেন, "বুদ্ধদেব কৃপা করে আজ আমায় দর্শন দিয়েছেন। দেখলুম শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি যেন জীবন্ত। তাঁর সৌন্দর্যের কি অপূর্ব বিভা!"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি-পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরে ঐ মন্দিরে মর্মর-মূর্তিতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত বিজ্ঞানানন্দ যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা ভারতের স্থাপত্য-শিল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পর্যবেক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিতেন। যথাকালে বেলুড়ে ফিরিবার পর স্বামীজী নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে একদিন

স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে ডাকিয়া মন্দিরটি কোথায় কিভাবে হইবে সেইসব কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করিয়া স্বামীজী তাঁহাকে একটি নক্সা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন এবং কহিলেন, "এ দেহটা তত দিন থাকবে না ; তবে আমি উপর থেকে দেখব।"

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবানন্দজী মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরে মন্দিরের স্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হওয়ায় বিজ্ঞানানন্দজী ১৯৩৫ অব্দের গুরুপূর্ণিমাতে নিরুপিত স্থানে পুনঃ তাম্রফলক স্থাপন করেন। পর বৎসর ১০ই মার্চ হইতে মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। মন্দিরটি যাহাতে সুচারুরূপে অথচ শীঘ্র সমাপ্ত হয়, এই বিষয়ে বিজ্ঞানানন্দজী বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন এবং বেলুড়ে বাসকালে কার্য কিরূপ অগ্রসর হইতেছে স্বয়ং দেখিতে যাইতেন। ১৯৩৭ অব্দের জগদ্ধাত্রীপূজার দিন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছিল এবং তিনি ঐ জন্য বেলুড়ে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু গর্ভমন্দিরের কার্য সমাপ্ত না হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা বাপু বড় দেরি কর ! যত শীঘ্র পার প্রতিষ্ঠার কার্য শেষ করে ফেল ; আর বেশী দেরি করো না।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী মন্দিরের প্ল্যান্ করেন ; কিন্তু মন্দির হয়নি। রাজা মহারাজ চেষ্টা করেন, তিনি করতে পারলেন না। মহাপুরুষ ভিত্তিস্থাপন করেন, তিনি করতে পারলেন না। সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বল্‌ছি, যত শীঘ্র পার তোমরা কাজ শেষ করে নাও, দেরি করো না।" এই কথার তাৎপর্য সকলেই বুঝিতে পারিলেন ; সুতরাং নাটমন্দিরের সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া গর্ভমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরবিগ্রহ স্থাপনপূর্বক ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি পৌষ-সংক্রান্তির দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য সমাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠার দুইদিন পূর্বেই তিনি এলাহাবাদ হইতে

আসিলেন। অতঃপর শুভদিনে ব্রাহ্মমুহূর্তে 'আত্মারামের কৌটা' পুরাতন ঠাকুর-ঘর হইতে নীচে নামাইয়া আনা হইল এবং উহা লইয়া অতিবৃদ্ধ বিজ্ঞান মহারাজ মোটরগাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি লাল সালুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে নূতন মন্দিরের সিঁড়ির নীচে উপস্থিত হইলে তিনি নামিলেন এবং 'আত্মারামের কৌটা' লইয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্বক বেদীতে স্থাপন করিলেন। পরে পূজা, ভোগনিবেদন ও আরতি সমাপ্ত হইলে তিনি নিজ কক্ষে ফিরিলেন। কক্ষে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "স্বামীজীকে বললাম,'স্বামীজী,আপনি উপর হ'তে দেখবেন বলেছিলেন ; আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নূতন মন্দিরে বসেছেন।' তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাঁড়িয়ে আছেন।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, "এবার আমার কাজ শেষ হ'ল। স্বামীজী আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল।"

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাস্টি এবং সমগ্র মঠ ও মিশনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন ; অতঃপর স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পরে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৩৮ অব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের সময় তিনি শেষবার বেলুড় মঠে আগমন করেন। উৎসবান্তে ৮ই মার্চ এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবার পর হইতেই তাঁহার শরীর ক্রমে অসুস্থ হইতে থাকে। চিরকাল স্বাবলম্বী ও ঈশ্বরপরায়ণ তিনি জাগতিক প্রতিকার ও চিকিৎসাদিতে বিশ্বাস করিতেন না, সুতরাং প্রতিদিন অবস্থার অবনতি হইতে থাকিলেও কাহারও সেবাগ্রহণ বা কোনরূপ চিকিৎসায় সম্মত হইলেন না, বরং বাহিরের লোকের আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে আবার যথাসময়ে চেম্বারে বসিয়া দৈনন্দিন কার্যের নির্দেশও দিতে থাকিলেন। কিন্তু

৯ই এপ্রিল তাঁহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। তখন সেবকদের একান্ত অনুরোধে তিনি সামান্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সম্মতি জানাইলে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, বেরী-বেরী হইয়াছে। ঐ সময়ে রাত্রে প্রায়ই তিনি 'মা মা' শব্দ উচ্চারণ করিতেন। আহারাদি সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে জল পান করিতেন মাত্র। অবশেষে ২৫শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণ ৩টা ২০ মিনিটের সময় তিনি লীলাসংবরণ করিলেন। পরদিন কাশী, হরিদ্বার ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রাসহকারে তাঁহার পূতদেহ ত্রিবেণীসঙ্গমে লইয়া গিয়া সেখানে সলিল-সমাধি দিলেন।

বিজ্ঞানানন্দজীর অনাড়ম্বর সাধুবৃত্তিতে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। এইরূপে মদনমোহন মালব্য, অধ্যাপক উমেশচন্দ্র বসু, মেজর বামনদাস বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আবার বালকদিগের সহিতও তিনি প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। কিন্তু ছেলেদের সহিত হাসি-তামাসা ও ক্রীড়াদি করিলেও তিনি কখনও নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন না; অনিচ্ছাস্থলে তাঁহার গাম্ভীর্য দেখিয়া বালকেরা সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া যাইত। বৃদ্ধবয়সে দীক্ষিত শিষ্যদের সহিত ব্যবহারকালেও তাঁহার এইরূপ চরিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার উপদেশগুলি অনেকক্ষেত্রে হাস্যরসসমন্বিত হইয়া বড়ই চিত্তাকর্ষক হইত। বিজ্ঞান মহারাজের উপদেশ শুনিতে শুনিতে হয়তো কোন শ্রোতা কথাচ্ছলে সাহসভরে বলিয়া ফেলিলেন, "আমরা আর আপনার কথার মূল্য কি বুঝব? আমাদের কাছে ওসব গল্পই বটে—ঠাকুরমার গল্প!" অমনি তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ হে, সবই গল্প, বাস্তবিকই গল্প। পৃথিবীটাকে যদি গল্প মনে করে নেওয়া যায় তাহলে কত আনন্দ! আর যাই এটাকে বাস্তবিক মনে করলে, অমনি কষ্ট!" ধর্মজগতে বিশ্বাসের

প্রয়োজন আছে শুনিয়া একজন বলিলেন, "কিন্তু মহারাজ, আমাদের যে বিশ্বাসের অভাব!" এই উক্তির ভ্রম দেখাইয়া তখনই বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "জগতে এমন কোন মানব নাই, যার বিশ্বাস আদৌ নাই। বিশ্বাস ব্যতীত আপনি একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারেন না।" জনৈক ভক্ত আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এখানে এলে আমাদের আনন্দ হয়, তাই আসি।" অমনি তিনি উত্তর দিলেন, "আমারও তো আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়, তিনি তো আপনাদের ভেতরও আছেন।" এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত দেখেছ?" শিষ্য 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, "তোমার শরীরেই পঞ্চভূত আছে। ভয় নেই, রাম-নাম করবে—ভূত পালাবে। যেখানে রাম-নাম হয় সেখানে আর ভূত থাকতে পারে না।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সাধারণ ব্যবহারাদি-দর্শনে মনে হইত, তিনি যেন অত্যন্ত খামখেয়ালী লোক। কিন্তু চেষ্টা করিয়া মিশিলে তাঁহার অন্তরের মহত্ত্ব, ঔদার্য ও কোমলতা দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইত। স্বেচ্ছায় অবলম্বিত তাঁহার অদ্ভুত বেশভূষাদি সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব বিশাল জামা, কান-ঢাকা টুপি, মোজা ইত্যাদি দেখিয়া পথিক কখনও কৌতূহলে চাহিয়া থাকিলে তিনি বলিতেন, "ক্যা দেখতে হ্যায়? হাম্ বান্দর হ্যঁায়, রামজীকা বান্দর"—কথাগুলি কত সরল, অথচ আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর। সীতারামের প্রতি তাঁহার একটা প্রাণের টান ছিল। একবার এক ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামায়ণ পড়েছ, সীতার দুঃখের কথা কিছু জানো?" এই বলিয়া সীতার দুঃখের কথা এমন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন যে, অবশেষে নিজেই কাঁদিয়া আকুল।

উচ্চ আত্মরাজ্যে বিচরণ করিলেও তিনি দেশের স্বাধীনতা-

আন্দোলনের নৈতিক দিকটার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। দেশসেবকদের ত্যাগ ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অহিংস যুদ্ধ তাঁহার প্রাণে সাড়া জাগাইত। ১৯৩১ অব্দের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল বন্দী হইলে ভারতব্যাপী হরতাল হয়। সেইদিন নিদ্রাত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এইমাত্র স্বপ্নে স্বামীজীকে দেখলাম; তিনি অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন।" দেশনেতার অবমাননায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মন তখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে তিনি ১৯২৫ অব্দের কংগ্রেস দেখিতে কানপুরে গিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "যেখানে সৎ কাজের জন্য এত লোকসমাগম হয়, জানবে সেখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পূজা হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করাও ঈশ্বরের পূজা। ...হাজার হোক, দেশের মঙ্গলবিষয়ে চিন্তা তো হচ্ছে! একতায়ই ভগবানের শক্তির বিকাশ হয়। আমাদের দেশ আবার উঠবে মনে হয়।"

সদা সচ্চিন্তায় মগ্ন বিজ্ঞানানন্দজী অপরের গুণরাশিই দেখিতেন—এমন কি নিজের যশঃ-কীর্তনকেও অপরের সদ্‌গুণেরই পরিচায়ক মনে করিতেন। রেঙ্গুনে জাহাজঘাটে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার থাকারও সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া একজন যখন বলিলেন, "আপনি মিশনের ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট; আর রেঙ্গুনে মিশনের বড় কেন্দ্র," তখন বিজ্ঞানানন্দ বলিলেন, "না হে, না। আমি তো ভারী একটা লোক! এখানকার লোকেরাই ভাল। ...আরে ভায়া, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী। আমাদের যে এরা যত্ন করে, এরা ভাল লোক বলেই তো করে!"

ব্রহ্মানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, "হরিপ্রসন্ন হচ্ছেন গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। 'গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী' বিজ্ঞানানন্দ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত স্বীয় জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবানন্দজী সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত

হইবার কয়েক মাস পরে তিনি হঠাৎ একদিন এলাহাবাদ হইতে মঠে আসিলেন। তিন দিন মঠে বাসের পর তিনি মহাপুরুষজীর নিকট বিদায় লইতে যাইলে মহাপুরুষজী স্বীয় সক্রিয় বাম হস্তখানি তাঁহার মস্তকে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ইহাতে তাঁহার যে অনুভূতি হইল তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, "সেদিন থেকে মনের ভাব একেবারে বদলে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্যন্ত আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে সে পর্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাব।" তাই তিনি মুক্তহস্তে বহু ধর্মপিপাসুকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের অবলম্বন ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা। তিনি বলিতেন, "সব রকমই করা গেল; এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের উপর নির্ভর করে পড়ে আছি।"

# পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে 'ঈশ্বরকোটি' বলিয়া নির্দেশ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ঐতিহ্যে তিনি ঈশ্বরকোটি বলিয়াই স্বীকৃত হন। সঙ্ঘের প্রাচীনগণ ঈশ্বরকোটিদের মধ্যে এই ছয়জনকে গণনা করিয়া থাকেন—স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতের' বিভিন্ন উক্তিতে পূর্ণের এই উচ্চাধিকারেরই সমর্থন পাওয়া যায়। 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে—ঠাকুর "আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার—নরেন্দ্রের নীচেই পূর্ণের এই বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে। এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল—অতঃপর ঐরূপ আর কেহ এখানে আসিবে না!" ('লীলাপ্রসঙ্গ'—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ১৬৮ পৃঃ)। 'কথামৃতে'ও আছে—"পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম" (৪র্থ ভাগ, ২৪৮ পৃঃ); "অংশ শুধু নয়, কলা" (ঐ, ২৪৭ পৃঃ); "ওদের কেমন জান? ফল আগে, তারপরে ফুল। আগে দর্শন, তারপর মহিমা-শ্রবণ। তারপর মিলন" (ঐ, ২৬৯ পৃঃ)।

এখানে ঈশ্বরকোটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিলে মন্দ হইবে না। ঠাকুর ভক্তদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন—ঈশ্বর-কোটি ও জীবকোটি। ঈশ্বরকোটি—যেমন শ্রীচৈতন্যাদি অবতারপুরুষ, কিংবা প্রহ্লাদাদি শুদ্ধ সত্ত্বগুণী ভক্ত বা লীলাসহচর। ঈশ্বরকোটি না হইলে মহাভাব, প্রেম হয় না; ইঁহারা ইচ্ছা করিলেই মুক্ত হইতে

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
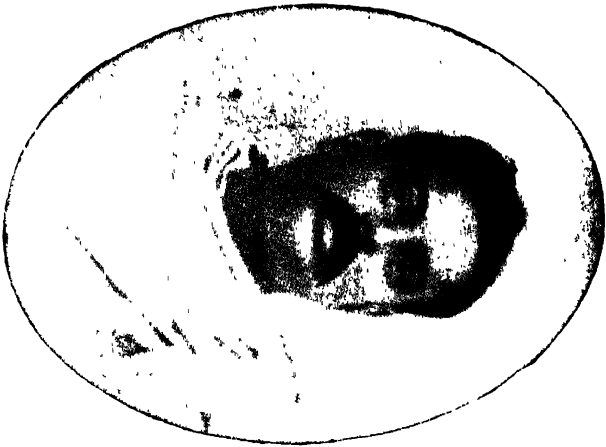
মথুরানাথ বিশ্বাস

পারেন—ইঁহারা প্রারব্ধের অধীন নহেন ; ইঁহাদের বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদের ; এবং ইঁহাদের কোনও অপরাধ হয় না। ঈশ্বরকোটির প্রেম হইলে জগৎ মিথ্যা বোধ তো হয়ই, অধিকন্তু শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তাহাও ভুল হইয়া যায়।[১] "যাঁহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল কোনওরূপ ভগবদ্ভাবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত কহে। যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ঐরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের ন্যায় বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'আধিকারিক পুরুষ', 'ঈশ্বরকোটি' বা 'নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতভাব লাভ করিবার পরে এজন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না—ইঁহারাই জীবকোটি বলিয়া অভিহিত হন" ('লীলাপ্রসঙ্গ'—গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৪৪ পৃঃ)। 'লীলাপ্রসঙ্গে' (দিব্যভাব, ১৭৪ পৃঃ) ইহাও উল্লিখিত আছে যে, ঠাকুর "ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদম্বার কৃপায় জানিতে পারিয়াছিলেন।"[২]

পূর্ণচন্দ্র পূর্ণজ্ঞান লইয়াই জন্মিয়াছিলেন ; তাই বলরাম বসু মহাশয়

---

১ 'কথামৃত'—২য় ভাগ, (৯ম সং) ১৫৯ পৃঃ ; ৩য় ভাগ (৮ম সং) ৭৩, ১৩১, ২০৪, ৩১৫ পৃঃ, ৪র্থ ভাগ (৬ষ্ঠ সং), ১৩৬ পৃঃ। 'কথামৃত'—১ম ভাগ (১৫শ সং), ১২০ পৃষ্ঠায় আছে—"নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।"

২ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে অনুরূপ বিবরণ আছে (৬০৪ পৃঃ)—

কোন কোন্ ভক্ত শুন ঈশ্বরকোটির।
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাবে লীলায় হাজির॥
নিরঞ্জন বাবুরাম ছোট শ্রীনরেন্দ্র।
শ্রীরাখাল শ্রীযোগীন আর পূর্ণচন্দ্র॥

ঠাকুরকে যখন একদিন প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, সংসার মিথ্যা একেবারে জ্ঞান পূর্ণের কেমন করে হ'ল ?" তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, "জন্মান্তরীন—পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছোট হয়, আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেইরূপ নয়।" পূর্ণের প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়া ঠাকুর আর একদিন বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা, কি অনুরাগ !" আর একদিন তিনি মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ ?" মাস্টার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে করে যাচ্ছি—ছাদ থেকে আমাকে দেখে রাস্তার দিকে দৌড়ে এল, আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে।" ঠাকুর অমনি সাশ্রুনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আহা ! আহা !—কি না, ইনি আমার পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হলে এইরূপ হয় না। এ তিন জনের পুরুষসত্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ।...পূর্ণর যে অবস্থা এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে—ঈশ্বরলাভ হ'ল, আর কেন ? বা কিছুদিনের মধ্যে তেড়ে ফুঁড়ে বেরুবে। দৈব স্বভাব, দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপধুনার গন্ধ দেওয়া যায়, তাহলে সমাধি হয়ে যায়। ঠিক বোধ হয়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন—নারায়ণ দেহধারণ করে এসেছেন" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৪৬-২৪৭ পৃঃ)। পূর্ণ আবার লীলাসহচর। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র এদের এত ভালবাসি ?

---

বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর।
শ্রীশ্রাবক বেলঘরিয়ায় ঘর যাঁর॥
প্রভুর নরেন্দ্র যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।
ঈশ্বরকোটির থেকে অত্যুচ্চ শ্রেণীর।

জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল— জানিয়ে দিলে, তুমি শরীরধারণ করেছ, এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এই ভাব নিয়ে থাক।"[১৯]

উপরের উদ্ধৃতিতে পূর্ণচন্দ্রের জীবনের দুইটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে ; প্রথম, মাস্টার মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলন এবং দ্বিতীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ। অধুনা আমরা ঐ দুই ঘটনারই বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হইব। পূর্ণ যখন ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করেন তখন তাঁহার বয়স তের বৎসর হইবে ; ঐ সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামবাজার শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ইতঃপূর্বেই বহু ভক্তিমান বিদ্যার্থীকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আনয়নপূর্বক 'ছেলে-ধরা মাস্টার' খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন ; এখন পূর্ণচন্দ্রের মিষ্ট ভাষা, সুন্দর মধুব স্বভাব, উজ্জ্বল নয়ন, সুঠাম দেহ ও উজ্জ্বল শ্যামকান্তি-দর্শনে তাঁহার প্রতিও আকৃষ্ট হইলেন ; অধিকন্তু আলাপ করিয়া যখন জানিলেন যে, বালক আবাল্য ভগবদ্ভক্ত, তখন তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-পাঠের উপদেশ দিলেন এবং একান্তে ডাকিয়া নানা ধর্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। অবশেষে ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখিয়া একদিন বলিলেন, "চৈতন্যদেবের মতো এক-জনকে যদি দেখতে চাও, তবে আমার সঙ্গে চল।" পূর্ণচন্দ্রের মন তো ইহারই জন্য আকুল ; অতএব তিনি সাগ্রহে সম্মত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে, সেই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে থাকেন এবং সেখানে যাতায়াতে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে, তখন তিনি অতীব চিন্তিত হইলেন। কারণ পূর্ণচন্দ্রের পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ মহাশয় ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পারিবারিক সুশৃঙ্খলার প্রতি তাঁহার

দৃষ্টি ছিল। আভিজাত্যের গৌরবও তাঁহার কম ছিল না; কারণ সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করায় এবং রাজসরকারের সম্মানলাভ হওয়ায় তিনি তদানীন্তন কলিকাতা-সমাজে স্বনামধন্য লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এমন সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র পূর্ণচন্দ্র যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। পূর্ণ পিতার এই মনোভাব জানিতেন বলিয়াই চিন্তাকুল হইলেন। পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। প্রয়োজনস্থলে ভাবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হইয়া গেলে ফাল্গুন মাসের এক শুভদিনে মাস্টার মহাশয়ের সহিত গাড়ি করিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপনীত হইলেন।[৩]

সুবৃহৎ দেবালয়-দর্শনে মুগ্ধ এবং দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎকারলাভে চরিতার্থ পূর্ণচন্দ্র ভক্তিবিহ্বলচিত্তে পরমহংসদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ৺জগদম্বা এই উচ্চকোটি ভক্তটির আগমনের কথা ঠাকুরকে পূর্বেই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি তাঁহাকে সাদরে আপনার নিকটে বসাইয়া ফল-মিষ্ট খাওয়াইলেন। এদিকে স্নেহমুগ্ধ পূর্ণচন্দ্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া নীরবে একদৃষ্টে সেই সৌম্য, শান্ত, মাধুর্য-ঘন, প্রেমময় মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে কি তখন অকস্মাৎ পূর্বস্মৃতি জাগিয়া তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে লইয়া গেল এবং এই লোকোত্তর মহামানবের সহিত তাঁহার দিব্যসম্বন্ধ জানাইয়া দিল? নির্বিষ্টমনে দেখিতে দেখিতে তিনি অলৌকিক আনন্দে বিভোর হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া কপোল-

৩ "পূর্ণ যখন ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করে, তখন তাহাকে নিতান্ত বালক বলিলেই চলে। বোধ হয়, তখন তাহার বয়স সবেমাত্র তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে" ('লীলাপ্রসঙ্গ'-দিব্যভাব, ১৬৬ পৃঃ)। ইহা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের কথা; অতএব পূর্ণের জন্ম ১৮৭১-এর শেষে কিংবা ১৮৭২-এর প্রারম্ভে ধরা যাইতে পারে।

দ্বয় ভাসাইয়া দিল। সে অপার্থিব লীলায় চমৎকৃত মাস্টার কিয়ৎক্ষণ সতৃষ্ণনয়নে উহা নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকে জানাইয়া দিলেন যে, গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। প্রত্যাগমনের জন্য পূর্ণ স্বপ্নোত্থিতবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে ঠাকুর জননীর ন্যায় তাঁহার চিবুক ধরিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "তোর যখন সুবিধা হবে চলে আসবি—গাড়ি-ভাড়া এখান থেকে নিবি।" কোন প্রকারে নিজেকে সামলাইয়া ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদদ্বয়কে টানিয়া লইয়া পূর্ণ গাড়িতে উঠিলেন এবং যথাসময়ে গৃহে পৌঁছিলেন—অভিভাবক জানিতেও পারিলেন না যে, আজ পুত্রের নবজীবনের সুপ্রভাত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র এখন হইতে কখনও মাস্টার মহাশয়ের সহিত, কখনও একাকী দক্ষিণেশ্বরে যান। প্রথম পরিচয়ের পর ঠাকুরকে দেখিবার জন্য যেমন পূর্ণের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত, বাড়ির শাসন বা তিরস্কারের ভয় অকস্মাৎ তিরোহিত হইত, সহপাঠীদের সঙ্গও বিষবৎ মনে হইত এবং অবিরাম নির্জনে ভগবানের নাম করিতে ভাল লাগিত, ঠাকুরও তেমনি পূর্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল থাকিতেন, সুবিধা পাইলেই নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লুকাইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন, সময়ে সময়ে দরদরিতধারে চক্ষের জল ফেলিতেন এবং কেহ এইরূপ ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিতেন, "পূর্ণের উপর এই টান দেখেই তোরা অবাক হয়েছিস, নরেন্দ্রের জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ যে-রকম ব্যাকুল হত ও যে-রকম ছটফট করতাম তা দেখলে না জানি কি হতিস!" অথবা বলিতেন, "পূর্ণকে আর একবার দেখলেই ব্যাকুলতা একটু কম পড়বে! কি চতুর! আমার উপর খুব টান! পূর্ণ বলে, 'আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য'।"

দক্ষিণেশ্বরে পূর্ণচন্দ্র একদিন আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, পূর্ণকে যেন

মাল্য ও চন্দনাদিতে ভূষিত করিয়া খাওয়ানো হয়। মাতাঠাকুরানীও ঠিক তাহাই করিলেন। পূর্ণ ঐ ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন—"আমাকে নহবতখানার ভিতর নিয়ে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে বললেন, 'এই পূর্ণ, একে খাওয়াবার কথা বলেছিলাম।' স্ত্রীলোকটি আমার ঠিক মায়ের মতো স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ডেকে বলছেন, 'ওগো, এই তরকারিটা বেশী করে দিও।' আবার যান, আবার আসেন—দাঁড়িয়ে ভাবে যেন কি দেখছেন! আমার আহার শেষ হলে ঠাকুর তাঁকে হাতে মুখ-ধোয়ার জল ঢেলে দিতে বললেন। পরে তাঁকে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ওগো, ষোল আনা দিও।' স্ত্রীলোকটি একটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আমি তখন ভেবেছিলাম, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ঠাকুরের কোন মেয়ে-ভক্ত। পরে যখন মা-ঠাকরুনকে প্রণাম করতে যাই তখন দেখি—সেই তিনি, আমাদের মা!" পূর্ণ না বলিলেও ঠাকুরের পূর্বোদ্ধৃত কথা ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৪৭ পৃঃ) হইতে অনুমান করিতে পারি যে, মালাচন্দনপরিহিত পূর্ণ সেদিন ভাববিহ্বল হইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুর অন্যসময়ে একটি অলৌকিক দর্শনের উল্লেখ করিয়াছিলেন—"এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান? তিন-চার ক্রোশ ব্যাপী শিওড়ে যাবার মেঠো রাস্তা। সেই মাঠে আমি একলা! সেই যে পনর-ষোল বছরের ছোকরার মতো পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম। চারদিকে আনন্দের কুয়াসা। তারই ভিতর থেকে তের-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে উঠল। মুখটি দেখা যাচ্ছে—পূর্ণের রূপ! দুজনেই দিগম্বর। তারপর আনন্দে-মাঠে দুই জনেই দৌড়াদৌড়ি আর খেলা! দৌড়াবার পর পূর্ণর জলপিপাসা পেল। সে একটি গ্লাসে করে জল পান করলে। পরে

আমাকে দিতে এল। আমি বললাম, 'ভাই, তোর এঁটো খেতে পারব না।' তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে ধুয়ে নিয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিলে।"

পিতার ভয়ে পূর্ণ ইচ্ছামত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না ; তাই ঠাকুর প্রাণের টানে স্বয়ং কলিকাতায় আসিতেন। এইরূপে একবার এক ভক্তগৃহে মিলিত হইয়া তিনি স্বহস্তে পূর্ণকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয় বল দেখি?" অপূর্ব প্রেরণায় অবশহৃদয় পূর্ণ ভক্তিগদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্বর।" অবাক হইয়া ভাবিতে হয়, বালক পূর্ণ প্রথম পরিচয়ের অব্যবহিত পরেই ঠাকুরকে কিরূপে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন! ইহার উত্তর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনান্তে স্বয়ং দিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমানুষ, বুদ্ধি পরিপক্ব হয়নি—সে কেমন করে ঐ কথা বুঝল, বল দেখি! ...নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। এদের শুদ্ধসাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

একদিন বলরাম-মন্দিরে পূর্ণকে নিজসকাশে ডাকাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপ্নে কি দেখিস?" পূর্ণ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আপনাকে দেখেছি—বসে আছেন, কি বলছেন।" ঠাকুর শুনিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "খুব ভাল। তোর উন্নতি হবে, তোর ওপর আমার টান আছে।" একরাত্রে পূর্ণচন্দ্র পাঠগৃহে বসিয়া একাকী পড়িতেছেন—সহসা মাস্টার আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অমনি পূর্ণচন্দ্র বাহিরে আসিলে মাস্টার মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুর শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন—সঙ্গে এস।" পূর্ণচন্দ্র কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর বাস করিতেন। সেখান হইতে মাস্টারের সহিত শ্যামপুকুর ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে

উপস্থিত হইলে তথায় অপেক্ষারত ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তোর জন্য সন্দেশ এনেছি, তুই খা।" এই বলিয়া মুখে তুলিয়া দিলেন। পরে তিনজনে পল্লীর মধ্যে মাস্টারের গৃহে গেলেন এবং ঠাকুর সেখানে পূর্ণকে সাধনসম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। অপর একদিন দেবেন্দ্র মজুমদারের হাতে পূর্ণের জন্য কয়েকটি আম পাঠাইয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তাঁহাকে খাওয়াইলে লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হইবে।

আর একদিন মাস্টারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর জানিতে চাহিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের পর পূর্ণের কোন উন্নতি হইতেছে কি-না। মাস্টার কহিলেন, "সে চার-পাঁচ দিন ধরে বলছে, 'ঈশ্বর-চিন্তা করতে গেলে আর তাঁর নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল পড়ে—রোমাঞ্চ এই সব হয়।" অতঃপর ঠাকুর বলিলেন, "খুব আধার। তা নাহলে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ওতো ঐসব কথা জানে না।" আবার সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছ? ভাব-টাব হয় কি?" মাস্টার যখন জানাইলেন যে, বাহিরে ঐরূপ কোন প্রকাশ দেখেন নাই, তখন ঠাকুর কহিলেন, "বাইরে তার ভাব তো হবে না—তার আকর আলাদা। আর আর লক্ষণ সব ভাল।"

পূর্ণ বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ইহাতে প্রধান শিক্ষকের সমর্থন আছে—এ সংবাদ অভিভাবকের অবিদিত রহিল না; সুতরাং বিদ্যালয় পরিবর্তিত হইল। তথাপি দেখা গেল যে, অন্য সর্ব-বিষয়ে পিতার বাধ্য হইলেও ঠাকুরের কলিকাতায় আগমনের সুযোগে পূর্ণ অতি সংগোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং স্বগৃহে পূর্ববৎ সাধনায় রত থাকেন। অধিকন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে যুবক

কাজেই অপরিণত বয়সেই পুত্রের উদ্বাহ-বন্ধনের আয়োজন চলিতে লাগিল। ঠাকুরের দেহত্যাগের দুই বৎসর পরে ষোল বৎসর বয়সে একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে গৃহস্থ সাজানো হইল। যথাকালে ভারত সরকারের অধীনে চাকরির ব্যবস্থাও হইয়া গেল। পূর্ণ এখন পুরা সংসারী! স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি পূর্ণের অধ্যাত্ম-বিকাশের পথ সহসা সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িল। সর্বপ্রকার বিরাট সম্ভাবনা লইয়া আগত যে ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ সত্ত্বগুণের আধিক্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরেই স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়মাধুর্যের অভিব্যক্তির ক্ষেত্র এইভাবে সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়া ভাবিতে হয়, "এ কী দৈবী মায়া! ইহা কি পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ পরিবেশের নিকট অন্তঃশক্তির পরাজয়, অথবা ভগবল্লীলার সমস্ত অংশ মানববুদ্ধির অতীত?" শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, অবতার যখন যুগধর্মপ্রবর্তনের জন্য ধরাধামে আগমন করেন, তখন দুই শ্রেণীর নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাঁহার অনুগমন করেন। একদল তাঁহার যুগধর্ম-প্রচারে ব্রতী হন, অপরেরা শুধু লীলা আস্বাদন করেন বা লীলা-বিলাসের সহায় হন—বাউলের দলের ন্যায় আপন মনে নাচিয়া-গাহিয়া চলিয়া যান! পূর্ণ কি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত?

সে যাহাই হউক, পূর্ণের পরবর্তী জীবন ভক্তের নিকট যেমন উপভোগ্য, সদ্‌গৃহস্থের নিকট তেমনি শিক্ষাপ্রদ। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার সত্যই লিখিয়াছেন, "ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাহারা সম্বদ্ধ হইয়াছিল তাহারা সকলেই তাঁহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা ও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে ( 'লীলাপ্রসঙ্গ'-দিব্যভাব, ১৬৯ পৃঃ )।" তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ ঘোষণা করিতে গিয়া

'উদ্বোধন'-সম্পাদকও লিখিয়াছেন ('উদ্বোধন,' পৌষ, ১৩২০)—"সন্ন্যাসপ্রবণ অন্তর লইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া কর্মবিপাকে যাঁহাদিগকে সংসার করিতে হয়, গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহারা কখনও সুখলাভে সমর্থ হন না। ঈশ্বরের অচিন্ত্য ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রকে তাহাই করিতে হইয়াছিল এবং ফলও তজ্জন্য তদনুরূপ হইয়াছিল। সমগ্র চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিরন্তর অবস্থান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আজীবন তিনি যেন সকলের নিকট অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন।"

পূর্ণচন্দ্র সরকার বাহাদুরের অর্থবিভাগের কর্মচারী ছিলেন; সেজন্য বৎসরে অর্ধেক সময় তাঁহাকে সিমলা শৈলে থাকিতে হইত। ভারত-রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের কর্মস্থলও তথায় চলিয়া যায়। দিল্লীতে অবস্থানের কাল হইতে তাঁহার জ্বর হইতে থাকে এবং সিমলা শৈলের বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ বায়ুসেবনেও সে জ্বরের হ্রাস না হইয়া দিন দিন উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সিমলা হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। এখানে তিনি প্রায় ছয় মাস শয্যাগত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। অন্তরে সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্র এই সময়ে সহধর্মিণীকে চিন্তিতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা কি সংসারের অন্যলোকের ন্যায়? আমরা যে সর্বতোভাবে ঠাকুরের; আমার জন্মিবার পূর্বে যিনি তোমাদের আহার দিয়ে রক্ষা করেছেন, আমার মৃত্যু হলে তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন, দেখবেন।" অশেষ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার দেহমনে একটা অপূর্ব শান্তি বিরাজিত থাকিত; তিনি বলিতেন যে, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বদা বসিয়া আছেন।

গৃহস্থজীবনের কর্তব্য তিনি যথাবিহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন—পুত্রকন্যাদের শিক্ষা ও লালনপালন, কন্যাদিগকে সৎপাত্রে দান,

ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই তিনি নিখুঁতভাবে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহুরূপে কার্যব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বা গুরুভ্রাতাদিগকে ভুলেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিয়াছেন, "কি প্রাতঃকালে, কি সন্ধ্যাকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। আবার অধিকাংশ সময়ে তিনি গম্ভীরভাবে শ্রোতার মতো থাকিতেন—মাঝে মাঝে দুই-একটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গের মাধুর্যবৃদ্ধি করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে পূর্ণবাবু প্রতি রবিবারে বেলুড় মঠে যাইতেন। সেখানে প্রায়ই একাকী বসিয়া হাসিমুখে চুরুট টানিতেন—মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই-একটি বাক্যালাপ করিতেন—তাও ভাসাভাসা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, যেন অন্তর্মুখভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার বাড়িতে অধিকাংশ যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা ঠাকুরের ভক্ত। শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় অনেক যুবক ছাত্রভক্তকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং পূর্ণবাবু তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে বিশেষ ভাল বাসিতেন। বিশেষ যে-সব যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হইবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইতেন, তাঁহাদের দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না" ('উদ্বোধন', ১৩৫৪, ৩৬১ পৃঃ)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সন্তানগণ পূর্ণবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং নবাগতদের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদানকালে পূর্বকথা স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন। স্বামীজীর আমেরিকা-বিজয়ের সংবাদে যখন দেশ উল্লসিত, তখন পূর্ণবাবু প্রত্যহ অপরাহ্ণে বলরাম মন্দিরে যাইয়া সংবাদপত্রগুলির খবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতিকে সাগ্রহে শুনাইতেন এবং তাঁহারাও স্বামীজীর পত্রাদি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। ঐ প্রসঙ্গে পূর্ণবাবু হয়তো কিছু বলিতেছেন, এমন সময়

অপর কেহ ব্যস্ত হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিতে চাহিলেন; অমনি মহারাজ প্রভৃতি বাধা দিয়া কহিলেন, "পূর্ণ যখন কথা বলবে, তোমরা চুপ করে শুনবে।" ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিলে তাঁহাকে যখন শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন তিনি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে পূর্ণবাবুর গৃহের সম্মুখে গাড়ি থামাইয়া পূর্ণবাবুকে ডাকিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পাঠাইলেন। পূর্ণবাবু সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে ভিড়ের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনার আড়ম্বর ও স্বামীজীকে দর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া আফিসে যাইবার আগে স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে ঐ অবস্থায়ই বাহিরে আসিলে স্বামীজী সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দিল্লী ও সিমলায় থাকা কালেও তিনি গুরুভ্রাতাদের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার কাশ্মীর-ভ্রমণান্তে তাঁহার সিমলার বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অপর অনেকেও তথায় গিয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত তাঁহার পত্রালাপ ছিল। কাহাকেও অর্থাদি দ্বারা তিনি সাহায্য করিতেন। গিরিশবাবুর দেহত্যাগের কিছু পূর্বে পূর্ণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলে গিরিশ করজোড়ে বলিলেন, "ভাই, আশীর্বাদ কর, যেন প্রতিমুহূর্তে ঠাকুরকে স্মরণ করতে পারি। জয় রামকৃষ্ণ।" পূর্ণ কোমল-স্বরে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর আপনাকে সর্বদাই দেখছেন—আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

বিবেকানন্দ সমিতির সদস্যবৃন্দের অনুরোধে তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উহার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যাসমাগমে শঙ্কর ঘোষের লেনে সমিতি-ভবনে যাইয়া স্বয়ং ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসিতেন এবং অপর সকলকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কালেই মাদাম্ কাল্‌ভে

কলিকাতায় আসেন। পূর্ণবাবু সমিতির মুখপাত্র হিসাবে সভ্যগণসহ গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের ফটো তাঁহাকে উপহার দেন। ঐ পদে তিনি এক বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন; অতঃপর সিমলা চলিয়া যাওয়ায় উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

আফিসের ছুটির পর তিনি সিমলা পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন—গৃহে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। সেখানে গুরুভ্রাতারা ছিলেন না, আশ্রমাদিও ছিল না; সুতরাং শ্রীগুরুর স্মরণ-মননের উপায় এতদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে বাহিরে ভাবের প্রকাশ না থাকিলেও অন্তরে উহা সর্বদাই ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইত এবং কোন কারণে উপরের আবরণ একটু সরিলেই স্বচ্ছ জলধারা বাহির হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, প্রফুল্লকুমার ব্যানার্জী মহাশয় একদিন সিমলার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত পুলিন মিত্র ভগবৎ-সঙ্গীত করিতেছেন এবং পূর্ণবাবুর দুই চক্ষে ধারা বহিতেছে। ইহার পরেও অনেকক্ষণ তাঁহার চক্ষু লাল হইয়াছিল। অপর একদিন ভ্রমণের সময় তাঁহাকে আনমনা দেখিয়া পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহবোধ আছে কিনা। ইহার উত্তরে পূর্ণবাবু গলায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, উপরের অংশটিই শুধু আছে, নিম্নের কোন বোধ নাই। ফলতঃ তিনি অধ্যাত্মভূমিতেই নিত্যপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন! তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনেরও একটা ধারা ছিল। অবসর সময়ে তিনি পড়াশোনা যথেষ্ট করিতেন এবং সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। ব্যায়ামাদির ফলে তাঁহার শরীর বেশ সবল ও সুদৃঢ় ছিল; সিমলা পাহাড়ে গোরাদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে তাঁহাকে দুই-একবার এই শক্তিপ্রয়োগও করিতে হইয়াছিল এবং জয় হইয়াছিল তাঁহারই।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর বয়সে কঠিন রোগে পূর্ণবাবুর জীবনসংশয় উপস্থিত হইলে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হন। তদবধি রোগের গতি পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তিনি শীঘ্রই সুস্থ হন। প্রেমানন্দ মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "ছেলেমেয়েরা খুব কম বয়সী ব'লে ঠাকুর ওঁর পরমায়ু বাড়িয়ে দিলেন।"

পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্যাদা বুঝিতেন। যাঁহারা দেশের জন্য কারাবরণ করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীর তুল্য মনে করিতেন। তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ ছিল, দোষদর্শন না করিয়া গুণগ্রাহী হওয়া। ধনী জমিদার ও সুপুরুষ শ্যাম বসু মহাশয়ের সর্বপ্রকার বৈষ্ণবোচিত বাহ্য সদাচারের সহিত চরিত্রগত দুর্বলতাও ছিল। তিনি পূর্ণবাবুর নিকট খুবই যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জনৈক যুক্তিবাদী যখন পূর্ণবাবুকে ঈদৃশ অসঙ্গতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "শ্যামবাবুর দোষ আছে বটে; কিন্তু সে যা করে একাই করে —দল নিয়ে করে না। কিন্তু তার যা গুণ আছে, তা খুব কম লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—সেটা সত্যানুরাগ। সে যদি কোন বিষয়ে কোন কথা দেয়, তা সে রাখবে—হিমালয়ের মতো অচল অটল! আর কেউ বিপদে পড়লে বা কারুর কষ্ট দেখলে সে সাহায্য করে—অবজ্ঞা করে না।" পূর্ণবাবুর সাহচর্যে এই গুণরাশি বর্ধিত হইয়া শ্যামবাবুর চরিত্রে অপূর্ব পরিবর্তন আনিয়াছিল এবং তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল।

পূর্ণবাবু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ অল্প বয়সে দেহত্যাগ করবে, তা না হলে সন্ন্যাস নিয়ে সংসারত্যাগ করবে;"..."ওকে যদি সংসারে আবদ্ধ করা হয়; ওর বেশীদিন দেহ থাকবে না।" ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংক্রান্তি, (৩০শে কার্তিক; ১৬ই নভেম্বর ১৯১৩)

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তিনি মাত্র বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। উহার এক বৎসর পূর্ব হইতেই জ্বরে ভুগিয়া তাঁহার শরীর অতিজীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে তাঁহার আফিসের অধস্তন কর্মচারী আশুবাবু একদিন তাঁহার রোগক্লিষ্ট দেহ দেখিয়া আক্ষেপসহকারে বলেন, "ঠাকুর যদি এখন থাকতেন, তা হলে আপনার এই অবস্থায় তিনি কী করতেন!" এই কথা শুনিয়াই পূর্ণবাবু বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং আশুবাবুর উপর তাঁহার জ্বলন্ত দুইটি বড় বড় চক্ষু রাখিয়া সতেজে বলিলেন, "তিনি গেছেন কোথায়?" অপ্রস্তুত আশুবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলে তিনি একটু শান্ত হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন, কাল রাত্রে প্রস্রাব করতে বারান্দায় কোনরকমে দেয়াল ধরে ধরে গেছলাম। ঘরে অবশ্য লোক থাকে; কিন্তু সে ঘুমিয়েছিল ব'লে তাকে আর জাগাই নি। একাই ঐ ভাবে বারান্দায় যাই। কিন্তু ফেরার সময় উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, আর একটু হলেই পড়ে যেতাম। ঠিক সেই সময় ঠাকুর এসে আমায় ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলেন।"

দেহত্যাগ তাঁহার অতি শান্তভাবেই হইয়াছিল—বাড়ির কেহ বুঝিতেই পারেন নাই। মুখে তখন তাঁহার দিব্য কান্তি ও শান্তি—ব্রহ্মতালু তখনও গরম। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, দুই-তিন ঘণ্টা আগে দেহত্যাগ হইয়াছে। ঠাকুরের লীলা যেমন অদ্ভুত—তাঁহার সহচরবৃন্দের জীবনও তেমনি অপূর্ব ও মানববুদ্ধির অগম্য!

# মথুরানাথ বিশ্বাস

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব—পূর্বার্ধ ও সাধকভাব) সবিস্তারে মথুরানাথের[১] চরিত্রাঙ্কনে নিয়োজিত হওয়ায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের যাঁহারা অনুধ্যান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ভক্তপ্রবরের সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-অবলম্বনেই ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংকলনে অগ্রসর হইলাম।

সাধনকালে একসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা জাগিয়াছিল, "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস নি, রসেবসে রাখিস।" মথুরানাথের সহিত ঠাকুরের যে অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা উক্ত প্রার্থনারই পরিণতিবিশেষ। কারণ এই প্রার্থনার উত্তরস্বরূপে ৺জগন্মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদদার তাঁহার সহিত প্রেরিত হইয়াছেন এবং মথুরানাথই তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। ইঁহাদের সম্বন্ধ বড়ই মধুর অথচ চমকপ্রদ ছিল। পূজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার দেখাইয়াছেন যে, একদিকে মথুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপর দিকে তেমনি আবার তিনি ঠাকুরকে অনভিজ্ঞ বালকপ্রায় জানিয়া সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণাদিতে তৎপর থাকিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মথুর শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইহকাল ও পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন; অন্যপক্ষে আবার ঠাকুরের কৃপাও মথুরের প্রতি অপরিমিত ছিল।

---

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' মথুরানাথ নামের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়; স্থলবিশেষে মথুরামোহন নামও ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন ব্যবহারে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও অচিরে উহা ভুলিয়া গিয়া আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্বক ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের চেষ্টা করিতেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট এবং অতীব প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, এবং দৈবনির্দিষ্ট ছিল বলিয়াই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্পবয়স মথুরবাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল।

মথুরবাবু রানী রাসমণির তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করিয়া রানীরই গৃহে বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পকাল পরে একমাত্র পুত্র ভূপালকে রাখিয়া করুণাময়ী পরলোকগমন করিলে রানী এই উপযুক্ত জামাতাকে পরিবারের সহিত চিরসম্বদ্ধ রাখিবার জন্য তাঁহার হস্তে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বাকে অর্পণ করেন। অতঃপর রানীর পতি শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস দেহত্যাগ করিলে বিষয়কর্ম-পরিচালনের জন্য মথুরবাবু রানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইলেন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মথুরবাবুর জাগতিক অভ্যুদয়ের দিক লক্ষ্য না করিয়া প্রধানতঃ তাঁহার ধর্মজীবনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব।

মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে যতই দেখিতেছিলেন, ততই অধিক আকৃষ্ট হইতেছিলেন। একদিন ঠাকুরের শ্রীহস্তে গঠিত এক সুন্দর শিবমূর্তিদর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং রানীকে উহা দেখাইলেন। তদবধি তাঁহার মনে সঙ্কল্প জাগিল, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবপূজায় লাগাইতে হইবে। এইরূপে মথুরেরই আগ্রহে তিনি ৺ভবতারিণীর পূজকপদে ব্রতী হন। ইহার পরে তিনি কিরূপে ৺রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পূজা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা আমরা রাসমণি-প্রসঙ্গে বলিব।

বিবাহান্তে পূর্ণযৌবন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া আসিয়া যেভাবে গৃহসম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া দিব্যোন্মাদে সাধনায় ডুবিলেন, তাহা দেখিয়াও

মথুরবাবু মুগ্ধ হইলেন। তাদৃশ আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার মর্মোপলব্ধিতে অসমর্থ কর্মচারীরা অবশ্য অভিযোগ জানাইলেন, "ছোট ভটচাজ সব মাটি করলে! মার পূজা-ভোগ-রাগ কিছুই হচ্ছে না; ওরকম অনাচার করলে মা কি কখন পূজা-ভোগ গ্রহণ করেন?" ইহাতেও মথুর বিচলিত না হইয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য একদিন অন্তরালে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের ভাববিহ্বলতা দেখিলেন এবং যাইবার সময় আজ্ঞা দিলেন, "ছোট ভটচাজ মশায় যেভাবে যাই করুন না কেন, তোমরা তাঁকে বাধা দিবে না। আগে আমাকে জানাবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করবে।" ইহারও পরে ঠাকুর আরও কিছুদিন পূজা চালাইলেন; কিন্তু পরে স্বীয় ভাবাবেগকে বৈধীভক্তির সীমার ভিতর রুদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইয়া একদিন ভাগিনেয় হৃদয়কে পূজাসনে বসাইয়া মথুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ থেকে হৃদয় পূজা করবে। মা বলছেন, আমার পূজার মতো হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করবেন।" বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সাধনাদির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে কর্তব্যনির্মুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

শুধু তাহাই নহে; ঠাকুরের প্রয়োজন জানিয়া তিনি তাঁহার জন্য মিছরির সরবতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং অন্য বিধিরূপে তাঁহার সাধকজীবনের সহায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর যেদিন রানী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিলেন[২] সেদিন মথুরেরও মনে সন্দেহ জাগিল যে, ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ ঘটিয়াছে। অতএব কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করাইলেন। অধিকন্তু তর্কযুক্তি সহায়ে ঠাকুরের মনকে অধিকতর সুসংযত করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরন্তু এই ক্ষেত্রে

---

২ 'রানী রাসমণি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মথুরেরই পরাজয় ঘটিল। একদিন যুক্তিবাদী মথুরবাবু বলিলেন, "ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার ক'রে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে উত্তর দিলেন, "ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।" মথুর সে কথা না মানিয়া বলিলেন, "লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেননা তিনি নিয়ম ক'রে দিয়েছেন। কই লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি।" পরদিন শৌচে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একটা লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুইটি ফেঁকড়িতে দুইটি ফুল—একটি লাল, অপরটি ধপধপে সাদা। অমনি উহা আনিয়া মথুরকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ!" মথুরও স্বীকার করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে।"

এই-সকল উপায় ছাড়া মথুরবাবু অন্যভাবেও শ্রীশ্রীঠাকুরের তথাকথিত রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক সময়ে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের ফলে ঠাকুরের মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে। তাই ব্রহ্মচর্যভঙ্গের জন্য একদিন কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ একভবনে তাঁহাকে বারনারীকুলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরন্তু ঠাকুর "মা, মা" বলিতে বলিতে বাহ্য চৈতন্য হারাইলেন এবং ঐসকল নারীর হৃদয় তাদৃশ পবিত্রতা-দর্শনে বিগলিত হইল; তাহারা সশঙ্কচিত্তে সে মহাপুরুষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল।

মথুরবাবু ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত. হঠকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্যশালী এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইংরেজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না—এইরূপ

স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে, তাহাই যে চোখ-কান বুজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন আর গুরুই হউন বা অন্য যে-কেহই হউন। এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির অভিব্যক্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস অতীব শিক্ষাপ্রদ। ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও এই মনোভাবের আশ্রয়েই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে মথুরবাবু প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত এবং অন্যান্য ঘটনাবলী ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশান্তে ঠাকুর শিবমহিম্নঃস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে ভাবাধিক্যে স্তবপাঠে অসমর্থ হইয়া সশ্রুনয়নে কেবলই বারবার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন ক'রে বলব!" মন্দিরের কর্মচারীরা ভাবিলেন যে, ছোট ভট্টাচার্যের পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে—হয়তো শিবের উপর চড়িয়া বসিবেন; সুতরাং হাত ধরিয়া সরাইয়া দেওয়াই ভাল। গোলমাল শুনিয়া মথুরবাবু তথায় আসিলেন এবং ঠাকুরের ভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "যার মাথার উপর মাথা আছে, সেই যেন এখন ভট্‌চাজ মহাশয়কে স্পর্শ করতে যায়।" শুধু তাহাই নহে; ঠাকুরকে পাছে কেহ বিরক্ত করে, এইজন্য তিনি বাহ্য ভূমিতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত মথুর তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দিনের পর দিন তখন ঠাকুরের গুরুভাবের অধিকাধিক বিকাশ হইতেছে এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিবিধ তান্ত্রিক সাধনে তাঁহার অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়া ও শাস্ত্রের সহিত সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া লইয়া দৃঢ়প্রত্যয়

হইয়াছেন যে, ঠাকুর অবতার। ব্রাহ্মণীর নিকট উহা শ্রবণপূর্বক বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণী বলে যে, অবতারদের যে-সকল লক্ষণ থাকে, তা এই শরীর-মনে আছে।" মথুর শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন, তিনি যাই বলুন না, বাবা, অবতার তো আর দশটির অধিক নাই। সুতরাং তাঁর কথা সত্য হবে কি ক'রে? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হয়েছে, একথা সত্য।" বলিতে না বলিতেই ভৈরবী তথায় উপস্থিত! অমনি সরলতার প্রতিমূর্তি ঠাকুর তাঁহাকে মথুরের অবিশ্বাসের কথা জানাইলেন। ভৈরবী তখন ভাগবতাদি শাস্ত্রাবলম্বনে প্রমাণ করিলেন যে, অবতারের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই; অধিকন্তু ইহাও বলিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের সহিত ঠাকুরের দেহমনে প্রকাশিত লক্ষণসমূহের সৌসাদৃশ্য আছে। সমস্ত শুনিয়া মথুরকে সেদিন নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু ঠাকুর উহাতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি এই বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে থাকায় মথুরবাবু অগত্যা পণ্ডিতসভার আহ্বান করিলেন। তাহাতে বৈষ্ণব-চরণাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সম্মুখে ব্রাহ্মণী শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বনে এমন ভাবে স্বপক্ষ প্রতিপাদন করিলেন যে, অবশেষে তাঁহারই জয় হইল। মথুরের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তির অতঃপর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কথাটার একটা গুরুত্ব আছে—উহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

মথুরবাবু শুধু পরীক্ষা করিয়া, যুক্তিতে পরাজিত হইয়া বা জ্ঞানী ও সিদ্ধদের কথা শুনিয়া ঠাকুরের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নাই। ঠাকুরের অসাধারণ ত্যাগ-বৈরাগ্যাদিও তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটাইবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইতেন এবং নানাভাবে তাঁহার সেবা করিতেন। কোন দিন হয়তো তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক প্রস্থ বাসন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দিলেন এবং মূল্যবান

বস্ত্রাদি পরাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমিই তো এই সকলের ( বিষয়ের ) মালিক ; আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয়।" কোন দিন হয়তো তিনি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এক জোড়া বেনারসী শাল ক্রয় করিলেন এবং "এমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব" ভাবিয়া নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করিলেন। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের ন্যায় আহ্লাদে এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু বালকেরই ন্যায় পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, ঐ শালখানি পঞ্চভূতের বিকার বই কিছুই নহে, উহাতে সচ্চিদানন্দলাভ হয় না ; বরং অভিমানের বৃদ্ধিবশতঃ মন ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যায়। অমনি উহাকে ভূমিতে ফেলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘসিতে লাগিলেন ; এমনকি, পোড়াইবারও উপক্রম করিলেন। এমন সময় কে একজন আসিয়া উহা রক্ষা করিল। মথুরবাবু যথাকালে শালের দুর্দশার সংবাদে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, "বাবা বেশ করেছেন।" তিনি বিষয়ী হইলেও ঠাকুরের সান্নিধ্যগুণে তখন বৈরাগ্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সস্ত্রীক মথুরবাবু প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি—ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়। উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, "বাবা মানুষ নন ; ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে কি করবে ? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান।" তাঁহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন তাহা নহে—কার্যতও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের

প্রতি মথুরের এই প্রকার একান্ত বিশ্বাস গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এই অনুভূতির ইতিহাস 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারের নিপুণ লেখনীমুখে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুণ্যবতী রানী রাসমণির দেহত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের প্রারম্ভ হইতেই মথুরবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি বারংবার বিবিধভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁহাতে মধ্যে মধ্যে উন্মত্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কিনা, তদ্বিষয়ে তিনি তখনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তন্ত্র-সাধনকালে মথুরের মন হইতে ঐ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, এই সময়ে অলৌকিক বিভূতিসকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ-অবলম্বনে তাঁহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী করিতেছেন। নিম্নোক্ত দর্শনটি মথুরের মনে একপ্রকার বিশ্বাসোৎপাদনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

তখনও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট ঠাকুরের চিকিৎসা চলিতেছে ; অথচ রোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশেষে নিরুপায় কবিরাজ বলিয়া দিয়াছেন, "ইঁহার দিব্যোন্মাদ-অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে ; উহা যোগজ ব্যাধি ; ঔষধে সারিবার নহে।" এই সময়ে

ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা বারান্দাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় গোঁভরে পদচারণ করিতেছিলেন আর এদিকে কুঠির একটি প্রকোষ্ঠে মথুরবাবু আপনমনে বসিয়া কখনও বিষয়-চিন্তা করিতেছিলেন, কখনও-বা ঠাকুরকে দেখিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া ঠাকুরের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু মথুর সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ, আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও—আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যাই পেছন ফিরে ওদিক যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল ক'রে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই। এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।" ঠাকুর তাঁহাকে যতই বুঝান, মথুর ততই কাঁদেন। সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বহু চেষ্টায় তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখান্তে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল, বাপু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীরধারণ ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের দিন হইতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনের বহু ঘটনাবলীর সহিত বিশেষভাবে জড়িত। একবার ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেমন পাঁইজর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ পরাইবার সাধ হইলে মথুরবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন। আর একবার বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাব-সাধনকালে ঠাকুরের মনে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবার ইচ্ছা জাগিলে মথুরানাথ তৎক্ষণাৎ এক প্রস্ত ডায়মন-কাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ী, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। পাণিহাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ

তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড়ে-ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে তাঁহার অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমাদিগকে চমৎকৃত করে, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎভাবের উদয় হয় কিনা পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া-পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুরের ভাবাবস্থায় "কি! আমাকে বিষয়ী করতে চাস?"—বলিয়া শ্রীযুত মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা, জমিদারি-সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধারকামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকারপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া শ্রীযুত মথুরের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও আমাদিগকে বিস্মিত করে।

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্ধিত হইয়াছিল তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস ও বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল-পরকালের সম্বল এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্যাদালাভের মূলীভূত কারণ। ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরবাবু যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালে অনুষ্ঠিত কার্যে পাইয়া থাকি। তিনি এই সময়ে (সন ১২৭০ সালে) বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ব্রতকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মণ চাউল ও সহস্র মণ তিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল এবং

সহচরী নাম্নী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী কিছুকালের জন্য উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঐসকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তি-রসাশ্রিত সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরকে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহার পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে তদনুসারে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তদ্‌গতপ্রাণ মথুরবাবু দেবদেবীসেবার ন্যায় সাধুভক্তের সেবায়ও বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাই ঠাকুর যখন এইকালে সাধুভক্তদিগকে অন্নদানের সহিত দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র-কম্বলাদি ও নিত্য ব্যবহার্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্রদানের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে বলিলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি সকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিলেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশে বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দিলেন। আবার উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে জাগ্রত হইলে, মথুরবাবু উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৯-৭০ সালেই ঐরূপ সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ভক্তির একটা সংক্রামিকাশক্তি আছে। ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাবসমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি তিনি একবার দেখিবেন ও বুঝিবেন ; তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন।

বলিলেন, "বাবা, আমার যাতে ভাবসমাধি হয় তা তোমায় ক'রে দিতেই হবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো বেশ আছিস—এদিক ওদিক দুদিক চলছে। ওসব হ'লে এদিক থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে! তখন কি করবি?" ঠাকুর আরও অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মথুর তথাপি ছাড়িলেন না দেখিয়া অবশেষে বলিলেন, "তা কি জানি, বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।" তাহার কয়েক দিন পরেই শ্রীযুক্ত মথুরের একদিন ভাবসমাধি হইল! ঠাকুর বলিতেন, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়, চক্ষু লাল, জল পড়ছে; ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে! আর বুক থর থর ক'রে কাঁপছে। আমাকে দেখে একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—'বাবা, ঘাট হয়েছে! আজ তিনদিন ধরে এই রকম, বিষয়-কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না; সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।" তখন ঠাকুর হাসেন আর বলেন, "তোকে তো একথা আগেই বলেছি।" উত্তরে মথুরবাবু বলিলেন, "হাঁ, বাবা; কিন্তু তখন কি অত শত জানি যে, ভূতের মতো এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমায় চব্বিশ-ঘন্টা ফিরতে হবে? ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারব না।" তখন ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

আর একবার শ্রীযুক্ত মথুরকে ভাববিহ্বল হইতে দেখা গিয়াছিল। সেবার ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুর তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্তা জগদম্বা দাসীর দ্বারা পুরনারীর ন্যায় বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যারতির সময়ে চামরহস্তে দেবীকে বীজন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহে সে সময়ে প্রকৃতিভাব এত সুব্যক্ত হইয়াছিল যে, মথুরবাবু

পর্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সখীভাব-সাধনকালে ঠাকুর স্ত্রীবেশে অনেক সময় মথুরানাথের বাড়ির অন্তঃপুর-চারিণীদের সহিত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন এবং স্ত্রী-আচারাদিতে পর্যন্ত যোগ দিতেন যে, অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষ বলিয়া মনে হইত না; পুরনারীদের মনেও তাঁহার উপস্থিতিজনিত কোন সঙ্কোচ হইত না। সে যাহা হউক, পূজা সেবারে খুব জমিয়াছিল এবং মথুরবাবু আনন্দে ভাসিতেছিলেন। এদিকে বিজয়া দশমীর নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিমাবিসর্জনের আয়োজন চলিতে লাগিল। তাই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইলেন, "বাবুকে নীচে এসে প্রণাম-বন্দনাদি ক'রে যেতে বল।" মথুরেব নিকট সংবাদ পৌঁছিলে আনন্দচিন্তায় মগ্ন তিনি প্রথমে কথাটা বুঝিতেই পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন ভাবিলেন, "না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙতে পারব না। মাকে বিসর্জন! মনে হলেও যেন প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে!" তথাপি পুরোহিতের আহ্বান বার বার আসিতে থাকায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি মাকে বিসর্জন দিতে দেব না। যেমন পূজা হচ্ছে তেমনি পূজা হবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হবে—খুনোখুনি পর্যন্ত হতে পারে।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। একে একে বাটীর গণ্যমান্য অনেকেই তাঁহাকে বুঝাইতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তিনি তখনও অটল। অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ধারণা করিয়া বসিলেন যে, বাবুর মাথা খারাপ হইয়াছে। অথচ হঠকারী মথুরের ভয়ে কেহ অনুরূপ করিতেও সাহস পাইলেন না। অবশেষে মথুরগৃহিণী ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর যাইয়া দেখেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর কাছে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি মাকে বিসর্জন দিতে পারিবেন না—প্রাণ থাকিতে নয়। ঠাকুর

তখন তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ! এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে ব'সে তোমার পূজা নেবেন।" সে অদ্ভুত মোহিনী শক্তিতে মথুরবাবু অচিরে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রতিমা-বিসর্জনও নির্বিবাদে হইয়া গেল।

মথুরের যেমন ঠাকুরের নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, ঠাকুরেরও আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে মাতার নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা যেমন অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখন কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে অমনি তিনি মথুরকে বলিতেন। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া "এটা কেন হ'ল, বল দেখি?" "ওটা তোমার মনে কি হয়—বল দেখি?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর ঠাকুর মথুরের উপাস্য হইলেও বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরতার ঘনমূর্তি সেই ঠাকুরকেই আবার সময়ে সময়ে মথুর নানা কথায় ভুলাইতেন ও বুঝাইতেন। বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ যোগাইত। তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দেশে গমন করিয়া ঠাকুর একদিন চিন্তায় মুখখানি শুষ্ক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এ কি ব্যারাম হ'ল বল দেখি? দেখলুম প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল। শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার এ কি হ'ল?"

মথুর শুনিয়াই বলিলেন, "ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে কুভাবের উদয় করে, কুকাজ করায়। মার কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল। এতে ভাবনা কেন?" ঠাকুর শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ; ভাগ্যিস তোমায় একথা বললুম; জিজ্ঞাসা করলুম!" বলিয়া বালকের ন্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর কথায় কথায় মথুরকে বলিলেন যে, ৺জগদম্বার কৃপায় তিনি অবগত হইয়াছেন, ঈশ্বরীয় বিষয় জানিবার জন্য ও প্রেমভক্তিলাভের জন্য অনেক অন্তরঙ্গ ভক্ত ঠাকুরের নিকট আসিবে। বলিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি বল? এসব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি বল দেখি?" মথুর কহিলেন, "মাথার ভুল কেন হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা সব দেরি করছে কেন? শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।"

ইহারই মধ্যে শ্রীযুক্তমথুরের মনে তীর্থদর্শনের বাসনা জাগিল এবং প্রায় সাত মাস কামারপুকুরে অবস্থানের পর ১২৭৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ উন্নততর স্বাস্থ্য লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলে মথুর স্থির করিলেন যে, তাঁহার পূর্বসঙ্কল্পিত তীর্থদর্শনে গমনকালে ঠাকুরকেও সঙ্গে লইবেন। এই প্রস্তাবে ঠাকুর সম্মত হইলেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের মধ্যভাগে (ইং ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৬৮) তীর্থযাত্রা করিলেন।[৩] দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি

---

৩ "ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান্… (১৮৬৩ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় তীর্থগমন…১৮৬৮ খ্রীঃ—মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে" ('কথামৃত' ১ম ভাগ, ৫ পৃঃ)।

রেলগাড়ি রিজার্ভ করিয়া মথুরবাবু পত্নী ও শতাধিক বন্ধুবান্ধবসহ 'বাবা'কে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা প্রথমে বৈদ্যনাথে দর্শন ও পূজাদির জন্য কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা এখানে হইয়াছিল। দেওঘরের এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রীপুরুষদিগের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি মথুরকে বলিলেন, "তুমি তো মার দেওয়ান। এদের একমাথা ক'রে তেল ও একখানা ক'রে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" মথুর প্রথমে একটু পেছপাও হইলেন; বলিলেন, "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক—এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?" সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া তাঁহার কথামত সকল কার্য করিলেন। বাবাও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত কাশী গমন করিলেন।

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথুর একেবারে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশীধামে পৌছিয়া মথুরবাবু কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। ঐ কারণে এবং বাটীর বাহিরে কোনস্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়া লোকে

তাঁহাকে একজন রাজরাজড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কৃপণ মথুর ঠাকুরের কথায় কাশীতে 'কল্পতরু' হইয়া দান করিলেন; আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। ঠাকুরকে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় তিনি কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না; বলিলেন, "একটি কমণ্ডলু দাও।" তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল। কাশীতে থাকা কালে মথুরের ব্যবস্থানুসারে ঠাকুর প্রায় প্রত্যহ পানসিতে চাপিয়া বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবী-দর্শনেরও সমুচিত ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছিলেন।

পাঁচ-সাত দিন কাশীতে অবস্থানের পর ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রিবাস করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে মথুরবাবু পুনরায় কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং একপক্ষকাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটি বাটীতে উঠিয়াছিলেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থান-সকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। একপক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশদর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। কাশী হইতে শ্রীযুক্ত মথুরের গয়াধামে যাইবার বাসনা ছিল; কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি থাকায় তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ঐরূপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথুরবাবুর সহিত আবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজঃ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীর-মধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলেন, "আজ

হ'তে এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হ'ল।" উহার অনতিকাল পরে তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে মথুরবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রিত করাইয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ঐ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬৲ এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত তীর্থসকল-দর্শনের পর ঠাকুর একবার মথুরবাবুর সহিত কালনা ও নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। কালনায় ঠাকুর একদিন ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়া মথুরবাবুর নিকট বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করেন। মথুরবাবুও উহা শুনিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে যান এবং আশ্রমস্থ দেববিগ্রহের সেবা এবং একদিন মহোৎসবাদির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহা সম্ভবতঃ ১২৭৭ বঙ্গাব্দের কথা।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমিদারি-মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। মথুরের জমিদারি-মহলের একস্থানে পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষগণের দুর্দশা ও অভাব দেখিয়া ঠাকুর তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পূরিয়া একদিনের ভোজন' দান করান। মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক ভিটা ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন তাঁহার জমিদারিভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তিনি এই সময়ে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। এখান হইতে তাঁহার গুরুগৃহ অধিক দূরে ছিল না। বিষয়-সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের

নাম তালামাগরো। মথুরবাবু তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া মথুরবাবুর মন এখন কতদূর নিষ্কামভাবে উপনীত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট। এক সময়ে শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হওয়ায় মথুরবাবু শয্যাগত ছিলেন। ঠাকুরের দর্শনের জন্য ঐ সময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐ কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমি গিয়ে কি করব—তার ফোড়া আরাম ক'রে দেবার আমার কি শক্তি আছে?" ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া শ্রীযুক্ত মথুর লোক পাঠাইয়া বারংবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। তিনি উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।" ঠাকুর বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা নিয়ে কি হবে, ওতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হবে?" মথুরবাবু তাহাতে বলিলেন, "বাবা, আমি কি এমনি? তোমার পায়ের ধূলা কি ফোড়া আরাম করবার জন্য চাচ্ছি? তার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাচ্ছি।" এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথুর ঐ অবকাশে তাঁহার' চরণে মস্তক স্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত মথুরকে বলিলেন, "মথুর, তুমি

যতদিন আছ, আমি ততদিন এখানে থাকব। মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, "সে কি, বাবা, আমার পত্নী ও পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।" মথুরকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাব পত্নী ও দোয়ারী যতদিন থাকবে, আমি ততদিন থাকব।" ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল।

সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুরূপ তরঙ্গ-সমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়ের অধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি পাইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন. মা তাঁহার ভক্তকে স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছে। সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন মথুরকে দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না; কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘন্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন এবং জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জিত লোকে তাঁহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন। ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন; তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠালেন—তার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গেল।" পরে গভীর রাত্রে কালীঘাটের কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল,

মথুরবাবু অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় (১৬ই জুলাই, ১৮৭১ ; ১লা শ্রাবণ, ১২৭৮) দেহরক্ষা করিয়াছেন।

জনৈক ভক্ত ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর পর মথুরের কি হ'ল মশায়? তাঁকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!" ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, "কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।" এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য অন্য কথা পাড়িলেন।

# শম্ভুচরণ মল্লিক

শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ[১] মল্লিক মহাশয়ের পিতার নাম ছিল সনাতন মল্লিক। ইনি পিতার একমাত্র পুত্র এবং ইঁহারা জাতিতে সুবর্ণবণিক। ইঁহাদের বাড়ি ছিল কলিকাতার সিঁদুরিয়াপটি পল্লীতে। দক্ষিণেশ্বরের ৺কালী মন্দিরের নিকটে তাঁহার যে উদ্যানবাটী ছিল, সেখানেও তিনি প্রায়ই বাস করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত, এবং বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি এক বিদেশী সওদাগরের অফিসে মুৎসদ্দী কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং দান, চরিত্রবল ও ভক্তিমত্তার জন্য তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ধনী হইলেও বাগবাজার হইতে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাটীতে আসিতেন। একজন বলিয়াছিলেন, "অত রাস্তা; কেন গাড়ি ক'রে আস না? বিপদ হ'তে পারে।" ইহাতে শম্ভুবাবু মুখ লাল করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "কি? তাঁর নাম ক'রে বেরিয়েছি—আবার বিপদ?" এমনি ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার দান ছিল অজস্র—প্রার্থী কেহ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিত না। ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সম্পর্কবশতঃ ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার মন বেশ উদার ছিল; তিনি বাইবেলাদি গ্রন্থ পড়িতেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে তিনি একবার সঙ্গে করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ৺কালীমন্দিরের পার্শ্বে অবস্থানের ফলে ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় সহজেই হইয়াছিল। ঠাকুর প্রায়ই তাঁহার উদ্যানবাটীতে যাইয়া দীর্ঘকাল ভগবদালাপনে

---

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' সাধকভাবে (৩৫৯ পৃঃ) শম্ভুচরণ এবং উহার গুরুভাব—পূর্বার্ধে (৫৬ পৃঃ) শম্ভুচন্দ্র নামের উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকারীদের হস্তগত দলিলে শম্ভুনাথ নামও দেখা যায়।

কাটাইতেন ; তাই গর্ব করিয়া মল্লিক মহাশয় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এখানে এস ; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আনন্দ পাও তাই এস।" ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, তেমনি সে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে এই চিন্তায় যে, ভগবানও তাহার অন্বেষণে ফিরেন।

শম্ভুবাবুর সহিত পরিচয়ের পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ৺জগদম্বার বিধানে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি সেবায়ত বা রসদদার নিযুক্ত হইবেন—"তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ, তাঁহার মাথায় তাজ।"

যখন অনেক দিন পরে মল্লিক মহাশয়ের সহিত পরিচয় ঘটিল তখন ঠাকুর বুঝিলেন, "একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি।" শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের দেহত্যাগের পর (১৬ই জুলাই, ১৮৭১) পানিহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরেব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অচিরে শম্ভুবাবু ঐ কার্য স্বহস্তে তুলিয়া লওয়ায় মণিমোহন অধিক সেবার সুযোগ পান নাই। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ পর্যন্ত শম্ভুবাবু একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবায় নিরত ছিলেন। তাঁহাদের কোনরূপ অভাব—যথা খাদ্যসামগ্রী বা কলিকাতা যাতায়াতের গাড়িভাড়া ইত্যাদি—জানিতে পারিলেই তিনি উহা অকাতরে মিটাইয়া দিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যে অধ্যাত্মসম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই কথা স্মরণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু।" শম্ভুবাবু তথাপি বিরত না হইয়া আপনভাবেই গুরুজীর সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতেন। মল্লিকজায়াও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি অশেষ ভক্তিবিশ্বাস পোষণ করিতেন, এবং দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের

অবস্থানকালে তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণপূজা করিতেন।

শ্রীমা ৺কালীমন্দিরের সংশ্লিষ্ট স্বল্পপরিসর নহবতে কষ্টে দিনযাপন করেন দেখিয়া শম্ভুবাবু ৺কালীবাটীর উদ্যানের পার্শ্বে একখণ্ড জমি ২৫০৲ ব্যয়ে মৌরসী করিয়া লন। তিনি পরে নেপাল সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত কাপ্তেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সাহায্যে ঐ জমিতে শ্রীমায়ের বাসের জন্য একখানি কুটীর প্রস্তুত করেন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ঐ জমি ও বাটীর দানপত্র লিখিয়া দেন। অন্যভাবেও তিনি মাতাঠাকুরানীর সেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। একবার শ্রীমা আমাশয়ে আক্রান্তা হইলে শম্ভুবাবু তাঁহার চিকিৎসার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

শম্ভুবাবু ছিলেন ভক্ত ও কর্মযোগী। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে তিনি আধ্যাত্মিক পথে আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উঁহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসসকল পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল। জনকল্যাণার্থে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উহাদের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিতেন, "আমার ইচ্ছা, টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় করি;" বা "আশীর্বাদ কর যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।" ঠাকুর তাঁহার অনুগত ভক্তকে শুধু সমাজসেবার স্তরে ফেলিয়া না রাখিয়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন; তাই শম্ভুবাবুর ঐরূপ প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, *"ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি হাসপাতাল ডিস্পেনসারী চাইবে?"* আর বলিয়াছিলেন, "এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি।... সম্মুখে যেটা পড়ল—না করলে নয়—সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়।" বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শম্ভুবাবুকে

তাঁহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি তুলিয়া দিতে বলেন নাই, বা তাঁহার অনুসৃত কর্মযোগমার্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবানলাভ, সেই বিষয়েই তিনি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিযুক্ত কর্মপ্রচেষ্টার দোষ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ ঠাকুরের উপদেশ কখনও কেবল নেতির পথ অনুসরণ করিত না—দুর্বল মানবকে তিনি ইতির পথেই চালাইতেন। শম্ভুবাবুকে ঐরূপ উপদেশদানের কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "লোকটা ভক্ত ছিল, তাই আমি বললুম···।" আর তিনি তাঁহাকে বলিয়াছেন, "এসব কর্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল ; কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ—হাসপাতাল ডিস্পেন্‌সারী করা নয়।···কর্ম আদিকাণ্ড, কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব অমূল্য উপদেশ যে সফল হইয়াছিল, তাহা আমরা শম্ভুবাবুর আলাপ-আলোচনা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তিনি শ্রীযুক্ত হৃদয়কে একদিন বলিলেন, "হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি।" ইহাতে ঠাকুর যখন আপত্তি করিতেন, "কি অলক্ষণে কথা কও," তখন শম্ভু বলিতেন, "না, বলো, এসব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই।" ভগবানে তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি একদিন রাঙ্গা মুখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।"

শম্ভুবাবুর দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সব লীলাবিলাস হইয়াছিল, তাহার অতি অল্পই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যীশুর দর্শনলাভের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শম্ভুবাবুরই নিকটে "বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের ও সম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বরে শম্ভুবাবুর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ঠাকুরের একবার পেটের অসুখ হইলে শম্ভুবাবু তাঁহাকে একমাত্রা আফিম খাইতে এবং যাইবার সময় উহা তাঁহার নিকট চাহিয়া লইয়া যাইতে বলেন। ঠাকুব ঐ উদ্যানে গেলে প্রায়ই কয়েক ঘন্টা সদালাপে কাটাইতেন। সেদিনও অনেক সময় ঐভাবে কাটিয়া গেলে উভয়েই আফিমের কথা ভুলিয়া গেলেন। পথে আসিয়া ঠাকুরের উহা স্মরণ হওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শম্ভুবাবু অন্দরে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব কর্মচারীর নিকট উহা চাহিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। কিন্তু শম্ভুবাবুর নিকট না চাহিয়া কর্মচারীর নিকট চাহিয়া লওয়ায় যে সত্যচ্যুতি হইল তাহারই ফলে ঠাকুর পথ দেখিতে পাইলেন না। তখন কারণ বুঝিতে পারিয়া আফিম ফিরাইয়া দিতে আসিয়া তিনি দেখেন, কর্মচারীও নাই, দরজা বন্ধ। অগত্যা জানালা গলাইয়া মোড়কটি ভিতরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রইল।" তারপর দেখেন, চোখ সাফ হইয়া গিয়াছে, স্বকক্ষে ফিরিতে আর কোনও কষ্ট হইল না।

আর একদিন ঠাকুরের সশিষ্য শ্রীযুক্ত গিরিজা ও শম্ভুবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়া গেলে ঠাকুর যখন মন্দিরে ফিরিবার জন্য রাস্তায় বাহির হইলেন, তখন গভীর অন্ধকারে দিক ঠিক করিতে পারিলেন না। ঐসময় গিরিজা স্বীয় যোগশক্তিবলে পৃষ্ঠভাগ হইতে ছটা বাহির করিয়া মন্দিরোদ্যানের প্রবেশপথ পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দিলে ঠাকুর উহার সাহায্যে স্বস্থানে ফিরিলেন।

শম্ভুবাবুর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। চারি বৎসরকাল শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের সেবা করিয়া শম্ভুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "শম্ভুর

প্রদীপে তেল নাই।” বহুমূত্ররোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত শম্ভু শরীররক্ষা করিলেন। পীড়িতাবস্থায়ও তাঁহার মনের প্রসন্নতা একদিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। শম্ভুবাবুর পৈত্রিক বাড়ি যে রাস্তার উপর ছিল, উহার নাম ছিল কমলনয়ন স্ট্রীট; কিন্তু পরে শম্ভুবাবুর স্মরণার্থ উহার নামকরণ হয় শম্ভু মল্লিক লেন।

নাগ মহাশয়

বলরাম বসু

# নাগ মহাশয়

'নাগ মহাশয়' বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ নারায়ণগঞ্জ শহরের অর্ধক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে দীনদয়াল নাগের পর্ণকুটির আলোকিত করিয়া ১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে ( ১৮৪৬ খ্রীঃ, ২১শে অগস্ট ) জন্মগ্রহণ করেন। নাগ মহাশয়ের আট বৎসর বয়সের সময় মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী পুত্র দুর্গাচরণ ও কন্যা সারদামণিকে বিধবা ননদিনী ভগবতীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। বালবিধবা অতি যত্নে ভ্রাতৃসন্তানদ্বয়ের লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পিসীমাকে নাগ মহাশয় মা বলিয়াই জানিতেন।

পিতা দীনদয়াল কলিকাতায় কুমারটুলিতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল চৌধুরীদের গদিতে চাকরি করিতেন। তাঁহার বাসাবাটী ছিল একখানি খোলার ঘর। পালবাবুরা দীনদয়ালকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। নির্লোভ দীনদয়াল একবার নৌকাযোগে বাবুদের নুন লইয়া কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জে যাইতেছিলেন। তখন জাহাজ-চলাচল আরম্ভ হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাসমাগমে আর অগ্রসর না হইয়া তিনি তীরে একখানি প্রকাণ্ড ভাঙ্গাবাড়ি ও তন্নিকটে দুইখানি কৃষকের গৃহ দেখিয়া রাত্রিযাপনের জন্য নৌকা নঙ্গর করিতে বলিলেন। প্রভাতে উঠিয়া শৌচের জন্য তিনি ভাঙ্গাবাটীর পার্শ্বে বসিয়া অভ্যাসবশতঃ নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতেছেন, এমন সময় মনে হইল টাকার মতো কি যেন হাতে ঠেকিতেছে। উৎসুক হইয়া আরও মাটি সরাইয়া দেখিলেন, পুরাতন আমলের মোহরপূর্ণ একটি ঘড়া প্রোথিত রহিয়াছে। অমনি বিষধর সর্পবৎ উহাকে দ্রুত পরিহারপূর্বক—দীনদয়াল নৌকায় গিয়া উঠিলেন এবং মাঝীরা শৌচাদির জন্য বিলম্ব করিতে চাহিলেও বলিলেন

যে, সেখানে ভয়ের কারণ আছে, নৌকা অবিলম্বে ছাড়িতে হইবে। অগত্যা তাহাই হইল।

মিষ্টভাষী, সুশীল, হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘকেশ বালক দুর্গাচরণকে দেওভোগের প্রতিবেশিনীরা সকলেই ক্রোড়ে তুলিয়া আনন্দ করিতেন; কিন্তু কেহ কোন খাবার দিলে সে উহা গ্রহণ করিত না। সন্ধ্যার সময় তারাখচিত আকাশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালক কখন পিসীমাকে আবদার করিয়া বলিত, "চল মা, আমরা ওদেশে চলে যাই—এখানে থাকতে আর ভাল লাগে না;" চন্দ্র উদিত হইলে সে আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিত; বাতাসে দোদুল্যমান বৃক্ষ দেখিয়া বলিত, "মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলব; আর অমনি হেলিয়া দুলিয়া তাহাদের অনুকরণে মধুর অঙ্গসঞ্চালনপূর্বক পিসীমার মনোহরণ করিত। পিসীমা পুরাণের গল্প বলিতে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। গল্প শুনিয়া বালক রাত্রে দেব-দেবীর স্বপ্ন দেখিত। বাল্যক্রীড়ায় তাহার তেমন মন ছিল না; তবে সঙ্গীদের আগ্রহে কখনও কখনও ক্রীড়ায় যোগ দিত। দলের জয়লাভের জন্য অন্য বালকেরা তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে বলিলে বালক অস্বীকার করিত; কিন্তু ইহার ফলে সময়বিশেষে প্রহার খাইয়া শরীর রক্তাক্ত হইত, অথচ বাড়িতে আসিয়া পিসীমার নিকট সে কোন অভিযোগ করিত না। তবে তাহার সত্যবাদিতা ও শান্তস্বভাবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইতে হইত এবং প্রায়ই তাহার ঐ বিষয়ক সিদ্ধান্ত সকলে মানিয়া লইত।

নারায়ণগঞ্জে একটিমাত্র বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে কেবল তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপন চলিত। এই সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নান্তে পাঠ বন্ধ হইয়া গেলে নাগ মহাশয় জ্ঞানস্পৃহা-পরিতৃপ্তির জন্য একদিন পিসীমার অজ্ঞাতসারে কোঁচার খুঁটে চারিটি মুড়কি বাঁধিয়া পদব্রজে পাঁচ ক্রোশ দূরে ঢাকা নগরীতে বিদ্যালয়ের অন্বেষণে বাহির হইলেন। সেখানে নর্ম্যাল

স্কুলে পড়া ঠিক হইল। এদিকে পিসীমা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মহা উদ্বেগে দিন কাটাইতেছিলেন; সন্ধ্যার সময় গৃহাগত বালকের মুখে যখন শুনিলেন যে, পরদিন হইতেই তাহাকে প্রত্যহ আটটায় ঢাকা যাত্রা করিতে হইবে, তখন তাহার আগ্রহ দেখিয়া তিনি সহজেই সম্মত হইলেন এবং প্রত্যহ যথাসময়ে রন্ধন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইভাবে দেড় বৎসর পাঠ চলিয়াছিল। ইহার ভিতর মাত্র দুই দিন নাগ মহাশয় কামাই করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ পথে যাতায়াত বড় সহজসাধ্য ছিল না। সন্ধ্যায় বাটী ফিরিবার সময় এক স্থানে তিনি কয়েকবার একটি ভূত দেখিয়াছিলেন। প্রথমবারে দেখিলেন, ভূতটি একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নাগ মহাশয় তো বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু পরে ভাবিলেন, আমি যখন তাহার কোন অনিষ্ট করি নাই, সেই বা আমার অনিষ্ট করিবে কেন? সুতরাং সাহসভরে অগ্রসর হইয়া ভূতকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। ভূত অনিষ্ট করিল না; কিন্তু তিনি পশ্চাতে শুনিতে পাইলেন এক বিকট অট্টহাস্য। তখন আর ফিরিয়া দেখার সাহস তাঁহার ছিল না। আর একবার পথে তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল—পথ অন্ধকার, আশ্রয়ের স্থান নাই। একটি মোড় ফিরিতে গিয়া তিনি অন্ধকারে এক পুকুরে পড়িয়া গেলেন। উহা হইতে উঠিয়া আসিতে তাঁহাকে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল।

নাগ মহাশয় অল্প দিনেই বাঙ্গালা রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন; আর তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মতো। পরে তিনি যখন পড়িবার জন্য কলিকাতায় যান, তখন চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে লিখিত এই রচনাগুলি 'বালকদিগের প্রতি উপদেশ' নাম দিয়া নিজব্যয়ে ছাপাইয়াছিলেন এবং বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিবার পূর্বে পিসীমাতার আগ্রহে একই রাত্রে গোধূলিলগ্নে নাগ মহাশয়ের ও শেষরাত্রে ভগিনী সারদার বিবাহ হইয়া

গেল। নববধূর নাম প্রসন্নকুমারী। বধূ গৃহে আসিলেন; কিন্তু নাগ মহাশয়ের এক অদ্ভুত আচরণে পিসীমাতার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। পাছে বধূর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়, এই ভয়ে নাগ মহাশয় সন্ধ্যা হইলেই বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিতেন এবং পিসীমাতা যতক্ষণ তাঁহাকে নিজ কক্ষে শয়নের অনুমতি না দিতেন ততক্ষণ নামিতেন না। পিসীমা ভাবিয়াছিলেন, কালে এই সৃষ্টিছাড়া মনোভাব পরিবর্তিত হইবে; কিন্তু তাহার পূর্বেই বধূ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন নাগ মহাশয় কলিকাতায়।

কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া নাগ মহাশয় ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক হোমিওপ্যাথি শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট তিনি সকাল-সন্ধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং তাঁহার সহিত রোগীদের গৃহে গৃহে যাইয়া এই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে দীনদয়াল পুত্রকে লইয়া দেশে গেলেন—ইচ্ছা, আর একটি বধূ গৃহে আনেন; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী না পাইয়া অচিরে পুত্রসহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে নাগ মহাশয় একটি ছোট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স কিনিয়া পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিনা অর্থে পাড়ায় পাড়ায় দীন-দুঃখীদের চিকিৎসায় রত হইলেন। বস্তুতঃ পরোপকার করিবার সুযোগ তিনি কদাচিৎ পরিহার করিতেন। তিনি পিতৃবন্ধুগণের অনুরোধে অম্লানবদনে তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং গৃহে বহন করিয়া আনিতেন। প্রেমচাঁদ মুনশী নামক এক কৃপণের ভ্রাতৃবিয়োগ হইলে ঐ ব্যক্তি শবদাহের জন্য কাহারও সাহায্য না পাইয়া নাগ মহাশয়ের দ্বারস্থ হইলেন; অগত্যা পিতাপুত্র মৃতের সৎকার করিয়া মুনশী মহাশয়কে বিপন্মুক্ত করিলেন।

এই সময়ে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তের সহিত

নাগ মহাশয়ের পরিচয় হয়। সুরেশবাবু তখন সাকার ভগবান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ; কিন্তু নাগ মহাশয় পূর্ণ বিশ্বাসে বলিতেন, "আছে বস্তু লয়ে আবার বিচার করা কেন ?" সুরেশবাবুর সঙ্গে তিনি কখনও বা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হইলেও সমাজের আচারাদি তাঁহার মনঃপূত ছিল না। সমাজ হইতে প্রকাশিত সাধুচরিত্র-সমূহ তিনি আগ্রহসহকারে পড়িতেন এবং পুরাণের অনুবাদেও আকৃষ্ট হইতেন। প্রায়ই তিনি শ্মশান-ঘাটে বা গঙ্গাতীরে সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গে লিপ্ত হইতেন বা আপনমনে দীর্ঘকাল ঐসকল স্থলে বসিয়া থাকিতেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে শ্মশানে বসিয়া মহানিশায় জপ কবিতে করিতে তিনি এক শুভ্রজ্যোতিঃ দর্শন কবেন এবং পরে নিয়মিত জপধ্যান আরম্ভ করেন। এক কথায় বলিতে গেলে নাগ মহাশয় তখন সংসার ভুলিয়া ক্রমেই ধর্মস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

দীনদয়াল ইহা লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে পাত্রী ঠিক করিয়া নাগ মহাশয়কে বিবাহের জন্য দেশে যাইতে আদেশ করিলেন। নাগ মহাশয়ের পক্ষে ইহা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! একবার তো বিবাহ হইয়াছিল—সে নবকুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে ; আবার পরের মেয়ের উপর এই অবিচার কেন ? পিতা কিন্তু কিছুতেই মানিলেন না ; পুত্রের অসম্মতি দর্শনে অভিমানপূর্বক অন্নত্যাগ করিলেন ও নির্জনে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। পুত্র বলিলেন, তিনি পুত্রবধূ অপেক্ষাও অধিক স্নেহভরে পিতৃসেবা করিবেন। কিন্তু কথা দিয়া কথা থাকিবে না, পিতৃপুরুষের পিণ্ড লুপ্ত হইবে—ইত্যাদি ভাবিয়া পিতা তখন ম্রিয়মাণ। অবশেষে পিতারই জয় হইল। বিষবৎ বোধ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ মহাশয় বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া দেওভোগে গেলেন এবং যথাকালে শ্রীমতী শরৎকামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

নাগ মহাশয় এখন গৃহস্থ ; সুতরাং কলিকাতায় ফিরিয়া ইচ্ছা না

থাকিলেও প্রয়োজনের তাড়নায় দর্শনী লইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। এই নবীন পরিস্থিতি সত্ত্বেও অধ্যয়নসুখ, রোগীর পরিচর্যা, সুহৃৎ-সঙ্গ ও ভগবদালাপে দিনগুলি বেশ চলিয়া যাইতেছিল। পরন্তু এইভাবে সাত বৎসর অতীত হওয়ার পর অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, মাতৃকল্পা পিসীমা অসুস্থা। নাগ মহাশয় অবিলম্বে দেওভোগে যাইয়া পিসীমার সেবায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাম-মন্ত্রে দীক্ষিতা পিসীমা পুত্রস্থানীয় নাগ মহাশয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোর যেন রামে মতি থাকে।" তারপর "রা—" বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিলিয়া গেল। মাতৃশোক কি, তাহা শৈশবে মাতৃবিয়োগকালে নাগ মহাশয় পূর্ণ অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ এই মর্মন্তুদ বিচ্ছেদ তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিল। গৃহবাস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় তিনি চিতাভূমিতে অধিক সময় কাটাইতে লাগিলেন। কাজেই ইহার অন্য কোন প্রতিকার না দেখিয়া দীনদয়ালকে দেওভোগে আগমনপূর্বক পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইল।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনান্তে পুনর্বার চিকিৎসাকার্য আরম্ভ করিলেও সদ্যশোকগ্রস্ত নাগ মহাশয় অর্থবৃদ্ধির চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর, বাহ্য পরিপাটী ইত্যাদি না থাকিলে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তেমন অর্থাগম হয় না বলিয়া পিতা তাঁহাকে পোশাক কিনিয়া দিলেন; কিন্তু পুত্র জানাইলেন, "আমার পোশাকের কোন দরকার নাই; ঐ টাকা দিয়া গরীবদুঃখীর সেবা করিলে যথার্থ কাজ করা হইত।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পিতা বলিলেন, "তোর কাছ থেকে আমার বহু আশা ছিল; এখন বুঝেছি, আমি আত্মবঞ্চিত হয়েছি। তুই যে দরবেশ হতে চলেছিস।" শুধু কি তাহাই, পুত্র রোগীর নিকট অর্থ লইতেন না; অপিচ নিজব্যয়ে পথ্য ও ঔষধাদি কিংবা নিজের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পর্যন্ত দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। সংসারানভিজ্ঞ পুত্রের সবই

সৃষ্টিছাড়া। এক শীতে একটি রোগীকে দেখিতে গিয়া তিনি নিজের গায়ের ভাগলপুরী খেশ রোগীর গায়ে জড়াইয়া দিয়া আসিলেন। আর এক ভূমিশয্যায় শায়িত রোগীকে নিজের বাটীর অতিরিক্ত তক্তাপোশ দিয়া আসিলেন। বিসূচিকাগ্রস্ত এক ক্ষুদ্র শিশুর পার্শ্বে বসিয়া সারাদিন চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু শিশুকে বাঁচাইতে পারিলেন না—সন্ধ্যায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিলেন।

অর্থের ভাগ্য যেরূপই হউক না কেন, চিকিৎসক হিসাবে নাগ মহাশয়ের বিশেষ সুনাম হইতে অধিক দিন লাগে নাই। ক্রমে তাঁহার পিতার মনিব পালবাবুরা তাঁহাকে গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। ইঁহাদের নিকট হইতেও তিনি অর্থগ্রহণ করিতেন না। একবার বিসূচিকাক্রান্তা এক রোগিণীকে আশ্চর্যরূপে আরোগ্য করায় বাবুরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে মুদ্রাপরিপূর্ণ একটি রৌপ্যপাত্র উপহার দিলেন। কিন্তু নাগ মহাশয় উহা গ্রহণ না করায় বাবুরা ভাবিলেন, উপহার আশানুরূপ হয় নাই; সুতরাং আরও পঞ্চাশ মুদ্রা দিলেন। তাহাও প্রত্যাখ্যানপূর্বক নাগ মহাশয় জানাইলেন যে, ঔষধের মূল্য ও পারিশ্রমিক কুড়ি টাকার অধিক হইতে পারে না; তিনি উহাই মাত্র লইয়া স্বগৃহে ফিরিলেন। স্বোপার্জিত অর্থ যাচককে অকাতরে দিয়া দুই-এক পয়সার মুড়ি খাইয়া দিন কাটানো তাঁহার জীবনে বিরল ঘটনা নহে। এইরূপ অবস্থায় যেক্ষেত্রে মাসিক তিন-চারি শত টাকা আয় হওয়া উচিত ছিল, সেক্ষেত্রে গৃহে আসিত মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বিনা প্রচেষ্টায় যাহা আসিয়া পড়িত, তাহা পিতাকে দিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁহারই নিকট চাহিয়া লইতেন। ধর্মের জন্য সংসারবুদ্ধি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলেও তিনি ধর্মরাজ্যে ভণ্ডামিতে ভুলিতেন না। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বা ভৈরব-ভৈরবী একসঙ্গে ভিক্ষায় আসিলে তাঁহার সমালোচনার কশাঘাতে তাহারা অবিলম্বে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইত।

সদ্‌গৃহস্থ দীনদয়াল ও ধার্মিক পুত্র নাগ মহাশয়ের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য থাকায় কার্যতঃ একটু মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা হইলেও দীনদয়াল বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেন না, নিজেই রন্ধন করিতেন। সুপুত্র পিতার স্বাধীন ব্যবহারে বাধা না দিয়া স্বীয় কর্তব্যবোধে পিতা রন্ধনশালায় যাইবার পূর্বে স্বয়ং রন্ধনে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে উভয়েই সুযোগের অনুসন্ধানে থাকিতেন এবং যিনি পরাজিত হইতেন তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও অপরকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেন। সেই সময়ে কোন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে হইত। অবশেষে এই মতান্তর-নিরোধের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নাগ মহাশয় স্বীয় সহধর্মিণীকে কলিকাতায় আনাইলেন এবং ক্ষুদ্র বাসা-বাটীতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না ভাবিয়া সুরেশবাবুর বাটীর নিকট একখানি দ্বিতল বাটী ভাড়া লইলেন। বধূ গৃহে আসায় দীনদয়াল একদিকে যেমন সুখী হইলেন, অপর দিকে তেমনি সংসারবিমুখ পুত্রকে সংসারে বিজড়িত করিতে পারিলেন না দেখিয়া দুঃখীও বড় কম হইলেন না; কারণ ঘটনাচক্রে সহধর্মিণীকে কলিকাতায় আনিলেও নাগ মহাশয় পূর্বেরই মতো ভাগবতাদি পাঠ করিয়া ও পিতাকে উহা শুনাইয়া অবসরকাল কাটাইতে লাগিলেন—পারিবারিক আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ তাঁহার ঘটিল না।

এই সময়ে সুরেশবাবু কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তে কীর্তন হইত। নাগ মহাশয় উপাসনাকালে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং কীর্তনে মাতিয়া মধুর নৃত্য করিতেন, কখনও বা বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পতিত হইতেন; এমন কি, একদিন ভাবাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তবু ইহা মনে করা চলিবে না যে, সকল সময়েই তিনি এইরূপ ধর্মোন্মত্ততা প্রকাশ করিতেন—ভাব চাপিয়া রাখাই ছিল তাঁহার স্বভাব; তিনি বলিতেন,

"যত থাকে গুপ্ত তত হয় পোক্ত। যত হয় ব্যক্ত তত হয় ত্যক্ত॥" এইরূপ ব্যক্তির ভাবের বহিঃপ্রকাশ ভাবাধিক্যেরই সূচনা করে মাত্র।

স্বাধীনভাবে সাধনায় রত থাকিয়া উন্নতিলাভ করিলেও নাগ মহাশয় জানিতেন যে, ইষ্টলাভ করিতে হইলে দীক্ষার প্রয়োজন। ঐজন্য তিনি যখন বিশেষ ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার কুলগুরু কৌল-সন্ন্যাসী শ্রীকৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বিক্রমপুর হইতে নাগগৃহে উপস্থিত হইলেন। পরদিনই নাগ মহাশয় সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষার পর সাধনা আরও নিবিড়তর হইল। জপ-ধ্যানে রাত্রি পোহাইয়া যাইত, অমাবস্যায় উপবাসপূর্বক গঙ্গাতীরে জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জোয়ারের স্রোত তাঁহার দেহকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। জ্ঞান-লাভান্তে তিনি সন্তরণপূর্বক তীরে উঠিলেন। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া তিনি কিছুকাল নক্তব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল রাগমার্গের সাধনা; কিন্তু সম্ভবক্ষেত্রে তিনি যে বৈধী সাধনাও করিতেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। এই সময়ে তিনি শ্যামাবিষয়ক অনেকগুলি পদাবলীও রচনা করেন।

এইরূপ ব্যক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়া অনিবার্য। এদিকে দীনদয়ালের শরীরও ক্রমে অপটু হইয়া পড়ায় তাঁহারও আয়-হ্রাসের সম্ভাবনা ঘটিল। তথাপি পিতার শ্রমলাঘবের জন্য এবং পিতা যাহাতে বিষয়চিন্তা ছাড়িয়া ধর্মে মন দেন, এই বিষয়ে সুযোগদানের জন্য নাগ মহাশয় স্বয়ং সংসার-বিমুখ হইলেও কর্তব্যবোধে পিতার ব্যবসায়গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। দীনদয়াল পালবাবুদের অধীনে কুতের কার্য করিতেন; পুত্র উহা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন আবার সহধর্মিণীকেও বলিলেন, "আমাকে ভুলে

মহামায়ার শরণাপন্ন হও, তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হবে।" পিতা বুঝিতে পারিলেন, পুত্র স্বাধীনভাবে স্বীয় ভাগ্যপরিচালনে বদ্ধপরিকর—বৃদ্ধবয়সে এই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সুতরাং কিছুদিন পরে পুত্র যখন দীনদয়ালকে দেশে পাঠাইতে চাহিলেন এবং শ্বশুরের সেবার জন্য বধূকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন, তখন প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া তিনি বধূর সহিত দেওভোগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর নাগ মহাশয় কলিকাতার দ্বিতল গৃহ ত্যাগ করিয়া পূর্বের ক্ষুদ্র বাটীতে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমনের ফলে সুরেশচন্দ্র সংবাদ পাইলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী এবং সদা ভগবৎপ্রসঙ্গে উন্মত্ত। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া দ্বিপ্রহরে আহারান্তে এই দুর্লভ সাধুদর্শনে চলিলেন। দক্ষিণেশ্বর কোথায় জানেন না—শুধু জানেন উহা উত্তরে। অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছেন; তখন আবার দক্ষিণে চলিয়া অপরাহ্ণ দুইটার সময় মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এখানেও বিপদ—সাধু কোথায় থাকেন তাহা তাঁহারা জানেন না। অবশেষে এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রকোষ্ঠের পূর্বদ্বারে একজন শ্মশ্রুধারী পুরুষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পরমহংসদেব চন্দননগরে গিয়াছেন—সেদিন আর দেখা হইবে না। পরে তাঁহারা জানিয়াছিলেন, ইনিই প্রতাপচন্দ্র হাজরা। হতাশায় অবসন্নমনে বিদায় লইবেন, এমন সময়ে নাগ মহাশয় দেখিলেন, ভিতরে উত্তরাস্য এক ব্যক্তি একখানি ছোট তক্তাপোশের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া স্মিতমুখে তাঁহাদিগকে ইঙ্গিতে ভিতরে আহ্বান করিতেছেন। দেখিলেই মনে হয় ইনি পবিত্রতার মূর্তি। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা মেজেতে পাতা

মাদুরে বসিলেন। সুরেশবাবু করজোড়ে প্রণাম করিলেন; নাগ মহাশয় ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে পদধূলি লইতে অগ্রসর হইলে সাধু চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না। কথাবার্তায় তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইনিই ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ। ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সংসারে পাঁকাল মাছের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। অর্ধঘন্টা পরে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও কালীমন্দিরে যাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রদাক্ষিণ করিলেন। ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুরের ভাবান্তর দেখিয়া আগন্তুকদের সত্যসত্যই অনুভব হইল যে, মায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কোন জাগতিক কল্পিত বস্তু নহে, ইহা দিব্য সহজ সরল অবস্থা। পাঁচটার সময় বিদায় লইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "আবার এসো; এলে গেলে তবে তো পরিচয় হবে।"

ঈশ্বরলাভ-লালসায় উন্মাদপ্রায় নাগ মহাশয় এক সপ্তাহ পরেই শ্রীযুক্ত সুরেশের সহিত আবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বহুদিন পরে আত্মীয়মিলনে যেরূপ হয়, সেইরূপ উৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ, তা বেশ করেছ; আমি যে তোমাদের জন্য এতদিন হেথায় বসে আছি।" তারপর নাগ মহাশয়কে নিকটে বসাইয়া বলেন, "ভয় কি? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা।" সেই দিনও ঠাকুরের আদেশে তাঁহারা পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুরের সহিত মিলন হইলে নাগ মহাশয়ের সেবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবারই জন্য যেন তিনি তাঁহাকে দিয়া পর পর তামাক সাজা, গামছা ও বটুয়া আনা, জলের গাড়ু আনা, জল ভর্তি করা ইত্যাদি কাজ করাইতে লাগিলেন। নাগ মহাশয়ের সেদিন আনন্দের অবধি নাই, শুধু ক্ষোভ রহিল, ঠাকুর পদধূলি দেন নাই। ঠাকুরও

উপযুক্ত ভক্ত পাইয়া সোল্লাসে সুরেশবাবুকে বলিলেন, "দেখছ, এ লোকটা যেন আগুন—জ্বলন্ত আগুন!"

তৃতীয় বারে নাগ মহাশয় একাই দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সেদিন ভাবাবস্থ ঠাকুর অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নাগ মহাশয়কে বলিলেন, "ওগো, তুমি না ডাক্তারি কর—দেখ দিকি, আমার পায়ে কি হয়েছে।" ডাক্তার নাগ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কৈ, কোথাও তো কিছু দেখছি না।" ঠাকুর বলিলেন, "ভাল করে দেখ না, কি হয়েছে।" ভাল করিয়া দেখার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু সাধ মিটাইয়া চরণধূলি লইবার আকাঙ্ক্ষা ভক্ত নাগ মহাশয়ের ছিল। তিনি তাহাই পূর্ণ করিলেন। এখন হইতে তিনি জানিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান। অতএব সেই দিনই পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীঅঙ্গ দেখাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এটা কি বোধ হয়?" নাগ মহাশয় বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "ঠাকুর আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি, আপনি সেই।" ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার বক্ষে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। সহসা নাগ মহাশয় অন্য এক অনুভূতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সর্বত্র এক দিব্য জ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিতেছে।

এইরূপে যাতায়াত চলিতে লাগিল। এক দারুণ গ্রীষ্মকালে নাগ মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বিপ্রহরে আহারান্তে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। নাগ মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার হস্তে পাখাখানি দিয়া ঠাকুর নিদ্রিত হইলেন। এদিকে বাতাস করিতে করিতে নাগ মহাশয়ের হাত ব্যথা করিতে থাকিলেও পাখা থামিল না; কারণ উহাতে ঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে; আর আদেশ না পাইলে থামেনই বা কিরূপে? ক্রমে ব্যথা এতই অধিক হইল যে, হাত আর

চলে না। ঠিক সেই সময়ে অন্তর্যামী ঠাকুর হাত ধরিয়া বাতাস বন্ধ করিলেন।

আর একদিন নাগ মহাশয় ঠাকুরের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্" ইত্যাদি শঙ্করাচার্য-বিরচিত স্তোত্রটি আবৃত্তি করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ তথায় প্রবেশ করিলেন। সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ—একদিকে শরণাগত ভক্ত, অপর দিকে বিচারপরায়ণ অদ্বৈতবাদী ; আর মধ্যে সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ! ঠাকুর নাগ মহাশয়কে দেখাইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "এরই ঠিক ঠিক দীনতা—একটুও ভান নাই।" নরেন্দ্র বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইলেন, "আপনি যখন বলছেন, তা হবে।" উভয়ের আলাপ আরম্ভ হইল। ভক্ত বলেন "তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাও নড়ে না।" জ্ঞানী বলেন, "আমি তিনি-টিনি বুঝি না। আমিই প্রত্যক্ষ আত্মা—আমার ইচ্ছায় এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে।" বিচারের-আর শেষ নাই। অবশেষে যবনিকাপাতচ্ছলে ঠাকুর সহাস্যে নাগ মহাশয়কে বলিলেন, "কি জান, ও খাপ-খোলা তলোয়ার, ওর ও কথা শোভা পায় ; নরেন ও কথা বলতে পারে।" অমনি নাগ মহাশয়ের ধারণা হইল, ঠাকুরের লীলাসহায়করূপে জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেব নরেন্দ্ররূপে অবতীর্ণ—নরেন্দ্র মানুষ নহেন। অতএব শিবাবতার নরেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে উপনীত নাগ মহাশয় একদিন শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল—এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন।···এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে—তাহলে কি ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?" তখনি নাগ মহাশয়ের সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল ; তিনি গৃহে ফিরিয়াই ঔষধের বাক্স, চিকিৎসার পুস্তকাদি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া সংসারের একটি পাশ হইতে চিরতরে

মুক্ত হইলেন। বাকী রহিল স্বেচ্ছায় বৃত পিতার কুতের কার্য। উহাতে তাঁহাকে অধিক শ্রম করিতে হইত না; তবে কার্যোপলক্ষে খিদিরপুর বা বাগবাজারের খালে উপস্থিত থাকিতে হইত। যেদিন বাগবাজারে যাইতেন, সেদিন যতক্ষণ কার্যক্ষেত্রে থাকা একান্ত আবশ্যক ততোধিক এক মুহূর্তও না থাকিয়া খালের অপর পারে নির্জন বনে জপে বসিয়া কাল কাটাইতেন। অন্যদিন স্বগৃহে একটা গঙ্গাজলের জালার পার্শ্বে জপ চলিত।

নাগ মহাশয়ের অন্তরে তখন ত্যাগের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলেও ঠাকুরের আদেশ ভিন্ন উহার বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "তুমি জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকবে; তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।" সুতরাং নাগ মহাশয় ঠাকুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মনকে আসক্ত করিয়াই বা রাখিবেন কিরূপে? আসক্তি তো ধর্মপথের অন্তরায়! সহধর্মিণী দূরে অবস্থিত থাকায় একটি অন্তরায় আপাততঃ নাই। কিন্তু অর্থ? ভাবিয়া স্থির করিলেন—কুতের কার্যও ত্যাগ করিবেন। রণজিৎ হাজরা নামে এক ধর্মভীরু ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ কাজে সাহায্য করিত। এখন রণজিৎকে ঐ কাজ বুঝাইয়া দিয়া তিনি অর্থোপার্জনে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইলেন—এখন তাঁহার অবলম্বন রহিলেন শুধু ভগবান। পালবাবুরা সব শুনিলেন, নাগ মহাশয়কে বুঝাইতেও চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সব বিফল হইল। তথাপি একটি ধার্মিক পরিবারের অচিরে অন্নকষ্টে পতিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা রণজিৎকে ডাকাইয়া ব্যবস্থা করাইলেন যে, লাভের অর্ধাংশ নাগ মহাশয়কে দিতে হইবে। রণজিৎ নাগ মহাশয়ের প্রকৃতি জানিত বলিয়া তাঁহার প্রাপ্য অংশের অর্ধেক মাত্র তাঁহাকে দিয়া বাকী অর্থ দেওভোগে দীনদয়ালকে পাঠাইয়া দিত।

উক্ত ঘটনার পূর্বে নাগ মহাশয় একবার যখন দেশে গিয়াছিলেন তখন দীনদয়াল একদিকে যেমন পুত্রের উদাস ভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, অপরদিকে পুত্রও তেমনি পিতাকে কেবলমাত্র ভগবানের স্মরণ-মনন লইয়া থাকিতেই বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব লীলা! একটি লাউগাছের নিকটে একটি গাভী বাঁধা আছে এবং সে বহু চেষ্টা করিয়াও গাছটী খাইতে পারিতেছে না দেখিয়া পুত্র গাভীটিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "খাও মা, খাও।" গাভী সাধ মিটাইয়া গাছটি নিঃশেষ করিল। দেখিয়া পিতা বলিলেন, "সংসারের যাতে হিত হয়, সে রকম করা দূরে থাক—এরকম অনিষ্ট করা কেন? ডাক্তারি ছাড়লি, এখন কি খেয়ে, কি করে দিন কাটাবি?" পুত্র উত্তর দিলেন, "যা হয় ভগবান করবেন।" অমনি পিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হাঁ, তা জানি। এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি, আর ব্যাঙ্ খেয়ে থাকবি।" পুত্র কোনও উত্তর না দিয়া পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং উঠান হইতে একটি মৃত ব্যাঙ্ লইয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, "এখন আপনার দুই আদেশই পালিত হ'ল। ···অতঃপর আপনার পায়ে ধরে বলছি—এ বয়সে আর সংসারচিন্তা করবেন না, বসে বসে ইষ্টনাম জপ করুন।"

দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে ছিন্নপাশ নাগ মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। পাছে ঠাকুরের বিদ্বান বুদ্ধিমান ভক্তদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় মূর্খের উপস্থিতি অশোভন হয়, এই চিন্তায় বিনয়ের অবতার তিনি পূর্বে ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন না। এখন সেই সব দিনেও যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলের সহিত পরিচয় হইতে লাগিল। এদিকে তপস্যাও উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে লাগিল। চরণ হইতে পাদুকা অপসারিত হইল; গাত্রাবরণ রহিল মাত্র একখানি ভাগলপুরী খেশ। আহার দিনান্তে গ্রাস দুই অন্নে পর্যবসিত হইল।

খাদ্যের সহিত লবণ বা মিষ্ট থাকিত না; কারণ তিনি বলিতেন, "তাতে জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।" তাঁহার অর্ধেক বাটীর ভাড়া লইয়াছিল মেদিনীপুরের কৃত্তিবাস-নামক একজন চাউলের ব্যবসায়ী। তাহার ঘরে অনেক কুঁড়া পড়িয়া থাকিত। নাগ মহাশয় স্থির করিলেন, এই অযত্নলব্ধ কুঁড়া খাইয়াই জীবনধারণ করিবেন। গঙ্গাজলে উহা ভিজাইয়া অন্য কোন উপকরণ ব্যতিরেকে দুই দিন গলাধঃকরণ করার পরে কৃত্তিবাস সব জানিতে পারিল। ইহার পরে অপরাধ হওয়ার ভয়ে সে আর গৃহে কুঁড়া জমাইয়া রাখিত না। সে সাধুপ্রকৃতির লোক ছিল; তাই নিঃসম্বল নাগ মহাশয়ের নিকট ভিখারী আসিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিলে অকাতরে ভিক্ষা দিত। তবে সাধারণতঃ তাহার প্রয়োজন হইত না; কারণ নিজের আহারের জন্য রক্ষিত শেষ তণ্ডুলমুষ্টি পর্যন্ত ভিখারীর হস্তে তুলিয়া দিতে নাগ মহাশয় কুণ্ঠিত ছিলেন না। বাহ্য সংযমবিষয়ে শিরঃপীড়াও তাঁহার সহায়ক হইয়াছিল। ঐ পীড়ার জন্য তাঁহাকে বাকী জীবন স্নান বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং ইহার ফলে শরীর অতি রুক্ষ দেখাইত। 'জিহ্বার সুখেচ্ছা' হইবে মনে করিয়া তিনি কোন ভাল আহার গ্রহণ করিতেন না; কিন্তু প্রসাদ সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার ছিল না। প্রসাদ বলিয়া কেহ কিছু হস্তে দিলে তিনি উহা নির্বিচারে গ্রহণ করিতেন। তবে দ্রষ্টব্য ছিল এই যে, সন্দেশাদি যেমন উদরস্থ হইত, তেমনি তৎসহ প্রসাদের পাতাখানিও উদরে চলিয়া যাইত। এইজন্য কেহ তাঁহাকে পাতায় করিয়া প্রসাদ দিতেন না; অথবা লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে প্রসাদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতাটা কাড়িয়া লইতে পারেন।

বিষয়প্রসঙ্গ তাঁহাকে পীড়া দিত। কেহ ঐরূপ কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, "জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুরের নাম করুন, মায়ের নাম করুন।" তাঁহার মুখে কাহারও নিন্দা শোনা যাইত না। ভুলক্রমে তাঁহার মুখ দিয়া একবার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা নির্গত হওয়ায় শাস্তিস্বরূপে

তিনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া স্বীয় মস্তকে এরূপ আঘাত করেন যে, মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে এবং ঘা শুকাইতে দীর্ঘকাল লাগে। মনেও ঐরূপ চিন্তা আসিলে তিনি অনুরূপ প্রতিকার করিতেন। একবার রিপুজয়ের জন্য কয়েক দিন নিরম্বু উপবাসান্তে রন্ধন করিতেছেন, এমন সময়ে সুরেশবাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সম্ভবতঃ তখন সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে মনে কোন বিপরীত চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাই নাগ মহাশয় ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং সুরেশবাবুকে বারংবার প্রণাম করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেদিন আর অন্নাহার হইল না। এইরূপে গৃহে থাকিয়াও নাগ মহাশয় অরণ্যবাসী যোগীর ন্যায় সর্ব বিষয়ে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যম-নিয়মাদিতে তিনি তখন সিদ্ধ হইয়াছেন এবং ধ্যানাদিতেও অতি উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছেন। গিরিশবাবু তাই বলিয়াছিলেন ; "অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নাগ মহাশয় তার মাথা ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন—তার আর মাথা তোলবার জো ছিল না।" শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত 'নাহং-নাহং তুঁহু-তুঁহু' সাধনার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভের পর এইরূপে প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল। ক্রমে যখন ঠাকুরের লীলাসমাপনের কাল আগ্রতপ্রায়, তখন তাঁহার রোগযন্ত্রণা দেখিতে, এমন কি স্মরণ করিতেও নাগ মহাশয়ের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইত বলিয়া তিনি কাশীপুরে অধিক যাইতে পারিতেন না। ঠাকুর সম্ভবতঃ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিন যখন তাঁহার দেহে দুর্বিষহ জ্বালা হইতেছিল তখন নাগ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহার শীতল দেহের স্পর্শে নিজের গাত্রদাহ প্রশমিত করিবার মানসে নাগ মহাশয়কে নিকটে ঘেঁসিয়া বসিতে বলিলেন এবং তিনি ঐরূপ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আর একদিন ঠাকুরের মনে কি এক সঙ্কল্প উদিত হইল।

রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসার জন্য নাগ মহাশয়কে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "ওগো, এসেছ? তা বেশ হয়েছে। ডাক্তার-কবিরাজেরা তো হার মেনে গেছে—দেখ দেখি, যদি কিছু উপকার করতে পার।" নাগ মহাশয় ফাঁপরে পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিয়াই তিনি উপায় স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং ইচ্ছাবলে ঠাকুরের রোগ স্বীয় দেহে লইবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে এক সুদৃঢ় সঙ্কল্প, সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব উত্তেজনা, আর মুখে বলিতেছেন, "হাঁ, হাঁ, পারি, আপনার কৃপায় সব পারি; এখনি রোগ সেরে যাবে।" ঠাকুর তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা তুমি পারো, রোগ সারাতে পারো।"

ঠাকুরের মহাসমাধির পাঁচ-সাত দিন পূর্বে তিনি ঠাকুরকে দেখিতে গিয়া শুনিলেন যে, মুখ বিস্বাদ হইয়া যাওয়ায় তিনি আমলকী খুঁজিতেছেন। তখন আমলকীর সময় নহে; কিন্তু নাগ মহাশয় জানিতেন যে, সত্যসঙ্কল্প পুরুষের অভিলাষ ব্যর্থ হয় না—কোথাও না কোথাও আমলকী পাওয়া যাইবেই! তাই আহার ভুলিয়া তিনি উদ্যানে উদ্যানে উহার উন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন এবং তৃতীয় দিবসে দৈবক্রমে উহা পাইয়া সোৎসাহে ঠাকুরের নিকট ফিরিলেন। ঠাকুরও উহা হস্তে লইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং পরে নাগ মহাশয়কে আহার করাইতে বলিলেন। শশী তদনুসারে নীচে অন্ন পরিবেশন করিলেন; কিন্তু সেদিন একাদশী—নাগ মহাশয় অন্ন গ্রহণ না করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি অন্নের পাত্র নিজের নিকট আনাইয়া উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন; অতঃপর নাগ মহাশয়ের আর আপত্তি থাকিতে পারে না; "প্রসাদ! প্রসাদ! মহাপ্রসাদ!" বলিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং উহা গ্রহণ করিলেন!

ঠাকুরের অন্তর্ধানের নিদারুণ শোকে আহার-নিদ্রা, এমন কি শৌচাদিও পরিত্যাগপূর্বক নাগমহাশয় শয্যাগ্রহণ করিলে উহা জানিতে পারিয়া হরি ও গঙ্গাধরের সহিত নরেন্দ্রনাথ তাঁহার বাড়িতে যাইয়া আহারভিক্ষা করিলেন। নাগ মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া রান্না করিয়া তাঁহাদিগকে খাইতে দিলেন; কিন্তু শত অনুরোধেও স্বয়ং না বসিয়া ঠাকুরের প্রিয় সন্তানগণকে ভোজ্য গ্রহণপূর্বক গৃহস্থের কল্যাণসাধনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অগত্যা আহার সমাপন করিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনর্বার পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং জানাইলেন যে, নাগ মহাশয় না খাইলে তাঁহারাও অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবেন। অনেক সাধ্যসাধনার পরে সেদিন তিনি আহার করিয়াছিলেন।

নিজ দেহাদির যত্নে বীতরাগ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ মহাশয় যখনই দেশে যাইতেন, তখনই পিতার সর্বপ্রকার যত্ন লইতেন। দীনদয়াল ক্রমেই অথর্ব হইয়া পড়িতেছিলেন; সুতরাং পুত্র তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্নান-শৌচাদি করাইতেন, পরিপাটীরূপে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং তিনি যেদিন যাহা খাইতে চাহিতেন তাহা আনিয়া দিতেন। একদিন তিনি অপরের মুখে শুনিলেন যে, পিতা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "দুর্গাচরণ তো উপার্জন করল না, নতুবা আমরাও শ্রীশ্রীদুর্গামায়ের অর্চনা করতে পারতাম।" তদবধি নাগ মহাশয় প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা ইত্যাদির আয়োজন করিতেন। একবার অর্ধোদয়যোগের সময় তিনি কলিকাতা হইতে দেশে উপস্থিত হইলে দীনদয়াল আক্ষেপসহকারে বলিলেন, "এ তোমার কিরূপ ধর্ম বুঝি না; কোথায় এই সময় গঙ্গাস্নানের জন্য লোকে ভাগীরথীতীরে যায়, আর তুমি কিনা এখানে এলে! এখনও তিন-চারদিন সময় আছে—আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চল।" নাগ মহাশয় শুধু বলিলেন যে, বিশ্বাস থাকিলে মা গঙ্গা ভক্তের গৃহে উপস্থিত হন। আশ্চর্যের বিষয় এই, যোগের দিন

দ্বিপ্রহরে প্রাঙ্গণের এক কোণ হইতে প্রবলবেগে জল উদ্‌গত হইয়া প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। লোকের কলরবে নাগ মহাশয় গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া উহা দেখিলেন এবং "মা পতিতপাবনী! মা ভাগীরথী!" বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে অঞ্জলি অঞ্জলি জল মস্তকে গ্রহণ করিলেন। পল্লীর লোক তখন "জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে" রবে নাগপ্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া তুলিল। দীনদয়াল সেই পুণ্যসলিলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এই স্রোতোবেগ প্রায় একঘণ্টা ছিল।

অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে যোগশক্তি এইভাবে প্রকটিত হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ নাগ মহাশয় সিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না। পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকের প্রাধান্য—বামাচার ও সিদ্ধাইকে তখন ধর্মের আসন দেওয়া হইয়াছে। নাগ মহাশয় ইহা জানিতেন বলিয়াই সিদ্ধাই-এর নিন্দা ও শ্রদ্ধা ভক্তির প্রশংসা করিতেন। এইজন্য বারদীর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। নাগ মহাশয় এই-সকল সাধকের নিকট কখনও যাইতেন না; কিন্তু একদিন ব্রহ্মচারীর একজন ভক্তের বিশেষ পীড়াপীড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে নাগ মহাশয়ের মনে ক্রোধের উদয় হওয়ায় তিনি শাস্তিবিধানে উদ্যত হইবেন, এমন সময় অকস্মাৎ স্বাভাবিক শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং "হায় ঠাকুর, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কেন আমি সাধুদর্শনে এলাম, কেন আমার মতিভ্রম হ'ল?" বলিয়া আপনাকেই শাস্তিদানব্যপদেশে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। পরে "হা রামকৃষ্ণ, হা রামকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে ছুটিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি এক ব্যক্তির মুখে শুনিলেন যে, ব্রহ্মচারী অভিশাপ দিয়াছেন এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে রক্তবমি করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। ঐরূপ অহিতকামনায় নাগ মহাশয় অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন যে, উহাতে তাঁহার কেশাগ্রেরও

ক্ষতি হইবে না। বস্তুতঃ নাগ মহাশয় ইহার পরেও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন।

নাগ মহাশয় সহজে বিচলিত হইতেন না। কিন্তু ঠাকুরের নিন্দা শুনিলে এই দীনের দীন ব্যক্তিটিও অগ্নিমূর্তি হইতেন। একবার দেওভোগের এক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি নাগগৃহে আসিয়া ঐরূপ নিন্দা করিতে থাকিলে নাগ মহাশয় প্রথমে তাঁহাকে ভদ্রভাবে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সুর ক্রমেই উচ্চ পরদায় উঠিতে থাকিলে অবশেষে তাঁহার পৃষ্ঠে পাদুকাঘাত করিয়া বলিলেন, "বেরোও শালা এখান থেকে, এখানে ব'সে ঠাকুরের নিন্দা!" লোকটি শাসাইয়া গেল যে, সে ইহার প্রতিশোধ লইবে। কার্যতঃ সে ঐরূপ না করিয়া নিজের ভুল বুঝিয়া কয়েকদিন পরে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি জল হইয়া গেলেন। গিরিশবাবু ঘটনাটি শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি তো জুতো পরেন না, তবে জুতো পেলেন কোথায়?" নাগ মহাশয় উত্তর দিলেন, "কেন, তারই জুতো নিয়ে তাকে মারলুম।" ঠাকুরের মঠের নিন্দাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার নৌকাযোগে বেলুড়ের সন্নিকটে আসিয়া তিনি মঠের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে থাকিলে আরোহী এক ব্যক্তি অকথ্যভাবে মঠের নিন্দা আরম্ভ করিল। তিনিও অমনি অগ্নিশর্মা হইয়া তাহার সম্মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঘুরাইয়া দৃঢ়স্বরে জানাইয়া দিলেন যে, ভোগে লিপ্ত সামান্য গৃহীর পক্ষে না জানিয়া এইভাবে সাধুনিন্দা করা অতি গর্হিত! অবস্থা দেখিয়া সেই আরোহী সেখানেই নৌকা থামাইয়া নামিয়া পড়িল।

ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আসে। নাগ মহাশয়ের নিকট তখন বহু গণ্যমান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আসিতেন; কিন্তু নিরভিমান নাগ মহাশয় কখনও গুরুর আসন গ্রহণ না করিয়া সদ্গৃহস্থের ন্যায় অতিথিসেবায় ব্যস্ত হইতেন। অতিথিকে তামাক সাজিয়া দিতেন, দাঁড়াইয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতেন,

বাজার হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী-সংগ্রহান্তে নিজ মস্তকে বহন করিয়া আনিতেন, বর্ষার রাত্রে সবেমাত্র উত্তম ঘরখানি অতিথির জন্য ছাড়িয়া দিয়া সস্ত্রীক অন্য সচ্ছিদ্র চালাঘরে বসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল বিষয়ে তিনি অতিথিদের নিষেধ বা অনুনয়-বিনয়ে কর্ণপাত করিতেন না। দরিদ্রের সংসার—অথচ কোন অতিথি অভুক্ত ফিরিতে পারিতেন না। নাগ মহাশয় শূলবেদনায় এত ভুগিতেন যে, অনেক সময় চলা-ফিরা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। একদিন অতিথিদের জন্য বাজার হইতে চালের মোট মাথায় বহিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় শূলব্যথা আরম্ভ হওয়ায় তিনি চলিতে অক্ষম হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায় হায়! রামকৃষ্ণদেব কি করলেন! গৃহে অতিথি উপস্থিত। তাঁদের সেবায় বিলম্ব হ'ল।" পরে বেদনা প্রশমিত হইলে গৃহে আসিয়া অতিথিদিগের নিকট এই সেবাপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। বর্ষার এক দারুণ দুর্যোগে চারিদিক জলে প্লাবিত; এমন সময়ে ট্রেন হইতে নারায়ণগঞ্জে অবতরণান্তে দেওভোগে যাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একটি ভক্ত সন্তরণক্রমে রাত্রি নয়টায় নাগ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নাগ মহাশয় ভক্তটিকে এই বিষয়ে সস্নেহ মৃদু ভর্ৎসনা করিলেও অবিলম্বে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন। সচ্ছিদ্র রন্ধনশালায় ব্যবহারোপযোগী শুষ্ক কাষ্ঠ না পাইয়া অগত্যা গৃহের একটি খুঁটি কাটিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করাইলেন—সহধর্মিণী এবং অতিথির নিষেধসত্ত্বেও তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সত্যপরায়ণ নাগ মহাশয় অপরকেও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দোকানী যে দর বলিত, নির্বিবাদে সেই দরেই জিনিস কিনিতেন। বাকী প্রাপ্য কাহারও নিকট চাহিতেন না। কেহ ভাবিত, ইনি পাগল; সুতরাং পয়সা ফিরাইয়া দিবার প্রয়োজনও বোধ করিত না। কেহ ভাবিত, ইনি সাধু; কাজেই সে যে শুধু বাকী পয়সা

ফিরাইয়া দিত তাহাই নহে, তাঁহাকে প্রত্যেক জিনিস কম মূল্যে দিত। নাগ মহাশয় কিন্তু সাবধান করিয়া দিতেন, "অন্যকে যা দেন আমাকেও তাই দেবেন, বেশী দেবেন না।"•

এইরূপ অমিত ব্যয়ের ফলে নাগ মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বন্ধুরা তাঁহাকে ঋণের বিষয় স্মরণ করাইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, "না মেলে, নাই বা খাব; তবু গৃহস্থের ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া আদর্শ গৃহীর জীবনযাপন করিতে বলিয়াছিলেন; সুতরাং অন্যথা করার শক্তি তাঁহার ছিল না; এমন কি বলরামবাবু একবার তাঁহাকে পুরীধামে লইয়া যাইবার জন্য জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর গৃহে থাকতে বলে গেছেন; তাঁর বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করতে আমার সাধ্য নাই।" এই আদর্শ গৃহীর ঋণ শোধ করিতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অগ্রসর হইলে নাগ মহাশয় জানাইয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসীর অর্থ গ্রহণ করিতে অপারগ।

তিনি অপরের সেবাগ্রহণেও পরাঙ্মুখ ছিলেন; এমন কি, জীর্ণ গৃহের সংস্কারাদির জন্য নিযুক্ত শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দিতেন না—করিতে গেলে ব্যথিত হইতেন। একবার তাঁহার পত্নী একজন ঘরামীকে ঐরূপ কার্যে নিযুক্ত করিলে নাগ মহাশয় কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় ঠাকুর! তুমি কেন আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে রাখলে? আমার সুখের জন্য অপরে খাটবে—এও আমাকে দেখতে হ'ল!" অবস্থা দেখিয়া ঘরামী চালা হইতে নামিয়া আসিলে নাগ মহাশয় তাহাকে তামাক সাজাইয়া খাওয়াইলেন এবং পূর্ণ মজুরি দিয়া বাড়ি পাঠাইলেন। এই অবস্থায় হয় ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতে হইত, নতুবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঐসব কাজ করাইতে হইত। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নৌকায় উঠিয়া নিজে নৌকা চালাইতেন, মাঝিকে লগি ধরিতে দিতেন না। ধর্মভীরু মাঝিও

সাধুকে পরিশ্রম করিতে দিয়া পাপ অর্জন করা অপেক্ষা তাঁহাকে নৌকায় না তোলাই শ্রেয়ঃ মনে করিত। বস্তুতঃ এই অদ্ভুত সাধুর জীবনে অহর্নিশ এইরূপ জটিল সমস্যা লাগিয়াই থাকিত।

অহিংসায় তিনি এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, পক্ষীরা নিঃসংশয়ে তাঁহার হস্তে বসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিত। একবার প্রাঙ্গণে অকস্মাৎ একটি গোক্ষুর সর্পের আবির্ভাব হইলে নাগগৃহিণী উহাকে মারিয়া ফেলাই স্থির করিলেন; কিন্তু নাগ মহাশয় তুড়ি দিতে দিতে যেন সর্পটিকে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সর্পও নির্বিবাদে ঐ শব্দ অনুসরণ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। একটি বাঁশের বেড়াতে উই লাগিয়াছে দেখিয়া জনৈক ভক্ত উহা সজোরে নাড়িয়া বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। অমনি ব্যথিত নাগ মহাশয় সজলনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, কি করলেন!" তারপর উইগুলিকে বলিলেন, "আপনারা আবার বাসা প্রস্তুত করুন।" বলাবাহুল্য, বেড়াটি শীঘ্রই বল্মীকস্তূপে পরিণত হইয়া আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িল—তথাপি আর কাহাকেও তিনি উহাতে হাত দিতে দিলেন না। মশা, মাছি, ছারপোকা মারা তো দূরের কথা, পাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে ক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবের মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি সশঙ্ক থাকিতেন এবং পথ চলিতে সাবধান হইতেন যাহাতে কোন কীট-পতঙ্গাদিকে মাড়াইয়া না ফেলেন। একবার পাখি মারিবার জন্য সাহেবরা দেওভোগে আসিলে তিনি প্রথমে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বারংবার নিষেধসত্ত্বেও তাঁহারা বন্দুক উঠাইলে তিনি অকস্মাৎ উহা অমিতবলে কাড়িয়া লইয়া গেলেন। পরে এক বন্ধুর হাত দিয়া ফেরত পাঠাইলে সাহেবরা কতকটা শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু শাস্তি দিবারও পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না; অধিকন্তু ঐ অঞ্চলে যাওয়াও বন্ধ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর দেশে আসিয়া নাগ মহাশয় পৃথক কুটীর রচনাপূর্বক নির্জনবাসের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহধর্মিণী জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিন কিছু করেন নাই; অতএব পৃথক বাসের আবশ্যকতা নাই। নাগ মহাশয় ভরসা পাইয়া স্বগৃহেই রহিয়া গেলেন। এদিকে দীনদয়াল পিণ্ডলোপের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া গুরুবংশীয় নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা পুত্রকে এ বিষয়ে অনুরোধ করাইলেন। শুনিয়াই নাগ মহাশয় ইষ্টকদ্বারা স্বমস্তকে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "গুরুকুলের সাধক হয়ে আপনি এই অসঙ্গত আদেশ করছেন?" আঘাতের ফলে কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া নবীনচন্দ্র আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। নাগ মহাশয়ের দেহত্যাগের পরে তাঁহার সহধর্মিণী বলিয়াছিলেন, "তাঁর শরীরে কিংবা মনে কখনও কোনরূপ মানবীয় বিকার লক্ষিত হয় নি। ...তিনি অগ্নিমধ্যে বাস করেছেন বটে; কিন্তু দিনেকের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয়নি।" নাগ মহাশয় নিজে এই বিষয়ে কত সাবধান ছিলেন, তাহার আভাস একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। এক প্রৌঢ়া বিধবা প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতে থাকিলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, বিধবার উদ্দেশ্য মন্দ। অমনি সহধর্মিণীকে বলিলেন, "হায় হায়, কাক-কুকুরেরও বোধ হয় এই ছাই হাড়-মাসের খাঁচার মাংস খেতে সাধ হয় না—এতে ওর কেন এমন ভাব হ'ল?" নাগগৃহিণী সেই প্রৌঢ়াকে আর আসিতে নিষেধ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া দীনদয়াল মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা করিতেন। একদিন মাত্রা একটু অধিক হওয়ায় নাগ মহাশয় জানাইলেন যে, স্ত্রীসঙ্গ তিনি কখনও করেন নাই এবং করিবেনও না—কারণ সংসারসুখে তিনি বীতস্পৃহ। বলিতে বলিতে বস্ত্রাদি-উন্মোচনান্তে 'নাহং নাহং'-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলেন। এদিকে সাধ্বী স্ত্রী কাঁদিয়া

আকুল। তখন অপরে প্রবোধ দিয়া সেই বৈরাগীকে আবার গৃহে লইয়া আসিল।

সাধনরাজ্যে যেরূপ, অনুভূতিরাজ্যেও তিনি তেমনি অতি উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। একবৎসর সরস্বতীপূজার দিনে তিনি জনৈক ভক্তকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেবদেবীর ও তাঁহাদের কৃপায় সিদ্ধিলাভের কথা বলিতেছিলেন। শুনিয়া শ্রোতা ভাবিলেন, "ইঁহার অনুভূতি শুধু দেবদেবীর রাজ্যেই সীমাবদ্ধ—উহা সসীমকে ছাড়াইয়া অসীম নির্গুণে উপস্থিত হয় নাই।" ইতোমধ্যে কর্মব্যপদেশে নাগ মহাশয় বাহিরে গেলেন। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিও তাঁহার অন্বেষণে বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, নাগ মহাশয় রন্ধনগৃহের পশ্চাতে আম্রবৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে বলিতেছেন, "মা কি আমার এই খড়-মাটিতে আবদ্ধ? তিনি যে অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী—মা যে আমার মহাবিদ্যাস্বরূপিণী" বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। প্রায় অর্ধঘন্টা পরে সেই সমাধিভঙ্গ হইল। সন্দেহমুক্ত ভক্তের মুখে সমস্ত শুনিয়া নাগগৃহিণী বলিলেন, "বাবা, তুমি তো তাঁর এই অবস্থা আজ নূতন দেখলে। এক একদিন দুই-তিন প্রহরেও তাঁর চেতনা হয় না।"

নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে আলমবাজার মঠে যাইয়া সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইতেন। একবার বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উদ্যানে যাইয়া তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণদর্শন করেন। স্বামী প্রেমানন্দ সেই দিন বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পমান তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া মাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়া গেলে মা তাঁহার আনীত সন্দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাই ফিরিবার পথে নাগ মহাশয় ভাবের ঘোরে বারংবার বলিয়াছিলেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের

চেয়ে মা দয়াল!” ঠাকুরের মহাসমাধির পরেও দক্ষিণেশ্বরে তিনি যাইতেন; কিন্তু ঠাকুরের কক্ষে একবার মাত্র প্রবেশের পরে পূর্বস্মৃতি ও দারুণ বিরহে এরূপ মুহ্যমান হইয়াছিলেন যে, আর ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না—দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। কাশীপুরের যে উদ্যানবাটীতে ঠাকুর লীলাসংবরণ করেন, উহার দর্শনেও অনুরূপ ভাবান্তর হওয়ায় আর তিনি সে পথে চলিতেন না। গিরিশবাবু তাঁহাকে একখানি কম্বল দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তের এই দানকে সাধারণভাবে ব্যবহার করিয়া অবহেলা প্রদর্শন করা অপেক্ষা স্বীয় মস্তকে ধারণ করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রদত্ত একখানি বস্ত্রও ঐরূপে তাঁহার শিরোভূষণ হইয়াছিল। একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বস্ত্র ও মিষ্টান্ন লইয়া যাইবার কালে বাগবাজারে শূলবেদনা আরম্ভ হওয়ায় তিনি এক রোয়াকে পড়িয়া প্রায় দুই ঘন্টা ‘হায় হায়’ করিয়াছিলেন; তথাপি মায়ের দ্রব্য মাকে না দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। সেই দিন গৃহে ফিরিতে রাত্রি নয়টা বাজিয়াছিল।

নাগ মহাশয় যেমন ছিলেন ভক্ত, তেমনি ছিলেন সেবাপরায়ণ। কলিকাতায় প্লেগের সময় পাল বাবুরা বাটীর ভার তাঁহার উপর দিয়া দেশে চলিয়া গেলে নাগ মহাশয় একজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন ব্রাহ্মণ মুহুরী ও একটি চাকরের সহিত ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণ মুহুরীটির প্লেগ হইলে নাগ মহাশয় তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিলেন; মৃত্যুর পূর্বে ব্রাহ্মণ গঙ্গাযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লোকাভাববশতঃ একাই তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার ৺গঙ্গাপ্রাপ্তির পর নিজেই সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় পঁচিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, “ইনি বদ্ধ পাগল।” পরবর্তী ঘটনাও তাঁহার এই বাতুলত্বেরই প্রমাণ দিবে।

পালবাবুরা একবার তাঁহাকে ভোজেশ্বরে লইয়া যান এবং ফিরিবার সময় স্টীমারভাড়া ইত্যাদি বাবদ আট টাকা ও একখানি কম্বল দেন। স্টেশনে টিকিট কিনিবার সময় নাগ মহাশয়ের নিকট তিন-চারিটি শিশু সন্তান লইয়া এক ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া সেই আটটি টাকা ও কম্বল তাহাদিগকে দিয়া পদব্রজে কলিকাতায় চলিলেন—তাঁহার সম্বল ছিল সাড়ে সাত আনা পয়সা। নদীগুলি তিনি সম্ভবস্থলে নৌকায় পার হইতেন, অন্যত্র সন্তরণক্রমে উত্তীর্ণ হইতেন; দেবালয় পাইলে প্রসাদ খাইতেন, নতুবা মুড়িমুড়কি। এইরূপে উনত্রিশ দিনে তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। আর একবার অনেক দিন অর্ধাশনে কাটাইয়া কুতের কার্যে খিদিরপুরে সারা দিনের পরিশ্রমান্তে যে তের আনা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা গড়ের মাঠে এক ব্যক্তিকে দিয়া তিনি রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

গৃহস্থের চরম পরীক্ষা হয় বিপদের সময়। একবার চৈত্রমাসে পাশের বাড়িতে আগুন লাগিয়া আগুনের ফিনকি নাগভবনের চালে পড়িতে থাকিলে প্রতিবেশীরা উহার রক্ষায় তৎপর হইলেন এবং নাগগৃহিণী ভীত হইয়া শশব্যস্তে কাঁথা, কাপড় ইত্যাদি বাহির করিতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় তখন 'জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর' রবে বাটীর প্রাঙ্গণে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এখনও অবিশ্বাস! ব্রহ্মা আজ বাড়ির নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; কোথায় এখন তাঁহার পূজা করিবে, না সামান্য কাঁথা-কাপড় লইয়া ব্যস্ত হইলে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" দৈবক্রমে অগ্নিদেব পার্শ্বের গৃহ ভস্মসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন—নাগগৃহের তৃণখণ্ডও স্পর্শ করিলেন না।

সাধু হিসাবে নাগ মহাশয়ের নাম দিকে দিকে ছড়াইলেও অভিমান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। গৃহে কীর্তনকালে তিনি যুক্তকরে এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কিংবা তামাক সাজিয়া সকলকে

খাওয়াইতেন। গিরিশবাবুর বাটীতে আসিলে অপরের সহিত সমান আসনে না বসিয়া মেজেতে বসিতেন। একবার স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ঠাকুরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেহ নিজেকে দীনহীন ভাবিলে দীনহীনই হইয়া যায়, সুতরাং নাগমহাশয়ের ঐরূপ ভাবা অনুচিত। ইহার উত্তরে নাগ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কীট যদি আপনাকে কীট ভাবে তবে যেমন সত্যের অমর্যাদা হয় না, তেমনি তিনি নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিলে সত্যের অপলাপ হয় না, কাজেই দোষস্পর্শও হয় না। মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন, "নরেনকে ও নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন, সে তত বড় হয়ে যায়—মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হ'ল যে, মায়া হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। নাগ মহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যত বাঁধেন, নাগ মহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।" নাগ মহাশয়ের কৃপায় অনেকে আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। কেহ গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি "আমি শূদ্দুর-ক্ষুদ্দুর, আমি কি জানি?"—এই বলিয়া মাথা খুঁড়িতেন; আর বলিতেন, "আমাকে আপনারা পদধূলি দিয়ে পবিত্র করতে এসেছেন। ঠাকুরের কৃপায় আপনাদের দর্শন পেলাম!"

দীনদয়ালের শেষসময়ে নাগ মহাশয় দেওভোগেই ছিলেন। পুত্রের ঐকান্তিক যত্নে শেষ জীবনে তাঁহার মন হইতে সাংসারাসক্তি নিবৃত্ত হইয়াছিল—তিনি সন্ধ্যাপূজা লইয়া থাকিতেন এবং তুলসীর মালা জপ করিতেন। অশীতিবর্ষ বয়সে তিনি সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করেন। পিতার সমুচিত ঔর্দ্ধদেহিক কার্য করিতে নাগ মহাশয়কে আগ্রহান্বিত জানিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা অর্থসংগ্রহ করিতে উদ্যত হইলে তিনি

তাহাদিগকে বিরত করিলেন। প্রত্যুত তিনি স্বয়ং ঋণ করিয়া এবং বসতবাটী বন্ধক রাখিয়া যথোচিতরূপে শেষকৃত্য সমাপন করিলেন এবং অতঃপর গয়াধামে যাইয়াও পিণ্ডপ্রদান করিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সমস্ত ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই।

ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার নিজের যাইবার দিন উপস্থিত হইল। শূলবেদনা ও আমাশয় তাঁহাকে তখন শয্যাশায়ী করিয়াছে; অথচ ঐ অবস্থায় তিনি শীতের রাত্রেও খোলা বারান্দায় শুইয়া থাকিতেন। অসুখ হওয়া অবধি তিনি আর গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করেন নাই। সেবাগ্রহণেও তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শেষ কয়দিন তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও গীতা-উপনিষদাদির পাঠশ্রবণে রত থাকিতেন। অথচ ঐ সময়ে অতিথি আসিলে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই তাঁহাদের সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার উচ্চ ধর্মকথা বা গান শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবের আতিশয্যে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। স্বামী সারদানন্দ তখন কার্যোপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। তিনি প্রায়ই নাগ মহাশয়ের নিকট যাইতেন। একদিন তিনি "শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে", "মজল আমার মনভ্রমরা" ও "গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি" —এই তিনখানি গান গাহিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় উহাতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। একদিন নাগ মহাশয়ের ইচ্ছা হইল ৺রক্ষাকালীর পূজা হয়। প্রতিমা আনা হইলে স্বামী সারদানন্দের পরামর্শে উহা নাগ মহাশয়ের দর্শনের জন্য তাঁহার শিয়রে স্থাপন করা হইল। অমনি তিনি 'মা মা' বলিতে বলিতে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। সেই রাত্রে সেই সমাধিভঙ্গ হইতে দুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে তিনি পঞ্জিকা আনাইয়া জানিলেন যে, ১৩ই পৌষ ১০টার পরে যাত্রার দিন ভাল। ইহা জানিয়া তিনি পঞ্জিকা-পাঠক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি করেন তবে ঐ দিনই মহাযাত্রা করিব।" শুভদিন স্থির করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত

হইলেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে রাত্রি দুইটার সময় তিনি মুদিত চক্ষু খুলিয়া অকস্মাৎ শরৎবাবুকে বলিলেন, "আপনি যে-সকল তীর্থ দেখিয়াছেন, একে একে নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি।" শরৎবাবু একে একে হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম, কাশীধাম ও জগন্নাথক্ষেত্রের নাম করিলেন। নাগ মহাশয়ও ভাবস্থ হইয়া ঐসকল তীর্থের বর্ণনা করিতে লাগিলেন—যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন। অতঃপর ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯) বেলা নয়টার সময় নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল—তাঁহার চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধর কম্পিত, যেন কি উচ্চারণ করিতেছেন। অর্ধঘন্টা পরে দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ ও সর্বশরীর কন্টকিত হইল এবং নয়নকোণে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। ধীরে ধীরে দশটার কয়েক মিনিট পরে প্রাণবায়ু নির্গত হইল—নাগ মহাশয় মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

# বলরাম বসু

শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম বসু জীবনপ্রভাতে হুগলি জেলার আঁটপুর-তড়া হইতে ব্যবসায়ব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন এবং জীবনমধ্যাহ্নে সরকারের পক্ষে হুগলি জেলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। অতঃপর কলিকাতায় বর্তমান শ্যামবাজারে ট্রামডিপো ও তৎপার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণভূমিতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ এবং শ্রীশ্রীকালী ও শিবমন্দির স্থাপনপূর্বক স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। জীবনসায়াহ্নে তিনি দুর্ভিক্ষনিবারণকল্পে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া এবং ব্রাহ্মণপরিপোষণের জন্য ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করিয়া অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ট্রাম-ডিপোর পশ্চিমবর্তী কৃষ্ণরাম বসুর স্ট্রীট আজও তাঁহার গৌরবময় স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে।

কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বৈষ্ণবধর্মবরণান্তে স্বগৃহে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামচাঁদ জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবিগ্রহের নামানুসারে পল্লীর নাম হয় শ্যামবাজার। গুরুপ্রসাদ একদিকে যেমন ভজনশীল ছিলেন, অপরদিকে তেমন ছিলেন মুক্তহস্ত। কিন্তু সহসা কলিকাতার 'ঠাকুর-ব্যাঙ্ক' দেউলিয়া হওয়ায় তাঁহার আমানত চৌদ্দ লক্ষ টাকা কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া গেল। অগত্যা গৃহসম্পত্তি হারাইয়া তিনি শ্রীরামপুর-মাহেশের বাড়িতে শ্রীবিগ্রহসহ আশ্রয় লইলেন। গুরুপ্রসাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনেও লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে একটি 'কুঞ্জ' বা দেবায়তন নির্মাণপূর্বক শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা বর্তমানে 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত।

গুরুপ্রসাদের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দুই সহোদর—বিন্দুমাধব ও রাধামোহন বংশানুক্রমে একান্নভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের আমলে ভাগ্যলক্ষ্মী পুনঃ প্রসন্না

হওয়ায় উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় আবার জমিদারি আরম্ভ হইল এবং কোঠার মৌজায় প্রধান কাছারি-বাড়ি স্থাপিত হইল। বিন্দুমাধবের পুত্র নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। নিমাইচরণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, মধ্যম হরিবল্লভ কটকে উকিল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ অচ্যুতানন্দ কলিকাতায় থাকিতেন।

রাধামোহন বিষয়কর্ম হইতে দূরে থাকিয়া সাধন-ভজনে রত হইলেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রায়শঃ বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে একাকী বাসপূর্বক অনুক্ষণ শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরবিগ্রহের সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন, অবসর সময়ে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতা'দি ভক্তিগ্রন্থ পড়িতেন, অথবা কোন অনুরূপ গ্রন্থের প্রতিলিপি করিতেন; আবার কখনও-বা বৈষ্ণবদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক ভোজন করাইতেন ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১১৯পৃঃ)। কোঠারে থাকা কালেও তাঁহার জীবন ঐভাবেই অতিবাহিত হইত। কুলপ্রথানুসারে তিনি মন্দিরের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া জপ করিতেন এবং জপান্তে ঐ অঙ্গনেই ধ্যানে বসিতেন। রাধামোহনের তিন পুত্র—জগন্নাথ, বলরাম ও সাধুপ্রসাদ এবং দুই কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও হেমলতা।

বলরামের জন্ম হয় ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪২-এর ডিসেম্বর মাস)। বৈষ্ণববংশসম্ভূত বলরাম স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ঠাকুরের নিকট আসিবার পূর্বে ইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাঁচ ঘণ্টা কাল কাটাইতেন। অহিংসাধর্মপালনে তিনি এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীটপতঙ্গাদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। "জমিদারি প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময়ে নির্মম হইয়া নানা হাঙ্গামা না করিলে চলে না দেখিয়া তিনি নিজ বিষয়-সম্পত্তির ভার নিমাইবাবুর উপরে সমর্পণপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রতিমাসে আয়স্বরূপ যাহা পাইতেন, অনেক সময় উহা পর্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসারযাত্রা

নির্বাহ করিতেন। তাঁহার শরীরও ঐসকল কর্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ-রোগে উহা একসময়ে এতদূর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর তাঁহাকে অন্ন ত্যাগপূর্বক যবের মণ্ড ও দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল ৺পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবতাদি শাস্ত্রশ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্যেই তাঁহার তখন দিন কাটিত এবং ঐরূপে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল, সেই-সকলের সহিত সুপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে পাইয়াছিলেন।...

"প্রথমা কন্যার বিবাহদানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ একাদশ বৎসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্য কোনপ্রকারের শান্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু কলিকাতার রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ ৫৭নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবশতঃ পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের পূতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্ষুণ্ণমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোনপ্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ হয় পূর্বে তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।" ('লীলাপ্রসঙ্গ'—দিব্যভাব, ২৮৬-২৯০ পৃঃ)।

বসুজ মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন সম্বন্ধে শ্রীগুরুদাস বর্মণ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' এবং শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে

প্রদত্ত বিবরণের সহিত উদ্ধৃত বিবরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আমরা তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি। কেশবচন্দ্র সেনের সংবাদপত্র হইতেই বলরাম প্রথম জানিতে পারিলেন—দক্ষিণেশ্বরে এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহার মুহুর্মুহুঃ সমাধি হইয়া থাকে এবং যাঁহার শ্রীমুখের বাণীতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ বিমুগ্ধ। ঐ সময়ে বসু মহাশয়দিগের পুরোহিতবংশীয় এক ব্রাহ্মণ কলিকাতায় বাস করিতেন; তাঁহার নাম রামদয়াল। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভে ধন্য ও কৃতার্থ এই ব্রাহ্মণ বলরামকে সবিশেষ লিখিয়া জানাইলে তিনি তাঁহার দর্শনমানসে অবিলম্বে উড়িষ্যা হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। পরদিন যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, তখন মুড়ি খাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া কেশবচন্দ্রও সদলবলে তথায় উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে মুড়ি খাইবার জন্য সকলে মন্দির-প্রাঙ্গণে চলিয়া গেলে ঠাকুর বলরামকে একান্তে পাইয়া প্রেমসিক্তস্বরে কহিলেন, "তোমার কি কথা আছে বল?" বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ভগবান আছেন কি?" উত্তরে ঠাকুর কহিলেন, "তিনি যে শুধু আছেন তাহাই নহে, আপনার ভাবিয়া ডাকিলে তিনি দর্শন দেন। আপনার সন্তান-সন্ততিতে যেমন মমত্ববোধ আছে, তাঁহাকেও সেই রকম ভাবিয়াই ডাকিতে হয়।" বলরাম ইহাতে নূতন আলোক পাইলেন; কারণ আজীবন জপধ্যানাদিতে মগ্ন থাকিলেও আজ পর্যন্ত ঠিক এইভাবে তাঁহার ডাকা হয় নাই। তাই ঠাকুরের মধুর আলাপনে আকৃষ্ট বসুজ মহাশয় এই-সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে ফিরিলেন এবং কোন প্রকারে রাত্রিযাপনান্তে প্রত্যুষে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। সেইদিন ঠাকুর তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিলেও তিনি ধর্মলাভার্থে দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন দেখিয়া অতীব আত্মীয়তা-সহকারে জানাইলেন, "ওগো, মা বলেছেন, তুমি যে আপনার জন; তুমি যে মার একজন রসদদার; তোমার ঘরে

এখানকার অনেক জমা আছে—কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।” বলরামও ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইলেন; অতএব পদধূলিগ্রহণান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে স্থির করিলেন যে, যাহা পাঠাইবেন তাহা স্বয়ং দেখিয়া-শুনিয়াই ক্রয় করিবেন; অধিকন্তু বিচারপূর্বক মনে মনে নিশ্চিত জানিলেন যে, এমন মিষ্ট ব্যবহার ও পুনঃপুনঃ ভাবসমাধি মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে—ফলতঃ শ্রীমহাপ্রভুই প্রেমবিতরণের জন্য এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহা হউক, এবংবিধ চিন্তায় নিমগ্ন বসুজ মহাশয় গৃহে ফিরিলেন এবং স্নানাহারান্তে স্বয়ং ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, ঠাকুর তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। বলরামকে দেখিয়াই তিনি হৃদয়কে সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, “ও হৃদু, এ সেই চৈতন্যদেবের কীর্তনের মানুষ—সেই এদের সব দেখেছিলুম, তোর মনে আছে?” তদবধি অন্তরঙ্গ-সম্বন্ধ প্রকটিত হওয়ায় বলরাম প্রায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন এবং প্রতি মাসে প্রভুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ডালি সাজাইয়া শ্রীচরণে পাঠাইতে লাগিলেন।

“ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শোনা—একসময়ে ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা! আর সেই উন্মাদ তরঙ্গের ভিতর উন্মাদ শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদন আকর্ষণ! সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—উহারই ভিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চির-অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তি-জ্যোতিপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখখানি তাহাদের অন্যতম। বলরামবাবুর যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে উপস্থিত

হন, সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন—এ ব্যক্তি সেই লোক।[১]

"বসুজ মহাশয়ের কোঠারে জমিদারি ও শ্যামচাঁদবিগ্রহের সেবা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্যামসুন্দরের সেবা আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও ৺জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ও সেবাদি আছে।[২] ঠাকুর বলিতেন, বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হ'তে নেমে যায়।' বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরামবাবুর অন্নই (ভাত) তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন, সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্মণ ভক্তদিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে কোনদিন অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্যকথা।

"সাধনকালে ঠাকুর একসময়ে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন, 'মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি—রসেবসে রাখিস।' জগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ (খাদ্যাদি) যোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদদার প্রেরিত হইয়াছে। ...বলরামবাবুকে ঠাকুর তাঁহার রসদদারদিগের অন্যতম বলিয়া কখনও নির্দেশ করিয়াছেন, একথা মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার যেরূপ সেবাধিকার দেখিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা মথুরবাবু ভিন্ন অপর রসদদারদিগের সেবাধিকার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।...বলরামবাবু যেদিন হইতে

---

১। "বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম—না হলে মিছরি এসব দেবে কে?" (ঐ, ২৭৯ পৃঃ)।

২। বর্ত্তমানে এই বিগ্রহ কোঠারে আছেন।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে ঠাকুরের অদর্শনদিন পর্যন্ত ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্যের প্রয়োজন হইত, প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি···

"প্রথম রসদদার মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কলিকাতায় প্রথম শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; দ্বিতীয় দেড় জনের ভিতর শম্ভুবাবু মথুরবাবুর শরীরত্যাগের কিছু পর হইতে কেশবপ্রমুখ কলিকাতার ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার কিছু পূর্ব পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন এবং অর্ধ রসদদার সুরেশবাবু[৩] শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের ছয়-সাত বৎসর পূর্ব হইতে চারি-পাঁচ বৎসর পর পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।···আমাদের প্রসঙ্গোক্ত বলরামবাবু ও যে আমেরিকাবাসিনী মহিলা (মিসেস্ সারা সি বুল) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীকে বেলুড়-মঠস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন, তাঁহারাই কি এই দেড় জন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীজীর অদর্শনে একথা এখন আর কে মীমাংসা করিবে?[৪]

"বলরামবাবুর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর রথের সময় ঠাকুরকে বাটীতে লইয়া আসেন। বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রীটে তাঁহার বাটী, অথবা তাঁহার ভ্রাতা কটকের প্রসিদ্ধ উকিল রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের বাটী। বলরামবাবু তাঁহার ভ্রাতার বাটীতেই থাকিতেন—বাটীর নম্বর ৫৭। এই ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট বাটীতে ঠাকুরের যে

৩। এই গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনী দ্রষ্টব্য।

৪। 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগে (৩২০—৩৩৫ পৃঃ) পাঁচজন রসদদারের উল্লেখ আছে। ইঁহারা সকলেই গৌরবর্ণ। "প্রথম সেজবাবু, তারপর শম্ভু মল্লিক· ·আর তিনজন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই।" সুরেন্দ্র অনেকটা রসদদার বলে মনে হয়।" ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিতে' বলরামকে রসদদার বলা হইয়াছে।

কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িকে ঠাকুর কখন কখন 'মা-কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন, কলিকাতার বসুপাড়ায় এই বাটীকে তাঁহার 'দ্বিতীয় কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা।' কর্তা-গিন্নী হইতে বাটীর ছোট ছোট মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ।···

"পূর্বেই বলিয়াছি, এ বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ছিল; কাজেই রথের সময় রথ-টানাও হইত; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই—বাড়িসাজানো, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এসবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ, বাহির বাটীর দোতলায় চকমিলান বারান্দার চারদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত; একদল কীর্তন আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত—আর ঠাকুর ও তাঁর ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। ···এইরূপে কয়েক ঘন্টা কীর্তনের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন। তারপর অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত এবং ভক্তেরা দুই-চারিজন ব্যতীত যে যার বাটীতে চলিয়া যাইতেন" ('লীলাপ্রসঙ্গ'—গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ২৭৫-২৮২ পৃঃ)।

পরিচয়ের প্রথমাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বলরামের একদিনের মিলনের যে চিত্র 'কথামৃত'-কার অঙ্কিত করিয়াছেন, উহা যেরূপ চিত্তাকর্ষক, বলরামের আচরণও তদ্রূপ মনোমুগ্ধকর। ঐ একটি ঘটনাতেই যেন পাই বলরামের চরিত্রের অনুপম অবদ্যোতনা। ১৮৮২-র অগস্ট মাস।

বিদ্যাসাগরভবনে দীর্ঘসময় ভগবৎ-প্রসঙ্গে কাটাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্য "ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্ত হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি।…শ্রাবণ কৃষ্ণা ষষ্ঠি, তখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।" ফটকের কাছে পৌঁছিলে "সকলে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ—বয়স আন্দাজ ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ; মাথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ী, পরনে কাপড়, মোজা, জামা—চাদর নাই।…পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ" প্রণাম করিলেন। তিনি উঠিলে "ঠাকুর বলিলেন, 'বলরাম! তুমি? এত রাত্রে?' বলরাম (সহাস্যে)—'আমি অনেকক্ষণ এসেছি—এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।' শ্রীরামকৃষ্ণ—'ভিতরে কেন যাও নাই?' বলরাম—'আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন—মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা!' এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।" অতঃপর ঠাকুর মিষ্টভাষে নিরভিমান ও অনুগত ভক্তকে বিদায় দিয়া গাড়িতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, ২১-২২ পৃঃ)।

ইহার পরে আমরা বলরামের আর একবার সাক্ষাৎ পাই ১৮৮২ খ্রীঃ, ২৪শে অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে। ঐদিন 'কথামৃত'-কার যদিও লিখিয়াছেন, "বলরাম নূতন আসিতেছেন," তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার যাতায়াত প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ঐ বৎসরের প্রারম্ভে কিংবা পূর্ব বৎসরের শেষে; ইহা 'কথামৃতে'ই উল্লিখিত আছে (১ম ভাগ, ৬ পৃঃ)। তবে স্বকীয় বিনয়-নম্র স্বভাবশতঃ বলরাম দীর্ঘকাল গমনাগমন করিলেও সাধারণের দৃষ্টির বাহিরেই থাকিতেন। বস্তুতঃ ১৮৮২-র ১১ই মার্চ ঠাকুরকে বলরাম-ভবনে আনন্দোৎসব করিতে দেখিয়া এই কথারই

সমর্থন পাই এবং ঐ দিনই বলরামের আত্মগোপনেরও পরিচয় লাভ করি। ঐ দিন 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন, "এইবার ভক্তেরা বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের ন্যায় বলরাম দাঁড়াইয়া আছেন—দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাড়ির কর্তা" (৫ম ভাগ, ১ পৃঃ)।

"ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্য পূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্বক স্বল্পকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্‌বিচারবান হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি সর্বস্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদনপূর্বক দাসের ন্যায় তাহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গে যতদূর সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণপূর্বক তিনি সর্বদা সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে বলরামের আগ্রহে বহু ব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্য হইয়াছিল।

"বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্মপালনসম্বন্ধীয় মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক উপাসনাকালেও মশকাদিদ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না—মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন ঐরূপ সময়ে সহসা একদিন তাঁহার মনে উদিত হইল, সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম, মশকাদি কীট-পতঙ্গের জীবনরক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে; অতএব দুই-চারটি মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাঁহাতে চিত্ত স্থির

করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম হওয়া দূরে থাকুক, সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, "অহিংসাধর্ম-প্রতিপালনে মনের এতকালের আগ্রহ ঐরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহনির্মুক্ত হইল না। সুতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম।...দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, 'বালিশটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার ব্যাঘাত করে। সেজন্য মারিয়া ফেলিতেছি।' জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত দুই-তিন বৎসরকাল ইঁহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি—দিনে আসিয়াছি, রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায়গ্রহণ করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে তিন-চারি দিন ঐরূপে আসা-যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইঁহাকে এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই। ঐরূপ কেমন করিয়া হইল? তখন নিজ অন্তরেই ঐ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতঃপূর্বে ইঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইঁহার উপর অশ্রদ্ধার উদয় হইত—পরমকারুণিক ঠাকুর সেজন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্বে কথনও করেন নাই" ('লীলাপ্রসঙ্গ'-দিব্যভাব, ২১৭-২২১ পৃঃ)।

"তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। ঐ হইবার তাঁহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথম, তাঁহারা বৈষ্ণবরূপ

বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারে তাঁহাদিগের ধর্মমত যে কতকটা একদেশী ও অতিমাত্রায় বাহ্যাচারনিষ্ঠ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং সকল প্রকার ধর্মমতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসসম্পন্ন, বাহ্যচিহ্নমাত্রধারণে পরাঙ্মুখ ঠাকুরের ভাব তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না—ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কৃপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাব-সম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ধন মান আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্য মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান-অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে। ...ঐ বংশমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া বলরাম ইতরসাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্মলাভের জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতিকেও তথায় লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের অভিমান যে বিষম প্রতিহত হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ কার্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল। ...কালনার ভগবানদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেমের আতিশয্য কীর্তন করিয়া এবং আপনাদিগের বংশগৌরবের কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াও যখন তাঁহারা বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কখন কখন তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না।...উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত আলোচনা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতৃদ্বয় নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ বসুর কর্ণে উত্থাপিত করিতে লাগিলেন।...সুতরাং পাছে হরিবল্লভবাবু তাঁহার উক্ত বাটী খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাইবাবু বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহাকে কোঠারে আহ্বানপূর্বক ঠাকুরের

পুণ্যসঙ্গে বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে তাঁহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।…

"আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাঁহার উভয় ভ্রাতাই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ-বাবু তাঁহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন এই সংবাদও অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। অন্যায় কিছুই করেন নাই বলিয়া…অশেষ চিন্তার পরে তিনি স্থির করিলেন, ভ্রাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইবেন না। ইতোমধ্যে হরিবল্লভবাবুও ( ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ) কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এইরূপে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিজ সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত করিতেন, প্রকাশ্যভাবে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।" ( ঐ, ২৮৬-২৯০ )।

হরিবল্লভবাবু যেদিন কলিকাতায় আসিলেন সেদিন বলরাম নিকটে উপস্থিত হইতেই ঠাকুর তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন, তাঁহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। অতঃপর হরিবল্লভের আগমনবার্তা শুনিয়া কহিলেন, "সে লোক কেমন ? তাহাকে একদিন এখানে আনতে পারো ?" বলরাম জানাইলেন যে, হরিবল্লভবাবু লোক খুব ভাল হইলেও একটু 'কান-পাতলা'—অপরের কথাতেই বলরামের সম্বন্ধে কি-একটা ঠাওরাইয়াছেন ; অতএব তাঁহার কথায় হয়তো আসিবেন না। অগত্যা ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের সাহায্য লইলেন—হরিবল্লভবাবু গিরিশের বাল্যবন্ধু। পরদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে হরিবল্লভ শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে সমাগত

হইলে ঠাকুর তাঁহাকে অতি নিকট আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণপূর্বক সাদরে সুমিষ্টভাবে আপ্যায়িত করিলেন। সেইদিন ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গের পর সুমিষ্ট ভগবৎ-সঙ্গীতশ্রবণে ঠাকুরের সমাধি হইল; উপস্থিত দুই-তিনজন যুবকেরও ভাবান্তর হইল; এমন কি, বিরুদ্ধ ধারণা লইয়া আসিয়া থাকিলেও সেই মর্মস্পর্শী বাণীশ্রবণে এবং সেই দিব্যভাবোজ্জ্বল মূর্তিদর্শনে বিহ্বলহৃদয় শ্রীযুক্ত হরিবল্লভেরও নয়নদ্বয়ে অশ্রু বিগলিত হইতে থাকিল। বস্তুতঃ বিদায়কাল উত্তীর্ণ দেখিয়াও সমস্ত সন্দেহাদি হইতে নির্মুক্ত হরিবল্লভ সন্ধ্যার পরেও কিছুকাল সানন্দে ঠাকুরের স্থানে কাটাইয়া অবশেষে যেন অনিচ্ছাক্রমেই বিদায় লইলেন। বলা বাহুল্য যে, গুণগ্রাহী হরিবল্লভবাবু অতঃপর ঠাকুরের অনুরাগী ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন; এমন কি, ঠাকুরের বারণ সত্ত্বেও তিনি কুলমর্যাদা ও পদগৌরব ভুলিয়া গিয়া বলপূর্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বলরামের এক সমূহ বিপদ কাটিয়া গেল।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ঠাকুরের দেহত্যাগ পর্যন্ত বলরামের গৃহদ্বার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তদের জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকিত। ঠাকুর স্বচ্ছন্দে তাঁহার এই 'কেল্লাতে' যাইতেন এবং তাঁহার শুভাগমন-সংবাদে ভক্তগণও সম্মিলিত হওয়ায় গৃহখানি প্রায়ই আনন্দমুখরিত থাকিত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ঐ বাটীতে আগমনপূর্বক ঠাকুর তথায় একাধিক দিন বাস করিয়াছিলেন ( 'কথামৃত,' ৪।২৩ )। ইহা বলরামের প্রতি কৃপারই নিদর্শন; কারণ সুস্থাবস্থায় তিনি কখনও কলিকাতায় রাত্রিবাস করিতেন না। পরে গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ সময়েও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ডাক্তারের পরামর্শে ভক্তগণ যখন ঠাকুরকে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার উদ্দেশ্যে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিলেন, তখন

ভাগীরথী-তীরে কালীমন্দিরের প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই উহাতে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া পদব্রজে ভক্তবর বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া গেলেন এবং বসু মহাশয়ও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণপূর্বক যতদিন মনোমত বাসস্থান না পাওয়া যায় ততদিন স্বগৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে ঐ সময়ে ঠাকুর সাহ্লাদে ঐ বাটীতে সপ্তাহখানেক বাস করিয়াছিলেন। এই কয়দিন বলরামভবন ভক্তগণের অবিরাম গমনাগমনে আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল এবং সে আনন্দবর্ধনে নিরত ঠাকুরেরও ক্ষণমাত্র বিশ্রাম ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ লীলাস্মৃতিবিজড়িত এই গৃহখানির পবিত্রতা স্মরণ করিয়া 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন—"ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে! কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন —যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন—নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন ব'লে ব্যাকুল! ...মাকে বলেন, '...যদি না আসতে পারে, তা হ'লে মা, আমায় সেখানে লয়ে যাও......।' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে আসেন। ...যখন আসেন, অমনি নিমন্ত্রণ করতে বলরামকে পাঠান—বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ ক'রে এস।' ...এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের খেলা হইয়াছে" (১ম ভাগ, ২২৩ পৃঃ)। স্বামী অদ্ভুতানন্দের মতে এই গৃহে ঠাকুর শতাধিকবার আসিয়াছিলেন। এইরূপে বহুধা পবিত্রীকৃত এই ভবনটি পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে 'বলরাম-মন্দির' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং মহা পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়।

বলরামের উপর ঠাকুরের অপূর্ব ভালবাসা ও বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা ছিল বলিয়াই তিনি একসময়ে নিজ মানসপুত্র রাখালকে স্বাস্থ্যলাভের জন্য

তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন ( সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ )। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সময়েও ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ বসু মহাশয়ের কলিকাতার গৃহে, বৃন্দাবনের 'কুঞ্জে' অথবা পুরীর আবাসে নিঃসঙ্কোচে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে বিভিন্ন সময়ে ঐ তিন স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঠাকুর ও ঠাকুরের জনের নানাভাবে সেবা করিয়াও যেন বলরামের আশা মিটিত না। কিন্তু তাঁহার আয় অধিক ছিল না—নিতান্ত পরিমিত মাসহারার উপর নির্ভর করিতে হইত ; সেজন্য হিসাব করিয়া চলিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে ব্যায়কুণ্ঠ মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা জানিতেন, কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক জানিতেন ভক্তের অনুরাগপূর্ণ হৃদয়। সুতরাং বলরামের কার্পণ্যের কথায় তিনি আমোদমাত্রই করিতেন এবং সে অনাবিল রসিকতায় বলরামের প্রতি তাঁহার প্রীতিই অধিকতর প্রকাশ পাইত—এ যেন আপনার স্নেহপাত্রের দোষগুণ সমস্ত লইয়াই আহ্লাদ প্রকাশমাত্র! দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নরেন্দ্র যখন একদিন ( ১৪ জুলাই, ১৮৮৫ ) বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকর্তৃক গান গাহিতে আদিষ্ট হইয়া বলিলেন, "যন্ত্র নাই, শুধু গান!" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমাদের, বাছা, যেমন অবস্থা! এইতে পার তো গাও! তাতে বলরামের বন্দোবস্ত! বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন।'…খ্যাঁট দিয়েছে—আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে।" এইরূপ কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলে হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তারপর রাম খোল বাজাবে, আর আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নাই ( সকলের হাস্য )। বলরামের ভাব—আপনারা গাও, নাচ, আনন্দ কর!" ( 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৬০ পৃষ্ঠা )। বলরামের এই আপাত-কৃপণতার আর একটা দিকও ছিল—তিনি স্বয়ং কষ্টে বাস করিয়াও সাধুসেবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতেন। তাই লাটু যখন

একদা তাঁহাকে স্বল্পপরিসর শয্যায় শুইতে দেখিয়া প্রশস্ততর বিছানা ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন, তখন বলরাম কহিলেন, "মাটির দেহ মাটিতে মিশবে ; কিন্তু বিছানার পয়সা সাধুসেবায় লাগবে।"

বলরামের আত্মীয়স্বজন অনেকেই ক্রমে ঠাকুরের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু ঐটুকুমাত্র বলিলেই বলরাম-পরিবারের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল না। বলরামের বহু আত্মীয় শুধু ভক্ত ছিলেন না, ঠাকুরের অতি ঘনিষ্ঠ পার্ষদমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বলরামের শ্যালক শ্রীযুক্ত বাবুরামই আমাদের সুপরিচিত স্বামী প্রেমানন্দ ; তিনি ঈশ্বরকোটির অন্তর্ভুক্ত। বলরামের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, তিনি "শ্রীমতীর ( রাধারানীর ) অষ্টসখীর প্রধানা।" ভাবিনী ঠাকুরানীর যত্নেই সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম-ভবনে সেবাদির সুব্যবস্থা হইত। বলরামের ভ্রাতা হরিবল্লভবাবুর সহিত পাঠক পূর্বে পরিচিত হইয়াছেন। পিতা রাধামোহন বসু মহাশয় বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপামুগ্ধ বলরাম ধর্মপ্রাণ পিতাকে এই অমৃতপানে বঞ্চিত রাখা অনুচিত মনে করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বসু মহাশয়ও এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। বলরামের তিনটি সন্তান—ভুবনমোহিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী। প্রথমা কন্যা ভুবনমোহিনী ১৮৯৪-এর শেষভাগে দেহত্যাগ করেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন এবং আজীবন ভক্তসেবার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ এইরূপ একটি সমপ্রাণ ভক্তপরিবার জগতে দুর্লভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহাদের ভক্তিতে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, একবার ভাবিনী ঠাকুরানীর অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় গিয়া রোগিণীকে দেখিয়া আসিতে বলেন। লজ্জাশীলা মাতা-ঠাকুরানী ভাবিলেন যে, কোন যান ব্যতীত যাওয়া অনুচিত হইবে ; কারণ

পল্লীগ্রামে পদব্রজে চলা তাঁহার অভ্যাস থাকিলেও মহানগরীর রাজপথে তিনি ঐরূপে চলিলে ঠাকুরের দুর্নাম হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও যান পাওয়া গেল না। ঠাকুর উহা শুনিয়া একটু যেন বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, "কেন? তুমি হেঁটে যাবে! আমার বলরামের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর তুমি যান গেলে না বলে যাবে না?" যাহা হউক, একখানি পালকি সংগৃহীত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মাতাঠাকুরানী উহাতে করিয়াই বলরাম-মন্দিরে গেলেন। ঠাকুর যখন শ্যামপুকুরে তখনও মাতাঠাকুরানী সেখান হইতে একবার পদব্রজে পীড়িতা ভাবিনী ঠাকুরানীকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের যখন কাশীপুরে যাওয়া স্থির হইল, তখন ব্যয়নির্বাহসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। গোপালচন্দ্র ঘোষের বাড়ির ভাড়া ৮০৲ টাকা, এতদ্ব্যতীত অন্য খরচও প্রচুর—গরীব ভক্তেরা এত টাকা কোথায় পাইবেন? তাই ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে ভাড়ার টাকা দিতে বলিলে তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন। পরে বলরামের দিকে ফিরিয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি চাঁদায় খাওয়া পছন্দ করেন না, অতএব বলরাম যেন খাওয়ার খরচটা দেন। বলরামও মহানন্দে স্বীকৃত হইলেন।

ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ অনেক বিষয়েই বলরামবাবুর উপর নির্ভর করিতেন। চিকিৎসাদিব্যপদেশে বা অন্যান্য কারণে ত্যাগী যুবকগণ প্রায়ই তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেন। বস্তুতঃ সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন মঠের অকৃত্রিম বন্ধু। বরাহনগর মঠের আদিম অবস্থায় বলরামবাবু একদিন মঠে গিয়া দেখিলেন মঠের ভ্রাতারা শুধু শাকভাত খাইতেছেন। অমনি গৃহে ফিরিয়া তিনি গৃহিণীকে বলিলেন যে, তিনিও সেদিন তদ্ভিন্ন কিছু গ্রহণ করিবেন না। গৃহিণী ভাবিলেন অম্বলের পীড়ার জন্য তিনি ঐরূপ করিতেছেন; কিন্তু বসু মহাশয় জানাইলেন যে, মঠের সাধুদের অবস্থা দেখিয়া অন্য ব্যঞ্জনাদিতে তাঁহার আর রুচি নাই। অতঃপর তিনি ঠাকুর-সেবার জন্য প্রত্যহ এক টাকা

দিতেন এবং শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যেন মঠের সব সংবাদ তাঁহাকে দেন। এতদ্ব্যতীত মঠের পাচকের নিকট সংবাদ লইয়াও তিনি সব অভাব দূর করিতেন। তিনি যখন শেষবার শয্যাগ্রহণ করেন, তখন এই-সব কথা স্মরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অবিলম্বে কাশী হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসেন এবং স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? ঠাকুরের অপর বহু ঘনিষ্ঠ পার্ষদের ন্যায় বলরামও অল্প বয়সে দেহত্যাগ করিলেন (১লা বৈশাখ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ : ১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০ খ্রীঃ)।

মাষ্টার মহাশয়

অধরলাল সেন

# মাস্টার মহাশয়

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বপ্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' 'শ্রীম', 'মাস্টার', 'মণি', 'মোহিনীমোহন' বা 'একজন ভক্ত' ইত্যাদি ছদ্ম নাম বা অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আবরণে আপনাকে গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন; কারণ তাঁহার অনুপম কীর্তিসৌরভ আপনা হইতেই সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভকালে তিনি মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামবাজারস্থ শাখার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পণ্টু, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইজন্য তিনি 'মাস্টার' মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন; এমন কি, ঠাকুরও তাঁহাকে কখন মাস্টার বলিয়া অভিহিত করিতেন।

'কথামৃতে'র আদিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত প্রচারপূর্বক মাস্টার মহাশয় সত্যসত্যই শত সহস্র ধর্মপিপাসু ব্যক্তির গৃহপার্শ্বে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করাইয়া সর্বোত্তম ফলদানের অধিকারী হইয়াছেন। পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার সহজ সাবলীল গতি, ভাবের গাম্ভীর্য, স্বল্প কথায় সজীব চিত্রাঙ্কন, সর্বজনীন সাহানুভূতি অসীম উদারতা ও অবাধ অন্তর্দৃষ্টির সুনির্মল দর্পণরূপে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে উচ্চাসন আধিকারপূর্বক লেখককে অমর করিয়াছে। একটি জীবনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইলেও

মাস্টার মহাশয় ইহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্বীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপূর্ণ মৌখিক উপদেশপ্রভাবে শত সহস্র দুর্বল ধর্মপথচারীর সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের উজ্জ্বল আলোক তুলিয়া ধরিয়া এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পৃহা জাগাইয়াছেন। তিনি যখন কথা বলিতেন, তখন অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার গুণে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কয়েকটি বৎসরের চিত্র শ্রোতাদের সম্মুখে সচল হইয়া উঠিত; ঠাকুরের পূত-সঙ্গলাভে ধন্য দিবসগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ চিত্রসমূহ সমুজ্জ্বল হইয়া এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করিত এবং সমাগত ধর্মপিপাসুদিগকে অবলীলাক্রমে সেই সজীব পুরাতন লীলাক্ষেত্রে উপস্থাপনপূর্বক শান্তি ও বিশ্বাসের শুভ্র পুণ্য জ্যোতিতে অবগাহন করাইত। মাস্টার মহাশয় সর্বদাই যেন দক্ষিণেশ্বর ও কামারপুকুরের স্মৃতিরাজ্যে বাস করিতেন এবং বাহিরের যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা সেই রাজ্যেরই কোন ঘটনার চিত্র উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে উহারই সহিত বিজড়িত অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিত। শ্রোতা আসিয়া যে-কোন বিষয়েরই প্রশ্ন করুক না কেন, অমনি উত্তরচ্ছলে তিনি জীবন্ত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের কিয়দংশ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ এই স্বেচ্ছাধৃত ব্রতই উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই (১২৬১ বঙ্গাব্দের ৩১শে আষাঢ়) শুক্রবার নাগপঞ্চমী দিবসে মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীস্থ শিবনারায়ণ দাস লেনের পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা শ্রীমধুসূদন গুপ্ত ১৩।২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের গৃহখানি ক্রয়পূর্বক তথায় চলিয়া আসেন। গৃহখানি অদ্যাবধি বর্তমান এবং ঐ অঞ্চলের 'ঠাকুর বাড়ি' বলিয়া পরিচিত। পিতা মধুসূদন এবং মাতা স্বর্ণময়ী উভয়েই সরলতা, মধুর ব্যবহার ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের

চারিটি পুত্র ও সমসংখ্যক কন্যার.মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। মাতার স্নেহ ও সদ্‌গুণরাশি মহেন্দ্রকে চিরজীবন মাতৃভক্ত করিয়াছিল। মাতার সহিত তাঁহার যে বহু অপূর্ব শৈশবস্মৃতি বিজড়িত ছিল, তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন চারি বৎসরের বালক মহেন্দ্র মাতার সহিত নৌকাযোগে মাহেশের রথদর্শনে যান। প্রত্যাবর্তনকালে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর দর্শনমানসে চাঁদনীর ঘাটে নামিয়া যখন নব-নির্মিত উদ্যান ও মন্দিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কালী-মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত বালক অকস্মাৎ আপনাকে জননী হইতে বিচ্যুত দেখিয়া কাঁদিতে থাকে। অমনি শ্রীমন্দির হইতে নির্গত এক সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলে বালক সুস্থ হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকে। উত্তরকালে মাস্টার মহাশয় এই পুরুষপ্রবর সম্বন্ধে বলিতেন, "হয়তো বা ঠাকুরই হবেন; কারণ তার কিছুদিন (চার বৎসর) আগে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুর তখন মা কালীর পূজকপদে রয়েছেন।" আর একবার পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার সহিত এক সুবৃহৎ ছাদে অবস্থানপূর্বক অসীম নীলাকাশ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে অনন্তের উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। বৃষ্টির সময় মহেন্দ্র নিস্তব্ধ পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিঝুম বারিপাতের মধ্যে অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইতেন। কালীঘাটের ছাগবলি তাঁহাকে ব্যথিত করিত। মাতার সহিত উহা দর্শনান্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে উহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন আসিল, তখন পরিণতবয়স্ক মাস্টার মহাশয়ের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; সুতরাং আর কিছুই করা হয় নাই। স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে কৈশোরেই ফেলিয়া চলিয়া যান। সেদিন মহেন্দ্র অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, জননী সস্নেহে বলিতেছেন, "আমি এযাবৎ তোকে লালন-পালন করেছি, পরেও

তাই করব; তবে তুই দেখতে পাবি না।" জগদম্বা পরে সত্যসত্যই তাঁহার লালনের ভার লইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের জীবনে একটা এক-টানা ধর্মভাব সর্বদাই পরিস্ফুট ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আশ্বিনের ঝড় ( ৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ ) মনে আছে?" তখন মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ! তখন খুব কম বয়েস—নয় দশ বৎসর বয়স—এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকছিলাম।" কোন দেবমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া গমনাগমনকালে তিনি সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিতেন। ৺দুর্গাপূজার সময় দীর্ঘকাল ভক্তিভরে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন। যোগাদি উপলক্ষে অথবা তীর্থযাত্রাব্যপদেশে কলিকাতায় সাধুসমাগম হইলে তিনি তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনাদির জন্য আকুল হইতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সানন্দে বলিতেন যে, এই সাধুসঙ্গ-স্পৃহাই তাঁহাকে এককালে সর্বোত্তম সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আনয়নপূর্বক জীবন সার্থক করিয়াছিল। বিদ্যালয় ও কলেজ পাঠের সময় তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পাঠ্যগ্রন্থেও ধর্মভাবোদ্দীপক অংশগুলি তিনি মনে করিয়া রাখিতেন। 'কুমারসম্ভবে' যেখানে শিবের ধ্যানবর্ণনাচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, গুহাভ্যন্তরে মহাদেব সমাধিমগ্ন, আর গুহাদ্বারে নন্দী বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল জীব ও সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতা বর্জন করিতে আদেশ দিতেছেন—আর সে অলঙ্ঘ্য নির্দেশে বৃক্ষ নিষ্কম্প, ভ্রমর গুঞ্জনহীন, বিহগকুল মূক, পশুবৃন্দ নিশ্চল এবং সমগ্রকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; অথবা 'শকুন্তলা'য় যেখানে কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিংবা 'ভট্টিকাব্যে' যেখানে রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কাবধার্থে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্বক তত্রত্য বৃক্ষলতাদিকে যজ্ঞধূমে কজ্জলবর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছেন—সেই-সব স্থল তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,

"ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি পাগলের মতো ঐ বই পড়তাম।" বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টের সহিত তিনি এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, পরে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইবার জন্য বাইবেলের বাক্য অনর্গল উদ্ধৃত করিতে থাকিতেন। আইন-অধ্যয়নকালে তিনি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতি হইতে হিন্দুদের সমাজনীতির মর্মকথা শিখিয়া লইয়াছিলেন ; তাই পরে বলিতেন, "ওকালতি কর আর নাই কর, আইন পড়ো ; কারণ তাতে ঋষিদের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুন অনেক জানতে পারবে।"

বিদ্যালয়ে বুদ্ধিমত্তার জন্য মহেন্দ্রনাথের সুনাম ছিল। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকারপূর্বক হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পরীক্ষায় তাঁহার স্থান ছিল পঞ্চম। অতঃপর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকারপূর্বক প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজী, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোযোগসহকারে আয়ত্ত করেন। ইংরেজীর অধ্যাপক টনি সাহেবের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কলেজের পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি শ্রীযুক্ত ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নীসম্পর্কীয়া শ্রীমতী নিকুঞ্জদেবীর পাণিগ্রহণ করেন (১৮৭৩)। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশান্তে তাঁহার অধ্যয়ন আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন ; কিন্তু সংসারের আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগপূর্বক সওদাগরি অফিসে চাকরি লইতে হইল। পরে অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী হইয়া তিনি বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের পদ শোভিত করেন কিংবা বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। অনেক সময় একই কালে একাধিক শিক্ষায়তনে কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি পালকিতে যাতায়াত করিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার গাম্ভীর্য, ধর্মভাব ও সহজ অধ্যাপনাপ্রণালীতে আকৃষ্ট হওয়ায় পাঠকালে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য

তাঁহাকে বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হইত না। বস্তুতঃ কার্যে তিনি সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পূর্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া সমাজ-মন্দিরে এবং 'কমল কুটীর' প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর তিনি কেশবের এপ্রকার আকর্ষণ-শক্তির কারণনির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "ওঃ! তাঁকে যে এত ভাল লাগত এবং দেবতা ব'লে মনে হ'ত তার কারণ তিনি তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি তাঁর নাম উল্লেখ না ক'রে প্রচার করছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণেব প্রথম পরিচয় তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও নিজের আত্মীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বিবাহের স্বল্পকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হওয়ায় উহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য মহেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিবস বরাহনগরে ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র কবিরাজের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই বাটীতে অবস্থানকালে তিনি এক সায়াহ্নে (২৬শে ফেব্রুয়ারী) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে রত আছেন। সুন্দর দেবালয়ের পবিত্র আবেষ্টন। সম্মুখে ঠাকুর যেন শুকদেবের ন্যায় ভাগবত বলিতেছেন কিংবা জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া ভগবৎগুণকীর্তন করিতেছেন। ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া চলে না; তথাপি মাস্টার মহাশয়ের কুতূহলী কবিসুলভ মন দেবোদ্যানের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য তাঁহাকে বাহিরে লইয়া চলিল। উদ্যানপর্যবেক্ষণান্তে তিনি পুনর্বার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। অচিরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঠাকুর অন্যমনস্ক

হইতেছেন দেখিয়া মাস্টার ভাবিলেন, "ইনি ঈশ্বরচিন্তা করিবেন" ; অতএব বিদায় লইলেন। গমনকালে ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "আবার এসো।"

দ্বিতীয় দর্শন হইল সকালবেলা আটটায়। ঠাকুর পুনঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসান্তে অবিবাহিত জীবনের প্রশংসা করিতে করিতে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিনা। মাস্টার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ!" অমনি ঠাকুর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওরে রামলাল, যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!" তারপর তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, মাস্টারেব একটি ছেলেও হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া-দর্শনে মাস্টার মহাশয়ের প্রতীতি হইল যে, এযাবৎ যদিও তিনি ধর্মচর্চা ও উপাসনাদি করিয়াছেন, তথাপি আদর্শ ধার্মিকের দৃষ্টিতে তিনি জাগতিক স্তরের অধিক উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। এইরূপে তাঁহার অভিমান প্রতিপদে চূর্ণীকৃত হইতে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ উৎসাহশূন্য না করিয়া যেন সান্ত্বনাচ্ছলেই বলিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল—আমি কপাল চোখ ইত্যাদি দেখলে বুঝতে পারি।" ইহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও মাস্টার মহাশয়কে শীঘ্রই আরও কয়েকটি আঘাতে সম্পূর্ণ অবনত হইতে হইল। ক্যান্ট, হেগেল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত সুপরিচিত মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, মানবজীবনের বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এবং যাহার বিদ্যালাভ হইয়াছে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু আজ সেরূপ শিক্ষাহীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানিলেন, ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। অমনি আবার প্রশ্ন হইল, তিনি সাকারে বিশ্বাসী কিংবা নিরাকারে? মাস্টার বলিলেন, তাঁহার নিরাকার ভাল লাগে। ঠাকুর জানাইলেন যে, নিরাকারে বিশ্বাস থাকা উত্তম বটে, তবে সাকারও সত্য। এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসদ্বয় কিরূপে সত্য হইতে পারে, তাহার নির্ণয়ে অসমর্থ মাস্টার মহাশয়ের অভিমান তৃতীয়বার চূর্ণ হইল

কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না—তিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিরের দেবী মৃন্ময়ী নহেন, চিন্ময়ী! মাস্টার তখনি বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাই যদি সত্য হয় তবে যাঁহারা প্রতিমায় উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের তো বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, বস্তুতঃ মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নহে, প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পূজা করা হয় মাত্র। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেক্‌চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তোমার মাথা-ব্যথা কেন? তোমার নিজের যাতে জ্ঞানভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।" মাস্টারের অভিমানের সৌধ একেবারে ভূমিসাৎ হইল। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম অনুভূতির বস্তু—বুদ্ধি ততদূর অগ্রসর হইতে পারে না; বুদ্ধিরূপ দুর্বল যন্ত্র-সাহায্যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না এবং তাদৃশ তত্ত্বলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী সাধুদের সঙ্গ অত্যাবশ্যক—তদ্ব্যতীত অতি মার্জিত বুদ্ধিও আমাদিগকে ভগবৎসকাশে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ঢালিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।

আরও কিছুদিন বরাহনগরেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার মহাশয় উপর্যুপরি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিয়া অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইলেন এবং ঠাকুরের ও মাস্টারের প্রতি কার্যে ও কথায় ঐ অন্তরঙ্গ সহজ ভাবেরই প্রকাশ হইতে থাকিল। এইরূপে ঐ বৎসর ৫ই মার্চ মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর সকৌতুকে সমবেত বালক ভক্তদিগকে বলিলেন, "ঐরে আবার এসেছে!" বলিয়াই অহিফেনের দ্বারা বশীকৃত একটি ময়ূরের গল্প বলিলেন—ঐ ময়ূরকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আফিম দেওয়া হইত এবং ময়ূরেরও এমনি মৌতাত ধরিয়াছিল যে, সে প্রত্যহ ঠিক সময়ে একই স্থানে উপস্থিত হইত। মাস্টার মহাশয়ের সত্যই তখন মৌতাত ধরিয়াছে!

তিনি গৃহে বসিয়া দক্ষিণেশ্বরের চিন্তা করেন ; দীর্ঘ বিরহ অসহ্য বোধ হইলে ছুটিয়া শ্রীগুরুপদে উপস্থিত হন। একবার বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজে ঘর্মাক্ত-কলেবরে মহেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগত দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এর মধ্যে ( নিজের দেহ দেখাইয়া ) কী একটা আছে যার টানে ইংলিশম্যানরা ( ইংরেজী-শিক্ষিতেরা ) পর্যন্ত ছুটে আসে।" এই টানের কারণ নির্দেশ করিয়া ঠাকুর একদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন ? কলিকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হ'ল না, তোমার হ'ল কেন ? এর কারণ জন্মান্তরের সংস্কার।" আর একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর-বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে—এসব তো আমি জানি !" ( 'কথামৃত', ৪।৯।৪ )। অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম—তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম" ( ঐ, ২।১১।২ )। আরও পরিষ্কার করিয়া একসময়ে কহিলেন, "তোমায় চিনেছি—তোমার 'চৈতন্য-ভাগবত'-পড়া শুনে। তুমি আপনার জন, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র" ( ঐ, ৪।৮।২ )।

এরূপ সংস্কারবান উচ্চাধিকারীকে ঠাকুর উপদেশ ও সাধনা-সহায়ে ক্রমে অনুভূতির ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর স্তরে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের অন্তরের সহিত সুপরিচিত থাকায় তাঁহাকে সদ্গৃহস্থ হইবারই উপদেশ দিতেন এবং তাঁহার মনে কখনও বৈরাগ্য আসিলে সংসারাশ্রমের উত্তম দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবৃত্ত করাইতেন। একদিন তাই জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সব ত্যাগ করিয়ো না, মা। ···সংসারে যদি রাখ, তো এক একবার দেখা দিস—না হলে কেমন করে থাকব ? এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে, মা ?—আচ্ছা, শেষে যা হয় করো।" অপরাপর

দিবসে সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় তাহার উপদেশ দিতেন, "ছেলে হয়েছে বলে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাক। তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।" "আর বাপের সঙ্গে প্রীতি করো। এখন উড়তে শিখে বাপকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম করতে পারবে না? ···মা আর জননী—যিনি জগৎরূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে, তিনিই জননী।" "যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী; ···এমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।" আবার একটু পরেই এইরূপ কঠোর আদেশ শ্রবণে চিন্তাকুল মাস্টারের নিকটে গিয়া তত্ত্বকথা শুনাইলেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে। ···ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।" আর উপদেশ দিয়েছিলেন, "ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।" "ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। ···তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। ···ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে প্রধানতঃ শুদ্ধা ভক্তিরই উপদেশ দিতেন। একদিন বলিলেন, "ছাখ, তুমি যা বিচার করেছ, অনেক হয়েছে—আর না। বল, আর করবে না।" মাস্টার যুক্তকরে বলিলেন; "আজ্ঞে, না।" মাস্টার স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। নৃত্যকালে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "এই শালা, নাচ!" আর তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন সর্বদা ভগবদালাপ

করিতে। একদিন মাস্টার ও নরেন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নৈতিক অবনতির কথা আলোচনা করিতেছেন জানিয়া মাস্টারকে বলিলেন, "এসব কথাবার্তা ভাল নয়—ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়।" এইরূপে সাধুসঙ্গ, নির্জন-বাস এবং ভগবদালাপনের সঙ্গে ব্যাকুলতার প্রয়োজনও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।" এইসব স্থলে ব্যাকুলতার উল্লেখ দেখিয়া এবং পূর্বে বিচার-বিষয়ে নিষেধবাক্য শুনিয়া পাঠক যেন মনে করিবেন না যে, ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে ভাবুকতায় ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের মনে যে বৃথা তর্কপ্রবণতা আসে এবং ভগবৎসম্বন্ধহীন বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মে, মাস্টার মহাশয়কে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখ সফল বিচারে প্রবৃত্ত করাই ছিল ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি, "সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার—কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়…এই পর্যন্ত; ভগবানলাভ হয় না! তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, এর নাম বিচার। বুঝেছ?"

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে যান, নীরবে সব শুনেন ও দেখেন এবং সমস্ত ব্যাপার ও পরিবেশটি স্মৃতিতে মুদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে পূর্বাভ্যাসানুসারে দিনলিপিতে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া রাখেন। এই প্রকারেই যথাকালে 'কথামৃতে'র সৃষ্টি হয়।

মাস্টার মহাশয় প্রথমতঃ নিরাকারেই আসক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে তদনুরূপ উপদেশই দিতেন। একবার মতিশীলের ঝিলে ক্রীড়ারত মৎস্যগুলিকে দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিরাকার ব্রহ্মে ঐরূপে মন নিমগ্ন রহিয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। মাস্টার সেই পথেই চলিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে একদিন (২২শে অক্টোবর, ১৮৮২)

তিনি স্বীকার করিলেন, "আমি দেখছি, প্রথমে নিরাকারে মন স্থির করা সহজ নয়।" ঠাকুর অমনি উত্তর দিলেন, "দেখলে তো? তাহলে সাকার-ধ্যানই কর না কেন?" মাস্টার উহা অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্বক তাঁহারই নির্দেশানুসারে ধ্যানভজনাদি করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও অধিকাধিক হইতে লাগিল; অবসরমত দুই-চারি দিন তিনি সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এইরূপে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় সমগ্র ডিসেম্বর মাসটি তিনি শ্রীগুরুসকাশে যাপন করেন।

এদিকে সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মাস্টার মহাশয়ের ধারণা পরিবর্তিত হইতেছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যে মাস্টাব মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই;" তিনিই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বীকার করিলেন, "আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করছেন —যেমন আইন-অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে;" আর তিনিই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জানাইলেন, "আমার মনে হয় যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক।" ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি করিয়া মাস্টার যখন বলিলেন যে, অবতার যেন একটি বড় ফাঁক, যাহার ভিতর দিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি সে ফাঁকটি কী?" মাস্টার বলিলেন, "সে ফোকর আপনি।" অমনি ঠাকুর তাঁহার গা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, "তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ—বেশ হয়েছে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে অসুস্থ, তখন মাস্টার কামারপুকুরদর্শনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গরুর গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্ধমান হইতে অধিকাংশ পথ পদব্রজে গিয়াছিলেন। সেই পথে সে সময়ে দস্যুর উপদ্রব ছিল; তাই পথিককে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। তখন মাস্টারের চক্ষে নবানুরাগের অঞ্জন—দূর হইতে কামারপুকুর দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করিলেন, কামারপুকুরের পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই অভিবাদন জানাইলেন; আর সর্বত্রই ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত জানিয়া পুলকিতচিত্তে সবই দর্শন-স্পর্শন করিতে লাগিলেন। রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর এই সমস্ত অবগত হইয়া একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, তার কি ভালবাসা! কেউ তাকে বলেনি, ভক্তির আধিক্যে আপনা থেকে এত কষ্ট সহ্য ক'রে ঐসব জায়গায় গিয়েছিল—কারণ আমি সে সব জায়গায় যাতায়াত করতাম। এর ভক্তি বিভীষণের মতো। বিভীষণ মানুষ দেখলে ভাল করে সাজিয়ে পূজো-আরতি করত, আর বলত, এই আমার প্রভু রামচন্দ্রের একটি মূর্তি।" আর কামারপুকুর হইতে প্রত্যাগত মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "কি করে গেলে ও-ডাকাতের দেশে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব।" সশরীরে একসঙ্গে যাওয়া অবশ্য হয় নাই; কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তিনি তাঁহাকে আরও আট-নয় বার কামারপুকুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কামারপুকুরের প্রতি মাস্টার মহাশয় একসময়ে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করেন। মা কিন্তু সহাস্যে বলেন, "বাবা, ও-জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো—ওখানে থাকতে পারবে না।" অবশেষে মায়ের আদেশই প্রতিপালিত হইল।

বাল্যের ন্যায় যৌবনেও মাস্টার মহাশয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও অসীমতার মধ্যে ভগবানের গোপন-হস্তের আভাস পাইতেন। ঠাকুরের লীলাকালে তিনি একবার কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখর দর্শনপূর্বক আনন্দে আপ্লুত ও ভক্তিতে পুলকিত হন। প্রত্যাবর্তনের পর ঠাকুর তাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কেমন, হিমালয় দর্শন ক'রে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?"

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত মাস্টারের তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। স্বভাবতঃ লাজুক মাস্টারের মুখে কিন্তু তখন কথা ফুটিত

না; তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার মাদীভাব, কথা কইতেই পারে না।" আর একদিন তিনি গান গাহিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ও স্কুলে দাঁত বার করবে; আর এখানে গান গাইতেই যত লজ্জা।" কখনও বা বলিতেন, "এর সখাভাব।"

যাহা হউক, এই নম্রপ্রকৃতির মানুষটির সহিত পুরুষসিংহ নরেন্দ্রের প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে কোনও বাধা হয় নাই। পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য যোগাড় করিয়া দেন; একবার নরেন্দ্রের বাড়ির তিন মাসের খরচ চালাইবার জন্য একশত টাকা দেন; এতদ্ব্যতীত গোপনে নরেন্দ্র-জননীর হস্তে টাকা দিয়া বলিতেন, নরেন্দ্রকে যেন জানানো না হয়, নচেৎ তিনি উহা প্রত্যর্পণ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে যখন যুবক ভক্তগণ সহায়-সম্পদহীন, তখন বিরল দুই-চারি জন গৃহস্থ ভক্তের সহিত মাস্টার মহাশয় তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সৎপরামর্শ দিয়া বরাহনগরের মঠ-সংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন। ছুটির দিনে তিনি প্রায়ই ঐ মঠে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল কথা স্মরণপূর্বক স্বামী বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে— হাবাতে (গরীব ছোঁড়াগুলো) মনে করে? কেবল বলরাম, সুরেশ (সুরেন্দ্র মিত্র), মাস্টার ও চুনীবাবু—এঁরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এঁদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরে জাগতিক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মাস্টার মহাশয় তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন এবং শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রঘুনাথদাস বাবাজীর

দর্শনলাভে ধন্য হন। তাঁহার সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। এক সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটীরে তপস্যায় রত হন ; কিন্তু আর্দ্র গৃহে কঠোর জীবনযাপনের ফলে অসুস্থ ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ায় স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে গাড়ি করিয়া গৃহে লইয়া যান। বরাহনগরের মঠে বাসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরেও তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন। আর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল তাঁহার ; স্বগৃহে অবস্থানকালে তিনি গভীর রাত্রে গাত্রোত্থানপূর্বক শয্যা লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বারান্দায় উপস্থিত হইতেন এবং তথায় গৃহহীনদের মধ্যে শয়নপূর্বক আপনাতেও সহায়সম্বলহীন গৃহশূন্য ব্যক্তির অবস্থা-আরোপের চেষ্টা করিতেন। পরে কেহ যদি এই গুপ্ত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিত, "এত কঠোরতা করতেন কেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "গৃহ ও পরিবারের ভাব মন থেকে যেতে চায় না, আঠার মতো লেগে থাকে।" পর্ব উপলক্ষ্যে তিনি গঙ্গাতীরে সমবেত সাধুদের সন্নিকটে গভীর রাত্রে যাইয়া দেখিতেন, মুক্তাকাশতলে কেমন তাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নিপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন বা জপরত রহিয়াছেন। কখনও হাওড়া স্টেশনে যাইয়া জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত যাত্রীদের প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা মহাপ্রসাদ চাহিয়া খাইতেন—উদ্দেশ্য, এইভাবে ঐ মহাতীর্থে গমনের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ফললাভ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের চির সামীপ্যবোধের জন্য তিনি দিবাভাগেও অবসরকালে স্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক পুরাতন দিনলিপি খুলিয়া শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পাঠ ও ধ্যান করিতেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার পরে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত কাশীধামে যান এবং তথায় কিয়দ্দিবস যাপনান্তে প্রায় এক বৎসর তীর্থভ্রমণাদি করেন। এই অবকাশে তিনি মাসাধিককাল কনখল সেবাশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে একটি কুটীয়ায় থাকিয়া তপস্যা করেন। তখন

স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন; তাঁহার সহিত ভ্রমণ ও আলোচনাদি করিয়া মাস্টার মহাশয় খুব আনন্দিত হইতেন। ইহার পরে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া ঝুলন দর্শন করেন এবং রাসধারীদের অভিনীত 'কৃষ্ণ-সুদামা'র পালা দেখিয়া আহ্লাদিত হন।

প্রকাশ্যে এই-সকল সাধনা ছাড়াও অনাড়ম্বর যোগী মাস্টার মহাশয়ের তপোনিষ্ঠা বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত হইত। ঋষিদের ভাব আপনাতে আরোপ করিবার জন্য তিনি কখন হবিষ্যান্ন-ভোজন বা পর্ণকুটীরে বাস করিতেন; কখন বা বৃক্ষমূলে একাকী উপবিষ্ট থাকিতেন, আর বিশাল আকাশ, গগনচুম্বী পর্বত, অপার সমুদ্র, সমুজ্জ্বল তারকামণ্ডলী, দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর, সুন্দর নিবিড় বনানী, সুকোমল সুগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরীয় চিন্তা সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ঋষিদের তপোভূমিতে লইয়া যাইত। সুযোগ পাইলেই তাঁহার অন্তর্নিহিত সাধনাভিলাষ উদ্দীপিত হইত। এইরূপে ১৯২৩ অব্দে মিহিজামে পাকা বাটী থাকা সত্ত্বেও তিনি নয় মাস পর্ণকুটীরে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫-এর শেষে পুরীতে চারি মাস নির্জনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন ছিল উচ্চসুরে বাঁধা; প্রভাতসূর্য দেখিলেই দিব্যভাব-গ্রহণে সদা উন্মুখ মাস্টার মহাশয়ের মুখে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হইত। ফলতঃ সর্বদা প্রাচীনের চিন্তাধারায় আপ্লুত মাস্টার মহাশয়ের দেহমনে প্রাচীনের একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছিল। তাই তিনি যখন নিবিষ্টমনে উপনিষদের কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন, তখন অনুভব হইত যেন কোন শ্বেতশ্মশ্রু, প্রশান্তললাট, সৌম্যবপু, সপ্ততিপর বৈদিক ঋষি মরধামে নামিয়া আসিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের গার্গীর দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। একবার (১৯২১ খ্রীঃ) ঐ অংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি আবেগে এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, সামলাইতে না পারিয়া

শয্যাগ্রহণ করেন; অনেকক্ষণ বাতাস করার পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

গৃহে থাকিলেও তাঁহার সাধুচিত অশেষ সদ্‌গুণরাশি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রাতে স্নানান্তে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ধ্যানে বসিতেন। সর্বদা এই চিন্তা মনে জাগাইয়া রাখিতেন যে, সংসার অসার এবং সমস্ত বস্তুর উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া বর্তমান, আর বলিতেন, "মৃত্যুচিন্তা থাকলে কখনও বেতালে পা পড়ে না বা কোনও জিনিসে আসক্তি থাকে না।" সংসারের প্রয়োজনেও তিনি কাহাকেও রূঢ় কথা বলিতে পারিতেন না। অন্যায় দেখিলে বলিতেন, "যার যেরকম স্বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে—মানুষের আর দোষ কি?" সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী—নিকটে ভৃত্য থাকিলেও তাহার সেবাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেন। এমন কি, আটাত্তর বৎসর বয়সে স্নায়ুশূলে হস্ত নিদারুণ ব্যথিত হইলেও যন্ত্রণা-উপশমের জন্য স্বহস্তে পুঁটুলি গরম করিয়া সেক দিতেন। আবার এত সদ্‌গুণের আধার হইয়াও প্রশংসা-শ্রবণে উত্যক্তস্বরে বলিতেন, "Mutual admiration (পারস্পরিক প্রশংসা) রেখে দাও।" নিরভিমান মাস্টার মহাশয় 'আমি, আমার' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই বহুবচন প্রয়োগ করিতেন বা গৌণভাবে কথা কহিতেন। তাঁহার বাড়ির প্রচলিত নাম ছিল 'ঠাকুরবাড়ি'। তিনি কখন কখন ভবানীপুরে গদাধর-আশ্রমে থাকিতেন। একবার ঐরূপ দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ে কার্যোপলক্ষে উত্তর কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যাইতে হইলে বলিয়া যাইতেন, "আমি এখানে খাব না—এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছি।" ভক্ত আর কেহ নহেন, তিনি স্বয়ং।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাদির পর তিনি ঝামাপুকুরে মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউট ক্রয় করেন। বিদ্যালয় পরে ৫০নং আমহার্ষ্ট

স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এই বাটীর চার তলার ঘরখানিতে তিনি থাকিতেন এবং তুলসী ও পুষ্পবৃক্ষে সজ্জিত গৃহছাদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মালাপ করিতেন। ঐ কক্ষই ছিল তাঁহার বাসস্থান বা আশ্রম; দিবসে একবারমাত্র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বগৃহে যাইয়া বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করিতেন। ক্রমে এইটুকু সংসার-সম্পর্কও তিরোহিত হইয়া তাঁহাকে ভগবৎপ্রসঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ মুক্তিপ্রদান করিল। 'কথামৃত'-প্রকাশের পর দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত ভক্ত পিপাসা মিটাইতে তাঁহার নিকট আসিত এবং মাস্টার মহাশয়ও তাঁহাদিগকে স্বীয় ভাণ্ড উজাড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনাইতেন।

শেষজীবনে যাঁহারা মাস্টার মহাশয়কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার বাসস্থান তখন প্রাচীন ঋষিদের তপোভূমিতে পরিণত হইয়াছিল—সংসারের প্রবল তরঙ্গোদ্বেলিত স্রোত নিম্নে প্রবাহিত, আর রাজপথের কোলাহলের ঊর্ধ্বে হিমালয়ের নীরবতা বিরাজিত! যখন যিনিই যান না কেন মাস্টার মহাশয়কে দেখেন শুধু জ্ঞান-ভক্তির আলোচনাতেই মগ্ন! ভক্ত ও সাধু-সঙ্গে তাঁহার অসীম আনন্দ, অবিরাম ভগবদালাপনে দীর্ঘকাল যাপন এবং ভক্তদের সহিত অধিকাধিক মিলনের আগ্রহ না দেখিয়া থাকিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সে মধুর আলাপনে লুব্ধ বহু ব্যক্তি নিত্য সেই অধ্যাত্মতীর্থে অবগাহন করিতে যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন সদ্‌গ্রন্থপাঠ চলিতেছে এবং মাস্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশপূর্বক জটিল অংশ সরল কিংবা সরস করিতেছেন, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অনর্গল অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন এবং বাইবেল, পুরাণ, উপনিষদাদি হইতে বাক্য উদ্ধারপূর্বক, কিংবা যীশু, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনের অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসাইয়া রাখিয়াছেন। কেহ অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি কৌশলে

আলোচনার ধারাকে ভগবন্মুখী করিয়া দিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টার মহাশয়কে একদিন সংসারত্যাগের চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তুমি আত্মবিস্মৃত ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে। ভগবানের বাণী যারা প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন, তা না হ'লে তাঁর কথা বলবে কারা? সেইজন্য মা তোমাকে সংসারে রেখেছেন।" শ্রীশ্রীজগদম্বার মহিমাপ্রচারের জন্য ঠাকুর যাঁহাদিগকে 'চাপরাশ-প্রাপ্ত' বলিয়া মনে করিতেন, মাস্টার মহাশয় ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের প্রতি মাস্টার মহাশয়েরপ্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও কাহারও ছবি স্বগৃহে রাখিয়া তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের শেষ অসুখের সময় তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পরও নিজের বিছানায় পড়িয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) প্রভৃতি যুবকগণ যদিও রিপণ কলেজে তাঁহারই নিকট পড়িতেন, তথাপি তাঁহার ধর্মভাবের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা রামবাবুর আকর্ষণে কাঁকুড়গাছিতে যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের সকলেরই মধ্যে ত্যাগের ভাব ছিল; অথচ রামবাবুর তদানীন্তন ধারণা ছিল অন্যরূপ। তিনি বলিতেন, "বিলে (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) তো ঠাকুরকে মানতই না, তর্ক করত," "ঠাকুরকেই যদি ভগবান ব'লে বিশ্বাস হ'ল, তবে তাঁর কথাই তো শাস্ত্র; অপর শাস্ত্রের দরকার কি? ঠাকুরকে বকলমা দিলেই হ'ল; আর কোন সাধন-ভজনের দরকার নেই। সংসারের মধ্যে থেকেই ঠাকুরকে ডাকলে তিনি কৃপা করবেন" ইত্যাদি। অতএব কাঁকুড়গাছিতে তাঁহারা বরাহনগর মঠ কিংবা মঠবাসী সাধুদের কোন সংবাদই পান নাই। এদিকে তাঁহাদের উৎসুক

নয়ন শীঘ্রই আবিষ্কার করিল যে, তাঁহাদের গম্ভীরপ্রকৃতি ও বেশভূষায় পারিপাট্যহীন মাস্টার মহাশয় কলেজের অবসরকালে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া নিজের নোটবুকখানি ( অর্থাৎ 'কথামৃত' ) নিবিষ্টমনে পড়েন। তাঁহার অন্যান্য চাল-চলনও একটু অসাধারণ। অতএব তাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহেও গেলেন। মাস্টার মহাশয় মাদুর পাতিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন এবং নিজেও পার্শ্বে বসিলেন—অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সাধারণতঃ যে কায়দা-দুরস্ত ব্যবহার দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই ছিল না। এইরূপে যুবকদিগের হৃদয় জয় করিয়া লইয়া মাস্টার বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী ; তাঁকে বুঝতে হলে, তাঁর প্রকৃত বাণী পেতে হলে, তাঁর যে-সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাঁদের সঙ্গ করতে হয় ; গৃহস্থেরা হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক বলতে পারে না।" এই উপদেশের ফলে এই যুবকগণ বরাহনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং যথাকালে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক মঠ ও মিশনের মুখ উজ্জ্বল করেন।

মাস্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও ত্যাগের মহিমা এইরূপ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে, তাঁহার অনুপ্রেরণায় অনেকে সন্ন্যাসী হইতেন। জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাধুসঙ্গ করলে শাস্ত্রের মানে বুঝা যায়।" আর একজনকে বলিয়াছিলেন, "হয় সাধুসঙ্গ, না হয় নিঃসঙ্গ! বিষয়ীদের সঙ্গ করলেই পতন।" আবার বলিতেন, "যখন সাধুসঙ্গ পাওয়া যাবে না, তখন সাধুদের ফটো বা ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে।" এইসব উপদেশ দিয়া তিনি আরও বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মর্মকথা ছিল ত্যাগ ; এমন কি, গৃহস্থদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তন্মধ্যেও ত্যাগের বীজ লুক্কায়িত থাকিত এবং বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রে এই জন্মেই উহা অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইত ; অপর স্থলে ভাবী

জন্মে ঐরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। জনৈক ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ না, তিনি চন্দ্রসূর্যকে আলো ও উত্তাপ দেবার জন্য রোজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন—আমরা দেখে অবাক্। লোকের চৈতন্য হবার জন্য তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ মানব। সাধুরাই তাঁকে বেশী ধরতে পারেন। তাঁরা সোজা পথে উঠেছেন, তাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে পারেন।"• ভক্ত আপত্তি জানাইলেন, "এই যে সব সাধুরা আসেন, এঁরা কি সকলেই সর্বোচ্চ আদর্শ নিয়ে আছেন?" মাস্টার মহাশয় ঈষন্মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "এঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। কত বড় ত্যাগ! সব ছেড়েছুড়ে রয়েছেন। চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গৈরিক বস্ত্র দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন। সংসারীরা কলঙ্কসাগরে মগ্ন হয়েও আবার কলঙ্ক অর্জন করছে। ...সাধুরা যদি অন্যায়ও করে তবু আবার ঝেড়ে ফেলতে পারে। সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ।" সাধু আসিলে তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সদালাপ করিতেন আর বলিতেন, "সাধু এসেছেন, ভগবানই সাধুর বেশে এসেছেন! এঁর জন্য আমার স্নানাহার বন্ধ রাখতে হবে। তা যদি না করতে পারি তবে এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য আর কিছু হতে পারে না।" সাধুদিগকে তিনি শুধুমুখে ফিরিতে দিতেন না—কিছু না কিছু অবশ্যই খাওয়াইতেন, আর বলিতেন, "আমি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছি—আমি পূজা করছি ও তাই দেখছি।" বস্তুতঃ তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাঁহার মুখে সাধুর উচ্চ আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া সাধুরাও নিজ আদর্শ সম্বন্ধে সমধিক অবহিত হইতেন এবং জীবনে সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে অধিকতর যত্নবান হইতেন।

যে-কোন ঘটনা বা বিষয় অবলম্বনে ভগবানের স্মরণ-মনন হয়, সেই সকলের সংস্পর্শে আসিবার জন্য তিনি নিজে যেমন ব্যাকুল হইতেন, তেমনি পরিচিত সকলকেও তৎতৎ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। উৎসবাদিতে

যাওয়া যখন তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভব হইত না, তখন অনুরক্ত ভক্তদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাঁহাদের মুখে সবিশেষ বর্ণনা শুনিতেন। একটি ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাবে! কালকে দশহরা—সেখানে পুজো দেখবে। হনুমান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'কি ক'রে সর্বদা আপনাকে স্মরণ থাকে?' রামচন্দ্র বললেন, 'উৎসব দেখলে আমাকে মনে পড়বে।' তাই পর্ব-উৎসবে যোগ দিতে হয়।" প্রসাদে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল—উহা ধারণ করিবার পূর্বে ভক্তিসহকারে হস্তে গ্রহণান্তে মস্তকে স্পর্শ করাইতেন। প্রসাদ সম্বন্ধে তাহার ধারণার একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি বলিতেন, "গুরুজন যা দেন, তা নিতে হয়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন, তাই হচ্ছে প্রসাদ।" আর ছিল তাঁহার দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না—সে সাধু বয়সে যতই ছোট হউক না কেন। একদিন জনৈক বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছেন, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওটা করবেন না। 'তৃণাদপি সুনীচেন'—ও থাক। ঠাকুর বলতেন, 'এর দেহের ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্য আসনে বসাতে হয়।' যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা শুনতে হয়।"

স্বয়ং ভগবৎকৃপালাভে ধন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব চন্দ্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রীতিলাভে চরিতার্থ হইয়াও মাস্টার মহাশয় অপরের সেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন এবং আপনাকে সকলের সেবক মনে করিতেন। গুরুর আসন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কিংবা দীক্ষা কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার প্রভাবে আসিয়া যাঁহারা সুদীর্ঘকাল তথায় যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের প্রতিও তিনি উপদেষ্টার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া কিংবা তাঁহাদিগকে নিজস্ব কিছু বলিবার প্রয়াস না করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। শাসন তিনি

করিতেন না—মুখে ছিল তাঁহার দৈব জ্যোতি, আর জিহ্বায় ছিল অবিমিশ্র আশীর্বাদ। তিনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ পাইতেন এবং বলিতেন যে, ভক্তদের সহিত আলাপ-আলোচনা না থাকিলে তাঁহার জীবন দুর্বিষহ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া বৃথা স্নেহ প্রকাশপূর্বক তিনি শক্তিক্ষয় বা অনুরাগীকে বিব্রত করিতেন না। সর্বাবস্থায়ই তিনি শান্ত থাকিতেন; সুখ-দুঃখ তাঁহাকে অকস্মাৎ অভিভূত করিতে পারিত না। জীবন ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য। অবস্থা মন্দ না হইলেও তিনি আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণভাবে চলিতেন। তাঁহার মতে ঠাকুরের উপদেশই এই ছিল যে, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতে হইবে। জীবন-ধারণের জন্য উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন ও লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্রপরিধানের ফলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তি আরও উজ্জ্বলতর হইয়া আগন্তুকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিত। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মনে ত্যাগ হলেই হ'ল; অন্তঃসন্ন্যাসই সন্ন্যাস।" মাস্টার মহাশয় সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণয়নই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতুম, তখনই বিশেষ ভাবে লিখে রাখতুম। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হ'ত, বার তিথি নক্ষত্র তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি ইচ্ছামত তাঁর কাছে যেতে পারতুম না। তাই দক্ষিণেশ্বরে যা পেয়েছি তার উপর সংসারের চাপ প'ড়ে পাছে সব গুলিয়ে যায়, এই ভয়ে আমি তাঁর কথা ও ভাবরাশি লিখে রেখে পুনর্বার যাবার আগে পর্যন্ত ঐসব পড়তুম ও মনে মনে আলোচনা করতুম। এভাবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য প্রথমে লিখতে আরম্ভ করি, যাতে তাঁর উপদেশ আরো ভাল ক'রে

জীবনে পরিণত করতে পারি।" এইসকল দিনলিপি-অবলম্বনে ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে লিখিত 'Gospel of Sri Ramakrishna (শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলেই অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আরও উপদেশ-প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বৃহত্তর পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এদিকে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে মাস্টার মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় 'কথামৃত'-রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৯০২ অব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কর্তৃক উহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। পরে ক্রমে ১৯০৪ অব্দে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ অব্দে তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ অব্দে চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত হইল। ১৯৩২ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয়।[১] তিনি ইহার আংশিক মুদ্রণ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং ইহারই ফলে বহুবার তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যভাবেও অর্থাদির দ্বারা তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিত ভক্তদের সাহায্যার্থে এবং তপোরত সাধুদের অভাব মিটাইবার জন্যও তিনি গুপ্তভাবে অর্থব্যয় করিতেন। ঐসমস্ত ব্যয়ের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হয় যে, তাঁহার ন্যায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সে দানের পরিমাণ নেহাৎ অল্প নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর পঞ্চাশ বৎসর সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীগুরুমহিমা ও বাণী প্রচার করিয়া তিনি ৺ফলহারিণী কালিকা-পূজার পরদিবস ১৯৩২ খ্রীঃ ৪ঠা জুন (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ) সকালে সাড়ে ছয়টার সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হন। পূর্বরাত্রি নয়টায় 'কথামৃত'

১ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে),' ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম ভাগের প্রুফ দেখিতে দেখিতেই হাতের স্নায়ুশূলের অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং প্রাতঃকালে "মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও" বলিতে বলিতে তিনি চিরনিদ্রায় চক্ষু নিমীলিত করেন। শ্রীগুরুর বাণী-প্রচারে উৎসৃষ্টপ্রাণ মাস্টার মহাশয় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ঐ কার্যেই রত থাকিয়া স্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিলেন।

# অধরলাল সেন

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ দোলপূর্ণিমার দিনে সুবর্ণবণিককুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন কলিকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে ২৯ নং শঙ্কর হালদার লেনে পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা হুগলী জেলাব সিঙ্গুর গ্রামে বাস করিতেন, পরে পৈত্রিক গৃহ পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় আসেন। অধরের পিতা রামগোপাল আরমানী স্ট্রীটে সুতার কারবারে প্রচুর অর্থোপার্জন করিলেও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র ছিল; অধরলাল তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচাদ শিক্ষা, সাহিত্যানুরাগ ও বদান্যতার জন্য সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। অধরলালের দুইজন ভগিনীও ছিলেন। তাঁহার পিতা রামগোপাল পরে ৯৭ নং বেনিয়াটোলা স্ট্রীটে নূতন বাসভবন-নির্মাণান্তে সপরিবারে তথায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। 'কথামৃত'-কার তাই লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের বাটীর বৈঠকখানা ও ঠাকুর-দালান তীর্থ হইয়া আছে" (২।৩।৬); "আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে" (৪।১৭।১); আর অধরের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "অধর ঠাকুরের পরমভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি আমার পরম আত্মীয়' " (২।৩।৬)।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধরলাল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকারপূর্বক সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে

এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকারান্তে ইংরেজী সাহিত্যে ডাফ স্কলারশিপ লাভ করেন। এই বয়সেই তাঁহার দুইখানি কবিতা-পুস্তক—'ললিতাসুন্দরী' ও 'মেনকা' প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থখানি তাঁহার উনিশ বৎসর বয়সে মুদ্রিত হইলেও উহা দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বের রচনা। 'মেনকা' উহার কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হয়। 'মেনকার' তিন-বৎসর পরে (১৮৭৭) 'নলিনী' ও 'কুসুমকানন' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় মুদ্রিত হয় এবং ঐ বৎসরই তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরবৎসর 'কুসুমকাননে'র দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হয়। এইসকল পুস্তকে আমরা অধরকে প্রধানতঃ প্রেমের কবিরূপেই পাই। এই প্রেমিক ও ভাবুক কবির কাব্যের নায়ক-নায়িকার উক্তি-অবলম্বনে তাঁহার তদানীন্তন ধর্মভাবের স্পষ্ট পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সম্ভবতঃ সমসাময়িক খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে 'ললিতাসুন্দরী'তে তথাকথিত পৌত্তলিকতা ও বলিদানের প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে, 'মেনকা'-কাব্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছে এবং 'কুসুমকাননে'র ২য় ভাগে 'মহাবীর' কবিতায় অদ্বৈতের ছায়া পড়িয়াছে।

অধরলাল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে যান। তথায় সীতাকুণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রাচীন কীর্তিসমূহ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি পুরাতত্ত্বের সহিত পরিচয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় পুরাণ এবং পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'The Shrines of Sitakund' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং পরবৎসর মার্চ মাসে উহা কলিকাতার রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধটি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তিনি বদলী হইয়া যশোহরে যান এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ডেপুটি কালেক্টর

হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীযুত অধরের পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহার বেনিয়াটোলার বাড়িতে বারমাসে তের পার্বণ লাগিয়াই ছিল। যৌবনোদ্গমে অধরবাবু স্বীয় কাব্যমধ্যে ধর্মসম্বন্ধে যত সন্দেহই প্রকাশ করিয়া থাকুন না কেন, স্বগৃহে তিনি হিন্দুভাবেই চলিতেন। বিশেষতঃ সীতাকুণ্ডের নির্জন মাধুর্য ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁহার মনে যে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছিল, উহা তাঁহাকে অধিকতর ধর্মপরায়ণ কবিয়া তুলিয়াছিল। আবার শিক্ষিতসমাজেও তাঁহার যশ বিস্তৃত হওয়ায় তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, সহাধ্যায়ী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিতাগ্রণী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সহিত সুপরিচিত. হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈষ্ণবদেব সংস্পর্শে আসিয়া 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন, জনৈক বন্ধুর কীর্তনাদি শ্রবণ এবং বন্ধুর ভাব বা দশা উপস্থিত হইলে তাহা নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সন্দেহের নিরাস হয় নাই; তাঁহার শুধুই মনে হইত, ভাবাবস্থাদি যদি ভগবৎপ্রেমেরই বিকাশ হয়, তবে বন্ধুর সেরূপ অবস্থায় মুখে একটা দুঃখেব কালিমা লক্ষিত হয় কেন? এদিকে সাহিত্যরসিক ও ধর্মানুসন্ধিৎসু শ্রীযুত অধরলাল 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি সংবাদপত্রপাঠে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে পোষণ করিতেন। কলিকাতায় আগমনের পর উহা কার্যে পরিণত করার সুযোগ ঘটিল।

সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ ('কথামৃত', ৫।৪।২) তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন এবং তদবধি প্রাণমন তাঁহাতেই অর্পণপূর্বক শান্তির অধিকারী হন। তাঁহার দ্বিতীয় দর্শন হয় ঐ বৎসর

৮ই এপ্রিল ('কথামৃত', ২।৩।৫)। বৃদ্ধ সাধক ও পুত্রশোকসন্তপ্ত সারদাচরণকেও তিনি সেদিন সঙ্গে নিয়াছিলেন; কারণ প্রথমদর্শনেই অধরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দুঃখজ্বালা মোচন করিতে সক্ষম। 'কথামৃতে'র পাঠক অবগত আছেন যে, শ্রীযুত অধরেব সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল। ঠাকুর অতঃপর তাঁহার ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অধরকে একান্তে বলিয়াছিলেন, "তুমি ডিপুটি; এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য। সংসার কর্মভূমি—এখানে কর্ম করতে আসা। ...কিছু কর্ম করা দরকার—সাধন। ...খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়।" একদা ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে দিব্যানন্দের আস্বাদ করাইলেন; অধিকন্তু সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবিতে যথার্থ ভাব-মহাভাবের অন্তর্নিহিত প্রেমানন্দের দ্যোতনাদর্শনে তিনি বৃদ্ধ সারদাচরণকে বলিলেন, "তোমাদের ভাব দেখে ভাবের উপর আমাব একটা ঘৃণা হয়েছিল; তোমাদের ভাব দেখে মনে হতো যেন ভিতবে কত যন্ত্রণা হচ্ছে। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে? ঠাকুরের আনন্দঘন মধুর হাসি ও তাঁর মাধুর্যময় ভাব দেখে আমার চোখ ফুটল।" ব্রহ্মানন্দজী তাই বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে দর্শন না করলে—তাঁর কাছে আসা-যাওয়া না করলে অধরবাবুর মনে সংশয় ঘুচত না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার গৃহে যাইতেন। তিনি একদিন (২০শে জুন ১৮৮৪) মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "ভাবে দেখিলাম—অধরের বাড়ি, বলরামের বাড়ি, সুরেন্দ্রর বাড়ি, এ-সব আমার আড্ডা। ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।" তাই তিনি পুনঃপুনঃ ইঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিতেন। তিনি কতবার কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ সংবাদ পাওয়া অসম্ভব।

তবে 'কথামৃত' হইতে জানা যায় যে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন, ১৪ই জুলাই ও ২১শে জুলাই অধরভবনে ঠাকুরের পদার্পণ হয়; পরবৎসর ৬ই সেপ্টেম্বর তথায় তাঁহার শুভাগমন হয়; ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ঐ বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার মিলন হয়।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অধর-গৃহে উপস্থিত হইলে অধর বলিলেন, "আপনি অনেক দিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম—এমন কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সহাস্যে কহিলেন, "বল কি গো!" যেদিন অধরগৃহে যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মিলন হয়, সেদিন যে অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়াছিল, তাহা বড়ই শিক্ষাপ্রদ, বড়ই উপভোগ্য—উহাতে তদানীন্তন ভারতীয় ভাবরাজ্যের অনেক রহস্যস্থল সমুদ্ভাসিত। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নহে। আমরা অধরলালের জীবনালোচনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি।

চারি-পাঁচ বৎসর ডেপুটির পদে অবস্থিতির পর অধর কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যানের পদের জন্য প্রার্থী হন। ডেপুটি হিসাবে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল তিন শত টাকা; আর প্রার্থিত পদের বেতন ছিল মাসিক হাজার টাকা। তাই তিনি এই পদলাভার্থে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীযুত যদু মল্লিক প্রভৃতির সাহায্য চাহিয়াছিলেন; এমন কি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগদম্বাকে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন। তাই অধর মাস্টার ও নিরঞ্জনের সম্মুখে ঠাকুর একদিন কহিয়াছিলেন, "হাজরা বলেছিল, 'অধরের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল।' অধরও বলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম, 'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে; যদি হয় তো হোক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম, 'মা, কী হীনবুদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই-সব চাচ্ছে!' (অধরের প্রতি)—কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে এত

আনাগোনা করলে!" অধর উত্তর দিলেন, "সংসার করতে গেলে এসব না করলে চলে না। আপনি তো বারণ করেননি।" ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করেন নাই ; তবে তাঁহার প্রকৃত ভাব বিশ্লেষণপূর্বক বলিয়াছিলেন, "আপনাদের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে।" আলোচ্য দিনে ঠাকুর শ্রীযুত অধরকে ত্যাগের কথাই শুনাইতে লাগিলেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপে আত্মজীবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অধরের সন্দেহ কিন্তু তবু মিটিল না, এমন কি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও তিনি বলিয়া বসিলেন, "চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন—···অত পণ্ডিত, অত মান!" ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষদের সমস্ত প্রচেষ্টা পরার্থে —শুধু ভগবানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নতুবা মান, যশ প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সর্বশেষে তিনি বলিলেন, "আপনি হাকিম, কি বলব! যা ভাল বোঝ তাই করো। আমি মূর্খ।" অমনি অধরবাবু হাসিয়া কহিলেন, "উনি আমাকে এক্জামিন (পরীক্ষা) করছেন।" ঠাকুরও সহাস্যে বলিলেন, "নিবৃত্তিই ভাল।" আর অধরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মাসিক তিনশত টাকা ও ডেপুটির সম্মানাদি নিতান্ত হেয় নহে ; অতএব উহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এইরূপে অধরকে ভর্ৎসনা করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যথাসময়ে যদু মল্লিককে অধরের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু মল্লিক যখন বলিলেন, "অধর যুবক, তার কর্মের বয়স যায়নি," তখন ঠাকুর আর ঐ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিলেন না। ফলতঃ অধরলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটই থাকিয়া গেলেন ; পরন্তু এই ঘটনাপরম্পরায় তাঁহার জীবনে কিছু আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল।

সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্যের অনুভূতি কিন্তু একদিনেই দৃঢ়মূল হয় না। সদ্‌গুরু তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিষ্যদের দৃষ্টি চরম সত্যের দিকে আকৃষ্ট করিতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অধরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস-এর একজন সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারত

সবকার কর্তৃক এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো মনোনীত হন। এই সময়ে কোন কোন দিন আফিসের পরে সন্ধ্যায় সেনেটের সভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদির সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতএব সভাসমিতির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এসব অনিত্য; মিটিং স্কুল আফিস—এসব অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত।" শ্রীযুত অধরকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এসব অনিত্য। শরীর এই আছে, এই নাই; তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।" গৃহী ভক্তকে এরূপ অবিমিশ্র অনাসক্তির উপদেশ-দান ঠাকুরের জীবনে বড় বিরল। এই ক্ষেত্রে তিনি কি দিব্যচক্ষে ভক্তের আসন্ন মৃত্যুর চিত্র দেখিতেছিলেন? অধরবাবু ইহার পরে দীর্ঘকাল ইহজগতে ছিলেন না।

ইহা মনে করিলে কিন্তু অধরবাবুর প্রতি অবিচার করা হইবে যে, তিনি কার্যে ডুবিয়া ঠাকুরকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মান ও ঐশ্বর্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও বর্ধিত হইয়াছিল। আফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই তিনি প্রায় প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ৺ভবতারিণীর মন্দিরে প্রণামান্তে ঠাকুরের পদতলে প্রণত হইতেন এবং পরে আরতিদর্শনে যাইতেন। আবাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেন কিংবা উপদেশ শ্রবণ করিতেন। কিন্তু দিবসব্যাপী অবিরাম পরিশ্রমের পর তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকা সম্ভব হইত না। তাই ঠাকুর তাঁহার জন্য মাদুর পাতিয়া দিতে বলিতেন এবং তাঁহার অবসন্ন দেহ অচিরেই তথায় নিদ্রাভিভূত হইত। রাত্রি নয়টা-দশটায় তাঁহাকে উঠাইয়া দিলে তিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্মবন্দনান্তে গাড়ি করিয়া

গৃহে ফিরিতেন। এই যাতায়াতে তাঁহার প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিত; সুতরাং অন্য প্রকার আমোদ-আহ্লাদের তাঁহার অবকাশ বা প্রবৃত্তি ছিল না। আবার ঠাকুরকে প্রায়ই গৃহে আনিয়া তিনি আনন্দোৎসব করিতেন। কোন সময়ে ঠাকুর দীর্ঘকাল না গেলে তাঁহার মনে হইত যেন গৃহের বায়ু দূষিত হইয়াছে; সেজন্য ঠাকুরকে বলিতেন, "আপনি অনেক দিন যাননি; ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে," অথবা "আপনি অনেক দিন এ বাড়িতে আসেননি; ঘর মলিন হয়েছিল, যেন কি একরকম গন্ধ হয়েছিল।" দুর্গোৎসবে ঠাকুর ভক্তসহ অধর-ভবনে যাইতেন এবং প্রতিমার সম্মুখে ভাবমগ্ন হইতেন; আর সমাধিভঙ্গে বলিতেন, "এমন হাস্যময়ী প্রতিমা আর দেখা যায় না।" আবার ঠাকুর চলিয়া গেলে সে আনন্দনিকেতনও শ্রীযুত অধরের নিকট নিরানন্দ মনে হইত।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে অধরবাবু কিছুদিন বৈষ্ণবচরণের পদাবলী-কীর্তন শুনিতেন এবং ঠাকুরও তথায় মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ ও ভাবগাম্ভীর্য শতগুণ বর্ধিত করিতেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ঠাকুর তাঁহার বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ ভক্তদের কাহারও কাহারও সুবর্ণবণিকের গৃহে ভোজনে দ্বিধা ছিল বলিয়া তাঁহারা অবকাশ খুঁজিয়া আহারের পূর্বেই সরিয়া পড়িতেন। তবে এমনও হইতে যে, ঠাকুরকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ ঐরূপ জাতিবিচার তখনকার মতো পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে একদিন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মনে দ্বিধা লইয়াই প্রসাদ পাইলেন। কিন্তু ইহার পর ভক্তগৃহে এপ্রকার সঙ্কোচ নির্যুক্তিক জানিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন; তখন ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, "ভক্ত হ'লে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায়।"

অধরলাল স্বল্পায়ু ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি, মঙ্গলবার সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে তিনি অশ্বারোহণে মানিকতলা ডিস্টিলারি-পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে শোভাবাজার স্ট্রীটে অশ্বপৃষ্ঠ

হইতে পতনের ফলে তাঁহার বাম হস্তের কব্জি ভাঙ্গিয়া যায় এবং অচিরে ধনুষ্টঙ্কার আরম্ভ হয়। বহুপূর্বেই ঠাকুর তাঁহাকে অশ্বারোহণসম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু ভবিতব্যতা কে খণ্ডাইবে ? তাঁহার দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ঠাকুর যখন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, তখন তিনি বাক্‌শক্তিহীন। তবু ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ তাঁহার দুই নয়নে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ঠাকুরও ম্লানমুখে সাশ্রুনয়নে তাঁহার অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অভয়বাণী শুনাইলেন। ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন যে, অশ্বপৃষ্ঠে গমনকালে অধরের ইষ্টদর্শন হইয়াছিল এবং সেই আনন্দে তিনি নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারি ( ১২৯১ সালের ২রা মাঘ ) বুধবার প্রত্যূষে বেলা ছয়টার সময় শ্রীযুত অধরলাল মহাপ্রয়াণ করিলেন। সে নিদারুণ শোকে মুহ্যমান ঠাকুর ৺জগদম্বার নিকট অভিমানভরে স্বীয় বেদনা জানাইয়া বলিলেন, "মা, তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস ব'লেই তো এই অবস্থা !" আহা ! ভক্তের জন্য ভগবানের কি অচিন্তনীয় আর্তি ![1]

---

১ 'উদ্বোধন', ১৩৫৬, ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৫৭, আষাঢ়-শ্রাবণে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনের লিখিত প্রবন্ধ-অবলম্বনে।
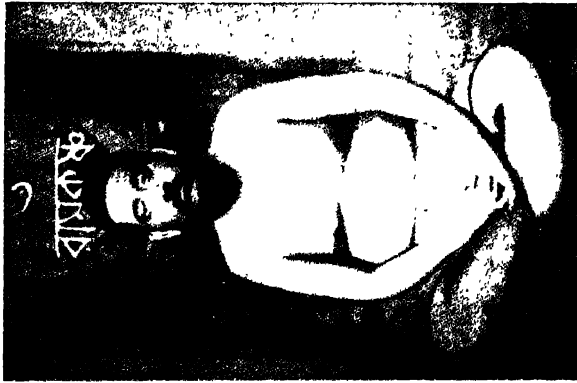
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রামচন্দ্র দত্ত
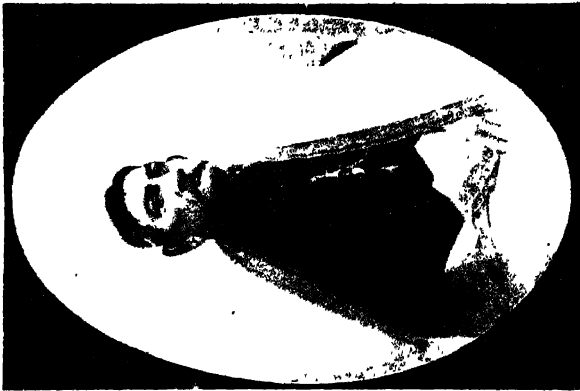
# গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন-রচিত 'রামকৃষ্ণপুঁথি'তে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে
উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া,
আইল মূরতি এক নাচিয়া নাচিয়া।
কেবা সে যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তায়,
কহিল, 'ভৈরব মুই আইনু হেথায়।'
'কিবা প্রয়োজন?'—তারে পুছিলে আবার
উত্তর করিল, 'কার্য করিব তোমার।'
গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর,
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার উপর। (৪৫৬-৭ পৃঃ)

গিরিশকে ভৈরবরূপে দেখার উল্লেখ 'লীলাপ্রসঙ্গে'ও (গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৮০ পৃঃ) আছে—"পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার মন্দিরে ভাবসমাধিতে একদিন তাঁহাকে ঐরূপ দেখিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বঙ্গসমাজে প্রধানতঃ মহাকবি নাট্যকার ও নট বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে তিনি একনিষ্ঠা ভক্তি ও ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া গিরিশ-জীবন যেমন মহিমমণ্ডিত হইয়াছিল, গিরিশকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাও তেমনি জীবকল্যাণে অপূর্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। গিরিশের জীবন বুঝিতে গেলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দেওয়া চলে না, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে গেলেও গিরিশের জীবন তেমনি অপরিহার্য।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার ( ১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন ) গিরিশের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নীলকমল ঘোষ কলিকাতায় ১৩নং বসুপাড়া লেনে বাস করিতেন। গিরিশের প্রপিতামহ রামলোচন ঘোষ ঐ বাটীটি ক্রয় করিয়া কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই গৃহেই গিরিশের জন্ম হয়। নীলকমল সওদাগরী অফিসে বুক-কিপারের ( হিসাব-রক্ষকের ) কার্য করিতেন। ঐ কার্যে তিনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া সাহেবদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। সমসাময়িক দৃষ্টিতে তাঁহার উপার্জন মন্দ ছিল না। সাংসারিক বিচক্ষণতা, উদারতা, পরোপকার ও অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য তিনি প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকুলসম্ভূতা ভক্তিমতী জননী রাইমণিও অন্যান্য অশেষ গুণের সহিত বংশপরম্পরায় ধর্মভাব পাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরদেবতার কথা শুনিতে ও স্তবপাঠ করিতে ভালবাসিতেন এবং বৈষ্ণব-ভিখারী বাড়িতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। গিরিশের মাতুল নবীনকৃষ্ণ ভাবপ্রবণ, বিদ্যানুরাগী ও অধ্যায়নশীল ছিলেন এবং তর্কে ছিল তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা। জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণের অমায়িকতা ও আমোদপ্রিয়তা পাড়ায় সুবিদিত থাকিলেও তিনি সুরাসক্ত ছিলেন। গিরিশ উত্তরাধিকারসূত্রে এই সকলের গুণাগুণই লাভ করিয়াছিলেন। খুল্লপিতামহীর প্রভাবও তাঁহার উপর অনেকখানি পতিত হইয়াছিল। পিতামহীর বর্ণনাভঙ্গীতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প গিরিশের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিত। একবার শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরাগমনের চিত্রটি বৃদ্ধা এমন প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, গোপ-গোপীদের নয়নজল, প্রকৃতির মৌনকাতরতা এবং মা যশোদার ক্ষিপ্তপ্রায় হাহাকার উপেক্ষা করিয়া অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া গেলেন শুনিয়া কাতরকণ্ঠে বালক গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কি আবার এলেন ?" পিতামহী বলিলেন, "না।" আবার প্রশ্ন

হইল, "আর এলেন না ?" "না !" তৃতীয়বারও অনুরূপ প্রশ্ন করিয়া এবং উত্তর পাইয়া কাতরহৃদয়ে বালক অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সে দারুণ বিরহ-ব্যথা দূর হইতে তিনদিন লাগিয়াছিল। কোমল-হৃদয় বালক সেই তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসে নাই।

গিরিশ ছিলেন রাইমণির অষ্টম গর্ভের সন্তান; তাই পাছে মায়ের দৃষ্টিতে পড়িয়া সন্তানের অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে জননী গিরিশকে কোনরূপ আদর করিতেন না। তবে জননীর স্নেহে তিনি যতটুকু বঞ্চিত ছিলেন, পিতার আদর ততটুকু অধিক পাইতেন। অতঃপর একটি ঘটনায় গিরিশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই মঙ্গলকামনায় জননী এই অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। একদিন গাল ও গলা ফুলিয়া বালক গিরিশ জ্বরে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, সেই সময় রাইমণি নীলকমলবাবুকে ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "তুমি যেমন ক'রে পার বাঁচাও।" অকস্মাৎ স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া নীলকমল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাইমণি বলিলেন, "আমি রাক্ষসী এক সন্তান খেয়েছি। পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, তাই আমি একে কাছে আসতে দিতুম না। ··আমার হেলায় কত কষ্ট পেয়েছে—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" ইতঃপূর্বে বাইশ বৎসর বয়সে গিরিশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। জননীর পূর্ণ স্নেহে বঞ্চিত থাকার আর একটি কারণও ছিল। পুত্রপ্রসবের পর রাইমণি সূতিকারোগে শয্যাশায়িনী হন এবং মাতৃস্তনে বঞ্চিত গিরিশ এক বাগ্‌দী মেয়ের স্তন্যপানে বাধ্য হন। জননী অতঃপর দীর্ঘদিন ধরাধামে ছিলেন না—গিরিশের দশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

গিরিশের বাল্য-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা সাধারণ গতিতেই অগ্রসর হইতেছিল। বিশেষ এই যে, পিতার আদরের দুলাল গিরিশ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড়ই আবদারে হইয়া উঠিতেছিলেন; যেখানে বাধা পাইতেন সেখানেই তাঁহার অশান্ত ভাব দ্বিগুণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিত।

জুজুর ভয় দেখাইলে তিনি জুজুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইতেন। পুত্রের এই প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া পিতা সম্ভবক্ষেত্রে মোটেই বাধা দিতেন না। গৃহদেবতা শ্রীধরকে নিবেদন করিবেন মনে করিয়া জেঠাই-মা বাগানের প্রথম শশাটি কুটো-বাঁধা করিয়া রাখিয়াছেন। গিরিশের উহা খাইবার ইচ্ছা হইল, তাই পিতার বাড়ি ফিরিবার পূর্বে কান্না শুরু করিলেন, "তেষ্টা পেয়েছে"—"জলখাবার তেষ্টা নয়" বা "বাজারের শশা-খাবার তেষ্টা নয়; খিড়কির বাগানের শশাখাবার তেষ্টা।" বাবার আদেশে শশা গিরিশের হাতে আসিল। জেঠাই-মা দেবরকে বারণ করিলে নীলকমল উত্তর দিলেন, "বালক যার জন্য এত ক'রে কাঁদছে, শ্রীধর কি তা তৃপ্তি ক'রে খাবেন?"

হাতেখড়ি হইবার পর গিরিশ বিদ্যালয়ে গেলেন; কিন্তু প্রকৃতিচালিত পুত্রকে স্নেহপ্রবণ পিতা ক্রমে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে সরাইতে থাকায় পুত্রের বিদ্যাভ্যাস অতি মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসকালেই তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের নাম শুনিয়া তিনি কবিতা-রচনায় মন দিয়াছিলেন এবং গুপ্ত-কবির 'সংবাদপ্রভাকরে'র গ্রাহক হইয়াছিলেন। হাফ্-আখড়াই, কথকতা, রামায়ণ-গান ইত্যাদির প্রতি তাঁহার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। 'কবিকঙ্কন-চণ্ডী,' 'অন্নদামঙ্গল,' পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি বাড়িতে বসিয়া পড়িতেন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই সময়ে হিন্দুর ধর্মজীবন ও ধর্মভাবের সহিত ক্রমেই সুপরিচিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনে হয় যে, ইহাতে তাঁহার কবিকল্পনার পরিপুষ্টি ঘটিলেও তিনি ইহার আধ্যাত্মিক আহ্বানে আত্মবিসর্জন দিতে কখনও প্রস্তুত ছিলেন না।

ভাবী জীবনের জন্য গিরিশ যখন এইরূপে গড়িয়া উঠিতেছেন তখন

তাঁহার চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা নীলকমল অকস্মাৎ পরলোক-গমন করিলেন। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে গিরিশ তখন স্বাধীন। পিতার দূরদৃষ্টির ফলে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরীর যত্নে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা পাইলেও গিরিশকে রক্ষা করা ভগিনীর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধিমতী কৃষ্ণকিশোরী পিতৃ-বিয়োগের এক বৎসর পর নবীনচন্দ্র সরকারের কন্যা শ্রীমতী প্রমোদিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটাইলেন। নবীনবাবু গিরিশের পিতৃবন্ধু এবং বিচক্ষণ ভদ্রসন্তান; তিনি এ্যাট্‌কিন্‌সন টিল্‌টন কোম্পানির বুক্-কীপার ছিলেন। দিদি ভাবিলেন, ইঁহার সাহায্যে গিরিশকে শাসনে রাখিতে পারিবেন। ফল কিন্তু বেশী কিছুই হইল না। পিতার মৃত্যুতে গিরিশের বিদ্যালয়েব পাঠ কিছুদিন বন্ধ রহিল। পরে পুনর্বার অধ্যয়ন আরম্ভ হইলে তিনি পূর্বেরই ন্যায় বিদ্যালয় বদলাইতে লাগিলেন; অবশেষে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হইলেন। বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ এইখানেই শেষ হইল। তবে পূর্বাভ্যাসানুসারে স্বগৃহে সাহিত্যচর্চা চলিতে লাগিল।

তখন ইংরেজী শিক্ষার সর্বাধিক আদর। গিরিশ বিবাহের যে যৌতুক পাইয়াছিলেন, উহা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরেজী গ্রন্থ কিনিলেন এবং মনোনিবেশপূর্বক অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। গিরিশ যখন যাহা ধরিতেন তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন; ইংরেজী-পাঠকালে নিজের গৃহেই অধিক সময় কাটিত—বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্পগুজব পর্যন্ত হইত না। এই কালে তিনি বঙ্গভাষায়ও ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং গৃহে বসিয়া উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতার পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিতেন। নিজের সংগৃহীত পুস্তকে পরিতৃপ্ত না হইয়া পরে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

যৌবনোদ্গমে অভিভাবকহীন গিরিশের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে

কয়েকটি দোষও বৃদ্ধি পাইল। পানদোষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা ক্রমেই প্রবল হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া একটি বওয়াটে দলের সৃষ্টি হইল। দলপতি গিরিশ কখনও তুবড়িওয়ালা সাপুড়ের সঙ্গে বাণ খেলিতেছেন, কখনও পাড়ায় আগত ভণ্ড সন্ন্যাসীকে শাস্তি দিতেছেন, কখনও-বা লোকাভাবস্থলে মৃতের সৎকারে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গরীবের চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রতিবেশীরা যদিও তখন গিরিশ ও তাঁহার দলের অযাচিত সাহায্যে উপকৃত হইতেন ও উহার প্রত্যাশা রাখিতেন, তথাপি এই উচ্ছৃঙ্খল দলকে তাঁহারা ভালবাসিতেন না। জামাতার ভাবগতিক দেখিয়া শ্বশুর নবীনবাবু তাঁহাকে স্বীয় সওদাগরী আফিসে শিক্ষানবীসরূপে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ন্যূনাধিক পঞ্চদশ বর্ষ গিরিশবাবু বিভিন্ন আফিসে চাকরি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার ধনাঢ্যগৃহে তখন পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে থিয়েটারের প্রচলন হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উহা দেখার সৌভাগ্য ঘটিত না। তাই জনসাধারণের জন্য সখের থিয়েটার আরম্ভ হয়। গিরিশবাবু অভিনেতা বা সঙ্গীত-রচয়িতারূপে এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতেন। পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই উদ্যোগে অভিনীত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের জন্য কয়েকখানি গান রচনা করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। অবশেষে যুগধর্মানুসারে সখের থিয়েটারে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশবাবু উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও বন্ধুদের আগ্রহে এবং নিজের অভিনয়-স্পৃহাবশতঃ মাঝে মাঝে উহাতে যোগ দিতে লাগিলেন। কালক্রমে থিয়েটারে বারাঙ্গনার আবির্ভাব হইল এবং সখের দল পেশাদারী সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এই উভয় পরিবর্তনের জন্য গিরিশ দায়ী না হইলেও, ইহাও সত্য যে বাঙ্গালার থিয়েটারের পূর্ণ পরিণতাবস্থায় তিনিই অধ্যক্ষ, অভিনেতা, নাট্যাচার্য ও নাট্যকার হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্য-

সম্প্রদায়ের পরিচালনভার গ্রহণপূর্বক বঙ্গীয় নাট্যালয়ের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং উহার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। থিয়েটারে প্রথম দীনবন্ধু ও মাইকেল প্রভৃতির নাটক অভিনীত হইত, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কিংবা নবীনচন্দ্রের কাব্যকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করা হইত। গিরিশবাবু প্রথমতঃ সঙ্গীত-রচনা, উপন্যাসাদিকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করা এবং স্বয়ং অভিনয় করাতেই তৎপর ছিলেন; পরে রঙ্গামোদীদের ক্রম-বর্ধমান আগ্রহ মিটাইবার জন্য মৌলিক নাট্যরচনায়ও অগ্রসর হইলেন।

তিনি তখনও সওদাগরী আফিসে চাকরি করিতেন বলিয়া অর্থের জন্য অভিনয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত না; একটা প্রকৃতিগত রসসৃষ্টি ও রসপরিবেশনের প্রেরণাতেই তিনি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই—'কৃষ্ণকুমারী'-অভিনয়ে (১৮৭৩ খ্রীঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি) ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি যখন শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন এবং উহার পুরস্কারস্বরূপ নাটোরের মহারাজের নিকট হইতে রাজবেশ ও তরবারি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি উহা আত্মসাৎ না করিয়া থিয়েটার-সম্প্রদায়কেই দান করেন। এইভাবে আরও কয়েক বৎসর থিয়েটার ও চাকরি একসঙ্গে চালাইয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে তিনি স্বীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে থিয়েটারের সৌষ্ঠবসাধনে অর্পণ করিলেন। ঐ দিন তিনি প্রতাপচাঁদ জহুরীর অনুরোধে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার হইলেন।

অতঃপর অনেক স্থানেই তিনি অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। যখন যেখানে যাইতেন সেখানেই তিনি হইতেন নূতন থিয়েটারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ও প্রাণ। সুতরাং তাঁহাকে পাইবার জন্য সকল সম্প্রদায়ই লালায়িত থাকিত। অথচ নির্লোভ গিরিশবাবু নিজদোষে কোন সম্প্রদায় ত্যাগ করিতেন না বা কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না—সকলেই ছিলেন তাঁহার বন্ধু। আবার সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার নিস্পৃহতা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত।

অমৃতলাল প্রভৃতি বন্ধুরা যখন তাঁহারই উৎসাহে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইয়া উহার গৃহনির্মাণে তৎপর, তখন এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গোপাললাল শীল গিরিশবাবুকে বলিলেন যে, তিনি যদি বিশ হাজার টাকা বোনাস (অতিরিক্ত পারিতোষিক) ও সাড়ে-তিন শত টাকা মাসিক বেতন লইয়া এমারেল্ডের অধ্যক্ষ না হন, তবে শীল মহাশয় স্টারের সর্বনাশ করিবেন। এই সঙ্কটে পড়িয়া গিরিশবাবু স্বীয় বোনাস হইতে ১৬০০০৲ টাকা স্টারের জন্য দান করিয়া এমারেল্ডের পরিচালনভার লইলেন (১৮৮৭)। পরে তিনি পুনর্বার স্টারে ফিরিয়া আসেন (১৮৮৯)।

শ্রীযুত গিরিশের নাট্যপ্রতিভা দিকে দিকে কিরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে ; কারণ আমরা ভক্ত গিরিশের সন্ধানে ফিরিতেছি। আমরা শুধু অমৃতলালের ভাষায় এইটুকু বলিয়াই শেষ করিব যে, "গিরিশচন্দ্র জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক। ...বাঙ্গালা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র। ...ইঁহার খুড়ো, জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিলেন না।"

ভক্ত গিরিশের অনুসরণের পূর্বে আমরা তাঁহার চরিত্রের আর একটু দিগ্‌দর্শন করিয়া লইব। প্রতিবেশীদের দুঃখ-দারিদ্র্য ও পীড়াদি তাঁহাকে ব্যথিত করিত বলিয়া তিনি এক সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন ; কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ সর্বপ্রকার আনুষঙ্গিক বিধি মানিতে পারে না দেখিয়া বিরক্তিসহকারে উহা বর্জন করেন, কিন্তু পরোপকারী হইলেও যৌবনারম্ভে তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, অধিকন্তু যুগপ্রভাবে ধর্মে আস্থা হারাইয়াছিলেন। তবে পিতার প্রতি অগাধ ভালবাসার ফলে তিনি পিতৃতর্পণ করিতেন—বলিতেন, "জল দিই ; কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কার্য হয়।" একবার শারদীয়া পূজার পূর্বদিন কাহারা তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রতিমা রাখিয়া গেল এবং প্রাতে প্রতিবেশীরা অনেকেই মজা

দেখিবার জন্য তথায় সমবেত হইল। নিম্নের কোলাহলে নিদ্রোত্থিত গিরিশবাবু সমস্ত বুঝিলেন এবং মদ্যপানান্তে কালাপাহাড় সাজিয়া কুঠার হস্তে প্রতিমাকে আক্রমণপূর্বক খণ্ড-বিখণ্ড করিলেন—দিদির আর্তনাদ, প্রতিবাসীর প্রতিবাদ প্রভৃতি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। সারাদিনের পরিশ্রমান্তে স্তূপীকৃত ধ্বংসরাশিকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই রাত্রে তাঁহার জ্বর হইল ও মুখ ফুলিয়া উঠিল। দিদি মানসিক করিলেন, চারি বৎসর মায়ের পূজা দিবেন এবং যথাকালে সে প্রতিজ্ঞা পালনও করিলেন। গিরিশের কিন্তু কোন অনুশোচনা দেখা গেল না। শোনা যায়, অবিশ্বাসের ধূমে আচ্ছাদিতবুদ্ধি গিরিশ তখন পথে চলিতে চলিতে নির্জন স্থানে শিবলিঙ্গকে অপমান করিয়া দেখিতেন, শিব শাস্তি দেন কিনা। তদানীন্তন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ঈশ্বর-না-মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু হিন্দুর দেশে···হিন্দুর প্রাণ ঈশ্বরকে একেবারে হঠ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য ছিলেন, ঈশ্বর লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার।···ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট।···জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ—তাঁহার যাহা বলেন, তাহাই ঠিক।" গিরিশের তখনকার দার্শনিক বিশ্বাস স্বরচিত কবিতায় প্রকটিত হইয়াছে—

পঞ্চভূত ধরি করে মহাকাল নৃত্য করে,<br>
সংযোগ-বিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলাপ্রায়।<br>
একত্র যখন বাঁধে পঞ্চভূত হাসে কাঁদে<br>
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায়!

চিরদিন সকলের একরূপ যায় না। পরবর্তী কালে যিনি লোকচরিত্র অঙ্কন করিয়া মহাকবি নামে পরিচিত হইবেন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন

ঘাত-প্রতিঘাতে বড়ই বৈচিত্র্যময়। তিনি ১৮৬৮ খ্রীঃ দ্বিতীয়া ভগিনী কৃষ্ণকামিনী ও অল্প পরেই অব্যবহিত অনুজ কানাইলালকে হারাইলেন। তাঁহার তেইশ বৎসর বয়সে একটি পুত্র জন্মিয়া এক মাস পরেই বিদায় লইল; ইহার সাত বৎসর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই শোকানল নির্বাপিত হইবার পূর্বেই আর একটি সহোদরার মৃত্যু হইল। অবশেষে গিরিশপত্নী সূতিকারোগে প্রায় এক বৎসর ভুগিয়া গিরিশের আপ্রাণ সেবাসত্ত্বেও দেহত্যাগ করিলেন (১৮৭৪-৭৫ খ্রীঃ)। দুঃখে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের শরণ লয়; কিন্তু গিরিশবাবু স্বেচ্ছায় সে সহায়তায় বঞ্চিত। এখন তাঁহার যন্ত্রণালাঘবের সহায় মাত্র সাহিত্যচর্চা, কাব্য-প্রণয়ন এবং সুরাপান। গিরিশচন্দ্র তাহাতেই ডুবিলেন।

বিপত্নীক গিরিশবাবু শীঘ্রই পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিলেন। নূতন পরিবারের ঐকান্তিক যত্নে গৃহে আবার শ্রী ফিরিল। তিনিও কতক সংযত হইলেন এবং থিয়েটারের কার্যে পূর্ণোদ্যমে যোগ দিলেন। রসসৃষ্টি এবং আনন্দপ্রদান ব্যতীত এই কার্যে তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা জানি না। কিন্তু এই থিয়েটারই তাঁহার জীবনকে অতঃপর এক মধুর পরিণতির দিকে লইয়া চলিল। তিনি চাহিয়াছিলেন পুরুষকার এবং যুক্তিতর্ক-পরিপুষ্ট অবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণ তীরদ্বয়ের মধ্যে জীবনপ্রবাহকে আবদ্ধ রাখিতে; কিন্তু ঘটনাপরম্পরার আকর্ষণে সে প্রবাহ ক্রমেই অধিকতর বিশাল ও শক্তিশালী হইয়া কখন কিরূপে যে অসীম সমুদ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না।

বুদ্ধি ও বিশ্বাসের ঘোর দ্বন্দ্বে তখন তাঁহার মন বিক্ষুব্ধ। বিপদে পড়িয়া তিনি কখনও অপরের অনুকরণে ঈশ্বরকে ডাকিয়া ফেলিতেন বটে; কিন্তু তখনই আবার কার্যকারণের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া বলিতেন, "এটা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটেছে।" দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে,

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি যখন ফ্রাইবার্জার কোম্পানির কাজে ভাগলপুরে ছিলেন, তখন একদিন বন্ধুদের সহিত বেড়াইতে গিয়া এক অন্ধকার গুহায় নামিয়া পড়েন। কিন্তু বহির্গমনের পথ না পাইয়া বন্ধুগণ বলিতে থাকেন যে, নাস্তিক গিরিশ সঙ্গে থাকায় এই বিপদ ঘটিয়াছে—এখন বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকা ভিন্ন উপায় নাই। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে অগত্যা তিনিও সে প্রার্থনায় যোগ দিলেন এবং তখনই সম্মুখে পথ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু বাহিরে আসিয়াই বলিলেন, "ভাই, আজ বিপদে পড়েই তাঁকে ডাকলাম; কিন্তু যদি বিশ্বাস ক'রে কখনও তাঁর নাম নিতে পারি তবেই নেব, নতুবা বিপদে কি—মৃত্যুভয়েও নয়।"

গিরিশবাবু প্রথমে ঐতিহাসিক নাটক লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণপূর্বক রঙ্গমঞ্চকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পৌরাণিক ও ধর্মবিষয়ক নাটক-রচনা আবশ্যক। সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনের তাড়নায়ই তিনি দেব-দেবী ও অবতারদের চরিত্রাঙ্কণে ব্রতী হইয়াছিলেন। নতুবা পূর্বোক্তরূপ মনোবৃত্তিবিশিষ্ট গিরিশবাবু যে অকস্মাৎ তাঁহাদের পূজায় আত্মসমর্পণ করিবেন, ইহা মোটেই যুক্তিসহ নহে। বস্তুতঃ অভিনেতা যেমন নাটকীয় ভূমিকাকে বুদ্ধিপূর্বক অঙ্গীকার করিয়াও তাহার সহিত একীভূত হন না, গিরিশও তেমনি লেখনীমুখে দেবচরিত্রাদি ফুটাইয়া তুলিলেও সর্বদা দ্রষ্টা ও সাক্ষী হইয়াই রহিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য রহিল দর্শকের চিত্তবিনোদন এবং প্রয়োজন হইল নামযশ ও জীবিকা।

ইহার সহিত বাল্যের সুসংস্কার যে একেবারেই মিশ্রিত ছিল না, তাহা নহে। অধিকন্তু তিনি তখন নিছক অর্থার্থীই নহেন, তিনি আর্তও বটেন। কত শোকই না তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছে! ইহারই মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের ছয়মাস পরেই বিসূচিকা-রোগে তাঁহার নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। মৃত্যু যখন শিয়রে দণ্ডায়মান, তখন

তিনি সহসা দেখিলেন সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব মাতৃমূর্তি—তাঁহার সীমন্তে সিন্দুর, নয়নদ্বয় স্নেহপূর্ণ, পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী। সেই দেবী তাঁহাকে দিলেন মহাপ্রসাদ খাইতে। গিরিশবাবুর যখন চমক ভাঙ্গিল, তখনও তাঁহার মুখে সেই মহাপ্রসাদের স্বাদ রহিয়াছে! অতঃপর তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই অলৌকিকরূপে পুনর্জীবনলাভান্তে আর একদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহাব চতুর্দিকে শত্রু; এমন কি, বন্ধুগণও নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত। পুরুষকার-সহায়ে সংসারে অভ্যুদয়লাভ করিয়া তিনি আজ পদে পদে বিপর্যস্ত! অধিকন্তু বিসূচিকা হইতে আরোগ্যের পরও তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যেব কোন উন্নতি দেখা গেল না। অগত্যা তিনি সর্বব্যাধিহর ৺তারকনাথ মহাদেবের শরণ গ্রহণপূর্বক কেশ-শ্মশ্রু রাখিলেন, নিত্য গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিলেন এবং শিবপূজা ও হবিষ্যান্ন-ভোজনে মন দিলেন। এই সময়ে তিনি প্রতিবৎসর শিবরাত্রি-ব্রত করিতেন এবং ৺তারকনাথদর্শনে যাইতেন; কখনও বা কালীঘাটে যাইয়া যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে আসন পাতিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বাকে ডাকিতেন। শোনা যায়, সকাম সাধকের প্রার্থনা মা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ করিয়াছিলেন—গিরিশ তখন ঔষধপ্রয়োগ ব্যতিরেকে শুধু ইচ্ছাশক্তিবলে রোগ আরোগ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার মনে তখন আকুলতাও জাগিয়াছে; তাই তাঁহার মুখে তখন রব উঠিত, "মা, মা," আর ৺তারকনাথের নিকট তিনি প্রার্থনা জানাইতেন, "আমার সংশয় ছেদন কর। যদি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয়ছেদন না হয়, তুমি আমার গুরু হও।"

সাহিত্যক্ষেত্রে গিরিশবাবু তখন পৌরাণিক নাটক-রচনায় লিপ্ত। একখানির পর একখানি নাটকে সাফল্যলাভের পর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের এক শুভমুহূর্তে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তাঁহার 'চৈতন্যলীলা' অভিনীত হইয়া বিকৃতরুচি নবীন বঙ্গকে পুরাতনের অবিস্মরণীয় আস্বাদ প্রদানপূর্বক

তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। গিরিশও কি তখন ভক্তিতে পরিপ্লুত? তাহার অবস্থা দেখিয়া তো ঐরূপ মনে হয় না। 'চৈতন্যলীলা'র রসাস্বাদে বিমুগ্ধ জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী স্বীয় প্রীতি ও ধন্যবাদজ্ঞাপনের জন্য গিরিশগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কবিবর সুরার বোতল লইয়া বসিয়া আছেন। নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ঔষধ সেবন করছেন?" নিন্দা ও স্তুতিতে ভ্রূক্ষেপহীন কবি জানাইলেন যে, বোতলে ঔষধ নহে, মদ্য আছে। গৌরলীলার সহিত এইরূপ আচারের অসামঞ্জস্য দেখিয়া বাবাজী তৎক্ষণাৎ বিদায় লইলেন।

বাবাজী গেলেন, কিন্তু এই 'চৈতন্যলীলা'ই অযাচিতভাবে গিরিশের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণকে আনিয়া দিল। 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয়ে সুখ্যাতি-শ্রবণে ঠাকুর একদিন ( ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ) ভক্তগণসহ থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া গিরিশবাবু অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলে ঠাকুরই তাঁহাকে প্রথমে প্রণাম করিলেন। গিরিশ প্রতিনমস্কার করিলে ঠাকুর আবার নমস্কার করিলেন। এইভাবে কয়েকবার চলিলে গিরিশ দেখিলেন, ঠাকুরের ভাগে সর্বদা একটি নমস্কার অধিক থাকিয়া যাইতেছে। গিরিশবাবু পরে বলিয়াছিলেন, "রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে।" তিনি প্রণামাস্ত্রে পরাজিত হইয়া মনে মনে শেষ নমস্কার জানাইলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া গিয়া উপরে বসাইলেন। তারপর একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া তিনি অসুস্থতাবশতঃ বাড়ি চলিয়া গেলেন। ইহা কিন্তু প্রথম দর্শন নহে, তৃতীয় দর্শন।

প্রথম দর্শন হইয়াছিল বসুপাড়ায় দীননাথ বসুর বাড়িতে ( সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খ্রীঃ )। গিরিশবাবু 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস-

দেবের কথা পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে আর্ত ও জিজ্ঞাসু গিরিশ বিসূচিকা হইতে অলৌকিকভাবে জীবনলাভের পর ধর্মে মন দিয়াছেন; কিন্তু উচ্চাঙ্গের বিশ্বাস তখনও মনে স্থান পায় নাই। 'মিরর'-পাঠান্তে তাঁহার মনে হইল, "ব্রাহ্মরা কি আবার এক পরমহংস খাড়া করিয়াছে!" যাহা হউক, পাড়ায় তিনি আসিয়াছেন জানিয়া কৌতুহলবশে সেখানে গিয়া দেখিলেন, পরমহংস মহাশয় উপদেশ দিতেছেন এবং কেশববাবু প্রভৃতি সানন্দে শুনিতেছেন। সন্ধ্যাসমাগমে একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ধ্যা হয়েছে?" শুনিয়া গিরিশ ভাবিলেন, "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে! সম্মুখে সেজ জ্বলছে, তবু ইনি বুঝতে পারছেন না যে সন্ধ্যা হয়েছে কি না।" সুতরাং আর সেখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন জানিয়া তিনি বাড়ি ফিরিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে দ্বিতীয় দর্শন। ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচূড়ামনি বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত গিরিশও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যোগী ও পরমহংসেরা কাহারও সহিত কথা বলেন না এবং কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ সাধ্যসাধনা করিলে পদসেবা করিতে দেন মাত্র। এই পরমহংস কিন্তু উহার বিপরীত! ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে কথা বলেন, আর দীনভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, বাস্তবের নিকট কাল্পনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল—তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে পরিণত হইল না। সেইদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখবে?" শ্রীযুত গিরিশের ইচ্ছা ছিল আরও দেখেন; কিন্তু শিশিরবাবু জোর করিয়াই সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তৃতীয় দর্শনকালে ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিকটে

আসিলেও সন্দেহ ও দম্ভের ঘোর কুজ্ঝটিকা তখনও কাটে নাই; সুতরাং গিরিশবাবু চিনিয়াও চিনিলেন না।

চতুর্থ দর্শনের পূর্বে জগদম্বাকে ডাকিয়া তিনি দেবতার ইহলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়াছেন; কিন্তু পরলোকের পথপ্রদর্শক গুরুর সন্ধান পান নাই। শাস্ত্রে বলিয়াছে বটে, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুর্কর্দেবো মহেশ্বরঃ" ইত্যাদি; কিন্তু ভগবানকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও মানুষকে তো গুরুর আসন দেওয়া চলে না—দম্ভ যে প্রতিপদে বাধা দেয়! এই সময়ে একজন বৈষ্ণব বলিলেন যে, তিনি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দেন এবং ভগবান তাহা গ্রহণ করেন; কখনও কখনও রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে। কিন্তু গুরুলাভ না হইলে তাদৃশ সাক্ষাৎকার অসম্ভব। ঘটনাটি যাহাই হউক, গুরুলাভসম্বন্ধে এই উক্তিটি শুনিয়া রুদ্ধগৃহে বসিয়া নিঃসহায় গিরিশবাবু অশ্রুবিসর্জন করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে তিনি পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসিয়া আছেন। এমন সময় ভক্তসমভিব্যাহারে ঠাকুর সেই পথে বলরাম-মন্দিরে যাইবারকালে গিরিশের সহিত চক্ষুর মিলন হইতেই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; কিন্তু গিরিশ প্রতিনমস্কার করিলে আর পুনর্নমস্কার না করিয়াই, তিনি নিজপথে চলিতে থাকিলে গিরিশের মনে হইল, কে যেন অদৃশ্য সূত্রে তাঁহার হৃদয় টানিয়া লইতেছে। একটু পরেই জনৈক ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।" তদনুসারে তিনি বলরাম-মন্দিরে গেলে কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "বাবু, আমি ভাল আছি; বাবু, আমি ভাল আছি"—বলিতে বলিতে কেমন যেন অবস্থা হইয়া গেল। পরে কহিতে লাগিলেন, "না না, ঢং নয়—ঢং নয়।" এ কি গিরিশের সন্দেহের উত্তর? একটু পরে গিরিশের সহিত এইরূপ আলাপ হইল—(গিরিশ) "গুরু কি?" "গুরু কি জান?—যেমন ঘটক। তোমার গুরু হয়ে গেছে।" (গিরিশ) "মন্ত্র কি?" "ঈশ্বরের নাম।" আরও কথাবার্তার

পর প্রত্যাবর্তনকালে গিরিশ অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার দম্ভের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—অবশেষে একদিন এই দেবমানবের নিকট তাঁহাকে মস্তক নামাইতেই হইবে।

পঞ্চম দর্শনকালেও সেই ভগ্ন দম্ভের কাঠামো দাঁড়াইয়া আছে। ভক্তপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার থিয়েটারের সাজঘরে প্রবেশপূর্বক যখন জানাইলেন যে, ঠাকুর অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন, তখন স্বস্থানে অবিচলিত থাকিয়াই গিরিশ কহিলেন, "ভাল বক্সে লইয়া গিয়া বসান।" দেবেনবাবু যখন বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসবেন না?" তখন বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না?" কিন্তু গেলেন ঠিকই। সেদিন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের সৌম্য মুখপদ্মদর্শনে গিরিশের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল—তিনি চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। অভিনয়ের অবকাশকালে পরমহংসদেব দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন; দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা গিরিশের অনুরোধসত্ত্বেও না বসিয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন—সাহিত্যিক গিরিশ তখনও জানেন না, বাস্তব জগতে গুরুকে শিষ্য কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যাহা হউক, গিরিশের সহিত আলাপ চলিতে লাগিল। গিরিশ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার মধ্যে যেন কি একটা নবধারা প্রবাহিত হইতেছে! ইতোমধ্যে ঠাকুর ভাবাবস্থায় একটি বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকিলে গিরিশের মনে প্রবল বিজাতীয় ভাবের উদয় হইল। অমনি ঠাকুর বলিলেন, "তোমার মনে বাঁক (আড়) আছে।" ইনি মনের ভাব বুঝিতে পারেন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁক যায় কিসে?" উত্তর হইল, "বিশ্বাস কর।"

ষষ্ঠ দর্শন হইল মধু রায়ের গলিতে শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। সেদিন গিরিশবাবু হঠাৎ একটু চিরকুট পাইলেন—সেখানে পরমহংসদেব

আসিতেছেন। অপরিচিত গৃহে যাইবেন কিনা এই বিচারবুদ্ধি আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেও এক অদৃশ্য টানে তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন সন্ধ্যাসমাগমে রামবাবুর প্রাঙ্গণে নৃত্য-পরায়ণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া ভক্তেরা নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন, "নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।" নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলে ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত গিরিশের দম্ভ ও ভক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিল—তিনিও ঐরূপ করিবেন কি-না। অমনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত ঠাকুর তাঁহারই ঠিক সম্মুখে আসিয়া পুনঃ সমাধিস্থ হইলে তিনি সাগ্রহে পদধূলি লইলেন। সঙ্কীর্তনান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া গিরিশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মনের বাঁক যাবে তো?" আশ্বাসের বাণী আসিল, "যাবে।" আবার জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি একই উত্তর পাইলেন। দুইবার জিজ্ঞাসা করায় সেদিন মনোমোহনবাবু তাঁহার অবিশ্বাসের জন্য রূঢ়স্বরে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বাধায় অসহিষ্ণু অভিমানী গিরিশ কিন্তু তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও সেদিন প্রতিবাদ করিলেন না। পরে তিনি থিয়েটারে যাইতে উদ্যত হইলে দেবেন্দ্রবাবু কিয়দ্দূর সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পরামর্শ দিলেন।

গিরিশের মন স্তরে স্তরে উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরে সপ্তম দর্শনকালে তাঁহার বোধ হইল যে, গুরুই জীবনের সর্বস্ব। সেদিন তিনি ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি মন্ত্রও আবৃত্তি করিলেন। ঠাকুর বসিতে বলিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে গিরিশ বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি উপদেশ শুনব না। আমি অনেক উপদেশ লিখেছি—তাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু ক'রে দিতে পারেন করুন।" ঠাকুর রামলাল দাদাকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন; উহার ভাবার্থ—বিশ্বাসই সব। গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" উত্তর আসিল, "আমায় কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ;

কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ; আমি এখানেই থাকি।" ফিরিবার সময় গিরিশ জানিতে চাহিলেন, "আমি আপনাকে দর্শন করেছি—আবার কি আমায় যা করতে হয় তাই করতে হবে?" ঠাকুর গিরিশকে কিছুই ছাড়ার উপদেশ না দিয়া ইতিমূলক বিশ্বাসের রাজবর্ত্মে চলিতে বলিলেন।

ঠাকুর কোন বিষয়ে গিরিশকে নিষেধ করিতেন না। জনৈক ভক্ত একদা ঐরূপ করিতে বলিলে ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না; ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।" এই বিষয়ে গিরিশও সাক্ষ্য দেন—"এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ-সেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি এ কি আপদ!" একদিন গিরিশ সুরাপানে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া অশ্বযানে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর লাটুকে বলিলেন, "গাড়িতে কিছু ফেলে এল কি-না দেখে আয় তো।" লাটু তাহাই করিলেন। আর একদিন কাশীপুরে গিরিশ উপস্থিত হইলে লাটুকে তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন, ফাগুর দোকান হইতে গরম কচুরী আনাইয়া খাওয়াইলেন এবং নিজ হাতে এক গেলাস জল গড়াইয়া দিলেন। গিরিশ এক রাত্রে বারাঙ্গনাগৃহে বন্ধুদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় প্রাণে দক্ষিণেশ্বরের আকর্ষণ অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই বন্ধুর সহিত ঘোড়ার গাড়িতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন মন্দিরোদ্যানের ফটক বন্ধ হইয়াছে, লোকজন নিদ্রিত। গিরিশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরমহংসদেব বাহিরে আসিলেন এবং মদ্যপানে বিহ্বল তাঁহার হাত ধরিয়া আনন্দে হরিনাম ও নৃত্য কবিতে লাগিলেন। সে স্নেহের স্পর্শে গিরিশের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। পরমহংসদেব সম্বন্ধে গিরিশ পরে বলিয়াছিলেন—"জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি।···তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া খাওয়াইতেন—আবার

পিতার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের আদর্শ।...আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না; কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই; কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু, যেহেতু আমাব দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক ভালবাসিতেন।"

একদিন ঠাকুর অভিনয় দেখিতে গেলে অপ্রকৃতিস্থ গিরিশ বাবু ধরিয়া বসিলেন, "তুমি আমার ছেলে হবে—বল।" ঠাকুর জানাইলেন যে, তাঁহার বাবা ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ, তিনি কেন গিরিশের ছেলে হইতে যাইবেন? গিরিশবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরকে অনেক গালাগালি করিলেন। ইহাতে উপস্থিত ভক্তেরা খুবই ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ঠাকুরকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন এইরূপ পাষণ্ডের নিকট আর না যান। ঠাকুর চুপ করিয়া শুধু সব শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। পরদিন দক্ষিণেশ্বরেও ঐ প্রসঙ্গ হইতেছে, এমন সময়ে ভক্তবীর রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "রাম, তুমি কি বল?" রামবাবু উত্তর দিলেন, "দেখুন, কালীয় সাপ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল, 'প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাব কোথায়?'—গিরিশবাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায়?" রামবাবুর কথা শুনিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "তবে চল, রাম, তোমার গাড়িতেই একবার সেখানে যাই।" ওদিকে প্রকৃতিস্থ হইয়া গিরিশ নিজ অপরাধ-স্মরণান্তে আহারাদি ত্যাগ করিয়াছেন; ঠাকুরকে দেখিয়াই পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন, আর কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর, তাহলে বুঝতুম, তুমি এখনো নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি—তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি

দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে ?"

কয়েকবার যাতায়াতের পর গিরিশবাবু ঠাকুরকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এখন থেকে আমি কি করব ?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যা করছ, তাই করে যাও। এখন এদিক ওদিক দুদিক রেখে চল; তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।" গিরিশবাবু তখন ভাবিতেছেন, "আমার স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই নিয়মিত সময় নাই; সুতরাং শ্রীগুরুর বাক্য স্বীকার করিয়া পরে অক্ষমতার জন্য কেবল দোষভাগীই হইতে হইবে।" আবার তিনি জানিতেন যে, "কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইলাম"—এই কথা ভাবিতেও তিনি হাঁপাইয়া উঠেন। অতএব নিজের অপারগ ও অসহায় অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁর একবার স্মরণ করে নিও।" গিরিশ তখনও নীরব। তাঁহার আহারের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই; আবার বৈষয়িক বিভ্রাটে আহার ভুল হইয়া যায়। নিদ্রার অবস্থাও তাই। এত সহজ গুরুবাক্যগ্রহণে অক্ষম হওয়ায় আপন ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিশের মনে তখন নৈরাশ্যের ঝড় বহিতেছে। তাই ঠাকুর আবার বললেন, "তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি।'—আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা দে।" ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা। কথাটি মনের মতো হওয়ায় গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল—তিনি ভাবিলেন, সমস্ত দায় ঠাকুরের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বকলমার গূঢ় অর্থ ক্রমেই তাঁহার নিকট প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে এক কঠিন সাধনসমরে অবতীর্ণ করিল। কোন কার্যে আর তাঁহার 'আমি', 'আমার' বলার পর্যন্ত অধিকার থাকিল না; সুখ-দুঃখে তাঁহার হর্ষ-বিষাদের অবকাশ রহিল না;

এমন কি, তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে ব্যক্তি বকলমা দিয়াছে, তাহার সাধনভজন-জপতপরূপ কার্যের আর অন্ত নাই—"তাকে প্রতিপদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটা করলে।" অচিরেই বকলমার পরীক্ষা দিতে হইল। দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহাকে দুইটি কন্যা ও একটি পুত্ররত্ন উপহার দিয়াছিলেন। অকালে সেই কন্যা দুইটি কালগ্রাসে পতিত হইল এবং স্ত্রীও পুত্রপ্রসবের পর সূতিকারোগে শয্যাগ্রহণ করিলেন; আর তিনি উঠিলেন না। ব্যথিত গিরিশবাবু লিখিলেন, "শূন্য প্রাণ, শূন্য এ সংসার!" কিন্তু বকলমা দিয়া তিনি নিঃশেষে আত্মদান করিয়াছেন; অতএব শেষ পর্যন্ত স্থির করিলেন, "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।"

ক্রমে এমন দিন আসিল, যখন শ্রীযুত গিরিশ পূর্বে যাঁহাকে ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীগুরুমূর্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বসাইলেন পূজার আসনে। শ্যামপুকুরে ৺কালীপূজা উপলক্ষ্যে ভক্তগণ যে নিশীথে ঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন গিরিশ। আবার কাশীপুরে ইংরেজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শুভ প্রথম দিনে যখন ঠাকুর 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন সেইদিনও গিরিশেরই অন্তস্তল হইতে উত্থিত অপূর্ব স্তব ঠাকুরের ঐশী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কল্পতরু হইবার অব্যবহিত পূর্বে গিরিশকে ঠাকুর যখন প্রশ্ন করিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (অবতারত্ব সম্বন্ধে) ব'লে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ ও বুঝেছ?" —তখন গিরিশ কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারি?" শ্রীযুত গিরিশের তখন পাঁচসিকা পাঁচআনা বিশ্বাস। ঠাকুরের গলা হইতে একদিন পুঁযরক্তাদি

পড়িয়াছে ; পাত্রাদি তখনও পরিষ্কার হয় নাই। গিরিশবাবু কাশীপুরে আসিলে ঠাকুর ইঙ্গিতে সেসব দেখাইয়া বলিলেন, "আবার বলে অবতার!" গিরিশ একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, "এবারে এসব খেয়ে কীট-পিপীলিকা পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে—তাই এই রোগ।" ঠাকুর অপর সকলের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "পাঁচসিকে পাঁচআনা।"

গিরিশবাবু জানিতেন যে, এমন পাপ নাই যাহা এই জ্বলন্ত দেবচরিত্রের সংস্পর্শে অচিরে ভস্মে পরিণত না হয়। তাই সাহঙ্কারে বলিতেন, "তুমি আসবে আগে জানলে আরো বেশী করে অপচার করে নিতুম।" আর কহিতেন, "ঠাকুরের কাছে আর সকল শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা এসেছিল; আর এমন পাপ নেই যা আমি করিনি। তবু তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন। ...তিনি কিছু নিষেধ করেননি—সব আপনি ছুটে গেল।" এই সবই সত্য ; কিন্তু শুধু পাপ-বিমোচনের দিক হইতে শ্রীযুত গিরিশকে দেখিলে অন্যায় হইবে—শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার 'ভৈরব' এক হস্তে সুধাপাত্র, অপর হস্তে সুরাভাণ্ড লইয়া মায়ের মন্দিরে উপস্থিত। গিরিশ 'চৈতন্যলীলা'দির ভিতর দিয়া যে সুধা বিতরণপূর্বক বঙ্গবাসীকে তৃপ্ত করিতেছিলেন, ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের পরে সে সুধা আরও অকাতরে বিতরিত হইতে লাগিল এবং উহার আস্বাদও অধিক রুচিপ্রদ হইল। 'চৈতন্যলীলা'দিতে যে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমবারি-সিঞ্চনে তাহা ফলপুষ্পসমন্বিত মহামহীরুহে পরিণত হইল। অতঃপর 'বিল্বমঙ্গল', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'নসীরাম' ইত্যাদি নাটকের প্রতিচরিত্র ও প্রতিপঙ্‌ক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নবভাবধারার সাক্ষ্য দিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যা করছ তাই করো ; ওতেও লোকশিক্ষা হবে।" আর একদিন তিনি জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তিনি

যেন গিরিশ প্রভৃতি কয়জনকে লোকশিক্ষার জন্য শক্তি দেন; কারণ একা ঠাকুরের পক্ষে অত কাজ করা অসম্ভব। জগন্মাতা সে প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও গিরিশচন্দ্রের অবদান অমূল্য। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার গৃহ ছিল ত্যাগী ভক্তদের একটি আনন্দের স্থান। অর্থ দিয়া, পরামর্শ দিয়া, রোগে সেবা করিয়া গিরিশ সর্বতোভাবে সঙ্ঘকে রক্ষা ও লালন-পালন করিয়াছিলেন। আর সেই ছোট ভাইদের উপর কত বিশ্বাস ও ভালবাসা! বিবেকানন্দ প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ সালে যেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে যোগ দেন, সেদিন তিনি গিরিশকে পঞ্চবটীতলায় সমাসীন দেখিয়া প্রণামানন্তর চলিয়া যাইবার সময় কে যেন তাঁহার সম্বন্ধে একটি কুৎসিত টিপ্পনী করিলেন। অমনি গিরিশ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "শালারা নিজেরাও ভাল হবে না আবার অপরের ভালও দেখবে না।... তিনি (ঠাকুর) বলতেন, 'ওরা (নরেন প্রভৃতি) হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে?' ওদের যদি নিজের চোখেও অন্যায় করতে দেখি, তা হলে বলব, ওরা অন্যায় করে নি, করতে পারে না—আমার নিজের চোখেরই দোষ হয়েছে। চোখ উপড়ে ফেলতে রাজী আছি, তবু ওরা অন্যায় করছে বলতে পারব না।"

ইহা শুধু মুখের কথা নয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রবীণ ভক্তেরা অকস্মাৎ ভাবিয়া বসিলেন যে, নরেন্দ্রাদি যুবকগণ সেবার নামে অযথা গৃহস্থদের কষ্টার্জিত অর্থের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন। প্রমাণ কিছুই ছিল না; তথাপি হিসাব দেখিতে চাহিলেন এবং দুই-চারি পয়সা ঠিকে ভুল পাইয়া ক্রুদ্ধভাবে শাসাইয়া গেলেন যে, তাঁহারা আর চাঁদা দিবেন না। কথাটা ঠাকুরের কানে উঠিলে তিনি সস্নেহে যুবকদিগকে বলিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, কেন না তিনি

তাঁহাদের আনীত ভিক্ষান্নেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। পরে শ্রীযুত গিরিশকে ডাকাইয়া সব শুনাইলেন। গিরিশ বিনা বাক্যব্যয়ে নিম্নে নামিয়া আসিলে যুবকগণ হিসাব দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। অমনি শূরভক্ত সে হিসাব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "কারো কাছে যেতে হবে না; আমি বাড়ির এক-একখানি ইট বিক্রী করে সব খরচ যোগাব।" কার্যতঃ অবশ্য ততদূর করিতে হইল না; কারণ ভক্তেরা অচিরে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন।

১৮৯১ খ্রীঃ গিরিশের দ্বিতীয় পক্ষের অতি আবদারের পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হইল। গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবার জন্য পুত্ররূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন। এই পুত্রের আচরণাদি-দর্শনে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার ঘরে আসিয়াছেন; অতএব ঐ দৃষ্টিতেই পুত্রের সেবাদি চলিতেছিল। সে কুসুমকলি অকালে বৃন্তচ্যুত হইলে তিনি দুঃসহ শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। অথচ ঠাকুরকে বকলমা দেওয়াতে শোকপ্রকাশেরও অবকাশ ছিল না—তিনি শুধু অন্তরেই জ্বলিয়া মরিতেছিলেন। এই শোকের কিঞ্চিৎ উপশমের জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিলেন। প্রবীণ কবি নবীন ছাত্রদের ন্যায় শ্লেট-পেন্সিল লইয়া গণিতশাস্ত্রের চর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও পুনর্বার আরম্ভ করিলেন এবং অভিনয়াদি নিত্যকর্ম হইতে অবসর লইয়া ভগবদালাপনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও এই শোক অতি গভীর এবং উহা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত থাকিয়া তাঁহার জীবনে অবসাদ আনিয়া দিতেছে, ইহা কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। তাই একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "ঠাকুর তো তোমায় সন্ন্যাসী করেছেন, চল দুজনে কোথাও চলে যাই।" গিরিশ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তোমরা যা বলবে, ঠাকুরের কথা-জ্ঞানে আমি এখনই করতে প্রস্তুত; কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা ক'রে

সন্ন্যাসী হবারও যে আমার সামর্থ্য নাই—ঠাকুরকে আমি যে বকলমা দিয়েছি।" নিরঞ্জন কহিলেন, "আমি বলছি, চল।" গিরিশ আর ইতস্ততঃ না করিয়া যাত্রা করিলেন। নিরঞ্জন জানিতেন, গিরিশের এই জ্বালা জুড়াইবার উপযুক্ত স্থান ঠাকুরের জন্মস্থান শ্রীধাম কামারপুকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর বাসভূমি জয়রামবাটী। তিনি তাঁহাকে সেই পুণ্যতীর্থদ্বয়ে লইয়া গেলেন। ঐ অঞ্চলে গিরিশ মায়ের আদর পাইয়া ও ঠাকুরের কৃপা অনুভব করিয়া কয়েকমাস আনন্দে কাটাইয়াছিলেন। অতঃপর শান্তহৃদয়ে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন যে, নিরঞ্জনের কৃপায়ই তাঁহার এবংবিধ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল!

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৺দুর্গাপূজাদর্শনের জন্য গিরিশ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে বলরাম-মন্দিরে আসেন এবং গিরিশভবনে প্রতিমা-দর্শন করিয়া ভক্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করেন। গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ ৺জগদম্বা-জ্ঞানেই পূজা করিতেন এবং অজ্ঞাতসারেও তাঁহার প্রতি ঈষন্মাত্র অবজ্ঞা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন। এক সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে পায়চারি করার কালে সহসা গিরিশের পত্নী তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্তী বলরাম-মন্দিরের গৃহচ্ছাদে অবস্থিতা মাতাঠাকুরানীর প্রতি আকর্ষণ করিলেন। অমনি গিরিশ নীচে নামিয়া আসিলেন এবং সহধর্মিণীকে বলিলেন, "না, না, আমার পাপনেত্র; এমন ক'রে লুকিয়ে মাকে দেখব না।"

ইং ১৯০৬ অব্দ হইতে তিনি প্রতি বৎসর হেমন্ত-সমাগমে শ্বাসরোগে কষ্ট পাইতেন। তদবধি তিনি সর্বপ্রকারে সংযত হইয়া চলিতে থাকিলেও রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯০৯-১০ অব্দে তিনি কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নিকটে এক ভাড়াবাড়িতে চারি মাস থাকিয়া আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সেবাশ্রমে আগত রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন এবং এই চিকিৎসায়

শহরে তাঁহার বেশ সুনাম হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের মতো জিনিস ছিল ঠাকুরের প্রসঙ্গ করা। স্বামী প্রেমানন্দ তখন কাশীতে গিরিশকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর অনেক সুস্থ হচ্ছে। আমরা নিত্যই প্রায় তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। আহা, তাঁর স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা ছিল, 'তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হবে।' ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কি চমৎকার কথাই তাঁর কাছে শুনি! যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্যি তাঁর কাছে থ্যাক্-থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও এমন স্বভাব দেখিনি। পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন—তাই প্রত্যক্ষ করছি। আর আমাদের উপর কি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা! ৬৮ বৎসর বয়স, কিন্তু বালকের মতো স্বভাব দেখি। ...শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা।...তাঁর চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভুর মহিমা।" কাশীতে থাকাকালে তিনি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'শঙ্করাচার্য' রচনা করেন। ঐ সময়ে তাঁহার মন সর্বদা ধর্মভাবে পূর্ণ থাকায় গ্রন্থেও উহার যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে। রচনা শেষ হইলে তিনি শঙ্কর-টিলায় যাইয়া শঙ্করাচার্যের বিগ্রহের সম্মুখে উহা পাঠ করিয়া আসেন ও নাটকের প্রথমাভিনয়ে লব্ধ অর্থ শঙ্কর মঠে দান করেন।

জীবনসন্ধ্যা যদিও ঘনাইয়া আসিতেছিল, তথাপি কাশী হইতে ফিরিয়া তিনি নব উৎসাহে রঙ্গালয়ের কার্যে যোগদান করিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আষাঢ় বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হইল যে, গিরিশবাবু 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। দুর্যোগ-রজনীতে কেহ আশা করে নাই যে, বিশেষ দর্শক-সমাগম হইবে। কিন্তু শ্রীযুত গিরিশের যাদুময় নামে আশাতীত লোকসমাগম হইল। বন্ধুগণ তাঁহাকে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে অভিনয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এত লোক

আগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, আর তিনি নামিবেন না—ইহা কিরূপ কথা? তাই সেই রাত্রে করুণাময়ের ভূমিকায় কয়েকবারই তাঁহাকে অনাবৃত দেহে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল। ইহার ফলে তাঁহার হাঁপানি আরম্ভ হইল। ইহাই শেষ পীড়া। জীবনের বাকী কয়টা দিন তিনি আর পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। এইরূপে প্রায় আট মাস ভুগিবার পর সকলেই বুঝিলেন, আর আশা নাই। শেষ তিন দিন রোগযন্ত্রণায় তিনি বসিয়া বিনিদ্র যামিনী যাপন করিতে করিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্বরাত্রে তৃতীয় প্রহরে সহসা নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিন বার রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণান্তে তিনি বলিলেন, "প্রভু, শান্তি দাও, শান্তি দাও।" শরীর আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না। পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১২ খ্রীঃ (২৫শে মাঘ, ১৩১৮) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় মহাকবি মহাপ্রয়াণ করিলেন।

# সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "জগদম্বা তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ (খাদ্যাদি) যোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদদার প্রেরিত হইয়াছে।···এই চারিজনের ভিতর রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ প্রথম ও শম্ভু মল্লিক দ্বিতীয় ছিলেন। সিমলার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে (যাহাকে ঠাকুর কখন 'সুরেন্দর' ও কখন 'সুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন) 'অর্ধেক রসদদার'—অর্থাৎ সুরেন্দ্র পুরা একজন রসদদার নয় বলিতেন।[১]···সুরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরের সেবাদির নিমিত্ত যে-সকল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ডাল-রুটির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন" (গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ২৭৭-৭৮ পৃঃ)।[২] "কাশীপুরের উদ্যানবাটী যখন···ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০৲) জানিতে পারিয়া···ডস্ট কোম্পানির মুৎসদ্দী পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা এত টাকা চাঁদায় তুলতে কেমন করে পারবে; অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।' সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা আজ্ঞা' বলিয়া ঐরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন" (দিব্যভাব, ৩২৭-২৮ পৃঃ)।

---

১ "সব গৌরবর্ণ। সুরেন্দ্র অনেকটা রসদদার বলে বোধ হয়"—কথামৃত, ৪।৩১।২
"এই তিনজন রসদদার" (শম্ভু, বলরাম ও সুরেন্দ্র)—শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৯৭

২ "ভক্তদের আহারের জন্য তিনি মাসিক ১০৲ টাকা দিতেন। 'The Life of the Holy Mother' (Madras), P. 64.

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাদেহ অপ্রকট হইলেও শ্রীযুত সুরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘদেহের পরিপুষ্টিবিধানে সতত নিরত ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে যখন গৃহী ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, কাশীপুরের বাগানবাটী ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক এবং যুবক সেবকগণের গৃহে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, তখন তারক, লাটু, বুড়ো গোপাল, কালী প্রভৃতির এরূপ কবিতে ইচ্ছা বা সুযোগ না থাকায় তাঁহারা তীর্থাদিতে থাকিয়া কোনও প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে আফিস হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগত সুরেন্দ্র সন্ধ্যাকালে পূজাগৃহে বসিয়া এক দিব্য দর্শন পাইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" শুনিয়াই সুরেন্দ্র উন্মত্তবৎ ছুটিয়া সমপল্লীবাসী নরেন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সমগ্র বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সকাতরে বলিলেন, "ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি, ভস্মাদি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমত পূজার্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমরা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে সেখানে জুড়ুতে পারব। আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" নরেন্দ্রনাথও এই প্রস্তাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাড়ির সন্ধানে [illegible]স্তত: ঘুরিতে লাগিলেন এবং বরাহনগরে গঙ্গাতীরে মুন্সীদের একটি জীর্ণ উদ্যানবাটী মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় স্থির করিলেন। এইরূপে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের শেষভাগে আদি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সূত্রপাত হইল। সুরেন্দ্র প্রথম দুই মাস ত্রিশ টাকা করিয়া দিতেন। ক্রমে মঠে ত্যাগী ভাইদের যোগদানের ফলে যেমন ব্যয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি দানের পরিমাণও বাড়িয়া মাসে ১০০৲ টাকা পর্যন্ত উঠিল। এই টাকা হইতে বাড়ি ভাড়া ১১৲ টাকা এবং পাচক-ব্রাহ্মণের

মাহিয়ানা ৬৲ টাকা দেওয়া হইত ; বাকী অর্থ ডালভাতের জন্য ব্যয়িত হইত। সুরেন্দ্রের এই সময়ের বদান্যতা স্মরণ করিয়া 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন, "ধন্য সুরেন্দ্র ! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়া ! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মুলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন।···ভাই, তোমার ঋণ কে ভুলিবে ? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ি ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে" ( ২য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ১ম পরিচ্ছেদ )।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রীযুত সুরেন্দ্র যখন প্রথম যান, তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক ত্রিশ বৎসর, শরীর সুগঠিত ও বলবান এবং বর্ণ গৌর। তিনি তখন মুৎসদ্দীর কার্যে মাসিক তিন-চারি শত টাকা রোজগার করেন। স্বভাব আপাততঃ একটু কর্কশ মনে হইলেও অন্তরে তিনি অতি সরল এবং মন সুদৃঢ় ; স্বধর্মের বিরোধী না হইলেও উহাতে তাঁহার আস্থা নাই ; মেজাজ একটু সাহেবীভাবাপন্ন ; অধিকন্তু সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য-ভাবানুকরণে "সুরাপানে সুরেন্দ্রের বড়ই পীরিতি।" বাহ্যতঃ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিলেও তাঁহার অন্তরে তখন হুতাশনপ্রায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা। উহা হইতে নিস্তারের উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি বিষপানে প্রাণনাশের পর্যন্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে পূর্বপরিচিত বন্ধু রামচন্দ্র ও মনোমোহন একদিন এই অশান্তির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইল তাহা রামচন্দ্রের ভাষাতেই উদ্ধৃত হইতেছে—"সেইদিন পরমহংস নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, 'দেখ, তোমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই, আমায় কেন আর সেই স্থানে লইয়া যাইবে ?

হংসমধ্যে বকো যথা। ঢের দেখিয়াছি—তিনি যদ্যপি কোন বাজে কথা কহেন তাহা হইলে আমি তাঁহার কান মলিয়া দিব' " ('ভক্ত মনোমোহন', ৭০ পৃঃ)। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই চরিত্রের সহিত গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। উত্তরকালে সুরেন্দ্র ইহা নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একদিন গিরিশবাবুকে দেখাইয়া সহাস্যে সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি তো কি? ইনি তোমার চেয়ে—" কথা সম্পূর্ণ না হইতেই সুরেন্দ্র সমর্থনের সুরে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা!" যাহা হউক, আলোচ্য সময়ে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রামচন্দ্র ও মনোমোহনের পীড়াপীড়িতে সুরেন্দ্রকে তাঁহাদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল।[৩] শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া সুরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম না করিয়াই আসনে বসিলেন। ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত ঠাকুরের বদন হইতে তখন অমৃতবাণী উৎসারিত হইতেছে। সুরেন্দ্র তেজস্বী, পুরুষকারে বিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় অনেকটা প্রভাবান্বিত হইলেও আজ সবিস্ময়ে শুনিলেন ঠাকুর বলিতেছেন, "লোকে বাঁদর-ছানা হইতে চায় কেন? বিড়াল-ছানা হইলেই তো ভাল হয়, বাঁদরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে তবে সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। কিন্তু বিড়াল-ছানার স্বভাব

---

৩ 'লীলাপ্রসঙ্গে'র (দিব্যভাব, ৫৫ পৃঃ) মতে ইহা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে কিন্তু আছে—"আমরা যখন দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করিতেছি তাহার কয়েক মাস পরে···অটুট বিশ্বাসী, স্পষ্টবক্তা মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথ মিত্র···আমাদের সহিত যোগদান করিলেন" (৮০পৃঃ)। ঐ স্থলেই উল্লিখিত আছে যে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে সুরেন্দ্রের উদ্যোগে ও উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। রাম ও মনোমোহন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান ১৮৭৯-এর শেষভাগে ('কথামৃত, ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ)। অতএব ধরা যাইতে পারে যে, সুরেন্দ্রের গমনাগমন আরম্ভ হয় ১৮৮০-এর প্রথমে। ঐ সময়ে তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর; অতএব জন্মবৎসর সম্ভবতঃ ১৮৫০ খ্রীঃ।

সেরূপ নহে, তাহার মা যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সেই স্থানে পড়িয়াই 'ম্যাও ম্যাও' করিতে থাকে। বাঁদর-ছানার স্বভাব জ্ঞানপ্রধান ও বিড়াল-ছানার স্বভাব ভক্তি-প্রধান।" সুরেন্দ্রের মনে হইল, এ যেন তাঁহাকেই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। নিজ বুদ্ধি-বিবেচনায় অতিমাত্র নির্ভর করিয়াও তিনি জীবনসমস্যার কোন সমাধান খুঁজিয়া পান নাই; এমন কি, স্বীয় অপারগতায় হতাশ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যার আয়োজন করিতেছিলেন। অথচ ইনি সমস্ত ভার লইবার ইঙ্গিতের সহিত তাঁহাকে এক শান্তিময় নূতন পথের সন্ধান দিলেন। সুরেন্দ্র অকূলে কূল পাইলেন, সুরেন্দ্র মজিলেন। অতঃপর তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে না যাইয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। আর প্রকাশ্যে বলিতেন, "তাঁহার কান মলিয়া দিব বলিয়া গর্ব করিয়াছিলাম; কিন্তু ফিরিবার পথে তাঁহার নিকট কানমলা খাইয়া আসিলাম। তিনি কি যেমন তেমন গুরু!" প্রথম দিনে ফিরিবার কালে পরাজিত সুরেন্দ্র পরমহংসদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সাদরে পুনর্বার আসিতে বলিয়া দিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু বিপরীত পথে চলিয়া যখন নিজের প্রায় সর্বনাশ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় যথার্থ পথ দেখিতে পাইলেন। এখন তিনি নিত্য ঠাকুর-ঘরে বসিয়া ধ্যানাদি অভ্যাস করেন। একদিন তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার বাসনা জাগিল; তিনি স্থির করিলেন, পূজাগৃহে ধ্যানকালে যদি ঠাকুরের আবির্ভাব হয়, তবেই তিনি জানিবেন যে, ঠাকুর অবতার। কি আশ্চর্য!—

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান।
ভবনে হাজির তাঁর প্রভু ভগবান॥

এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর।
সুরেন্দ্রের প্রভুপদে পড়িল নির্ভর॥ ('পুঁথি')

শ্রীযুত সুরেন্দ্রের পরবর্তী জীবনকাহিনী অতীব চমকপ্রদ। আমরা গিরিশবাবুর জীবনালোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি, তিনি কিরূপ স্তর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপায় কীদৃশ উচ্চ নিষ্কাম ভক্তির ভূমিতে উঠিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের জীবনেও অনুরূপ ঘটনারই পরিচয় পাই। নতুবা ধর্মে আস্থাহীন, মদ্যপ, আত্মহত্যায় কৃতোদ্যম সুরেন্দ্র কিরূপে রামকৃষ্ণভাবধারার অন্যতম পরিপোষক হইতে পারেন? ইহা পরমহংসদেবেরই মহিমা। কারণ উত্তমকে সকলেই উত্তম পথে পরিচালিত করিতে পারে; কিন্তু অধমকে যিনি পরহিতার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার শক্তি অসীম। মুৎসদ্দীর গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যে কর্তব্যপরায়ণ সুরেন্দ্রের অবসর ছিল না বলিলেই হয় —সারাদিনেও তাঁহার কর্ম শেষ হইত না। অথচ ইহারই মধ্যে তাঁহার অন্তরে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মনন চলিত; আবার কখন কখন মন এমনই চঞ্চল হইয়া উঠিত যে, অসমাপ্ত কার্য ফেলিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছুটিতেন। এইরূপে এক অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপনীত সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জানিলেন যে, ঠাকুর তাঁহারই সহিত মিলিত হইবার জন্য তখনই কলিকাতায় যাইতে উদ্যত! সুরেন্দ্রকে দেখিয়াই তিনি ঐকথা বলিলেন। সুরেন্দ্র কিন্তু ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইবার সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে গাড়িতে বসাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু শুধু শ্রীরামকৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকিয়া এবং বিবিধরূপে তাঁহার প্রেম-আস্বাদন ও তৎপ্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিয়াই স্থির থাকিতে পারেন নাই; যে অমৃতের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাকে উত্তমরূপে উপভোগ করিতে এবং অপরকেও তাহার আস্বাদন করাইতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আমরা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, সুরেন্দ্রের গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্যের প্রথম মিলন হয়।

ঐ গৃহ প্রায়ই ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তদের সমাগমে মহোৎসবে মাতিয়া উঠিত। 'কথামৃতে' (৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট ৭৫-৭৭ পৃঃ) এইরূপ একখানি চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। উহাতে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সুরেন্দ্র-ভবনে কীর্তনানন্দাদিতে মগ্ন থাকিলেও ভক্তের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ও তাঁহার চিত্তের সর্বপ্রকার বাসনা-কামনার সহিত সুপরিচিত ঠাকুর প্রয়োজনস্থলে তাঁহাকে শাসন করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। ঘটনাটি এইরূপ —১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের এক সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সুরেন্দ্রের দ্বিতলে বৈঠকখানায় ঠাকুর ভক্তপরিবৃত হইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে সুরেন্দ্র মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে গেলে তিনি উহা হাতে লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তখন সুরেন্দ্র পশ্চিমের বারান্দায় যাইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং সমীপস্থ ভক্তবৃন্দকে অভিমান-ভরে কহিলেন, "রাঢ় দেশের বামুন এ-সব জিনিসের মর্যাদা কি জানে! অনেক টাকা খরচ ক'রে এই মালা! ক্রোধে বললাম, সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ—ভগবান পয়সার কেউ নয়, অহঙ্কারের কেউ নয়! আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা কেন লবেন? আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রুধারায় গণ্ড ও বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যসিদ্ধি হইয়াছে; অনুতপ্ত ভক্তকে অতঃপর কৃপাপ্রদর্শন আবশ্যক। অতএব ঐ সময়ে কীর্তন ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইলে তিনি পরিত্যক্ত মালাটি তুলিয়া লইয়া এক হস্তে উহা ধারণপূর্বক অপর হস্ত নানা ছন্দে দুলাইতে দুলাইতে মধুর নৃত্যলহরীতে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উহা গলায় পরিলেন এবং নৃত্যশেষে সুরেন্দ্রকে বলিলেন, "আমায় কিছু খাওয়াবে না?" —বলিয়া তখনই সুরেন্দ্রের আহ্বানে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া তখন এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি বিরাজিত!

শ্রীযুত সুরেন্দ্রের চরিত্র ও তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসম্বন্ধে ঠাকুর

অবহিত ছিলেন বলিয়াই একদিকে যেমন তাঁহাকে শাসন করিতেন, অন্যদিকে তেমনি সাহস দিয়া ক্রমে উচ্চাদর্শের প্রতি লইয়া যাইতেন—অকস্মাৎ অসম্ভব কর্তব্য সম্মুখে স্থাপনপূর্বক তাঁহার জীবন হতাশাচ্ছন্ন করিতেন না। সেদিন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণেশ্বরে স্বকক্ষে উপবিষ্ট ঠাকুর সস্নেহে সুরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হ'লে কলঙ্ক পড়বে।...সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ।...তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে, আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে। বীরভক্ত না হ'লে দু'দিক রাখতে পারে না।...তুমি অফিসে মিথ্যা কথা কও; তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার যে দান-ধ্যান আছে! তোমার যা আয়, তার চেয়ে বেশী দান কর—বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি!" ('কথামৃত', ৫।১৬।৩)। আর একদিন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) সুরেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন, "আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন?" ঠাকুর যদিও বুঝিলেন যে, ক্ষমতানুসারে সরলভাবে সাধন করাই উন্নতির রহস্য—ইহা না জানিয়া সুরেন্দ্রনাথ অপরের অনুকরণে স্বীয় অধিকার অতিক্রমপূর্বক অকস্মাৎ উচ্চস্তরে আরোহণের বৃথা প্রচেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিতেছেন, তথাপি সেই রূঢ় সত্যসহায়ে ভক্তের দৃষ্টি তদীয় প্রকৃত অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বৃথা পীড়া দেওয়া অনুচিত, বরং পূর্বলব্ধ সাফল্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে সাহস দেওয়াই কর্তব্য, এই বিবেচনায় কহিলেন, "স্মরণ-মনন তো আছে?" সুরেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, 'মা মা' ব'লে ঘুমিয়ে পড়ি।" অমনি উৎসাহ দিয়া ঠাকুর বলিলেন, "খুব ভাল—স্মরণ-মনন থাকলেই হ'ল।"

সুরেন্দ্রনাথের দান ও ঈশ্বরপ্রণিধানে মুগ্ধ ঠাকুর অনেক সময় স্বেচ্ছায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। এইভাবেই (২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২)

কেশবচন্দ্রের সহিত স্টীমারে বিহারের পর সন্ধ্যাসমাগমে গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার পথে তিনি ভক্তগণসহ সিমুলিয়া স্ট্রীটে সুরেন্দ্রভবনে পদার্পণ করিলেন। সুরেন্দ্র তখন গৃহে ছিলেন না। সুতরাং গাড়ি-ভাড়া মিটাইবার সময় ভক্তেরা যখন জানাইলেন যে, হাতে টাকা নাই, তখন সুরেন্দ্রের প্রতি অনুপম আস্থা ও আত্মীয়তা-প্রদর্শনচ্ছলেই যেন ঠাকুর নিঃসঙ্কোচে নির্দেশ দিলেন, পরিবারের মহিলাদের নিকট হইতে ভাড়ার টাকা চাহিয়া লওয়া হউক এবং বলিলেন যে, অন্তঃপুরচারিণীদেরও উহা দেওয়া উচিত ; কারণ তাঁহাদের তো জানাই আছে যে, সুরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান। বলা বাহুল্য, ভাড়ার ব্যবস্থা সেদিন ঐভাবেই হইল ; অধিকন্তু গৃহবাসীরা ঠাকুর ও ভক্তদিগকে সাদরে উপরে লইয়া গিয়া সুরেন্দ্রের বৈঠকখানায় বসাইলেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, নরেন্দ্রও সংবাদ পাইয়া আসিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রি পর্যন্ত সুরেন্দ্র ফিরিলেন না দেখিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।

সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কৃপাবিতরণার্থে ঠাকুর কতবার কিভাবে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে আমরা জানি যে, কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্রের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধনভূমিদর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে ( ২৬শে ডিঃ, ১৮৮৩ ) ঠাকুর সুরেন্দ্রের তত্রত্য উদ্যান-বাটীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক সাধুর সহিত আলাপনান্তে জলযোগ করেন। আর একবার ( ১৫ই জুন, ১৮৮৪ ) তিনি সুরেন্দ্রের আমন্ত্রণে ভক্তসহ ঐ উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইয়া কীর্তনাদিদ্বারা আনন্দের তুফান তুলিয়াছিলেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "সুরেন্দ্র কোথায় ? আহা, সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটি হয়েছে। বড় স্পষ্টবক্তা ···আর খুব মুক্তহস্ত।" ১৮৮২-এর ৺জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুর শ্রীযুত সুরেন্দ্রের কলিকাতার গৃহে গিয়াছিলেন এবং পরবৎসর ৺অন্নপূর্ণা-দর্শনে তথায় যাইয়া নৃত্য-গীতাদি-সহকারে কৃপাবর্ষণ করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু মদ্যপান করিতেন—প্রথম প্রথম একটু বাড়াবাড়িই হইত। এদিকে তাঁহার পল্লীবাসী বন্ধু রামচন্দ্র বৈষ্ণব এবং এরূপ আচরণের ঘোর বিরোধী। তিনি সুরেন্দ্রকে মদ্যত্যাগ করিতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐরূপ না করিলে তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই দুর্নাম হইবে। সুরেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, দুঃসাধ্য হইলেও তিনি উহার চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাহাই গুরুদেবের অভিপ্রেত হয়; কিন্তু কহিলেন, "ভাই, যদি ত্যাগ করাই উচিত হ'ত, তাহলে পরমহংস মশায় কি তা ব'লে দিতেন না?" অগত্যা স্থির হইল যে, নির্দেশ লইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে। তাঁহারা যখন সেখানে গেলেন, তখন ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া বকুলতলায় বসিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের অবস্থা তিনি জানিতেন এবং ঐজন্য চিন্তিতও ছিলেন। আজ জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তিনি স্বতই মদ্যপানের বিষয়ে কথা তুলিলেন; পরন্তু অকস্মাৎ পানত্যাগের আদেশ না দিয়া বরং বলিলেন, "দেখ, যা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে খাবে; আর যেন মাথা না টলে, পা না টলে। তাঁকে চিন্তা করতে করতে তোমার পান করতে আর ভাল লাগবে না—তিনি কারণানন্দদায়িনী। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।" সেইদিন এই আনন্দের চাক্ষুষ পরিচয় দিবার জন্যই যেন ভাবে গরগর মাতোয়ারা হইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢলঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥ ইত্যাদি

ঠাকুর আরও কহিলেন, "প্রথম কারণানন্দ হবে, তারপর ভজনানন্দ।" "সুরেন্দ্র তদবধি তদ্রূপ অনুষ্ঠানই করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন অনন্যকর্মা হইয়া কিঞ্চিৎ কারণ ৺মা-কালীকে নিবেদনপূর্বক সেই প্রসাদ পান করিতেন; কিন্তু কারণানন্দ না আসিয়া তাঁহার ভজনানন্দের উদয় হইত। সেই সময়ে তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনর্গল অশ্রুধারা, মুখে মধ্যে মধ্যে

মর্মস্পর্শী করুণস্বরে 'মা মা' রব, মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ ধ্যানে মগ্ন অবস্থা দেখিয়া নাস্তিক দর্শকের হৃদয়েও ভগবদ্ভাবের সঞ্চার হইত এবং এই সময়ে তিনি ভগবৎকথা ব্যতীত অন্য কোন কথা কহিতে বা শুনিতে ভালবাসিতেন না। ···সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তাঁহার মনের অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু আপনার পূর্ব স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না। এই অভিমানে এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। তাঁহার বন্ধুরা রামকৃষ্ণদেবকে জানাইলেন যে, তিনি আবার পূর্বের মতো মন্দ লোকের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, 'আচ্ছা, এখনও ভোগবাসনা আছে—দিন কতক ভোগ করে নিক্ ; এর পরে ও-সব কিছুই আর থাকবে না—সে নির্মল হয়ে যাবে।' তাহার পর রবিবারে সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া একটু সলজ্জভাবে রামকৃষ্ণ-দেবের নিকট হইতে অল্প দূরে যাইয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব ইহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'কি গো, চোরটির মতো অমন দূরে গিয়ে বসলে কেন? এগিয়ে কাছে এস।' সুরেন্দ্র নিকটে আসিলে রামকৃষ্ণদেবের ভাব হইয়া পড়িল এবং তদবস্থায় তিনি কহিলেন, 'আচ্ছা, লোকে যখন কোথাও যায় তখন মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না কেন? মা সঙ্গে থাকলে অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পায়।' ···সুরেন্দ্রের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। এতদিন বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার রোগের কোন প্রতিকার করিতে পাবেন নাই, অদ্য রামকৃষ্ণদেবের কথায় তাহার প্রকৃত ঔষধ প্রাপ্ত হইলেন—রোগমুক্ত হইবার উত্তম পথ পাইলেন" ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত', ১৯১-১৯৪ পৃঃ)।

ভক্তিশ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সহিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রের চরিত্রের যেমন উন্নতি হইতে থাকিল এবং তিনি যেমন অধিকতর ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন, ঠাকুরও তেমনি আরও স্পষ্টতরভাবে তাঁহার ভুলত্রুটি দেখাইয়া তাঁহাকে সুপথে

পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রবাবু একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের নিকট বলিতেছিলেন যে, তিনি এক সময়ে তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে পাণ্ডা ও ভিখারীরা 'পয়সা দাও' 'পয়সা দাও' রবে বড়ই বিরক্ত করিতে থাকে ; তাই তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি পাণ্ডা প্রভৃতিকে মুখে যদিও বলিলেন যে, পরদিন কলিকাতায় ফিরিবেন, তথাপি সেই দিনই তাহাদের অজ্ঞাতসারে পলাইয়া আসিলেন। শুনিয়া এইরূপ মিথ্যাচারের জন্য ঠাকুর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। লজ্জিত সুরেন্দ্রনাথ তখন প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিয়া জানাইলেন যে, বৃন্দাবনের নির্জন স্থানগুলিতে যাইয়া তিনি তপস্যানিরত অনেক বাবাজীকে দর্শন করিয়াছেন। অমনি ঠাকুর জানিতে চাহিলেন, তিনি তাঁহাদের কিছু দিয়াছেন কি-না। সুরেন্দ্র যখন উত্তর দিলেন যে, কিছুই দেওয়া হয় নাই, তখন ঠাকুর বলিলেন, "ও ভাল কর নাই—সাধু-ভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়।" শাসনের সঙ্গে সুরেন্দ্র আবার স্নেহস্পর্শও পাইতেন। কাশীপুরে একদিন ( ১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬ ) রাত্রি নয়টায় সুরেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্রের আনীত মালা পরিধান করায় ঠাকুরকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সেদিন সুরেন্দ্রের প্রতি আরও কৃপাবর্ষণের জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিতে স্বপার্শ্বে আনাইয়া প্রসাদী মালা তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলে শ্রীপদে হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। সে স্নেহস্পর্শে সেদিন সুরেন্দ্রের আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তিনি সানন্দে ভক্তদের সহিত কীর্তনে যোগ দিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া গান ধরিলেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।

আমি মায়ের পাগল ছেলে, (আমার) মায়ের নাম শ্যামা॥ ইত্যাদি।

কাশীপুরে আরও একদিন ( ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ ) ঠাকুরের শ্রীহস্ত হইতে

সুরেন্দ্রবাবু দুইগাছি মালা পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এইরূপ সৌভাগ্য তাঁহার প্রায়ই ঘটিত।

আমরা দেখিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে পূজা-ধ্যানাদি প্রচলিত রীতি-অবলম্বনে বৈধী ভক্তির পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারাও বহুদিন যাবৎ যুক্তি ও অনুমানাদি-অবলম্বনেই পরিচালিত হইত। তাই একদিন (২রা মার্চ, ১৮৮৪) তিনি কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন?" ঠাকুর এই গতানুগতিক চিন্তাধারার ত্রুটিপ্রদর্শনচ্ছলেই যেন বলিলেন, "এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল—কিছু বোঝা যায় না।"

দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বে সুরেন্দ্র দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগ্রহে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হওয়ায় তিনি নিত্য ঠাকুরের স্বীয় ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীকালীমাতার সম্মুখে দীর্ঘকাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাসে একসময়ে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, অন্যান্য বহু ভক্তের ন্যায় তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ঠাকুরের সান্নিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে অন্ততঃ রাত্রিকালে বাস করিয়া সাধনাদিতে ডুবিবেন। সঙ্কল্পানুসারে একটি বিছানা আনিয়া তথায় রাখিলেন এবং দুই-এক দিন রাত্রিবাসও করিলেন। ঠাকুর শুধু দ্রষ্টা হিসাবে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন—কিছুই বলিলেন না। কিন্তু মিত্রগৃহিণী আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "তুমি দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও; রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না।" অতএব সুরেন্দ্রের আর সেখানে রাত্রিবাস হইল না। এইরূপে আপাততঃ বিফলকাম হইলেও সুরেন্দ্রের হৃদয়ে বিষয়কামনা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং তিনি স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল জীবন সংযত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাই কেদারবাবু একদা (১০ই মাঘ, ১৮৮২) যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন, "যদ্যপি এদের (রাম, সুরেন্দ্র,

মনোমোহন) চরণে স্থান দিয়েছেন, তবে আর কেন এদের নিগ্রহ দেন; একবার ভাল ক'রে দয়া করুন, যেন এরা নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে," এবং ঠাকুর যখন তদুত্তরে উদাসীনপ্রায় বলিলেন, "আমি কি করব? আমার কি ক্ষমতা আছে? যদি তিনি মনে করেন তো সকলই হ'তে পারে," অধিকন্তু আর কিছুই না করিয়া কিয়ৎকাল পরে সন্ধ্যার প্রারম্ভে পঞ্চবটীমূলে যাইয়া নিশ্চেষ্টপ্রায় বসিলেন, তখন সুরেন্দ্র আর আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আমাদের আর কেন যন্ত্রণা দিতেছেন? আমরা জানি আমরা পাপী; কেন না আমরা মহাপুরুষের নিকট সর্বদা আসিতেছি, হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছি, ভাবে গদ্‌গদ হইতেছি, লোকে দেখিতেছে যে ইঁহারা সাধু হইতেছেন, কিন্তু যদ্যপি আপন আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যায়, সে বলিবে, 'আমি সাধুর একবিন্দু বাতাসও পাই নাই।' ...আমাদের মনের যে-সকল অসৎ সংস্কার ছিল, তাহা যখন বিন্দুমাত্র কমে নাই, তখন কি করিয়া আমরা সাধু হইলাম? বরং শঠতা বিলক্ষণ শিখিলাম—আগে এমন করিয়া কাঁদিতে পারিতাম না, এখন বেশ কাঁদিতেছি।" ঠাকুর কিন্তু দেখিতেছিলেন যে, এই চক্ষের জলে এবং আত্মবিশ্লেষণের ফলে সুরেন্দ্রের পূর্ব সংস্কার ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে; সুতরাং সুরেন্দ্রাদির পুনঃপুনঃ করুণ মিনতির উত্তরে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "আনন্দময়ী করুন, তোমরা সকলে আনন্দে থাক।"

সত্যসংকল্প ঠাকুরের সে আশীর্বাদ অচিরেই সফল হইয়া সুরেন্দ্রকে ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ করিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৺দুর্গাপূজার সময় ঠাকুর অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে বাস করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রের গৃহে পূজা হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুর যাইতে পারেন নাই। বিজয়ার দিনে (১৮ই অক্টোবর) ৺মহামায়ার আশু বিদায়ের দুঃখ সহ্য হইবে না বোধে সুরেন্দ্র বাড়ি ছাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং প্রাণের

আবেগে 'মা মা' করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে বহু কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁর ভাব দেখিয়া ঠাকুরের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল ; তিনি মাস্টার মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বিগলিতস্বরে বলিলেন, "কি ভক্তি! আহা, এর যা ভক্তি আছে!"—এই বলিয়া সুরেন্দ্রকে জানাইলেন যে, নবমীর রাত্রে সাতটা সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার এক দিব্য দর্শন হইয়াছিল। তিনি সম্মুখে দেখিলেন সুরেন্দ্রদের দালান, ঠাকুর-প্রতিমা রহিয়াছেন—সব জ্যোতির্ময় ; শ্যামপুকুরের আবাস-স্থল ও সেই ঠাকুর-দালান এক হইয়া গিয়াছে—যেন একটা আলোর স্রোত দুই জায়গার মধ্যে প্রবাহিত। সুরেন্দ্র বলিলেন,"আমি তখন ঠাকুর-দালানে 'মা মা' বলে ডাকছি—দাদারা ত্যাগ ক'রে উপরে চলে গেছে। মনে উঠল—মা বললেন, আমি আবার আসব।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সুরেন্দ্রবাবুর বিশ্বাসের পরিচয় আর একদিনের ( ১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৬ ) ঘটনায় পাওয়া যায়। ঠাকুর তখন কাশীপুরের উদ্যানে রোগশয্যায় শায়িত। সুরেন্দ্র অফিসের কার্যসমাপনান্তে চারিটি কমলা লেবু ও দুই ছড়া ফুলের মালা লইয়া রাত্রি আটটায় সেখানে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "আজ ১লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার ; কালীঘাটে যাওয়া হ'ল না—ভাবলাম, যিনি কালী, যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে" ( 'কথামৃত,' ৩।২৬।২ )। সুরেন্দ্র সেদিন কথাপ্রসঙ্গে আরও জানাইলেন যে, পূর্বদিন সংক্রান্তি ছিল ; কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই ; তাই স্বগৃহেই ঠাকুরের ছবি ফুল দিয়া সাজাইয়াছিলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া সমীপস্থ মাস্টার মহাশয়কে ইঙ্গিতে বলিলেন, "আহা, কি ভক্তি!"

শ্রীরামকৃষ্ণের রসদদার সুরেন্দ্রের দানের পরিমাণ কিরূপ ছিল, তাহা কেহ স্পষ্টতঃ লিখিয়া রাখেন নাই ; তবে প্রবন্ধের প্রারম্ভে 'লীলাপ্রসঙ্গের' যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠক উহা হইতে কতক বুঝিতে

পারিবেন। আর একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের উল্লেখ করিলেও মন্দ হইবে না। 'কথামৃতে' ( ২।২৭।১ ) আছে, "সুরেন্দ্র একটু অভিমানী। ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্য বাহিরের ভক্তদের কাছে অর্থসংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন—তাই বড় অভিমান হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন।" মনে রাখিতে হইবে যে, তখন নগদ মাসিক প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইত। এই মোটা খরচ দেওয়া ছাড়াও ঠাকুরের ছোট-খাট সুখসুবিধা-বিধানে সুরেন্দ্রবাবু সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। কখন হয়তো উত্তাপ নিবারণের জন্য খসখসের পরদা কিনিয়া আনিতেন, কখন সেবার জন্য ফল প্রভৃতি লইয়া আসিতেন, আবার কখন মাল্যাদি দ্বারা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গকে মনের সাধে সাজাইতেন। উদারহৃদয় সুরেন্দ্রের পরবর্তী কালের মহাপ্রাণতার একটি নিদর্শন স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে ( ১ম ভাগ, ৬৭ পৃঃ ) লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার ( সুরেন্দ্র ও বলরামের ) নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার ( শ্রীরামকৃষ্ণের ) অস্থি সমাহিত করা হয়···এবং সুরেশ ( সুরেন্দ্র ) বাবু তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন।"

যাহা হউক, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকালেই ফিরিয়া যাই। আপন বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশিকে রূপপ্রদান করিতে সুরেন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। মনোমোহন ও রামচন্দ্রের পরামর্শক্রমে তিনি সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের দ্যোতক একখানি চিত্র আঁকাইয়াছিলেন। উহাতে শিবমন্দির, মসজিদ ও গীর্জার সম্মুখে যীশু, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারপুরুষ বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ রহিয়াছেন এবং নৃত্য, বাদ্য ইত্যাদি সহকারে আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন—অপর পার্শ্বে পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া কেশবচন্দ্রকে সেই অপূর্ব মিলনোৎসব দেখাইতেছেন। এপ্রকার গম্ভীর-ভাবব্যঞ্জক চিত্রদর্শনে কেশবচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া সুরেন্দ্রকে পত্রদ্বারা

জানাইয়াছিলেন, "যাঁহার দ্বারা এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য।" মনোমোহন ও রামচন্দ্রের সহায়তায় সুরেন্দ্র সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি প্রতীকও নির্মাণ করাইয়াছিলেন—উহাতে বৈষ্ণবদের খুন্তি, খ্রীষ্টানদের ক্রুশ, মুসলমানদের পাঞ্জা ইত্যাদি মিলিত হইয়াছে। কেশববাবু ঐ সম্মিলনপ্রতীকটি লইয়া একবার নগরকীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের আর একটি অবদান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের প্রবর্তন। 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (৮০ পৃঃ) মনোমোহন বলিতেছেন, "মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের যত্নে এবং ব্যয়ে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সংস্থাপিত হয়। আমরা সেই দিবস কয়েকটি মাত্র বন্ধুবান্ধব সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করি। ···প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর উক্ত উৎসবের সমুদয় ব্যয়ভার ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ বহন করিয়াছিলেন; কিন্তু তৃতীয় বর্ষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর প্রস্তাবমত সকলে কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তাহা হইলেও ভক্ত সুরেন্দ্রনাথই সেই মহোৎসবের প্রাণস্বরূপ ছিলেন—অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।"

ঠাকুরের হয়তো ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার রসদদারগণ দীর্ঘজীবী হন; তাই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে (১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) রাত্রে অনুমান চল্লিশ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ স্বকার্য-সমাপনান্তে অভীষ্টলোকে চলিয়া যান।

# রামচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুত রামচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে (৩০শে অক্টোবর, ১৮৫১) কলিকাতার অন্তঃপাতী নারিকেলডাঙ্গায় পিতা নৃসিংহপ্রসাদ দত্তের গৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। মাতৃস্নেহ তিনি অধিক দিন উপভোগ করিতে পারেন নাই; কারণ জন্মের মাত্র আড়াই বৎসর পরেই তিনি মাতৃহারা হন। কিন্তু মাতাকে হারাইলেও মাতার একটি বিশেষ গুণ সর্বদা মনে রাখিয়া তিনি স্বীয় জীবনে উহা প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। দয়াবতী তুলসীমণি গৃহকর্ম-সমাপনান্তে যখন আহারে বসিতেন, তখন কেহ হয়তো গল্পচ্ছলে সেখানে বসিয়া স্বীয় দারিদ্র্য ও অনাহারের কথা নিবেদন করিত; তুলসীমণি অমনি সমস্ত অন্ন তাহাকে দিয়া উঠিয়া পড়িতেন; অপরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সেদিন তাঁহার আহারে রুচি নাই। পিতা নৃসিংহপ্রসাদ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং পণ্ডিত বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। রামচন্দ্রের পিতামহ সংস্কৃতে কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক মন্ত্রশিষ্য ছিল। ফলতঃ উত্তম বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবোচিত ভক্তি ও অন্যান্য গুণাবলীতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

বালক রামচন্দ্র নিজের খেলাঘরে নিজস্ব ঠাকুরের ভোগ দিতেন; কখন সখী সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নৃত্য করিতেন; কখন বা মহোৎসবে সমবয়স্কদিগকে ডাকিয়া আনিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিবাস বাবাজীর আশ্রমে ও শিখের বাগানে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট গমনাগমন করিতেন। বৈষ্ণব রামচন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি একবার হরিপালে এক কুটুম্বগৃহে যান।

কুটুম্ব মাংসাশী ছিলেন ; সুতরাং প্রিয়দর্শন আত্মীয় বালককে প্রথমে আদর করিয়া মাংস খাওয়াইতে চাহিলেন। বালক তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি স্নেহের আতিশয্যে বলপ্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন। অমনি বালক অন্ন ও আত্মীয়গৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে চলিল—কাহারও নিষেধ শুনিল না। তাহার সঙ্গে পয়সা ছিল না, পথও অজ্ঞাত ; তথাপি পথচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে পদব্রজে কোন্নগরে পৌছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নিরুপায় হইয়া বালক এক জায়গায় বসিয়া ইতিকর্তব্যতা স্থির করিতেছে, এমন সময় এক স্নেহশীলা গৃহস্থবধূর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন এবং গৃহে স্থান না থাকায় এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলেন। সেই বৈঠকখানায় গুলিখোর ভদ্রলোকদের যাতায়াত ছিল ; তাঁহারা অধিক রাত্রে মাদকদ্রব্য-সেবনকালে বালককেও নানা প্রকারে দলে টানিতে চেষ্টা করিলেন ; বালক এই পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইল এবং দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া স্টেশনে উপস্থিত হইল। কিন্তু আসিলে হইবে কি—হাতে যে পয়সা নাই ! সৌভাগ্যক্রমে পূর্বরাত্রের পরিচিত এক ভদ্রলোক কলিকাতায় ফিরিবার পথে স্টেশনে বালককে দেখিতে পাইলেন এবং কলিকাতার টিকিট কিনিয়া দিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি রামচন্দ্র বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু পিতার তখন ঘোর দারিদ্র্য। পিতামহ প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গেলেও পিতা তাহা ব্যয় করিয়া তখন পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং রামচন্দ্র এক আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ইহারও শেষ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রতাপনগরে কিছুকাল চাকরি করার পর কলিকাতায় চল্লিশ টাকা বেতনে গভর্ণমেণ্টের অধীনে কুইনাইন-পরীক্ষকের সহকারী

শ্রেণীর মধ্যে নিয়োজিত হইলেন। সি. এইচ. উড সাহেব তখন কুইনাইন-পরীক্ষক। তিনি রামচন্দ্রের নিকট শুধু দৈনন্দিন কাজ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অবসরমত তাঁহাকে রসায়নশাস্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। সাহেব অল্পকাল পরেই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার কালে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ একটি ঘড়ি ও অনেকগুলি পুস্তক প্রিয় ছাত্র ও সহকারীকে প্রদান করেন। কিন্তু রামচন্দ্র এই সামান্য উপহার অপেক্ষাও আর একটি মূল্যবান দান পাইলেন—সাহেবের একনিষ্ঠ বিদ্যানুরাগ। সাহেব তাঁহার হৃদয়ে যে বিদ্যোৎসাহের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে রামচন্দ্র রসায়ন-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অচিরে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ-উপার্জনে সমর্থ হইলেন। তাঁহার পিতার অবস্থাবিপর্যয়ের ফলে নারিকেলডাঙার পৈতৃক ভবন বহু পূর্বে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। এখন রামচন্দ্র সিমুলিয়া-পল্লীর মধু রায়ের গলিতে নূতন বাটী নির্মাণ করিলেন।

রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ক্রমে এত সুবিদিত হইয়াছিল যে, অনেক বি. এ., এম. এ.-উপাধিধারী ও ডাক্তার তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে আসিতেন। ক্রমে তিনি ইংলণ্ডের রাসায়নিক সভার সভ্য হন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক ও সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত নানা সভা-সমিতিতে তিনি রসায়ন-বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। রসায়নে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তির ফলে তিনি কুর্চির ছাল হইতে 'কুর্চিসিন' নামক একটি আমাশয়-প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করেন। ইহাতে দেশবিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি হয় এবং প্রচুর অর্থাগমও হয়। ক্রমে সরকারী কার্যেও বেতনবৃদ্ধি হইয়া ২০০৲ টাকায় উঠে। এতদ্ব্যতীত স্বাধীনভাবে বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন; এমন কি, কোন সময়ে মাসিক সহস্র মুদ্রা গৃহে আসিত।

যৌবনে একসময়ে নাটক-রচনায় ও অভিনয়ের প্রতি রামচন্দ্র আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই আকর্ষণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানেই তিনি অধিক আনন্দ ও কৃতিত্ব লাভ করিয়া ঐ দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।

এই কালমধ্যে রামবাবুর পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চাকরির প্রথমাবস্থাতেই তিনি বালাখানার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শিতালাভের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেরূপ তাঁহার আর্থিক উন্নতি হইতে থাকিল, অপর দিকে তিনি তদ্রূপ ক্রমেই নাস্তিক হইতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজন হইলে তিনি অপরের বিশ্বাসে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় ক্ষুরধার যুক্তিদ্বারা অপরের সমস্ত কথা খণ্ড খণ্ড করিতেন। সুতরাং স্বধর্মে আস্থাবান ভদ্রলোকেরা এই নাস্তিকের সহিত সহজে বিচারে অগ্রসর হইতেন না। বাল্যে বৈষ্ণবকুলে লালিত যে বালক স্বহস্তে দেবার্চনান্তে প্রসাদবিতরণ করিত ও মধুর নৃত্যে অপরকে মোহিত করিত, সেই যে যৌবনে এই প্রকার নিরীশ্বরবাদী হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? বস্তুতঃ সে যুগের যে সর্বগ্রাসী জড়বাদ তৎকালীন শিক্ষিতসমাজকে গভীরভাবে আলোড়িত করিতেছিল রামচন্দ্রও তাহার হস্তে অব্যাহতি পান নাই। ধর্মমাত্রে আস্থাহীন রামবাবু আবশ্যক স্থলে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিও স্বীয় অবিশ্বাস-স্থাপনে অগ্রসর হইতেন। একদিন তিনি ট্রামে যাইতেছেন এমন সময় একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টানবাবু উহাতে উঠিয়া স্থানকাল-বিবেচনা না করিয়াই সকলকে মরণের পরে পরিত্রাণের জন্য যীশুর শরণ লইতে আহ্বান জানাইলেন। কথার ভঙ্গি কাহারও মনঃপূত না হইলেও সকলেই নীরব রহিলেন; কেবল রামচন্দ্র যৌবনোচিত রহস্যভরে বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, মরলে পরিত্রাণের যা হয় হবে, আপনি তো এ যাত্রা

পরিত্রাণ করুন—আপনার বক্তৃতার জ্বালায় যে প্রাণান্ত উপস্থিত!" উহার ফল ফলিল—তুমুল হাস্যের মধ্যে বক্তৃতাস্রোত থামিয়া গেল। প্রচারক কিন্তু রামবাবুকে ছাড়িলেন না; গাড়ি হইতে নামিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের পথেও তিনি যীশুমহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অগত্যা রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নহেন এবং তৎসহ নাস্তিকতার তূণীর হইতে এইরূপ দুই-একটি শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন যে, প্রচারক স্বীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

তিনি নাস্তিক হইলেও কোনদিনই বৈষ্ণবোচিত সদাচার ত্যাগ করেন নাই। একবার পত্নীর অসুখের সময় ডাক্তার মাংসের ঝোল পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রী মরে যাবে, তবু আমি বাড়িতে মাংস এনে কুলাঙ্গার হব না।" সৌভাগ্যক্রমে ঐ পথ্য ভিন্নও রোগিণী আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি এযাবৎ যুক্তির তরণী-অবলম্বনে ভবনদীতে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ শোকের তুফান উঠিয়া তাঁহার সে তরণীকে এমন একটি দোল দিল যে, তিনি আর শুধু উহার ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একদিন তাঁহার প্রাণসম একটি কন্যা কালস্রোতে বিলীন হইলে যুক্তিবাদী রামবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিল, মৃত্যুর পশ্চাতে কি কোন গভীর তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে? পরবর্তী ৺কালীপূজার দিন দীপাবলীর দীপসজ্জাকালে তিনি শোকভারে নিপীড়িত হৃদয়ে এই সমস্যার সমাধানেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য—আকাশে মেঘ ভাসিতেছে ও অকস্মাৎ বিবিধ রাগে রঞ্জিত হইয়া নয়ন মন হরণ করিতেছে। শুধু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে তো এ সৌন্দর্যের রহস্যভেদ হয় না! এই বিচিত্র ক্রীড়ার পশ্চাতে কি কোন ক্রীড়াকারী আছেন, এই সৌন্দর্যের উৎসস্থলে কি কোন সৌন্দর্যবান

আছেন ?) রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসা ক্রমেই শৈশবের বিশ্বাসপূর্ণ দিনগুলিকে স্মৃতিপথে আরূঢ় করাইয়া অন্তরে অনুসন্ধিৎসা জাগাইল, ("ঈশ্বর কি আছেন ? তাঁকে কি দেখা যায় ?")

শ্রীযুত রামচন্দ্রের শোকবিদগ্ধ মনে যখন এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, ঠিক তখনই কুলগুরু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, ইঁহার নিকট পথের সন্ধান পাইবেন ; কিন্তু কুলগুরুর আচরণ তাঁহার মার্জিত মনে বিদ্রোহ জাগাইল—তিনি হতাশ হইয়া অন্যত্র উহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, কর্তাভজা ইত্যাদি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিতেন এবং তত্তৎ সম্প্রদায়ের পুস্তকাদিতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভাবিয়া উহা পাঠ করিতেন, কিন্তু ইহাতে মনের খাদ্য জুটিলেও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত পরিচয়ের ফলে তাঁহার এই লাভ হইল যে, তিনি কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহাকে দর্শনের বাসনা ক্রমেই সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

অবশেষে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (৺কালীপূজার পরে কার্তিক মাসের শেষে) এক শুভ মুহূর্তে রামচন্দ্র, মনোমোহন ও গোপালচন্দ্র মিত্র নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম আগমন ; শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় থাকেন জানেন না ; ঘাটে নামিয়া চাঁদনিতে উপস্থিত লোকেদের নিকট সংবাদ লইয়া তাঁহারা পরমহংসদেবের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, আর উত্তর-পূর্ব বারান্দায় কতকগুলি পুলিশের লোক বসিয়া আছে। পাশ্চাত্ত্য আদব-কায়দায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাঁহারা ঘরে ঢুকিবার পথ না পাইয়া পুনর্বার চাঁদনির লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঐ রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিলেই উহা খুলিয়া যায়। তাঁহারা ঐরূপ করিলেন এবং দ্বার অচিরাৎ উন্মুক্ত হইলে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ

প্রণামান্তে স্বীয় শয্যায় আসনগ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য রীতি-অনুসারে শুধু মস্তক নত করিয়াই অভিবাদন জানাইলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশশ্রবণ ও মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া নিজেদের সন্দেহভঞ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশান্ত মূর্তি, মধুর আলাপ, বাহ্যাড়ম্বরশূন্যতা, সহজ অথচ যুক্তিপূর্ণ সমস্যা-সমাধান ইত্যাদিতে তাঁহারা বিশেষ মুগ্ধ হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার সহিত যাপনান্তে এক অননুভূতপূর্ব শান্তি ও বিমল আনন্দ লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ভাগীরথীবক্ষে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনাই চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র বলিলেন, "এরূপ যুক্তিপূর্ণ ভগবৎ-সিদ্ধান্ত আগে কখনও শুনি নাই।" মনোমোহন বলিলেন, "তিনি আমাদেরও সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন যেন আমরা তাঁর কত আপনার জন—কত কালের পরিচিত!" সমর্থন করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "মহৎ ব্যক্তির লক্ষণই এই যে, তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে ক্ষণকালের মধ্যে পরমাত্মীয় ক'রে নিতে পারেন।" প্রথম দিনেই তিনি আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া জানিলেন।

শ্রীযুত রামচন্দ্র এত দিনে অকূলে কূল পাইলেন। ইহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবের কথামৃতে অন্তরের পিপাসা মিটাইতেন। সপ্তাহের কার্যব্যস্ততার মধ্যে তিনি ঐ দিনটিরই অপেক্ষায় থাকিতেন এবং উহা দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইয়া রাত্রিতে গৃহে ফিরিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রবিবার সন্ধ্যার সময় যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া আমরা একেবারে আনন্দে বিভোর হইতাম—ইচ্ছা হইত না যে, গৃহে ফিরিয়া আসি। সংসারকে তখন সংসার বলিয়া বোধ হইত না। তখন আমরা প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান করিতাম—

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।"

এই পূতসঙ্গের ফলে রামচন্দ্র যদিও তখন আস্তিক ও শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পিতপ্রাণ, তথাপি অলৌকিকত্বের প্রমাণের জন্য তাঁহার প্রাণ লালায়িত। এমন সময়ে একদিন নিশাশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি এক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় আগমন-পূর্বক মন্ত্র-প্রদানান্তে প্রতিদিন স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্রে উহা একশত বার জপ করিতে বলিতেছেন। এই অপূর্ব স্বপ্ন তাঁহার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, "স্বপ্নসিদ্ধ যেই জনা, মুক্তি তাঁর ঠাঁই।"

বিশ্বাসের পথে রামবাবু এযাবৎ বহুদূর অগ্রসর হইলেও যুক্তি তখনও নিরস্ত না হওয়ায় আবার তাঁহার মনে সন্দেহ উঠিল—স্বপ্ন তো মস্তিষ্কের বিকারমাত্র, উহাতে আস্থা কি? এতদপেক্ষাও স্থিরতর প্রমাণ চাই। সে প্রমাণ পাইতেও বিলম্ব হইল না। একদিন দ্বিপ্রহরে পটলডাঙ্গার গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া জনৈক বন্ধুর নিকট তাঁহার এই মানসিক অশান্তির কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় এক দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ ব্যক্তি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন, সয়ে থাক।" দুই বন্ধুই প্রত্যক্ষ দেখিলেন, কিন্তু চকিতে সে পুরুষ কোথায় মিলাইলেন—তাঁহারা আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। রামচন্দ্র ভাবিলেন, "ইহাও হয়তো মস্তিষ্কের বিকার"; কিন্তু তখনই মনে হইল, "এরূপ বিকারও ভাল, যাতে এমন আশ্বাসের বাণী পাওয়া যায়, আর যাতে মন এমন শান্ত হয়ে যায়।" ঠাকুর ঐ বিবরণ শুনিয়া স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাস্যে বলিয়াছিলেন, "অমন কত কি দেখবে!"

রামবাবুর মনে তখনও শান্তি-অশান্তির আলো-ছায়ার খেলা চলিতেছে। এক অশান্তির মুহূর্তে তিনি "কিছু হইল না" বলিয়া ঠাকুরের নিকট আক্ষেপ করিতে থাকিলে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি করব বাপু, সবই হরির ইচ্ছা।" রামচন্দ্র ক্ষান্ত না হইয়া আবার শান্তিকামনা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আমি কারো খাইও না, নিইও না—তোমাদের এখানে আসতে ইচ্ছা হয় এসো, না হয় এসো না।" কি নিদারুণ উপেক্ষা! কিন্তু ভক্তকে নিষ্কাম প্রেম-ভক্তি আস্বাদ করাইতে হইলে গুরুকে বোধ হয় বাধ্য হইয়াই এই নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করিতে হয়, সে অবহেলায় রামচন্দ্রের ব্যথিত মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল—এমন কি, মনে হইল যে, এইরূপ নিষ্ফল জীবনে কোন লাভ নাই। অবশেষে স্থির করিলেন—শাস্ত্রে বলে, নামী অপেক্ষা নামের মহিমা অধিক; অতএব নামজপ করিয়া দেখিবেন, ঠাকুরের মন টলে কি না। এই ভাবিয়া রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিলেন এবং নামজপ করিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে ঠাকুর নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন ও রামচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহার সমস্ত খেদ দূর করিলেন।

রামচন্দ্র প্রথম জীবনে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেন। ঠাকুর ইহা জানিতেন; তাই অপর ভক্তদের অনুকরণে রামবাবু একবার যখন ঠাকুরকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে আগ্রহ দেখাইলেন, তখন তিনি অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরে একদিন কি ভাবিয়া নিজেই যাইবার অভিলাষ জানাইলেন এবং দিনও স্থির করিয়া দিলেন। তদনুসারে ভদ্রতা হিসাবে রামবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন এবং যথাসময়ে ঠাকুর ভক্তসহ আগমনপূর্বক আনন্দ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে রামচন্দ্রের ভক্তিমহিমা খ্যাপিত হইলেও তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত উহার যোগ না থাকায় তিনি উহাকে ঠাকুরের প্রকৃত শুভাগমন

বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে ঠাকুর পুনরায় জানাইলেন যে, বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল উপলক্ষে তিনি রামভবনে পদার্পণ করিবেন। ব্যয়কুণ্ঠ রামবাবু বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ঐ দিবসের মহোৎসব স্বগৃহে না হইয়া অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু সত্যসন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের মত-পরিবর্তন না হওয়াতে তিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। সেইদিন ভক্তদের আগমন, সংকীর্তন ও শ্রীমুখের বাণীতে রামভবন মুখরিত ও পবিত্রীকৃত হইল এবং ঠাকুরের কৃপায় রামচন্দ্রের কার্পণ্যও দূরীভূত হইল। নবজীবন লাভ করিয়া তিনি অতঃপর এই শুভদিনের স্মরণে প্রতিবৎসর ঐ দিবসে উৎসব করিতেন। বলা বাহুল্য, বৈশাখী পূর্ণিমার পরে বহুবার এই গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। এই-সব দিনে রামচন্দ্রের সুব্যবস্থায় ঠাকুর এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, অন্যান্য ভক্তগৃহেও তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে যখনই অনুরূপ মহোৎসবের আয়োজন হইত, তখনই তিনি সেই সেই ভক্তকে রামচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার রামবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কার্যপরিচালনার ভার লইতেন।

ফুলদোলের পরদিবস রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গমনপূর্বক ঠাকুরের কথামৃত-পানান্তে রাত্রি প্রায় দশটায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর অকস্মাৎ কক্ষের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" রামচন্দ্র ফাঁপরে পড়িলেন—সম্মুখে নয়নবিমোহন কল্পতরু সমস্ত মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু অন্তরে কোন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তো জাগিতেছে না! অগত্যা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "প্রভু, কি চাইব কিছুই জানি না; কি চাইতে হয়, আমায় বলে দিন।" রামচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ঠাকুরই রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রটি ফিরাইয়া লইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার সাধনভজন হইবে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রীতি; ঐ প্রেমের নিকট বাহ্য সাধন

অকিঞ্চিৎকর। রামচন্দ্র আজ নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্তহৃদয়ে স্বগৃহে ফিরিলেন। তিনি জানিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার আরাধ্য দেবতা আর একমাত্র প্রেমই তাঁহার আরাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে ও অনুপ্রেরণায় ভক্তপ্রবর রামচন্দ্রের জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল ভক্তসেবা। আগেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের পূর্বে তিনি ব্যয়াদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সতর্ক ছিলেন; ক্ষেত্রবিশেষে উহা কৃপণতারূপে আত্মপ্রকাশ করিত। সম্ভবতঃ ইহারই প্রতিকারকল্পে ঠাকুর একদিন রামচন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি উকিল ও ডাক্তারের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। অবশ্য রামবাবু ডাক্তারি পাস করিলেও ডাক্তারি করিতেন না, তিনি রাসায়নিক পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। তথাপি কথাটা তাঁহার প্রাণে বিদ্ধ হইল। ভক্তের অর্থ ইষ্টের সেবায় লাগিবে না—ইহা যে বিষম সঙ্কট। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি স্পষ্টই শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তুমি ভক্তসেবা কর; তা হলেই আমার সেবা করা হবে।" তদবধি রামচন্দ্রের প্রাঙ্গণ ভক্তদের মিলনভূমি ও সঙ্কীর্তনক্ষেত্রে পরিণত হইল। প্রত্যহ সেখানে পঁচিশ-ত্রিশ জন ভক্তের সমাগম হইত এবং সকলেই প্রচুর প্রসাদ পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরেও কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার ভক্তপ্রীতি দেখিয়া মনে হইত, তিনি ঠাকুরের এই বিধান-বাক্যই জীবনের ধ্রুব অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর নিজ আচরণ এবং বাক্যেও তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিতেন, "যে জন রামকৃষ্ণ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।" বস্তুতঃ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে প্রণাম করিত, 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করিত, সে শত্রু হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামচন্দ্রের হৃদয় জয় করিত।

রামচন্দ্র ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলেন—ভক্তের অর্থ সাঁকোর জলের মতো, সাঁকোর জল কখনও সঞ্চিত থাকে না। তাই তিনি অর্থসঞ্চয়ে যত্নপর

না হইয়া ভক্তসেবার প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। শুধু তাহাই নহে, অভাবের পীড়নে কেহ তাঁহার দ্বারস্থ হইলে রিক্তহস্তে ফিরিত না।

রামচন্দ্র ঠাকুরকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিলেও স্বমুখে তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইবার বাঞ্ছা পোষণ করিতেন। এক সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখছ?" রামবাবু বলিলেন, "আপনাকে।" আবার প্রশ্ন হইল, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" রামবাবু বলিলেন, "আপনাকে আমার চৈতন্যদেব ব'লে মনে হয়"—তিনি তখন 'চৈতন্য চরিতামৃত' পাঠ করিতেন। উত্তর-শ্রবণে ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বামনীও (ভৈরবী ব্রাহ্মণী) ঐ কথা বলত বটে।" এই বিশ্বাস রামচন্দ্রের মনে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "গিরিশ দাদা, বুঝেছ কি? এবারে একে তিন—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—এই তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব; একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান।"

রামচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল অতুলনীয়। একবার রোগশয্যাগত হইয়াও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক ভিন্ন অন্য ঔষধসেবনে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশেও সে ধনুর্ভঙ্গপণ অটুট রহিল। সৌভাগ্যক্রমে চরণামৃতই তাঁহাকে রোগমুক্ত করিল। তিনি প্রত্যহ ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া আহারে বসিতেন না। এই জন্য প্রসাদী কোন মিষ্টান্নাদি গৃহে আনিয়া রাখিতেন এবং স্নানান্তে উহারই এক কণিকাগ্রহণান্তে ভোজন করিতেন। একদিন প্রসাদী করাইবার জন্য কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমনপূর্বক উহা যথাবিধি শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে স্থাপন করিলেও ঠাকুর তৎসম্বন্ধে উদাসীন রহিলেন, এমন কি, সন্ধ্যাসমাগমেও উহা স্পর্শ না করিয়াই পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। রামবাবু মহা সমস্যায় পড়িলেন—গৃহে ফিরিতে হইবে, অথচ

মিষ্টান্ন প্রসাদীকৃত হয় নাই! কি হইবে? ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, পার্শ্ববর্তী ডাবরে ঠাকুরের মুখামৃত আছে—উহা স্পর্শ করাইলেই মিষ্টান্ন প্রসাদে পরিণত হইবে। যেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ কার্য—রামচন্দ্র তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক এমনি সময়ে ভক্তকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়াই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং মিষ্টান্ন গ্রহণপূর্বক প্রসাদ করিয়া দিলেন। শ্যামপুকুরে ৺কালীপূজার রাত্রে পূজোপকরণ উপস্থিত থাকিলেও পূজারম্ভের লক্ষণ না দেখিয়া ভক্তদের মন যখন সমস্যামগ্ন, তখন শ্রীযুক্ত রামই গিরিশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "যাও না, যাও।" অমনি গিরিশের অনুকরণে ঠাকুরের শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি পড়িতে লাগিল এবং "জয় জয়" রবে কক্ষ মুখরিত হইল।

রামবাবুর ধারণা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে পদার্পণ করিতেন, কিংবা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেন, তাহাই পবিত্রীকৃত হইত এবং ঐ সকলের স্পর্শে অপরেও নিষ্পাপ হইত। এমন কি, দূর হইতে তাঁহার দর্শনও মুক্তিপ্রদ ছিল। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর একদিন এই প্রসঙ্গ চলিতেছে, এমন সময়ে জনৈক শ্রোতা অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোক তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখেছে; কত গাড়িতে তিনি চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সহিস তাঁকে দেখেছে; তা ব'লে তারা সকলেই কি মুক্ত হয়ে যাবে?" অবিশ্বাসের অপ্রীতিকর উষ্ণ সমীরস্পর্শে রামচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল, আর কণ্ঠে হুঙ্কার উঠিল, "যা যা, সেই গাড়োয়ান সহিসের একটু পায়ের ধুলো নিগে যা—তোর মতো লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" যে উদাত্ত কণ্ঠের আবেগময় কশাঘাতে সমালোচকের মন সেই দিন হইতেই পরিবর্তিত হইয়া গেল।

রামচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, নিজের ও পরের জন্য শ্রীমুখের বাণীগুলি লিখিয়া

রাখেন। সেজন্য কাগজ-পেন্সিল লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ঠাকুর প্রসঙ্গ করিতে থাকিলে তিনি লিখিয়া লইতেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুর একদিন বলিলেন, "রাম, তুমি এত করছ কেন? এর পর দেখো, তোমার মনই তোমার গুরু হবে।" প্রভুর এই ইঙ্গিতে ও আশীর্বাদে রামচন্দ্র অতঃপর এই কার্যে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারের আনন্দ তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার জন্য আর এক নূতন কর্মক্ষেত্র রচনা করিল। ঠাকুরের লীলাবস্থায়ই তিনি তাঁহার অনুমতিক্রমে কোন্নগরে হরিসভায় 'সত্যধর্ম কি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের উপদেশপ্রচারের মানসে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে তিনি 'তত্ত্বসার' নামক একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করেন। প্রথমতঃ এই কার্যে ভক্তেরা বাধা দেন —এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অভিযোগ করা হয়। ঠাকুর তাই গোপনে রামচন্দ্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ গা, এরা সব বলছিল তুমি কি ছাপছ। তাতে কি লিখেছ?" রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি শ্রীমুখের উপদেশই মুদ্রিত করিয়াছেন এবং উহার কথঞ্চিৎ আভাসও দিলেন। ঠাকুর শুনিয়া কোন আপত্তি করিলেন না, তবে সাবধান করিয়া দিলেন যে, রামচন্দ্রের কোন কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকিলে উহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না—নিরহঙ্কারভাবেই ঐ কার্য করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তিনি কহিলেন, "দেখ, এখন আমার জীবনী ছেপো না—আমার জীবনী বের করলে শরীর থাকবে না।" রাম তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বে 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকাও ঐরূপ উপদেশপ্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করেন। লীলাবসানের পরেও এই পত্রিকা কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেই যুগে কেশবচন্দ্রের পরে রামচন্দ্রই রামকৃষ্ণ-প্রচারের গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তবৃন্দের কীর্তনে মাতামাতি প্রতিবেশীদের বিরক্তির সঞ্চার

করে দেখিয়া রামবাবু একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, নির্জনে একটা সাধনস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ঠাকুর সে শুভসঙ্কল্প অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "এমন জায়গায় বাগান কিনো যেখানে একশটা খুন হলেও টের পাওয়া যায় না।" তারপর ১৮৮৩-র মধ্যভাগে কাঁকুড়গাছিতে এক উদ্যানবাটী ক্রয় করা হইল। উহাই বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানের সূত্রপাত। ঐ অঞ্চল তখন নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ—পথও পঙ্কিল। উদ্যানক্রয়ের পর ঠাকুর উহা দর্শন করিতে আসিলেন (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩)। ঐ উপলক্ষ্যে বর্তমানে যেখানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত, সেখানে তুলসী-কানন রচিত হইয়াছিল। ঠাকুর উহার এক বৃক্ষতলে প্রণাম করেন, কলিকাতা হইতে আনীত ফল-মিষ্টান্নাদি ভক্ষণান্তে পুষ্করিণীর জল পান করেন, একস্থানে উপবেশনপূর্বক সৎপ্রসঙ্গ করেন আর এক স্থানে পঞ্চবটীনির্মাণের আদেশ দেন। সে আদেশ প্রতিপালিত হইল। অধিকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে প্রত্যেক বস্তু পবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে রামচন্দ্র ঐ বাগানে আম্রবৃক্ষের নাম রাখিলেন 'রামকৃষ্ণ-ভোগ', পুষ্করিণীর নাম হইল 'রামকৃষ্ণ-কুণ্ড', যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন তাহা সযত্নে রক্ষিত হইল এবং যে তুলসীবৃক্ষতলে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সেখানেই তদীয় পূতাস্থি সমাহিত ও তদুপরি মন্দির নির্মিত হইল। রামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটীর স্থানটিও অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শ এবং রামচন্দ্রের ভক্তির মিশ্রণে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান আজ রামকৃষ্ণসঙ্ঘের মহাতীর্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের ফলে শ্রীযুত রামচন্দ্র যে শুধু অতুল ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহাই নহে, তদবধি তাঁহার নিকট অস্পৃহা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষকরূপে একবার তিনি এক ব্যবসায়ীর কেরোসিন তৈল পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, উহা খাঁটি নহে। ব্যবসায়ী বুঝিলেন এই দোষাবিষ্কারের ফলে তাঁহার লক্ষ লক্ষ

টাকার ক্ষতি হইবে; তাই বহু সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদানপূর্বক কার্যোদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। রামচন্দ্র কিন্তু ঘৃণাভরে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার এক ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর পদ শূন্য হইলে অনেকে উহার জন্য আবেদন করিলেন; শুধু তিনি নির্বিকার রহিলেন। ইহা অফিসের বড় সাহেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি রামচন্দ্রকেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কর্মপ্রার্থী হইতে আদেশ করিলেন। রামবাবু উপস্থিত মত তদনুরূপ করিলেও ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি বিবেক-বৈরাগ্য-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; আর তিনিই কিনা অর্থলোভে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবেন? সুতরাং আবেদনপত্র ফিরাইয়া লইয়া উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই জাতীয় প্রলোভন অনেক স্থলে প্রকারান্তরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। কিন্তু উহার মুখোশ অপসারণপূর্বক প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিত না। একদা যোগোদ্যানের অবস্থা ভাল নহে দেখিয়া জনৈক ব্যবসায়ী বহু অর্থব্যয়ে মন্দিরাদি-নির্মাণের প্রস্তাব করিলে রামচন্দ্র উহা প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ভাবে কার্যের প্রতিদানে ঐ ব্যবসায়ী নিজের ঘৃতাদি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট উত্তম প্রশংসাপত্রলাভের আশা পোষণ করেন।

পারিবারিক জীবনেও তাঁহার এই বৈরাগ্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইত। তাঁহার স্নেহের পুত্তলি একটি কন্যার অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগের পর তাঁহাকে শান্ত থাকিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "প্রভুই কন্যা দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন—এতে আমার দুঃখ করবার কী অধিকার আছে?" তিনি অর্থ উপার্জন করিলেও পরিবারের জন্য বিশেষ সঞ্চিত হইতেছে না বলিয়া জনৈক বন্ধু অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি একদিনও ভাবিনি

যে, আমি স্ত্রীকে অন্ন দিচ্ছি—প্রভুই আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খেতে দিচ্ছেন। আমি মরে গেলে তিনিই খাওয়াইবেন।"

ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁহার পূত চিতাভস্ম সমাহিত করিয়া তদুপরি স্মৃতিমন্দির-নির্মাণের জন্য অন্য কোনও উপযুক্ত ভূমি না থাকায় রামচন্দ্রের আগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের সম্মতিক্রমে সাতদিন পরে জন্মাষ্টমী তিথিতে শোভাযাত্রা করিয়া ভক্তগণ চিতাভস্মপূর্ণ কলসীটি কাঁকুড়গাছির উদ্যানবাটিতে লইয়া গিয়া তথায় সমাহিত করেন।[১] তদবধি পাঁচ-ছয় মাস কাল শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল নিত্যপূজাদি করিতে থাকেন এবং রামচন্দ্র সমস্ত ব্যয়নির্বাহ করেন। অবশেষে নিত্যগোপাল অসুস্থ হইলে একজন বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ রাখিয়া সেবা পরিচালিত হয়। রামবাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে তথায় যাইতেন এবং ছুটির দিন সেখানেই কাটাইতেন। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন যে, প্রভুর জন্য আনীত মিষ্টান্নের উপর পিপীলিকা রহিয়াছে। সেবাপরাধে ভীত হইয়া তিনি তদবধি কাঁকুড়গাছিতে অবস্থানপূর্বক নিজহস্তেই পূজা আরতি, ভোগ-নিবেদন ইত্যাদি অধিকাংশ কার্য চালাইতে লাগিলেন।

তাঁহার যোগোদ্যানে বাসের সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকটি ধর্মপ্রাণ যুবক তথায় আগমনপূর্বক ঠাকুর-সেবায় সাহায্য ও তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া যোগোদ্যানেই থাকিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল যুবক ভিন্ন অপর অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুও ছুটির দিনে রামচন্দ্রসমীপে সমবেত হইতেন। যুবকবৃন্দ প্রতি রবিবারে কলিকাতার পথে পথে রামকৃষ্ণ নাম-কীর্তনে প্রেরিত হইতেন। ক্রমে রামবাবুর প্রচার-প্রচেষ্টা আর একটি রূপ ধারণ করিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৯শে চৈত্র, শুক্রবার, গুড্ ফ্রাইডের দিনে তিনি স্টার থিয়েটারে সর্বজনসমক্ষে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা'—

১ বিশেষ বিবরণ 'উদ্বোধন', ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার পূর্বে অনেক ভক্তই এরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতায় আপত্তি জানাইয়াছিলেন; কিন্তু রামবাবু সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। শুধু তাহাই নহে; ঐ দিনের বক্তৃতা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তিনি ক্রমে স্টার থিয়েটার, সিটি থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-অবলম্বনে মোট আঠারটি বক্তৃতা দিলেন ( ১৮৯৩-৯৭ খ্রীঃ )।

শ্রীরামকৃষ্ণকে জগতে প্রচারিত করার আকাঙ্ক্ষা দুর্দমনীয় হইলেও রামচন্দ্রের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ধারাবাহিক ধর্মবক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি মধুমেহ (ডায়েবিটিস) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রোগের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতেন না এবং শয্যাশায়ী না হইলে কর্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপে পৃষ্ঠব্রণ, আমাশয় ইত্যাদিতে ভুগিয়াও তিনি আফিসের কাজ ও রামকৃষ্ণপ্রচার সমভাবেই চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিল। এই সময়ে একবার উরুদেশে নিদারুণ বেদনাগ্রস্ত হইয়া তিনি বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। একসময়ে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, অনেকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগশয্যাত্যাগের পর যদিও তিনি বুঝিলেন যে, শরীর নিতান্তই নিঃসার হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি শুধু মানসিক বলে যথারীতি আরব্ধ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিলেন। কিন্তু চিকিৎসকগণ আর মাসিক বক্তৃতার অনুমতি দিলেন না। তাই 'তত্ত্বমঞ্জরী'ই হইল তাঁহার জনসাধারণে প্রচারের একমাত্র উপায়। অবশ্য ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ববৎ ছুটির দিনে যোগোদ্যানে ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। তখনও কিন্তু বন্ধুবান্ধবের একান্ত অনুরোধে চিকিৎসাব্যপদেশে তিনি মধ্যে মধ্যে স্বগৃহে অবস্থান করিলেও যোগোদ্যানই ছিল তাঁহার স্থায়ী বাসস্থল।

রামবাবুর প্রচারের একটা নিজস্ব ধারা ছিল। তিনি নিজে বুদ্ধি-বিবেচনায় যেরূপ ভাল মনে করিতেন তাহাতেই সোৎসাহে নিরত

হইতেন। এইভাবেই কোন্নগরে বক্তৃতা, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' প্রকাশ এবং উপদেশ-সংগ্রহান্তে ১৮৮৬ খ্রীঃ জুলাই মাস হইতে 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক পুস্তক খণ্ডশঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অত্যুৎসাহ অনেকের নিকট অহঙ্কাররূপে প্রতিভাত হইলেও, উহা সত্য সত্যই নিছক অহঙ্কার বলিয়া মনে হয় না; কারণ দেখা যায় যে, শিষ্য বা শিষ্যস্থানীয়দিগের পদসেবা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। বেশভূষায় তাঁহার কোনও পারিপাট্য ছিল না। একখানি থান কাপড় ও একখানি লংক্লথের চাদরই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আফিসের পোশাকও অতি সাধারণ রকমের ছিল। যোগোদ্যানে অবস্থানকালে তাঁহার পরিধানে একখানি অল্পপরিসর পাঁচহাতী বস্ত্র মাত্র থাকিত। তিনি এইরূপ অনাড়ম্বর জীবনই অতিবাহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্দিরের সমস্ত কার্য তিনি যথাসম্ভব স্বহস্তেই করিতে ভালবাসিতেন; ব্রাহ্মণ নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং রন্ধন করিতেন; প্রভুর নামকীর্তন করিবার জন্য নগ্নপদে রাজপথে বাহির হইতেন; এমন কি, শরীর অসুস্থ থাকিলেও প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়াও শোভাযাত্রাসহকারে অনাবৃত মস্তকে সিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছিতে যাইতেন। বস্তুতঃ সুবিবেচকের দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতিকার্যে ভক্তির আতিশয্যই প্রকাশ পাইত। ভক্তির প্রেরণাতেই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে দীক্ষাদানচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পণ করিতেন; ভক্তির আবেগেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবার সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্তের প্রয়াসে যোগোদ্যানে ও অন্যত্র স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইতেন।

আবার শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রেই নহে, জাগতিক ক্ষেত্রেও বহু উপযাচক তাঁহার দয়ায় সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। একবার দুই ভদ্রলোক চাকরি যাওয়ায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। বহু স্থানে চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা অবস্থার উন্নতি করিতে

পারিলেন না। অথচ রামচন্দ্রের দ্বারস্থ হইতেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না ; কারণ তাঁহারা ধর্মপাগল রামচন্দ্রকে উপহাসই করিতেন। অবশেষে একদিন দৈবক্রমে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি কুশলাদি-জিজ্ঞাসাব্যপদেশে তাঁহাদের অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন যে, ঠাকুরের দয়ায় ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। ফলে নূতন কর্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনিই অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল ; অপিচ স্বগৃহ ও যোগোত্থানের প্রাত্যহিক ব্যয়নির্বাহে এবং উৎসবাদি-পরিচালনে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। তথাপি তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কত বালকের তিনি শিক্ষাভার বহন করিতেন, কত ব্যক্তির পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে সাহায্য করিতেন, কত কন্যাদায়গ্রস্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন এবং কত ভিখারীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

গৃহে থাকিয়াও ঠাকুরের উপদেশানুসারে নির্লিপ্ত জীবনযাপন করা ও তাঁহার অর্থ নানা ভাবে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করা ছিল রামচন্দ্রের আদর্শ। যোগোত্থানে থাকিয়া যাঁহারা ঠাকুরের সেবা করিতেন, তাঁহাদিগকেও তিনি ঐ আদর্শেই গড়িয়া তুলিতেছিলেন ; তাঁহারাও ঠাকুরের সেবায় ব্যয় করিবেন বলিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। কিন্তু অর্থের অনতিক্রমণীয় মোহিনীশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় নিজ-জীবনে অনুভূত হয় নাই বলিয়া রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, সকলেই ইচ্ছামাত্র উহা অতিক্রম করিতে পারে। কার্যতঃ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল—অর্থোপার্জনে রত যোগোদ্যানের সেবকগণ অনেকেই একে একে সংসারে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নিজের ভ্রম বুঝিয়া তিনি অবশিষ্ট সকলকে সন্ন্যাসে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন। কোনও কিছু সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে উহা সর্বতোভাবে গ্রহণ করাই ছিল রামচন্দ্রের স্বভাব। তাই যে রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পরে ঠাকুরের যুবক ভক্তদিগকে

স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি জীবনের শেষ তিন বৎসর সন্ন্যাসমহিমাখ্যাপনে তৎপর হইলেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার দুইজন শিষ্য ঐ সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লীলাসমাপনের কিয়দ্দিবস পূর্বে এক অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্বোপবিষ্ট রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি মাকে বলছিলাম যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না; রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, বিজয় ও কেদার—এদের একটু শক্তি দে—এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব।" প্রার্থনাচ্ছলে ঠাকুরের এই আশীর্বাদ রামচন্দ্রকে অবলম্বনপূর্বক প্রচারক্ষেত্রে কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; এতদ্ব্যতীত রামবাবুর শেষজীবনে অপরের মধ্যে ভাবসংক্রামণের শক্তিও প্রকটিত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাঁহার নিকট গমনাগমনকারী এক ব্যক্তি যখন তাঁহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন, "মহাশয়, কিছু অদ্ভুত দেখাতে পারেন তো আপনার কথায় বিশ্বাস করে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে মানতে পারি," তখন রামচন্দ্র অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আজ হতে তিন দিনের ভিতর তোমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু অদ্ভুত ঘটবে।" এই ঘটনার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথে ঐ ব্যক্তির অন্তর মথিত করিয়া এরূপ এক দুর্দমনীয় হাস্যরোল উঠিল যে পরিচিত সকলে সেই অবিরাম হাস্য দেখিয়া স্থির করিল, তিনি প্রেতাবিষ্ট হইয়াছেন। পরে রামচন্দ্রের উপদেশে আস্থাস্থাপনান্তে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। কর্মস্থলে যে নিভৃত কক্ষে উপবেশনপূর্বক রামবাবু অবসর-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন, সেই কক্ষে একদিন এক উকিলবাবু ঠিক ঐরূপ ভাবেই বলিলেন, "এসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। আপনার কথায় বিশ্বাস হয়, যদি আমার মতো পাষণ্ডের মনকে ভগবানের জন্য কাঁদাতে পারেন!" রামবাবু বলিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় সবই হতে

পারে।" উকিল ঐ কথাও উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া দিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিলেন। তখন রামচন্দ্র আবেগভরে আরক্তিমনয়নে বলিলেন, "আপনি অবশ্যই তিন দিনের মধ্যে ঠাকুরের জন্য কাঁদবেন।" তিন দিনের প্রয়োজন হইল না, তিন মিনিট যাইতে না যাইতে বাবুটি তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের হেমন্ত ঋতু আসিয়া পড়িল। রামচন্দ্রের প্রতি অঙ্গে তখন রোগের আক্রমণ হইয়াছে; হৃৎপিণ্ড অতীব দুর্বল; তদুপরি শ্বাসরোগ আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্বাসকষ্ট কখন কখন এতই দুর্বিসহ হইত যে, তিনি শয্যায় বসিয়া বহু রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইতেন। তথাপি ঐ অবস্থায়ও প্রতিশ্বাসে রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইত। এই রোগ হইতে কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পুনর্বার কার্যে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু অচিরেই আবার শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। এইভাবে সিমুলিয়ার বাটীতে প্রায় দেড় মাস ভুগিয়া তিনি মনে মনে জানিলেন যে, জীবন আর বেশী দিন নাই—এইবার রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করিতে হইবে; অতএব অবশিষ্ট দিবসগুলি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে শ্রীগুরুর শেষ স্মৃতিচিহ্নের পার্শ্বে ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিতে সম্মত নহেন দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার দেহ কঙ্কালসার ও উত্থানশক্তিরহিত···পার্শ্বপরিবর্তনেরও ক্ষমতা নাই; কিন্তু সেই দিন তিনি যোগোদ্যানে যাইবার আগ্রহে সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিলেন। অগত্যা পালকি ডাকিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠান হইল (২৮শে পৌষ)। যোগোদ্যানে তিনি মাত্র পাঁচদিন ছিলেন। এখানে আসিয়া শ্রীমন্দিরের সেবকদিগকে বলিয়াছিলেন, "গুরুদেবের কাছে জুড়াতে এসেছি। আমার জন্য তোমাদের একদিন মঙ্গলারতির বিঘ্ন হবে। কি করি, বল? —একদিন।" বেলুড় মঠের সাধুরা তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। চিরবিদায়ের একঘন্টা পূর্বে নাভিশ্বাস আরম্ভ হইলে তিনি গঙ্গাতীরে

যাইতে চাহিলেন এবং কেহ ঐ কথা বুঝিতেছে না দেখিয়া বলিলেন যে, 'রামকৃষ্ণ কুণ্ড'ই তাঁহার গঙ্গা। সেখানেই তিনি প্রভুপদে মিলিত হইলেন ( ৪ঠা মাঘ, ১৩০৫, ১৭ই জানুয়ারি, ১৮৯৯ খ্রীঃ, মঙ্গলবার, রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিট )। তাঁহার পূতদেহ যথারীতি সৎকার করিয়া চিতাভস্ম যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

বৈষ্ণবকুলভূষণ রামচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বীয় আবাল্য সংস্কার অনুযায়ী বুঝিয়া থাকিলেও সেই বোধের মধ্যে একটা সার্বভৌমিকতাও ছিল; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যাঁহারাই আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার উদার ভাবের অন্ততঃ কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্রের কার্যধারা ও ভাবরাশির সহিত অপর ভক্তেরা সর্বদা একমত না হইলেও সকলেই তাঁহার উর্জিতা ভক্তির প্রশংসা করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীতে তাঁহাকে অতি উচ্চ স্থান দিতেন। তাঁহার মধ্যে যে ভাগবত জীবনের স্ফূর্তি হইয়াছিল তাহা সর্বকালে সর্বজনে শ্রদ্ধার্হ।

# মনোমোহন মিত্র

'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী লিখিয়াছেন, "ভক্ত রামচন্দ্রের জীবনের সহিত মনোমোহনের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ···যাঁহারা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দৈবী কৃপা এবং ভাগবত সংস্পর্শে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন ও তাঁহার যুগলীলার আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী অল্পাধিক সহায়তা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, মনোমোহন সেই চিহ্নিত ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ···মনোমোহনের যে বৈশিষ্ট্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, তাহা ছিল তাঁহার সুগভীর তেজোদীপ্ত ভাবাবিষ্টতা। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি খুব মাতিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক আবেশের উন্মাদনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। ···নামসংকীর্তনের সময়েও তাঁহার প্রগাঢ় তন্ময়তা ও ভাবাবেশ ভক্তগণের মধ্যে এক নিবিড় উন্মাদনা সৃষ্টি করিত।"

মনোমোহনের পিতা ভুবনমোহন মিত্র এবং মাতা শ্যামাসুন্দরী। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর (১২৫৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে ভাদ্র, শুক্লা চতুর্দশীতে) হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনমোহন চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সরকারের নিকট রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আচারে একনিষ্ঠ হিন্দু হইলেও যুক্তিপরায়ণ ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। শ্যামাসুন্দরীও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন এবং পরিবারে তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই দম্পতির একমাত্র পুত্র মনোমোহনের শৈশব অতি আদরেই যাপিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যকালও সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের

মনোমোহন মিত্র

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
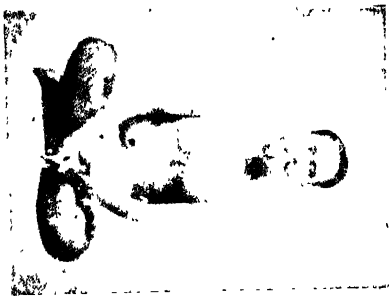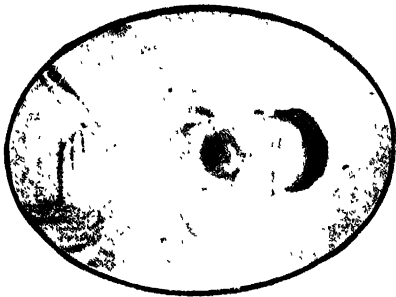
মতোই কাটিয়াছিল। প্রায় তের বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার ঝামাপুকুর পল্লীতে তাঁহার মেসো মহাশয় রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র প্রায়ই রাজেন্দ্রবাবুর বাটীতে আসিতেন এবং রাজেন্দ্রবাবুও কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎলাভের মানসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজে যাইতেন। এই সূত্রে কেশব ও দেবেন্দ্র উভয়েরই সহিত মনোমোহন পরিচিত হন এবং তাঁহাদের ভাবধারাও অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করেন। সহপাঠী রাজমোহন বসু ও এম. এন. ব্যানার্জির (পরে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) সহিতও মনোমোহন এই-সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের মূলে হয়তো ছিল মনোমোহনকে ব্রাহ্মপ্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রচেষ্টা; কারণ রাজেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিলেও মনোমোহন ঐদিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়েন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। বিবাহের পর মনোমোহন পিতার সহিত ঢাকায় চলিয়া যান এবং ঐখানেই প্রবেশিকা-পরীক্ষা পাস করেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ইহার পর আর অগ্রসর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার একুশ বৎসর বয়সে ঢাকাতেই পিতার দেহত্যাগের পর পরিবারের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে সংসারে মন দিতে হয়।

পিতার সঞ্চিত অর্থ অল্পই ছিল; অতএব শীঘ্রই অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা দিল। বিশেষতঃ যে সামান্য পুঁজি ছিল, তাহাও কলিকাতায় পূর্ব হইতে বায়না করা ২৩নং সিমুলিয়া স্ট্রীটের বাটীখানি ক্রয় করিতে প্রায় নিঃশেষিত হইল। সুতরাং নূতন বাড়ি ভাড়া দিয়া মনোমোহনকে মাতা ও ভগিনীদের সহিত কোন্নগরে চলিয়া যাইতে হইল। এখানে থাকিয়া ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি চাকরির অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন এবং অবশেষে রাজেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে ৪০৲ টাকার একটি কাজ পাইলেন। সেখানে ক্রমে পদোন্নতি হইয়া তাঁহার বেতন ১৫০৲ টাকা

হইয়াছিল। তিনি কোন্নগর হইতে আফিসে যাতায়াত করিতেন বলিয়া অবসর খুব কমই ছিল। যেটুকু সময় পাইতেন তাহা তিনি পিতার সংগৃহীত পুস্তক ও মন্তব্যপাঠে ব্যয় করিতেন। মনোযোগসহকারে পিতার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য-পাঠকালে সমাজসংস্কারবিষয়ে তাঁহার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তিনিও ক্রমে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং বাল্যে যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যৌবনে তাহাকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিলেন। একটি ঘটনায় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের সুযোগ ঘটিল।

মনোমোহনের একটি সপ্তম মাসের কন্যা ইহলোক ত্যাগ করিলে তিনি এতই অধীর হইয়া পড়িলেন যে, কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। সময় পাইলেই তিনি অন্যের অলক্ষ্যে শ্মশানে যাইয়া কন্যার শেষ বিশ্রাম-স্থলের অন্বেষণ করিতেন। মাতা শ্যামাসুন্দরী ইহার অন্য কোনও প্রতিকার না দেখিয়া স্থানপরিবর্তনের জন্য কলিকাতার বাড়ির ভাড়াটিয়া উঠাইয়া দিয়া সেখানে আসিলেন। তখন মনোমোহনের বাল্যবন্ধু রাজমোহন কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়াছেন। দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলেই কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গ ও ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাদি বিষয়ে আলোচনা হইত। ঐ সময়ে সমাজসংস্কারের দিকেই মনোমোহনের ঝোঁক থাকিলেও রাজমোহনের মুখে কেশবের যোগসাধনার কথা শুনিয়া ও মাতার উৎসাহ পাইয়া তিনি উপাসনায় রত হইলেন এবং উহাতে মন স্থির করিবার জন্য ব্রাহ্মগণের অনুকরণে ব্যাঘ্রচর্ম, একতারা এবং খান-দুই গৈরিকবস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। উপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালীন ধারণা তিনি নিজেই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, "ভাল ভাল কতকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়া পরব্রহ্মের আরাধনা করাকেই উপাসনা বলিয়া গণ্য করিতাম। ...আমাদের বিশ্বাস এবং ধারণা যে, মানব-অন্তরে প্রকৃত অনুতাপ না জন্মিলে কোন উপাসনাকেই প্রকৃত উপাসনার মধ্যে

পরিগণিত করা যায় না। অনুতাপ ব্যতীত, চোখের জল ব্যতীত আত্মার মলিন আবরণ ধৌত হয় না। আত্মা শুদ্ধ না হইলে পবিত্র শুদ্ধাত্মাস্বরূপ ভগবানকে জানা যায় না।")

এই উপাসনায় বাধ সাধিলেন মনোমোহনেরই মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্ত। বিজ্ঞানবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসহীন রামচন্দ্রের প্রবল যুক্তির স্রোতে মনোমোহনের অদৃঢ়সংবদ্ধ উপাসনা-ভেলা বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু বাল্য-সংস্কার নির্মূল না হওয়ায় তিনি ভোগে মগ্ন না হইয়া বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের তরঙ্গে দুলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে যাইবাব ইচ্ছাও মনে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয় নাই। মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন চারিদিক জলে জলময়, আর সে প্রবল বন্যায় তিনি একাকী ভাসিয়া চলিয়াছেন—মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা, কেহ কোথাও নাই; অকস্মাৎ অশরীরী বার্তা বিঘোষিত হইল, "জগতে কেহ বাঁচিয়া নাই—সকলে মরিয়াছে।" মনে হইল, "তবে আমারই বা বাঁচিয়া লাভ?" দৈববাণী উত্থিত হইল, "আত্মহত্যা পাপ।" আবার মনে হইল, "কেহই যখন নাই, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব?" আকাশবাণী কহিল, "যাঁহারা ভগবান কি বস্তু জানেন, কেবল তাঁহারাই বাঁচিয়া আছেন এবং তাঁহাদের সহিত তোমার শীঘ্রই দেখা হইবে।" রাত্রিশেষে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও অপূর্ব স্বপ্নের ঘোর কাটিতে অনেক সময় লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি কোথায় আছেন বুঝিতে না পারিয়া নিকটস্থ আত্মীয়বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে, আর আমি কোথায়?" তাঁহারা তো অবাক্।

সেইদিনই প্রত্যূষে রামচন্দ্র এক গোস্বামীর সহিত মনোমোহনবাবুর গৃহে আসিয়া সদালাপে রত হইলেন। তাঁহাদের আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে মনোমোহনও উহাতে যোগ দিলেন। গোস্বামী মহাশয় সেদিন

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হিন্দুধর্মের এইরূপ প্রশংসা করিতেছিলেন যে, উহাতে মনোমোহনের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। রামচন্দ্রও তখন অবিশ্বাসের ঘূর্ণিপাক হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল; সুতরাং আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল ও ক্রমে দশটা বাজিয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় বিদায়-গ্রহণান্তে মনোমোহনের মুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন যে, সত্য সত্যই সমস্ত জগৎ মায়াঘোরে অচৈতন্য—কেহই জীবিত নাই। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল যে. সেদিন অবকাশ আছে; অতএব উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। যেমন সঙ্কল্প তেমনি কার্য—তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র-প্রসঙ্গে আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে মনোমোহনের মনের পরিবর্তন হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম সমাজের সমাজসংস্কারের আগ্রহে মত্ত মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুনিলেন যে, তাঁহারা যে ধর্মের কথা বলিতেছেন, তাহা সামাজিক ধর্ম—সমাজের শুভাশুভ লইয়াই তাহার কথা, সে ধর্মে ভগবানের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু তিনি (তাঁহাদিগকে) যে ধর্মের কথা বলিতেছেন, তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও শুনাইলেন যে, জাতি আছেও বটে আবার নাইও বটে—জাগতিক দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে ভেদ অনিবার্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে উহা নাই। ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মনোমোহন ক্রমেই নিজ অন্তরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন।

মনোমোহন প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে এবং সপ্তাহে অন্য দুই-একদিন ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুর কামারপুকুরে গমন করিলে মনোমোহন ছুটির দিনও ব্রাহ্ম সমাজেই কাটাইতেন। এতদ্ব্যতীত মাসতুতো ভাই শ্রীযুত নিত্যগোপাল ও রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তিনি প্রতিসন্ধ্যায় কীর্তন করিতেন। নিত্যগোপাল

পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে পরিচিত হন। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে তিনি রামচন্দ্রেরই গৃহে অবস্থান করিতেন।

ঐ বৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলে রামচন্দ্র ও মনোমোহনের প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে মনোমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ নহেন—অবতার। মনোমোহনের তখন বাসনা জাগিয়াছে, ঠাকুরের সেবা করিবেন। একদিন কোন্নগর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুর শ্রীচরণদ্বয় বিস্তারপূর্বক উপবিষ্ট আছেন; কিন্তু মনোমোহনের আগমনে উহা সঙ্কুচিত করিলেন। অমনি অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া মনোমোহন বলিলেন, "বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন? শীগগির বার করুন, নইলে কাটারি এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে গিয়ে কোন্নগরে রাখব এবং সকল ভক্তের সাধ মেটাব।" শ্রীরামকৃষ্ণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে চরণসেবার অধিকার দিলেন। ঠাকুরের কৃপায় ধন্য মনোমোহন ক্রমে স্বীয় আত্মীয়বর্গ এবং পরিচিতদিগকেও ঠাকুরের শ্রীচরণে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি নিজ জননী শ্যামাসুন্দরীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার অব্যবহিত পরেই ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরীর আগ্রহে কলিকাতায় মনোমোহন-গৃহে পদার্পণপূর্বক মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনোমোহনের চারিটি ভগিনী—মনোমোহিনী, সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী ও সুরেশ্বরী—সকলেই ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরীর পতি শশিভূষণ দে এবং সুরেশ্বরীর স্বামী বলরাম সিংহও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। বিশ্বেশ্বরী ও তাঁহার পতি রাখালচন্দ্রের কথা আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

মনোমোহনবাবু কয়েকবার কেশবচন্দ্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন, কেশবকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন; তাই শ্রীরামকৃষ্ণচরণে

তাঁহাকে প্রণতি ও পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান করিতে এবং নীরবে শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিতে দেখিয়া মনোমোহনের ভক্তি যে আরও দৃঢ় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৮১ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর মনোমোহন ঠাকুরকে স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং ঐ উপলক্ষ্যে একটি মহোৎসবের আয়োজন করেন। তাহাতে অন্যান্য ভক্তদের সহিত কেশবও আসিয়াছিলেন। পরবর্তী শনিবারে (১০ই ডিসেম্বর) ঠাকুর স্বেচ্ছায় মনোমোহনের মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে আসেন এবং সেখানেও মহোৎসব হয়। ঐ দিনও ঠাকুর মনোমোহনগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁহাকে 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্সের' স্টুডিওতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁহার ফটো তোলা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় রাজেন্দ্রবাবুর বাটীতে যে ভক্তসম্মেলন ও কীর্তন হয়, তাহাতে কেশব উপস্থিত ছিলেন। কেশবের ঐকান্তিক সেবার ভাব সৈদিনও অপূর্ব আকারে অভিব্যক্ত হইয়া মনোমোহনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কেশব বলিতেন যে, সাধারণের সহিত ঠাকুরকে উদ্দাম নৃত্য করিতে দিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটানো উচিত নহে—তাঁহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিয়া তাঁহার উপদেশামৃত পান করাই উচিত। এইরূপ কীর্তনে ক্লান্ত হইতে দেখিলেই কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্যত্র লইয়া যাইতেন, স্বয়ং তাঁহার আননের ঘর্ম অপসারিত করিতেন, পাখা লইয়া তাঁহাকে বীজন করিতেন এবং মিষ্টান্নাদি স্বহস্তে ও সন্তর্পণে শ্রীমুখে তুলিয়া দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের পর মনোমোহনের মন সাধনক্ষেত্রে যেভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, সম্প্রতি আমরা উহাই দুই-চারিটি ঘটনা-অবলম্বনে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনোমোহন সাধারণতঃ খুব শান্ত ও নিরীহ হইলেও বড় স্পষ্টবক্তা ছিলেন—অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা এক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে অযথা কটূক্তি করিতে থাকিলে মনোমোহন দৃঢ়স্বরে শাসন করিয়া, এমন কি, প্রহারের ভয় দেখাইয়া

তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু ঘটনাটি ঠাকুরের অজ্ঞাত রহিল না। পরে সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ক্রোধ সম্বন্ধে মনোমোহনকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, "কেউ আমার নিন্দা করল, কি সুখ্যাতি করল, তাতে আমার কি! আমি সকলের রেণুর রেণু।" ইহাতে মনোমোহন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমি কি তোমায় বকেছি যে তুমি চুপ করে মুখ গোঁজ করে বসে আছ? আমি কি তোমাদের বকতে পারি? ক্রোধ না চণ্ডাল। শাস্ত্রে কামের পরই ক্রোধকে শত্রু বলেছে। কাউকে রাগ করতে দেখলে আমি তাকে ছুঁতে পারি না।" ইহার ফলে মনোমোহন অতঃপর কাহাকেও স্বমতে আনিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতেন না। কেহ কথা না শুনিলে বা বিপরীত তর্ক করিতে থাকিলে তিনি তাহার সদ্বুদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন মাত্র।

একবার অসুস্থা জ্যেষ্ঠা কন্যা মানিকপ্রভার প্রায় অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মনোমোহনবাবু সেইদিন আর রামচন্দ্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না। কিন্তু মাতা শ্যামাসুন্দরী ইহা জানিয়া বলিলেন যে, তাহার যাওয়া উচিত; কারণ ইহাই বিশ্বাসের পরীক্ষা দিবার সময়। মাতা আরও বলিয়া দিলেন, মনোমোহন যেন ঠাকুরের নিকট মানিকপ্রভার কথা বলেন এবং ঠাকুরের সাধনভূমি হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া আসেন। ঐরূপ সকাম উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কৃপাভিক্ষা করা অসঙ্গত জানিয়াও মনোমোহন মাতার আদেশে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সেদিন ঠাকুর কেবল বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেছিলেন; অতএব মনোমোহন নিজ বক্তব্য বলিতে পারিলেন না। পরে অন্তর্যামী ঠাকুর শৌচে গমনকালে মনোমোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় সাধনার স্থানও দেখাইয়া দিলেন। মনোমোহনের কানে তখনও বৈরাগ্যের বাণী ধ্বনিত হইতেছে—তিনি মৃত্তিকা লইতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে ঠাকুর

নিজেই হৃদয়ের দ্বারা কিছু ধূলি ও একটি ফুল তাঁহাকে দেওয়াইলেন। মনোমোহন বাড়িতে ফিরিয়া মাতাকে উহা দিলেন এবং বলিলেন, "মা, আমায় আর কখনও এমন পরীক্ষায় ফেলো না।" মানিকপ্রভা সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

পিতার আদরের দুলাল মনোমোহন বড় অভিমানী ছিলেন। সেই অভিমান কখনও বা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। একবার তাঁহারই সমক্ষে ঠাকুর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথের ভক্তির প্রশংসা করিলে মনোমোহন অভিমানে ফুলিয়া উঠিলেন। পরবর্তী শনিবার দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি কোন্নগরে চলিয়া গেলেন এবং পর পর কয়েক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না; বলিলেন, "তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন, আমি সেখানকার কে?" শুধু কি তাই? ঠাকুর কোন্নগর হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য রাখালকে পাঠাইলেও তিনি নিজে তো গেলেনই না, অধিকন্তু রাখালকেও যাইতে দিলেন না; কেবল অপর কোন ভক্তের মুখে ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আগে ভক্তি হোক তবে যাব।" কিন্তু অভিমানবশে বিপরীত আচরণ করিলেও অশান্ত মন সর্বদা দক্ষিণেশ্বরেই ধাবিত হইতে লাগিল; তিনি শয়নে-স্বপনে ঠাকুরের কথাই ভাবিতে লাগিলেন—অন্য কোন বিষয়ে মন স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এইরূপ অশান্ত মন লইয়া কোনপ্রকারে দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে একদিন গঙ্গাস্নানকালে অকস্মাৎ একখানি নৌকায় ভক্ত বলরামবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আজ প্রাতেই ভক্তদর্শন হল—আজ আমার মহাসৌভাগ্য দেখছি।" বলরাম বলিলেন, "শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ আসিয়াছেন।" প্রভুর কথা শুনিয়াই মনোমোহন চমকিয়া উঠিলেন। নৌকায় অবস্থিত নিরঞ্জন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্বরে যান না কেন? আপনাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ঠাকুর স্বয়ং এখানে এসেছেন।" নৌকা মনোমোহনের নিকটবর্তী হইলে ঠাকুর সমাধিস্থ

হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরদরধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে দৃশ্যে পাষাণও গলিয়া যায়। মনোমোহনও নিজের অভিমান, অত্যাচারের কথা ভাবিয়া অকস্মাৎ বিবশ হইয়া পড়িলেন—দেহ ঢলিয়া জলে পড়িতে উদ্যত হইল। তখন নিরঞ্জন তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন। অনন্তর ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া ভক্ত মনোমোহন ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেদিন মনোমোহনের বাটীতে পদধূলি-অর্পণান্তে ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন প্রভৃতিকে কীর্তন করিতে বলিয়াছিলেন। পূর্বে অভ্যাস না থাকিলেও ঐ উপদেশের পর তাঁহারা কীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন; কিন্তু অচিরেই অনুভব হইল যে, যদিও কীর্তন-অবলম্বনে তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাময়িক প্রকাশ হইয়া থাকে এবং ভাবুকতার বৃদ্ধি হয়, তথাপি সঙ্কীর্তনের মত্ততা জীবনের অপর অংশগুলিকে মোটেই স্পর্শ করিতেছে না—সেখানে যে তিমির সেই তিমির। মনে মনে স্থির করিলেন, ইহা বৈরাগ্যের অভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে, সুতরাং একদিন (১৮৮২ খ্রীঃ, ১০ই মাঘ) শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন, যেন আর তাঁহাদিগকে সংসারবন্ধনে পতিত হইতে না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শোল মাছের ঝাঁকের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, ঝাঁকের নীচে মাছটিকে অবলম্বন করিয়াই যেমন চারাগুলি বাঁচিয়া থাকে, বড় মাছটিকে সরাইলে সেগুলিকে অপর মাছে খাইয়া ফেলে, তেমনি গৃহস্বামীই পরিবারের অবলম্বন—তাঁহাকে গৃহে থাকিয়াই সাধন করিতে হইবে। তারপর জগন্মাতার উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করার প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি গাহিলেন—

"যখন যেরূপে কালী রাখিবে আমারে।
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ

ভাব বজায় রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়—শুধু ভেখধারণ করিলেই একজনের ভাবরাশি অকস্মাৎ অপরের মনে সঞ্চারিত হয় না। তিনি বলিলেন, "কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ করা যায় না —একথা সত্য। আবার এও বলছি যে, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করলেই ঈশ্বরলাভ হয় না। ···জেনে রাখ, এ সংসার তোমার নয়—এ সংসার ভগবানের।" এই-সকল কথায় মনোমোহনের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, অনাসক্তিই সাধনের সার কথা এবং উহাই জীবনে প্রতিফলিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

এই নির্লিপ্ত ভাবের পরীক্ষা মনোমোহনকে একাধিকবার দিতে হইয়াছিল। একদিন রামবাবুর গৃহে মহোৎসব-কালে নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে মনোমোহনের মাতার শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া মনোমোহনকে সংগোপনে ডাকিয়া উহা জ্ঞাপন করিলেন এবং মহোৎসবের ব্যাঘাত যাহাতে না হয় তজ্জন্য অপরকে বলিতে বারণ করিলেন। অশেষ সংযম-সহকারে মনোমোহন মাতৃবাণী পালন করিয়া ঐ বিষয়ে নীরব রহিলেন। উৎসবান্তে ভক্তগণ চলিয়া গেলে দেখা গেল, শ্যামাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মাতৃবিয়োগের পর আর একটি কন্যার মৃত্যুকালেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া সমভাবে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বন্ধুগণ সান্ত্বনা দিতে আসিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে না যাই।" কন্যা মানিকপ্রভার মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরের ছবি কন্যার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "ভাল করে দেখ এবং তাঁকে ডাক। ভয় নাই, মা—তিনি সর্বদাই সঙ্গে আছেন। কেঁদো না, মা—এখন কাঁদবার সময় নয়।" তিনি কন্যার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কর্ণে মধুর রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেন। মানিকপ্রভা মুখে বিমলহাস্য ফুটাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলে

পিতা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "মানিক বেঁচে গেল!" ঐ বিদায়মুহূর্তে তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছেন, মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই—সমস্তই চৈতন্য, এমন কি মুমূর্ষু কন্যাটিও চৈতন্যের পুত্তলি মাত্র। এই অনুভূতির ফলে তিনি পাগলপ্রায় হইয়া কখন কাঁদিতে এবং কখন হাসিতে লাগিলেন। বাটীর লোকে ভাবিল, কন্যার শোকেই এইরূপ হইয়াছে—অন্তরের কথা কেহই জানিল না।

ভগিনীপতি ও ভগিনী সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ নির্লিপ্ততা ছিল। প্রথমে রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বৈরাগ্য দেখিয়া তিনি ভগিনী বিশ্বেশ্বরীর সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত ছিলেন; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন বলিলেন, "মনোমোহন, তুমি রাগই কর আর যাই কর, রাখালকে বললাম, 'ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস, একথা বরং শুনতে প্রস্তুত, তবু কারো দাসত্ব করছিস, চাকরি করছিস, একথা যেন না শুনি'"—সেদিন হইতে তাঁহার সকল ক্ষোভের অবসান হইল। বস্তুতঃ মনোমোহনের এই অনুভূতি হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিবারের সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও সেবিকা, মনোমোহন শুধু ইহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত।

এই সময়ে মনোমোহনবাবুর ভাগ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাপ্রচারের এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটিল। ১৮৮২ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর বৈষ্ণবচূড়ামণি নবচৈতন্য মিত্র মহাশয়ের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে যে মহোৎসব হয় তাহাতে যোগদান করিয়া এবং পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া কোন্নগরবাসীরা তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মনোমোহনবাবুকে প্রতি সপ্তাহে কোন্নগরে প্রচার করিতে বলিলেন। ভক্ত রামচন্দ্র প্রচারের নামে তখন উন্মাদবৎ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন কিছু করিবেন না; তাই তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "টেনে-বুনে কিছু করো না, তাঁর যেমন ইচ্ছা হবে তেমনি করাবেন।" ইহাকেই আদেশ মনে করিয়া

মনোমোহন ও রামচন্দ্র কোন্নগরে প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই জন্য প্রতি শনিবারে তাঁহারা কোন্নগরে যাইতেন। স্টেশন হইতে মনোমোহনের গৃহে যাইবার কালে কোন্নগরবাসী অনেকে তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া পরমহংসদেবের কথা শুনিতেন; মনোমোহনের বাটীতেও আলোচনাদি চলিত। রবিবার প্রাতে মনোমোহন, রামচন্দ্র ও নবচৈতন্য সংকীর্তনে বাহির হইতেন—পথে শত শত ব্যক্তি উহাতে যোগ দিতেন। এই সময় একদিন কোন্নগর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে রামবাবু ও মনোমোহনবাবু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখানে অন্য কেউ নাই, তোমরা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ; তোমাদের বলছি, শোন—একটি কথা আছে, 'সাঁঝ পহরে ভাতার ম'ল, কাঁদব কত রাত?' তোমরা এখনই এত পরিশ্রম করছ কেন? এরপর এমন সময় আসবে, যখন তোমরা খেতে-শুতে সময় পাবে না।" তদবধি সাপ্তাহিক প্রচার বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার পরেও কোন্নগরবাসীরা শ্রীযুত রামচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশেও তাঁহারা একবার গিয়াছিলেন। সেবারে কোন্নগর হরিসভায় বাৎসরিক উৎসবে সভার সভ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি রামবাবু ও মনোমোহনবাবুকে যাইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "তোমরা গেলেই আমার যাওয়া হবে।" রামচন্দ্র তথায় 'সত্যধর্ম কি' এই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। পরে সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তনের মধ্যস্থলে রামচন্দ্র ও মনোমোহন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; কোন্নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া সেই ভাববিহ্বল নৃত্যে যোগদান করিলেন। ক্রমে ভক্ত মনোমোহন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া উচ্চহাস্য করিতে থাকিলে কয়েকজন তাঁহার হতচেতন দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া পল্লীতে হরিধ্বনিসহকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি একটা পর্যন্ত তাহার সংজ্ঞা ফিরিল না দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া

গেলেন। ঐ রাত্রে প্রায় তিনটার সময় তিনি বাহ্যভূমিতে ফিরিয়া আসেন। এই ঘটনার পর তিনি কোন্নগরবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন এবং অনেকেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিত। শোনা যায়, কোন্নগরে যখন এই কীর্তনের উন্মাদনা চলিতেছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেবল বলিতেছিলেন, "লাগ ভিল্‌কি লাগ।"

এই-সকল প্রচারকার্য ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশসম্বলিত 'তত্ত্বসার' নামক পুস্তিকা এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক পুস্তক-প্রকাশে মনোমোহনবাবু রামচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে পরমহংসদেবের অনুমতিক্রমে, নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, কালীপদ ঘোষ ও মনোমোহনের অর্থসাহায্যে এবং রামচন্দ্রের সম্পাদনায় 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। উহার অধিকাংশ সংখ্যাই ঠাকুরের ভাবে ও উক্তিতে পূর্ণ থাকিত এবং উহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ফলতঃ ঐ সময়ে যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগাবতার বলিয়া সর্বসাধারণে্য প্রচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন ও রামচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন।

ঠাকুর অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবা চালাইবার জন্য অনুগন ভক্ত মনোমোহন মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। এই জন্য একখানি পত্রে তাঁহার সহধর্মিণীকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "একটি পয়সাও যেন বাজে খরচ না হয়। যে পয়সাটি বাজে খরচ করিবে, জানিবে সেইটি প্রভুর সেবাকার্যে লাগাইতে পারিলে না। এখন প্রভুর সেবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যুবকগণ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, তাহাদের সেবাকার্য দেখিলে আনন্দ হয়। যাহাতে অর্থাভাবে এই সেবাকার্যটি অচল না হইয়া পড়ে তাহা আমাদের দেখা অবশ্য কর্তব্য।" শুধু অর্থ দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আফিস কামাই করিয়াও মধ্যে মধ্যে দুই-চারি দিন

কাশীপুরে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন, অধিকন্তু চাকরি ছাড়িয়া দিবার কথাও ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে আফিসে যাইতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যুবক ভক্তরাই সব করিতেছে, অপর কাহারও সেখানে থাকা অনাবশ্যক। মনোমোহন মস্তক পাতিয়া সে আদেশ মানিয়া লইলেন।

ঠাকুরের পূত দেহাবশেষ কাঁকুড়গাছিতে সমাহিত হইবার পর মনোমোহনবাবু প্রায়ই সেখানে যাইয়া অনেক সময় কাটাইতেন। বৃষ্টি নিবারণের জন্য সমাধিস্থানের উপর আচ্ছাদন ছিল না। মনোমোহনবাবু একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পরলোকগতা জননী বলিতেছেন, "ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে।" সুতরাং তিনি শ্রীযুত রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, যাহাতে পাকা আচ্ছাদন প্রস্তুত করা হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার অস্থি গঙ্গাতীরে সমাহিত হয়; অতএব এই প্রস্তাবে আপত্তি উঠিল। অবশেষে সমস্যা-সমাধানের জন্য এক সভা আহূত হইল এবং ভক্তগণ এই মর্মে একখানি স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিলেন যে, কস্মিন্ কালে কেহ ঐ অস্থিপূর্ণ কলসটি স্থানান্তরিত করিবেন না। এই-সকল কার্যে মনোমোহনকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অতঃপর মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলে তিনি প্রতিদিনই তথায় যাইয়া বেলা নয়টা পর্যন্ত কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পূর্বেই মন্দির সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং ৺শ্যামাপূজার দিনে উহাতে বিশেষ পূজাদি হয়।

জন্মাষ্টমীতে কাঁকুড়গাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থিপূর্ণ কলসটি সমাহিত হইয়াছিল। এই ঘটনার স্মরণার্থে প্রতিবৎসর শ্রীযুত রামচন্দ্রের গৃহ হইতে কাঁকুড়গাছিতে যখন গীতবাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা যাইত, তখন মনোমোহনবাবু থাকিতেন উহার পুরোভাগে। ঐরূপ একটি কীর্তন-(সম্ভবতঃ ১৮৯০ কি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) সম্বন্ধে স্বামী বিরজানন্দ (তদানীন্তন

কালীকৃষ্ণ) পরে বলিয়াছিলেন, "রামবাবু, মনোমোহনবাবু, দেবেনবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের অনেক গৃহী ভক্ত ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। 'ত্রিতাপে সদা তনু দহিছে'—এই গানটি ধরা হয়েছিল। যোগোদ্যানে পৌঁছেও খুব সংকীর্তন হ'ল। রামবাবু ও মনোমোহন-বাবুর ভাবাবেশ হ'ল। রামবাবু 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে হুঙ্কার দিয়ে সিংহবিক্রমে ঘুরতে লাগলেন। মনোমোহনবাবু ভাবে কি যেন অপূর্ব দর্শন বা অনুভূতি করছেন, তাই খিলখিল ক'রে হেসে উঠছিলেন। মাঝে মাঝে কুঁজো ও আড়ষ্ট হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। খুব মাতামাতি হয়েছিল। আমরা সকলেই খুব অভিভূত হয়েছিলাম।"

এদিকে বরাহনগরের মঠে ত্যাগী ভক্তেরা সমবেত হইয়া সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেছেন; কিন্তু তখন অন্নবস্ত্রের বড়ই অভাব। মনোমোহনবাবু ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে একদিন মঠে যাইয়া স্বচক্ষে যে অভাব দেখিলেন তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের নিকট উহা জ্ঞাপন করিয়া মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করাইলেন। মঠের সাধুদের অসুখ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। সন্ন্যাসীরা তাঁহার গুরুভাই এবং তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি সন্ন্যাসীর মর্যাদা বিস্মৃত হইতেন না, দেখা হইলেই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের প্রতিও তাঁহার তুল্যরূপ আকর্ষণ ছিল এবং এক বৎসর কাল তিনি নিয়মিতভাবে তথায় যাইয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। তথায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিত, সময়ে সময়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত এবং শরীর পুলকিত হইত। এতদ্ব্যতীত যখনই তিনি যাইতেন তখনই মিষ্টান্নাদি লইয়া গিয়া ঠাকুরের ঘরে এমনভাবে নিবেদন করিতেন, যেন প্রত্যক্ষ ঠাকুর সেখানে রহিয়াছেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহনবাবু এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। একই সঙ্গে তাঁহার দুইটি পুত্র ও এক ভাগিনেয় বিসূচিকায় দেহত্যাগ করে। ইহাদের দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্বে এক জ্যোতির্ময় প্রশান্ত মূর্তি মনোমোহনের বক্ষ স্পর্শপূর্বক দেখাইয়া দিলেন যে, এই বিশ্বসংসার একটি খেলাঘর মাত্র। এই দর্শনের ফলস্বরূপ লোকে দেখিয়া আশ্চর্য হইল যে, মনোমোহন পুত্রশোকে মোটেই বিহ্বল হইলেন না; সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা সান্ত্বনার জন্য আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেই ব্যস্ত রহিলেন—যেন কিছুই হয় নাই।

এই সময়ে রামবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি জীবনী লিখিবার সঙ্কল্প করিলে উহার উপাদান-সংগ্রহের জন্য মনোমোহনবাবু কামারপুকুরে গমন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচরদের নিকট অনেক তথ্য অবগত হইয়া ঘাটালের পথে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রচার প্রধানতঃ মহোৎসব ও নাম-সঙ্কীর্তন-অবলম্বনেই চলিতেছিল; ১৮৯২ খ্রীঃ হইতে যোগোদ্যানের যুবকগণ নামকীর্তনসহকারে নগরভ্রমণ আরম্ভ করেন। পরবৎসর ১৯শে চৈত্র রামচন্দ্র স্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে বক্তৃতাকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। এই-সকল কার্যে মনোমোহন বিশেষ সহায়তা করিতেন। বক্তৃতাস্থলে যাইবার কালে যোগোদ্যান হইতে রামচন্দ্রের পুরোভাগে সংকীর্তনের যে দল চলিত উহার নেতা হইতেন মনোমোহন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উদ্যমে পরিচালিত সিমলা-পল্লীর সাপ্তাহিক সভায় বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ পর্যায়ক্রমে পরমহংসদেবের ভাবধারায় পুষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়লাভের পর এই প্রচারকার্য অধিকতর সহজ হইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিবার আগ্রহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু সভাসমিতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের অনেকগুলিরই সহিত উদ্যোগী ভক্ত মনোমোহনের

সংযোগ ছিল। এই সূত্রে তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে ঘাটাল, যশোহব, ঢাকা, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, গয়া, আরা প্রভৃতি স্থানেও যাইতে হইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় 'তত্ত্বমঞ্জরী' নবকলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হইলে তিনি উহাতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

১৮৯৩ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার গৃহে প্রতিদিন অনেক ভক্তের সমাগম হইত এবং তিনিও অক্লান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতেন কিংবা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইঁহাদের মধ্যে সুধীর মহারাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ, শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকুমার বসু, চারুচন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের লীলাপার্ষদগণের ভিতর স্বামী অদ্ভুতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, ভবনাথ ও মাস্টার মহাশয় তাঁহার গৃহে সময়ে সময়ে শুভাগমন করিতেন।

তাঁহার শেষ কয় বৎসর বিষাদে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল পুত্রবৎ প্রতিপালিত তাঁহার ভাগিনেয় সত্যানন্দ ঘোষ দশ বৎসব বয়সে দেহত্যাগ করিল। তিন-চারি বৎসর পরে তাঁহার বিবাহিতা কন্যা মানিকপ্রভা শ্রীরামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিল। ইহার অল্প পরেই (২৩শে মার্চ, ১৯০০) তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রীরামকৃষ্ণে অর্পিতপ্রাণ মনোমোহন অচল-অটল রহিলেন। স্ত্রীর শ্রাদ্ধদিবসে মনোমোহনকে কীর্তনের মাঝে শঙ্খধ্বনিসহকারে নৃত্য করিতে দেখিয়া একজন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ আমার মহামায়ার গুরু নিপাত হইয়াছে—আজ আমি বন্ধনমুক্ত।" ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভগ্নী সুরেশ্বরীর মৃত্যু হয়। তখন তিনি সকলকে জানাইয়া দেন যে, ইহার পরে তাঁহার পালা।

স্ত্রীবিয়োগের পর মনোমোহনবাবু সমস্ত অবসরসময় ধর্মপ্রসঙ্গ ও যোগোদ্যানের কার্যের তত্ত্বাবধানাদিতে কাটাইতেন। অনেক সময় সারা রাত্রি ধ্যানে কাটিয়া যাইত। সকাল নয়টা পর্যন্ত গঙ্গাস্নান ও পূজাদিতে অতিবাহিত হইত। আফিসেও অবসরকালে অনুরাগীদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ চলিত। শনিবারে নিজগৃহে আলোচনা-সভা বসিত এবং রবিবারে যোগোদ্যানে অনুরূপ প্রসঙ্গাদি হইত। শেষ বয়সে তাঁহার বহু দর্শনাদিও হইয়াছিল। কোন সময়ে তিনি সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দেখিয়া আত্মহারা হইতেন, কখনও বা শ্বেত পক্ষীর শ্রেণী পৃথিবী হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া নীল আকাশে মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন দেশকালের ঊর্ধ্বে ধাবিত হইত, আবার কোন সময়ে বা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে লক্ষ্মীরূপে দর্শন করিয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। কাঁকুড়গাছির মন্দির-বেদিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির পশ্চাতে একবার তিনি দেখিলেন, ঠাকুর উঁকি মারিতেছেন। বিশ্বাস না হওয়ায় পুনঃপুনঃ চক্ষু মার্জিত করিয়া চাহিলেন—দেখিলেন, সেই একই মূর্তি। অমনি তিনি দীর্ঘ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গের পরেও স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতে-ফিরিতে বহুক্ষণ যাবৎ সেই মূর্তি তাঁহার সম্মুখে জ্বলজ্বল করিতেছিল। একবার পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনে যাইয়া তৎস্থলে ঠাকুরকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণরূপী জগন্নাথের জয়!" আর একবার কাঁকুড়গাছির মন্দিরসম্মুখে দাঁড়াইয়া মনোমোহনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "রামকৃষ্ণ-ভাবের বন্যা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে," আর বলিলেন, "দেখ, এই যে তিনি; তিনি আনন্দে হাততালি দিচ্ছেন, আর ওষ্ঠদ্বয়ে মধুর হাসি!" অতঃপর প্রায় একঘণ্টা ভাবের ঘোর চলিতে লাগিল—সকলে দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু আরক্তিম, কপোল অশ্রুসিক্ত আর দেহ ঘন ঘন কম্পিত।

কঠিন পরিশ্রম ও হাঁপানিরোগে তাঁহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দেখিয়া তিনি গৃহে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন—আর উঠিলেন না। ডাক্তারদিগের মতে তাঁহার সন্ন্যাসরোগ হইয়াছিল; কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত যোগস্থ ছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজ তিন দিন প্রায় অবিরাম তাঁহার শয্যাপার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলেন। এই তিন দিন ভক্তবর মনোমোহনের মুখে অনুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইয়াছিল; যখন অধরোষ্ঠ উচ্চারণে অক্ষম হইল তখনও উহা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া জানাইয়া দিতেছিল যে, অন্তরে জপ চলিতেছে। যখন তাহাও সম্ভব হইল না, তখন অপরের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে তাঁহার দেহ পুলকিত হইল এবং ৩০শে জানুয়ারী (১৬ই মাঘ, ১৩০৯) তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

## দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ধ্যানলব্ধ সত্যকে গার্হস্থ্য জীবনে রূপপ্রদান করা এক বিষম সমস্যা; অথচ উহা না করিতে পারিলে সাধারণ মানব তাদৃশ সত্যের মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল জনকয়েক ভক্তের মধ্যে ঐ সহজবোধ্য আদর্শ স্থাপন করা। তাই দেবেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া সন্ন্যাসগ্রহণের আকুতি জানাইলে ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে ভূমি হইতে তুলিয়া শচীমাতার ভাবে গান ধরিলেন—

"কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হবি?
ও তোর ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার দশা কি করিবি?
একে বিশ্বরূপের শোকে,
শক্তিশেল রয়েছে বুকে,
তুইও কি অভাগী মাকে অকূলে ডুবাবি?"

বলা আবশ্যক যে, দরিদ্র দেবেন্দ্রের বৃদ্ধা মাতা তখনও জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রের শোক ভুলেন নাই, আর তাঁহার ঘরে আছেন সাধ্বী স্ত্রী।

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইল মহাকুমার অধীন জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৫০ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষ (জানুয়ারী, ১৮৪৪) মজুমদার-উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা প্রসন্ননাথ দেবেন্দ্রের জন্মের দুইমাস পরে দেহত্যাগ করেন। মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকুলের সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যেই দেবেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠতাত তাঁহার অভিভাবক হন। তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্র কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত গতাসু হইলে একবিংশ বৎসর বয়সে

সুরেন্দ্রই সংসারভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেবেন্দ্র অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন।

পিতৃহীন, গৌরবর্ণ, সুদর্শন দেবেন্দ্র শৈশবে সকলের আদরে একটু দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।। একদিন মাতা তাঁহাকে দৌরাত্ম্যের জন্য শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলে তিনি লম্ফপ্রদানপূর্বক পলায়ন করিলেন ; কিন্তু বাম হস্তখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। উহা জোড়া লাগিলেও চিরজীবন একটু বাঁকিয়াই রহিল। পাঠাদিতে তাঁহার মন ছিল না ; তবে হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল এবং হিসাব ও দলিলপত্র লেখায় খুব পটুতা জন্মিয়াছিল। সরল দুরন্ত বালক একবার এক গোপবালকের প্ররোচনায় আকাশ ধরিতে ইতস্ততঃ ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে অভিজ্ঞতা চিত্তপটে মুদ্রিত থাকিয়া পরে সঙ্গীতাকারে নির্গত হইয়াছিল—

"সৃষ্টিজোড়া তোমার মায়া, কায়া নয় কেবলই ছায়া,<br>মাঠের মাঝে আকাশ ধরা,<br>ঘুরে সারা চারিধারে।")

জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনর বৎসব। এখানে আসিয়াও তাঁহার পড়াশুনা অধিকদূর অগ্রসর হইল না ; চারি-পাঁচ বৎসর কোনও প্রকারে শিক্ষালয়ে কাটাইয়া তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিলেন।

পুঁথিগত বিদ্যার অবসান হইলেও কাব্যামোদী সুরেন্দ্রের সান্নিধ্যবশতঃ দেবেন্দ্রের সাহিত্যস্পৃহা বর্ধিত হইল। যৌবনারম্ভে সুরেন্দ্র সংসারের তাড়নায় বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও সর্বদা বাণীর আরাধনায় রত থাকিতেন। পরিণত বয়সেও ইংরেজী দর্শন ও ইতিহাস-চর্চায় তাঁহার অবসরকাল অতিবাহিত হইত, আর অন্তরের সৌন্দর্য কাব্যরচনায় আত্মপরিচয় দিত। তৎপ্রণীত 'মহিলা', 'সবিতা-সুদর্শন' ইত্যাদি কাব্য তাঁহার উচ্চ কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। কবি সুরেন্দ্রের আসরে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের

আবির্ভাব হইত এবং উভয় সাহিত্যরসিকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাব্যালোচনা চলিত। দেবেন্দ্র পার্শ্বে বসিয়া সব শুনিতেন এবং বহু বিষয় হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আর একটি গুণ ছিল যোগাভ্যাস। ভ্রাতার দ্বারা অনুপ্রাণিত দেবেন্দ্রও যোগাভ্যাসে তৎপর হইলেন এবং দীর্ঘ সাধনার পর চৌষট্টি প্রকার আসনে তাঁহার অধিকার জন্মিল।

এই সময়ে দেবেন্দ্রের জননী তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে; এমন কি, পুত্র সম্মত নহেন দেখিয়া তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। কাজেই ১২৭৭ বঙ্গাব্দের এক শুভ মুহূর্তে দেবেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। ইহারই আট বৎসর পরে (১২৮৫ সালের ৩রা বৈশাখ) সুরেন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া একচল্লিশ বৎসর বয়সে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইলেন। দেবেন্দ্রের জীবন তখন সমস্যাময়—অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবারের দায়িত্ব তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। বহু দিবস অনশন ও অর্ধাশনে কাটাইয়া এবং অযাজনীয়দের গৃহে শ্রাদ্ধের দান পর্যন্ত স্বীকার করিয়া তিনি অবশেষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের জমিদারী সেরেস্তায় একটি অল্প বেতনের চাকরি পাইলেন। এইরূপ স্থানে অপরেরা উৎকোচ গ্রহণপূর্বক স্বীয় অভাব মেটায়। দেবেন্দ্রবাবু কিন্তু এতটা হীনতা স্বীকার করিতে পারিলেন না; অতএব ঋণ বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিলে তিনি নিজ মনিবকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মনিব দেবেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট চিনিয়াছিলেন; তাই স্বেচ্ছায় তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিলেন। তখনও ব্যয়সঙ্কোচের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, ব্যয়বহুল মহানগরী পরিত্যাগপূর্বক হাওড়া শহরের শালকিয়া অঞ্চলে বাস করিবেন। ঐ স্থান তখন ম্যালেরিয়াসঙ্কুল ছিল। ফলে তিনি অচিরেই রোগগ্রস্ত হইলেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে পুনর্বার কলিকাতায়

ফিরিয়া আসিয়া আহিরীটোলায় নিমু গোস্বামী লেনে বাড়িভাড়া লইলেন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ নিয়মিত যোগাভ্যাস করিতেন। সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একাদিক্রমে একাদশ বৎসর যোগাভ্যাসের ফলে তাঁহার দেবদেবীর সাক্ষাৎকার, অপরূপ জ্যোতিদর্শন কিংবা অশ্রুতপূর্ব শব্দশ্রবণ হইত। কখনও শরীর অতি লঘু মনে হইত—যেন ইচ্ছা করিলেই আকাশমার্গে চলিতে পারেন ; কখনও বা ভ্রূমধ্যে জ্যোতিবিন্দু প্রকাশিত হইয়া বিস্তারলাভপূর্বক সমস্ত গৃহ স্নিগ্ধ আভায় উদ্ভাসিত করিত। কিন্তু এইরূপ উন্নতিসত্ত্বেও মজুমদার মহাশয়ের অভাববোধ বা বিষয়চিন্তা দূরীভূত না হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয় নাই। আবার এত চেষ্টাও বিফল হইতেছে দেখিয়া ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল! তবে সৌভাগ্যবশতঃ জন্মগত বিশ্বাস ও সংস্কার তাঁহাকে ঐ পথে অধিক দূর যাইতে না দিয়া বরং অচিরে গভীরতম সাধনায় মগ্ন করিল। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সংস্পর্শ পরিত্যাগপূর্বক তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির ত্রিতলের এক নির্জন কক্ষে ভগবদ্ধ্যানে দীর্ঘকাল কাটাইতেন। ঈদৃশ নিভৃত চিন্তার ফলে তাঁহার এই অনুভূতি হইল যে, ভগবদ্দর্শন ভগবানেরই কৃপাসাধ্য ; অতএব তিনি লিখিলেন—

কে তোমারে জানতে পারে
তুমি না জানালে পরে ?
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত,
খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে। ইত্যাদি

অতঃপর ঈশ্বরসাক্ষাৎকারে ব্যাকুল দেবেন্দ্রবাবু যেখানে ঐ বিষয়ে সাহায্যলাভের সম্ভাবনা দেখিতেন, সেখানে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে

কেশবচন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আরম্ভ হইল। একদিন মাতুলগৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি বৈঠকখানায় 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিতে' পড়িলেন—একবার অঘোরনাথ ডাকাতের হস্তে পড়িয়াছিলেন, প্রাণনাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাঁহার ভক্তিদর্শনে দস্যুরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বিবৃতি পড়িয়া মজুমদার মহাশয় উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে বলে ভগবান নাই? এই যে ভগবান আছেন দেখছি, নইলে অঘোরনাথকে কে বাঁচালে?" তখনই আপন গৃহে ফিরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন, আর ব্যাকুলতার আবেগে কেশ ছিন্ন করিতে করিতে ও দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "কোথায় কে আছ, দেখা দাও।" তিন দিন তিন রাত্রি আনাহারে অনিদ্রায় কাটিল। চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে ছাদে পদচারণকালে অরুণরাগে ঢলমল বালার্ককে উদীয়মান দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে বলে ভগবান নাই? ঐ যে ভগবানের নিদর্শন।" আর মন হইতে স্বতই বাণী উঠিল, "গুরু চাই।"

গুরুর সন্ধানে তিনি প্রথমে কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু কালনার স্টীমার সেদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব ক্ষুণ্ণমনে পূর্বপরিচিত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে প্রাপ্ত 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' নামক একখানি পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। উহার এক স্থানে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লেখ ছিল। 'পরমহংস রামকৃষ্ণ!'—কথা দুইটির মধ্যে না জানি কি মোহিনী শক্তি লুক্কায়িত ছিল! অজ্ঞাতসারে নবালোকে উদ্বোধিত দেবেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, "পরমহংস তো খুব উচ্চ অবস্থা! ভগবদ্দর্শন না হলে এমন অবস্থা হয় না। তিনি কি আমার সহায় হবেন?" এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে দৈবক্রমে এক পরিচিত ব্যক্তির নিকট তিনি পরমহংসের সন্ধান পাইলেন। অতঃপর বাসায় ফিরিয়াই দক্ষিণেশ্বর

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আহিরীটোলার ঘাট হইতে অন্যান্য যাত্রীসহ নৌকা পাল তুলিয়া বেগে উত্তরাভিমুখে চলিল।

আবেগভরে সহসা গৃহীত সঙ্কল্পানুসারে দেবেন্দ্র চলিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে; কিন্তু ঐরূপ চলা ঠিক হইয়াছে তো? তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হয়তো না আসিলেই ছিল ভাল। কিরূপ সাধু ইনি? নামিয়া পড়াই কি উচিত নয়?" এইরূপ আন্দোলন মনোমধ্যে চলিতেছে, এমন সময়ে নৌকা দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসিয়া লাগিল। স্পন্দিতহৃদয়ে দেবেন্দ্র-বাবু তীরে নামিলেন এবং স্নানরত নিরঞ্জনের নির্দেশ-অনুসারে ঠাকুরের কক্ষের পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কক্ষ তখন শূন্য; কিন্তু অচিরেই ঠাকুর আগমন করিলেন। দেবেন্দ্রের মন বলিয়া দিল, ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে পদধূলি গ্রহণ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া এবং পাদুকা বাহিরে রাখিয়া ঘরে আসিতে বলিলেন। দেবেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া পুনঃ প্রণামান্তে মাদুরের উপর বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" দেবেন্দ্র—"কলকাতা থেকে।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "কি এমনি দেখতে?" দেবেন্দ্র—"না, আপনাকে দেখতে।" অমনি ঈষৎ ক্রন্দনস্বরে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "আর আমায় কি দেখবে বল? পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। হাত দিয়ে দেখ না—এই জায়গাটি। দেখ দেখি হাড় ভেঙ্গেছে কি না? বড় যন্ত্রণা, কি করি?" দেবেন্দ্রবাবু স্পর্শ করিয়া দেখিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁগা, সারবে তো?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "আজ্ঞে সেরে যাবে।" সরল বালকেব ন্যায় ঠাকুর অমনি সোৎসাহে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন।" দেবেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "এ ঢং নয় তো? কোথায় আমি সাধুদর্শনে

এলাম, আর ইনি আমায় সাধু বানিয়ে দিলেন! ইনি যেন আমায় বাকসিদ্ধ পেলেন। কী এঁর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস কি মানুষে হতে পারে? না, হয়তো এ সমস্ত লোক-দেখানো ঢং।" অনিমেষনেত্রে তিনি ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ঠাকুরের আদেশে হরিশ সন্দেশ ও জল আনিয়া দেবেন্দ্রকে দিলেন। জলযোগের পর ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলাপ চলিল। পরে ঠাকুরের উপদেশানুসারে তিনি দ্বিপ্রহরে বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, সেদিন আর স্নান করিলেন না। ঠাকুরের মধুর আলাপ ও ততোধিক মধুর ব্যবহারে মজুমদার মহাশয়ের হৃদয় সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইল। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর অন্তর্যামিবৎ তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতি ও নিরামিষাহারের কথা জানিতে পারিয়াছেন, কৌশলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করাইয়াছেন ও সস্নেহে আহারাদি করাইয়াছেন। সাধু সম্বন্ধে তাঁহার এযাবৎ যে-সকল ধারণা ছিল, তাহার অনেকটাই বর্তমান ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিলেও এখানে এমন একটা দেবদুর্লভ ভাব ছিল যাহা সর্ব কল্পনার অতীত।

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া ও দেবালয়াদি দর্শন করিয়া যখন দেবেন্দ্রনাথ পুনর্বার শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে আসিলেন, তখন ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক এবং দেহ উত্তপ্ত। ঠাকুরের সমুৎসুক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, তিনি অসুস্থ বোধ করিতেছেন। ইহাতে ঠাকুর বিচলিত হইলেন এবং সমীপাগত বাবুরামকে সঙ্গে দিয়া দেবেন্দ্রকে নৌকাযোগে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় আসিয়া টলিতে টলিতে দেবেন্দ্রবাবু এক আত্মীয়গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং স্বগৃহে যাইবার জন্য পালকি আনিতে বলিলেন। কিন্তু স্বগৃহে আর যাওয়া হইল না। প্রবল জ্বরে অজ্ঞানপ্রায় ও চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায় ঐ গৃহেই তাঁহার একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। রোগযন্ত্রণামধ্যে তিনি অচৈতন্য অবস্থায় বলিতেন, "ঠাকুরবাড়িতে শৌচ-প্রস্রাব করা ভাল হচ্ছে না।" মধ্যে মধ্যে পরম-

হংসদেবের নামোচ্চারণপূর্বক অস্ফুটস্বরে কত কি বলিতেন এবং যেমনই রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চক্ষু ঊর্ধ্বদিকে ফিরাইতেন, অমনি যেন শিয়রে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন। অথচ আরোগ্যলাভান্তে দক্ষিণেশ্বরের নামে তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, আর তিনি মনকে বুঝাইতেন, "সেখানে গেলে বুঝি তিনি তোমায় চতুর্ভুজ দেখিয়ে দেবেন—না? এই তো গিয়েছিলে—কেমন ভগবান দেখে এলে? বাপ! প্রাণ নিয়ে টানাটানি! তার চেয়ে যা রয় সয় তাই কর না কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, নিঃসহায় তো নও? গায়ত্রী জপটাই বেশ ক'রে কর না কেন?" তাহাই হইল—দক্ষিণেশ্বরে তিনি গেলেন না; তবে গায়ত্রী-জপের সময়বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে রাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বহুদিন পর এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় বসিয়া দেবেন্দ্রবাবু 'সুলভ সমাচার' পড়িতে পড়িতে দেখিলেন এক স্থানে আছে, "অদ্য বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে ভক্তসহ মিলিত হইবেন।" পরমহংস-নামের বিমোহিনী শক্তি আবার তাঁহাকে বিচলিত করিল—তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে বলরাম-মন্দিরে উপনীত হইলেন। ঠাকুর তখন কীর্তনানন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছেন। সহসা তিনি সমাধিস্থ হইলে সকলে সাদরে পদধূলি লইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র এযাবৎ আপনাকে পৃথক রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন ভাবিলেন, এই তো সুযোগ, এই সময়ে পদধূলি লইলে ঠাকুর লক্ষ্য করিবেন না—সুতরাং সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ দেখাইতে গিয়া ভক্তসমাজে লজ্জিত হইতেও হইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই দেবেন্দ্রের পৃষ্ঠে হস্তস্থাপনপূর্বক ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো, কেমন আছ? এতদিন ওখানে যাওনি কেন? আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।" ধরা পড়িয়া লজ্জাবনতবদনে মজুমদার মহাশয় জানাইলেন, "আজ্ঞে,

ভাল আছি। বড় অসুখ করেছিল, তাই যাওয়া ঘটে ওঠে নি।" ঠাকুর পুনরায় সস্নেহে বলিলেন, "এখন থেকে যেও, ওখানে যেও। কেমন, যাবে তো?" "আজ্ঞে, যাব বৈকি" বলিয়া দেবেন্দ্র চুপ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ভুলেন নাই, তিনি তাঁহাকে চাহেন। —তিনি তদবধি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন।

মজুমদার মহাশয় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমার বড় ইচ্ছা আপনার কাছে মন্তর নিই।" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "কি করব বাপু, আমি তো কাউকে মন্তর দিই না।" ইহাতে দুঃখিত হইলেও দেবেন্দ্র নিরাশ না হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং অবিলম্বে একদিন গঙ্গাস্নানান্তে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং পুষ্প, মাল্য ও একটি ফুলের তোড়া হাতে লইয়া মন্ত্রগ্রহণোদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া প্রীতিসহকারে ঠাকুর বলিলেন, "বেশ ফুল, বেশ মালা তো! যাও, ঠাকুরদের দিয়ে এস।" দেবেন্দ্র জানাইলেন, এই মালা তাঁহারই জন্য; ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ফুলে দেবতার ও বাবুদের অধিকার। তুমি আমায় কি ঠাওরাও?" বাধা-অসহিষ্ণু দেবেন্দ্র অভিমানভরে কহিলেন, "এ দুয়ের মধ্যে একটা মনে করেছি।" অমনি ঠাকুর ফুলের তোড়াটি হাতে লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একটি নিচ্ছি, বাকীগুলো মায়ের ঘরে দিয়ে এস।" অগত্যা তাহাই হইল। কিন্তু মন্ত্র না পাইলেও তিনি তদবধি কিছুকাল যখন তখন ঠাকুরের দর্শন পাইতে লাগিলেন—পথ চলিতে ঠাকুর তাঁহার অগ্রগামী, গৃহে তিনি পার্শ্বে দণ্ডায়মান, চলিতে-ফিরিতে সর্বদা তিনি রক্ষাকর্তা।

দক্ষিণেশ্বরে বালক-ভক্তগণকে ঠাকুরের সেবা করিতে দেখিয়া দেবেন্দ্রের মনেও একদা অনুরূপ ইচ্ছার উদয় হইল। সুযোগ পাইয়া তিনি একদিন ঠাকুরের শৌচে গমনকালে গাড়ু-গামছা লইয়া পশ্চাতে চলিলেন। কিছু দূর যাইয়াই ঠাকুর পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলেন

এবং জিব কাটিয়া বলিলেন, "এঁ্যা! তুমি কেন নিয়ে এসেছ? তোমার সঙ্গে যে আমার ও-ভাব নয়।" অভিমানী মজুমদার মহাশয় ভাবিলেন, "আমি কি এতই হীন যে, গাড়ু-গামছা বইবারও অধিকারী নই?" অগত্যা গাড়ু নামাইয়া অপরাধীর ন্যায় নিম্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং ঠাকুর দূরে চলিয়া গেলে পঞ্চবটীমূলে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইলেন। চিন্তা ধ্যানে পরিণত হইয়া তাঁহাকে নিস্পন্দ করিল—বৃক্ষলতা, বাটী, গঙ্গা সব অন্তর্হিত, নিজের অস্তিত্বজ্ঞানও নাই। জ্ঞান হইলে দেখিলেন, ঠাকুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "দেখ, তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি সকাল বেলা আর সন্ধ্যে বেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করো; তা হলেই হবে। হরিনাম চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন—বড় সিদ্ধ নাম। আর এখানে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবে!"

আর একদিন ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, তুমি যে এখানে আসছ যাচ্ছ, তা কি বুঝলে? কি হ'ল?" চিন্তা করিয়া দেবেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, "তা মশাই, এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে পারছি না; তবে ধর্মসম্বন্ধে, কি ঈশ্বরসম্বন্ধে জানবার জন্য আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না, আর মনটাও তেমন হাঁকপাক করে না।" ঠাকুর দুই হাতের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি অনেক করেছ বটে; কিন্তু থাপে থাপে লাগেনি। কি জান?—যে ঘরের যে।"

পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া দেবেন্দ্র তদবধি হরিনামজপে মন দিলেন। জপ তখন তাঁহার এমন অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, নিদ্রাবস্থায়ও মুখ হইতে 'হরি হরি' ধ্বনি উঠিত। তখন জমিদারী সেরেস্তার কার্য পরিত্যাগ করায় সময়েরও অভাব ছিল না। অন্যের প্রবেশরহিত গৃহে তিনি আপন সাধনায় মগ্ন থাকিতেন—আহার সেখানেই পৌছাইয়া দিতে হইত। ধ্যানাবস্থায় তখন তাঁহার বিবিধ দর্শন হইত। একদিন শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা

ও তিলকভূষিতা কয়েকটি স্ত্রীলোক একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "ওরা অবিদ্যার সহচরী—তোমায় প্রণাম ক'রে চলে গেল।" একদিন তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার দেহ পৃথক হইয়া পড়িয়া আছে—তিনি দাঁড়াইয়া উহা দেখিতেছেন। অকস্মাৎ কেমন ভয় হইল, "তবে কি দেহত্যাগ হইল ?" অমনি শরীর কম্পিত হইল--তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। দীর্ঘ সাধনার ফলে এই সময়ে তাঁহার দেহে পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইত, আর বাহ্য ব্যবহার উন্মাদপ্রায় হইয়াছিল—বিষয়ীর সংস্পর্শ অসহ্য বোধ হইত, আত্মীয়স্বজন কালসর্পবৎ ও গৃহ অন্ধকূপসদৃশ প্রতিভাত হইত। কিন্তু গুরুভ্রাতাদের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হইয়া এমন হইল যে, তিনি তাঁহাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না, কেহ আসিলে বলপূর্বক দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতেন। সব জানিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা, ওকে এত দিস না। আহা, ও ছা-পোষা লোক, ওর মুখ চেয়ে অনেকগুলি রয়েছে।" অনন্তর দেবেন্দ্রনাথের মন সহজাবস্থায় ফিরিল ; সংসারপালনের জন্য তিনি ভ্রাতৃজামাতা যোগেশ-প্রকাশ বাবুর জমিদারিতে কার্য গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর স্বয়ংকৃতার্থ দেবেন্দ্র অপরকেও শ্রীরামকৃষ্ণচরণে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন রামচন্দ্রের গৃহে ঠাকুরকে দর্শনান্তে গমনোদ্যত গিরিশবাবুকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাটীর এক যুবক তাঁহার প্রেরণায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিল। দেবেন্দ্রেরই টানে তাঁহার মাতুল হরিশচন্দ্র মুস্তফী এবং বীরভূমবাসী বিহারী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারই কৃপায় অক্ষয় মাস্টার শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আশ্রয় পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষার্থে দেবেন্দ্রবাবু একদিন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে

তাঁহার বসিবার ছোট চৌকীর তোষকের কোণ তুলিয়া উহার তলায় একটি রূপার দু-আনি রাখিয়া দিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া বারংবার বসিতে চাহেন, কিন্তু বসিতে পারেন না; অগত্যা দেবেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হাঁগা, এমন হচ্ছে কেন? আমি বিছানা ছুঁতে পারছি না কেন?" লজ্জায় ম্রিয়মাণ দেবেন্দ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলে ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "কি, আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা বেশ, বেশ।" কাঞ্চনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঠাকুর তখনও ভক্তের নিকট কামিনীবিষয়ে পরীক্ষা দেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত দেবেন্দ্রকে তিনি একদিন বলিলেন যে, একজন মহিলার জন্য তাঁহার মন কেমন করিতেছে—অনেক দিন তাঁহাকে দেখেন নাই। তারপর রসগোল্লা আনাইয়া দেবেন্দ্রকে খাওয়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, উক্ত মহিলাই উহা দিয়াছেন এবং তিনি ঠাকুরকে বড় ভালবাসেন। দেবেন্দ্রের সন্দেহ জাগিয়াছিল; তাই অনিচ্ছাক্রমেই ইহা গলাধঃকরণ করিলেন। অবশেষে ঠাকুর গাড়ি করিয়া উক্ত মহিলার গৃহে চলিলে দেবেন্দ্রও আমন্ত্রিত হইয়া গাড়িতে উঠিলেন। পথে ঠাকুর নারীমূর্তি-দর্শনে "মা আনন্দময়ী" বলিয়া প্রণাম করেন, আর দেবেন্দ্রের গা টিপিয়া জানাইয়া দেন, "আমি কারো ভাব নষ্ট করি না।" ক্রমে সদলবলে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর একাকী সটান অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্রের সন্দেহ তখন চরমে উঠিয়াছে, আর এদিকে সঙ্গী মাস্টার মহাশয় গান ধরিয়াছেন—

আমার গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে,
গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে,
গোরা কার ভাবেতে মাতোয়ারা (ভাব বুঝতে নারলুম রে)।

ইতোমধ্যে ঠাকুরও বাহিরে আসিয়া অসমাপ্ত গানের বাকী অংশ গাহিতে লাগিলেন। একটু পরেই ভিতর হইতে আহ্বান আসায় তিনি জলযোগ

করিতে গেলেন। স্বল্প পরেই আহূত হইয়া দেবেন্দ্রাদিও ভিতরে প্রবেশপূর্বক দেখেন এক বৃদ্ধা বাৎসল্যভাবে আপ্লুতা হইয়া সজলনয়নে শ্রীরামকৃষ্ণপার্শ্বে উপবেশনপূর্বক তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন এবং ঠাকুরও পাঁচ বছরের ছেলের মতো আলুথালু অবস্থায় বসিয়া আছেন। এই প্রকার স্বর্গীয় দৃশ্য-দর্শনে দেবেন্দ্রের সন্দেহাকুল মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল এবং দুষ্ট মনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কিয়ৎক্ষণ জলযোগের কথা ভুলিয়া সেই বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র পরে জানিলেন, এই ভক্তিমতী মহিলা যদুবাবুর মাসী।

দেবেন্দ্র এই সময়ে যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, উহার খাতিরে তাঁহাকে বিদেশী পোশাক পরিয়া মধ্যে মধ্যে আদালতে যাইতে হইত ; ঐ বেশেই আদালতের নথিপত্র সহ তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিলেন ; কারণ তিনি জানিতেন যে, ঠাকুর আদালতের কালিমালিপ্ত দলিলপত্র পছন্দ করেন না। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন এবং তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ওতে কোন দোষ হবে না, তুমি ভিতরে এস।" আর একদিন হঠাৎ গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির অনুরোধে অশুচি বস্ত্রেই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্র স্থির করিলেন যে, সেদিন ঠাকুরকে স্পর্শ করিবেন না ; কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে আপন সন্নিকটে টানিয়া বসাইলেন। আর একদিন গরম মিহিদানা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসার সময় স্থানাভাববশতঃ দেবেন্দ্রকে জনৈক দীর্ঘশ্মশ্রু বিধর্মীর নিকট বসিতে হয় এবং সে ব্যক্তি অনর্গল কথা বলিতে থাকিলে দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, বক্তার মুখ হইতে অবিরাম থুৎকারবিন্দু নির্গত হইতেছে। অতএব সন্দেহ জন্মিল যে, হয়তো মিহিদানা অপবিত্র হইয়াছে। কাজেই দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া উহা এক কোণে রাখিয়া দিলেন। এদিকে ঠাকুর ক্ষুধাবশে খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে উহা দেখিয়া আনন্দসহকারে

খাইতে লাগিলেন। ভাবদোষ, স্পর্শদোষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন ঠাকুরের এরূপ আচরণদৃষ্টে স্বতই মনে হয়, "সত্যই তো, ভগবানও যদি ভক্তের ভাব না দেখিয়া আচারমাত্র দেখেন, তবে দুর্বল মানুষ দাঁড়ায় কোথায় ?"

শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বগৃহে আনিয়া ভক্তগণ আমোদ-আহ্লাদ করেন দেখিয়া দেবেন্দ্রেরও একদিন অনুরূপ ইচ্ছা হইল। তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে চাহিলে দেবেন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "গাড়িভাড়া যে অনেক লাগে, তোমার আয় তেমন নয়।" দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তা হোক মশাই, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" বস্তুতঃ সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎসহ আগত ভক্তবৃন্দ দেবেন্দ্রের সেবা ও আতিথ্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। আহারকালে, দেবেন্দ্রের পরিবারবর্গের ভক্তিসন্দর্শনে ঠাকুর বিশেষ প্রীত হইয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন, তিনি যেন একদিন সকলকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। সপরিবারে দেবেন্দ্র যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রের মাতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জননীর ন্যায় সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধা দেবেন্দ্রজননীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত আলাপান্তে শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা লইয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুর অঙ্গুলি দ্বারা দেবেন্দ্রের জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলে দেবেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল যে, ঠাকুর তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন।

বরাহনগর মঠপ্রতিষ্ঠার পর দেবেন্দ্রবাবু প্রায়ই তথায় যাইতেন। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। দেবেন্দ্রবাবু যদিও জানাইলেন যে, ইহা ঠাকুরের অনুমোদিত নহে, তথাপি স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইলেন। ইহাতে অন্তরের বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে এতই বিভোর করিল যে, তিনি সঙ্গী মাতুলকে জানাইলেন, আর "আমি বাড়ি যাব না।" মামা

অবশ্য নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন ; কিন্তু সন্ন্যাসের সে ঘোর কাটিতে প্রায় একমাস লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভাবে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। একদা গিরিশবাবুর বাড়িতে নারিকেলবৃক্ষের শাখা বায়ুভরে দুলিতেছে দেখিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছচূড়ার কথা মনে পড়ায় তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। জ্ঞান হইলে গিরিশচন্দ্র ভাবুক দেবেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখ, দেবেনবাবু, আমার এখানে ভাব-টাব করো না—ওতে আমার বড় ভয় করে।" আর একদিন সশিষ্য এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, "সসীম মনের দ্বারা অসীম ভগবানের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?" প্রশ্নশ্রবণে দেবেন্দ্রনাথ মা-কালীর ছবির দিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার জ্ঞানলাভান্তে পণ্ডিতের শিষ্য যখন আবার ঐ প্রশ্নের কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তখন পণ্ডিত কহিলেন, "বাপু, তোমার চেয়ে মূর্খ তো আর দেখিনি। চোখের সামনে দেখলে কি ক'রে মনের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা হ'ল—তবু আবার জিজ্ঞাসা করছ?"

আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় দেবেন্দ্রকে বড়ই বিব্রত থাকিতে হইত। তাই মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি তথায় ক্যাসিয়ারের পদ গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে দিনে জমিদারী সেরেস্তায় এবং রাত্রে থিয়েটারে কাজ চলিতে লাগিল। থিয়েটারের অনুরোধে তাঁহাকে বহু উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতীর সংস্পর্শে আসিতে হইত ; এমন কি, অনেক সময় নটীদিগকে গৃহ হইতে ডাকিয়া আনিতে হইত। ইহার ফলে দেবেন্দ্রর মনে কুচিন্তার উদ্ভব হইয়া ক্রমে উহা আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার আকারে দেখা দিল। অতএব তিনি ১৮৯৫-এর মার্চ মাসে ঐ কার্য পরিত্যাগপূর্বক ভক্তদের নিকট সান্ত্বনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নাগ মহাশয় বলিলেন, "কাজলের

ঘরে কাজ করতে গেলে গায়ে দাগ লাগেই ; তা ভয় কিসের ? গুরু সঙ্গী আছেন, ধুয়ে নিবেন ।" এতদিনে দেবেন্দ্র সত্যকার আশ্বাসবাণী শুনিয়া শান্ত হইলেন । ঠাকুরই তাঁহাকে রক্ষা করিলেন । পরে তিনি সকলকে বলিতে লাগিলেন, "লোকে আমার জীবনের এই সময়কার ঘটনা জানতে পারলে বুঝতে পারবে যে, জীবনে একবার মন্দ কার্য করলে যে তাকে ভগবানের পথ হতে জন্মের মতো বিচ্যুত হতে হবে তার কোন কারণ নাই । আমি সেই সময়ে কত গর্হিত কাজ করেছি, তথাপি দয়াময় ঠাকুর আমায় ত্যাগ করেননি ।" জীবনের এই অধ্যায়ের কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "একটানা উন্নতিই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে, প্রত্যুত প্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান উহাই প্রকৃত মহত্ত্ব ।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারির কার্য পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্র প্রায় এক বৎসর বেকার ছিলেন ; এই সময়মধ্যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পরিবারে অতঃপর রহিলেন তাঁহার সহধর্মিণী ও ভ্রাতৃজায়া । নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে চাকরিহীন থাকা অসম্ভব জানিয়া তিনি ১৮৯৬খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে ইটালী অঞ্চলের মহেন্দ্রবাবুর জমিদারিতে চাকরি লইলেন ; বেতন ধার্য হইল মাসিক ২৫৲ । এই কর্মগ্রহণের প্রায় পাঁচ-ছয় মাস পরে তিনি সপরিবারে ইটালী ৩৩নং দেব লেনের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন ।

কার্যের অবসরকালে দেবেন্দ্রনাথ জমিদারবাবুদের পুষ্পোদ্যানে নিভৃতে জপধ্যানে রত থাকিতেন ; কখনও বা তিনি কেওড়াতলার শ্মশানে সাধন করিতেন ; কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে আপনাকে সাধক বলিয়া পরিচয় দিতেন না, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাও প্রচার করিতেন না ; বরং তাঁহার আয়ের তুলনায় পোশাকের পারিপাট্যের আধিক্যদর্শনে লোকে মনে করিত, তিনি ঘোর বিষয়ী ও বিলাসী । ইতোমধ্যে আচার্য বিবেকানন্দের বিজয়লাভের পর কলিকাতাবাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের অন্বেষণে

ফিরিতেছে এবং তাঁহাদের নিকট যে গুপ্তধন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া উহার অংশগ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছে। তাই মজুমদার মহাশয়েরও মনে হইল যে, তিনিও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গে ধন্য হইয়াছেন, তখন শ্রীগুরুর মহিমাখ্যাপন তাঁহারও অবশ্য কর্তব্য। এই ভাবেই মহেন্দ্রবাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উপেন্দ্রবাবুকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। উপেন্দ্র শৈশবে পরমহংসদেবকে কয়েকবার দেখিয়াছিলেন; সুতরাং দেবেন্দ্রবাবুকে পাইয়া সেই-সব স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে অগ্রসর হইলেন। ইহাই দেবেন্দ্রের প্রচারকার্যের আরম্ভ। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থ দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চালাঘরে সমাগত লোকদিগকে লইয়া সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে তিন-চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

তখনও মজুমদার মহাশয় আচার্যের আসন গ্রহণ করেন নাই; সে সুযোগও শীঘ্রই আসিল। একদিন মহেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রবাবুর বিশেষ অনুরোধে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপরের বৈঠকখানায় এক সন্ন্যাসীর মুখে শ্যামাসঙ্গীত শুনিতে যাইয়া ভাবে এতই বিভোর হইলেন যে, আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া সভামধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেদিন হইতে ইটালী অঞ্চলে তিনি সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে অনেকে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিল।

প্রাগুক্ত ঘটনার অল্প পরে (১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯) দেবেন্দ্রবাবুর সহধর্মিণী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯০৫-এর শেষভাগে ইঁহারও দেহান্ত হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্র নামক ঐ অঞ্চলের এক যুবক তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হইয়া স্বীয় আবাসবাটী ৪৩নং দেব লেনে কীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

নির্দিষ্ট গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি রাখিয়া ভক্তগণ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই-মে সন্ধ্যার সময় মহানন্দে নিয়মিত কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের' প্রতিষ্ঠার দিন। এইরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রবাবু ভক্তবৃন্দসঙ্গে যোগদানপূর্বক কীর্তন এবং সুমধুর গল্প ও সরস উপদেশাবলীতে সকলের মন হরণ করিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার উপলব্ধি হইল যে, উপস্থিত ভক্তদের উপযুক্ত সঙ্গীত অতীব বিরল; অতএব সুনিপুণ লেখনি-অবলম্বনে গম্ভীরভাবপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনায় অগ্রসর হইলেন। এই-সকল গান পরে 'দেবগীতি' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'ইটালীর অর্চনালয়' অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। স্বামী সারদানন্দ একসময়ে প্রায় দুই মাস কাল প্রতি শনিবারে সেখানে শাস্ত্রপাঠাদি করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দেরও তথায় শুভাগমন হইয়াছিল (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১)। ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীদের এবং গিরিশবাবু ও মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তদেরও প্রায়শঃ আগমন হইত। স্বামী অখণ্ডানন্দের সারগাছি আশ্রমের জন্য দেবেন্দ্রবাবু নিয়মিতভাবে অর্থসংগ্রহ করিতেন। আর বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিল তাঁহার এক অপূর্ব সৌহার্দ্য। গোপীভাবে বিভোর মজুমদার মহাশয়কে স্বামীজী অনেক সময় 'সখী' বলিয়া সাম্বোধন করিতেন; আর তাঁহার নৃত্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগিলেই গান ধরিতেন:

"আমি মথুরা-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।" ইত্যাদি

অমনি দেবেন্দ্রের পদদ্বয় নৃত্যচঞ্চল হইয়া উঠিত। কিন্তু স্বামীজী অধিক ভাবপ্রবণতা পছন্দ করিতেন না; তাই স্নায়ুমণ্ডলী দৃঢ়করণার্থে তাঁহাকে আমিষাহারের পরামর্শ দিতেন। দেবেন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী হইলেও

স্বামীজীর এই কথাকে আদেশরূপে গ্রহণপূর্বক মৎস্যাহার আরম্ভ করেন ; কিন্তু মাংসভোজন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে অর্চনালয়ে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব হয়। তদবধি প্রতিবৎসরই উহা হইয়া আসিতেছে। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে অর্চনালয়ে বর্তমান ৩৯নং দেব লেনের বাটীটি ভাড়া করা হইলে দেবেন্দ্রবাবু উহাতে উঠিয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই দোলের সময় হইতে সেখানে ঠাকুরের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি আরম্ভ হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র ঠাকুরকে রথে বসাইয়া আনন্দোৎসবের পরিকল্পনা করিলেন। তদনুসারে সুসজ্জিত বালকদিগকে দেবেন্দ্র-বিরচিত একটি গান শিখাইয়া দেওয়া হইল। যথাসময়ে শ্রীশ্রীমা উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়া রথপুরোবর্তী নৃত্যপরায়ণ বালকগণের মুখে গান শুনিলেন—

"এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্টু করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা ? বাবা নিদয় গেছেন ফেলে !
বেড়াই বলে যেথা সেথা, মা বুঝি তাই কস্‌নে কথা,
শুনি নাই এমন কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র মলে !"

শ্রীশ্রীমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বালকমুখে দেবেন্দ্র স্বীয় আর্তি তাঁহারই শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি পূর্বে তাঁহার সম্মুখে ঘোমটা খুলিয়া কথা বলিতেন না ; আজ কিন্তু উহার ব্যতিক্রম হইল—তিনি দেবেন্দ্রকে সম্মুখে ডাকাইয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

দেবেন্দ্রবাবুর প্রেরণায় অনেক যুবক ঐ সময়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিরত হইতেন। তাঁহাদেরই মধ্যে শ্রীযুত নফরচন্দ্র কুণ্ডু একদিন ঐ অঞ্চলের ঢাকা নর্দমা-পরিষ্কারে নিযুক্ত মরণাপন্ন দুইটি ধাঙ্গর বালককে বাঁচাইবার জন্য নর্দমার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ; ফলে তাঁহারও মৃত্যু হইল। অতঃপর দেবেন্দ্রবাবু সভাসমিতির সাহায্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাইলেন।

শেষ বয়সে মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ১৯০৬-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি পুরীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ১৯০৭ অব্দে তিনি মীরাটে গমন করিলে তাঁহার গুণমুগ্ধ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে হৃষীকেশাদি-দর্শনান্তে পর বৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ভক্তগণ তাঁহাকে দুর্বল শরীরে পরের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহার সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। তদবধি তিনি শুধু ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়াই রহিলেন। ১৯০৮ অব্দেও তিনি মীরাটে গিয়াছিলেন। সেখানে শীতলচন্দ্র মিত্র নামক এক ভক্তের মাতা পীড়িতা হইলে দরিদ্র শীতলচন্দ্র ভাবিয়া আকুল হইলেন যে, মায়ের সেবা ও চাকরী কিরূপে একসঙ্গে চলিবে। সব শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ সেবাকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শীতপ্রধান স্থানে বারংবার বাহিরে যাতায়াতের ফলে অচিরেই স্বয়ং অসুস্থ হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, ডবল নিউমোনিয়া, প্রাণসংশয়। যাহা হইক, ভক্তদের যত্নে ও ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া তিনি পর বৎসর মার্চ মাসে কলিকাতায় ফিরিলেন।

কলিকাতায় স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতে লাগিল। অথচ ভক্তসমাগম ও উপদেশদান বাড়িয়াই চলিল। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি বিভিন্ন সময়ে ভবানীপুর, হেতমপুর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। এই সময়ে ভক্তগণ স্থির করেন যে, অর্চনালয়ের বাটী অস্বাস্থ্যকর ; অতএব উপযুক্ত স্থানে বাড়ি ক্রয় করিবেন। বাটী নির্বাচিত হইয়া বায়না পর্যন্ত হইয়া গেল ; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, বহু মহাপুরুষের স্মৃতিজড়িত ও তীর্থীভূত বর্তমান বাটী তিনি ত্যাগ করিবেন না। সুতরাং সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল।

ক্রমে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ আসিল। মজুমদার মহাশয়ের বয়ঃক্রম তখন

৬৮ বৎসর। তাঁহার শরীর তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতেছে, দেহে দুর্বলতা আছে, তদুপরি শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট ও সায়েটিকার যন্ত্রণা, অথচ সবল ব্যক্তির ন্যায় তিনি তখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভক্তদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এপ্রিল মাসে গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে মহাসমারোহে তাঁহার জীবনের শেষ শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া গেল। দেবেন্দ্রবাবু পূর্বসংস্কারানুযায়ী নৃত্যগীতে পূর্ণোৎসাহে যোগ দিলেন এবং সমাগত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের গুণগ্রাহীদিগকে উৎসবানন্দে মাতাইলেন! কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝিলেন যে, আর অধিক দিন তিনি থাকিবেন না—ভক্তদিগকে তাহা জানাইয়াও রাখিলেন। অনন্তর ২৭শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ( ১৪ই অক্টোবর ১৯১১ ) বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে অশ্রু-পুলক-কম্পমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বাঞ্ছিত লোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

# সুরেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকালে যাঁহারা তাঁহার উপদেশমধ্যে একটা শাশ্বত সৌন্দর্য ও অমৃতরসের আস্বাদলাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া সর্বসাধারণের উপকারার্থে উহা প্রকাশপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী ও হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত সেই অগ্রণীবৃন্দের অন্যতম। আবার গৃহস্থ হইয়াও যাঁহারা অমায়িকতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাবলম্বন, সরলতা প্রভৃতি সাধুচিত গুণরাশি নিজ জীবনে প্রকটনপূর্বক সেই উপদেশলাভের সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন, সুরেশবাবু তাঁহাদেরও মধ্যে অতি উচ্চাসনের অধিকারী।

তিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অন্তঃপাতী হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', 'সাধকসহচর', 'নারদসূত্র' (বা 'ভক্তিজিজ্ঞাসা'), 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সমালোচনা', 'বেদ ও বাইবেল', 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ', 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত', 'কাজের লোক' প্রভৃতি পুস্তকের সংগ্রাহক বা রচয়িতারূপে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তকখানি এখনও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। গ্রন্থখানির প্রথম ভাগ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হয়। পরে ১২৯৭ সালে উহা 'পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ' নামে দুই ভাগে পরিবর্ধিতাকারে বাহির হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়; তখন উহার প্রতিখণ্ডে একশতটি উপদেশ ছিল। এই কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্রের অদম্য উৎসাহ ও সহায়তা ছিল এবং তিনিই ছিলেন গ্রন্থের প্রকাশক; প্রতি সংস্করণ

নিঃশেষিত হইয়া গেলে তিনি আরও নূতন উপদেশ-সংযোজনের জন্য সুরেশবাবুকে অনুরোধ করিতেন ও গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত মুদ্রণকার্যে অগ্রসর হইতেন না। ইহার ফলে নূতন সংস্করণপ্রকাশে বিলম্ব হইয়া যাইত। চতুর্থ সংস্করণের সময় অধিক বাধা ঘটিল এই যে, হরমোহনকে ঠাকুর স্বধামে টানিয়া লইলেন। সুতরাং নবকলেবর লইয়া গ্রন্থখানি ১৩১৫ সালের পূর্বে জনসমাজে উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতঃপর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রে ৬২ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্রও বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করিলেন। বর্তমানে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামে ঐ গ্রন্থখানি একখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাতে পরমহংসদেবের জীবনী ও ৯৫০টি উপদেশ আছে। গ্রন্থখানির প্রারম্ভে প্রদত্ত 'প্রকাশকের নিবেদন'-পাঠে জানা যায় যে, সুরেশবাবু সমস্ত উপদেশ স্বকর্ণে না শুনিলেও নির্ভরযোগ্য ভক্তগণের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রামাণ্য অবিসংবাদিত।

সুরেশবাবু সম্ভবতঃ ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কোনও একসময়ে নাগ মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ করেন। এই ঘটনা ও নাগ মহাশয়ের সহিত সুরেশের সৌহার্দ্যের কথা আমরা নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুরেশ নাগ মহাশয়কে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া সাকারে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন; সুতরাং 'মামার' সহিত তাঁহার প্রায়ই তুমুল তর্ক হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিনে আগত সুরেশবাবু মন্দিরের দেবদেবীকে প্রণাম করেন নাই। পরে একাকী বা নাগ মহাশয়ের সহিত তিনি অনেকবার তথায় গিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন। সুরেশবাবুর উহাতে বিশ্বাস না থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণের মত জানিবার জন্য উভয়ে তৎসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি সুরেশকে দীক্ষার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু ব্রাহ্মসংস্কারাপন্ন সুরেশ জানাইলেন, "আমার তো মন্ত্রে বা ঈশ্বরীয় রূপে বিশ্বাস নেই।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তবে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নেই। পরে তুমি এর প্রয়োজন বুঝবে ; সময়ে তোমার দীক্ষা হবে।"

ইহার পরে যখন তাঁহার মনে দীক্ষার আগ্রহ জাগিল, তখন তিনি কোয়েটার ইংরেজ সরকারের সমরবিভাগে মাসিক তুইশত টাকা বেতনে চাকরি করেন। তখন ( ১৮৮৫ খ্রীঃ ) আফগান যুদ্ধ চলিতেছে এবং সরকার ঐজন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার মধ্যে দ্রুত কার্যসম্পাদনের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে হয় বলিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পিত হয় ; বহু বিষয়ে তাঁহাদের মঞ্জুরী থাকিলেই আয় ব্যয়াদির যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে না। এই সুযোগে অসাধুতাবৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুরেশবাবুর উর্ধ্বতন জনৈক কর্মচারীও এই প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং লভ্যাংশের এক তৃতীয়াংশ সুরেশচন্দ্রকে দিবার প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। সুরেশবাবু উহা অস্বীকার করিলে কর্মচারী ভয় দেখাইলেন যে, অবাধ্যতাদির অভিযোগ আনিয়া তিনি তাঁহাকে সামরিক আইন অনুযায়ী বন্দী করিবেন অথবা বলপূর্বক স্বকার্য সিদ্ধ করাইবেন। সুরেশবাবু তখন চাকরিত্যাগে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু কর্মচারী জানাইলেন যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না। নিরুপায় সুরেশবাবু তখন এক সহৃদয় ইংরেজ ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোক তাঁহার সততায় মুগ্ধ হইয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন যে, সুরেশচন্দ্র সমরবিভাগের কার্যের অনুপযুক্ত। এইরূপে অব্যাহতি পাইলেও তাঁহার স্থলে নূতন লোক না আসা পর্যন্ত আরও কিছুদিন তাঁহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

মুক্তি পাইয়া সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় চলিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বল তখন মাত্র কুড়ি টাকা। কাশীতে পৌঁছিবার পরেই ঐ সামান্য অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি অতঃপর পদব্রজে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তিনি অযাচিত অন্নে উদরপূর্তি করিতেন এবং বিশ্রামস্থলে পথের সহায় 'গীতা'খানি খুলিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এইভাবে ভাগলপুরে উপনীত হইলে জনৈক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে কলিকাতা অবধি একখানি টিকেট কিনিয়া দিলেন। বাড়িতে যখন তিনি আসিলেন তখন তিনি নিঃস্ব, আর ভ্রাতার মাসিক আয় মাত্র পঁচিশ টাকা। সুরেশবাবুর পোষ্য তখন তাঁহার স্ত্রী এবং একটি কন্যা। ইঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি কুলি সাজিয়া কলিকাতার রাস্তায় আত্মীয়দের অজ্ঞাতসারে আলু ফেরি করিয়া দৈনিক সাত-আট আনা গৃহে আনিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে তিনি মাসিক ষাট টাকা বেতনে একটি চাকরি পাইলেন। ঈশ্বরভাবে ভাবিত অনাড়ম্বর জীবনেই তিনি আনন্দ পাইতেন; অতএব অল্প আয়ই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। স্বল্পে তুষ্ট থাকিয়া তিনি ধর্মকর্মে অধিকতর মন দিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তখন অসুস্থ হইয়া কাশীপুরে আছেন। অতএব সুরেশের মনে এখন দীক্ষার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি উহার সম্ভাবনা দেখিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই ঠাকুর স্বধামে প্রয়াণ করিলেন।

সুরেশের অন্তর তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। নিশীথে তিনি ভাগীরথী-তীরে যাইয়া ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, অথবা একাকী কাঁদিয়া বুক ভাসান। মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নিরাকারবাদী হইলেও ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনাদি করিতেন। অধুনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নাগ মহাশয়ের পূত সঙ্গে সাকারোপাসনা ও দীক্ষাদির প্রয়োজনবোধ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হওয়ায় পূর্বসঞ্চিত ভক্তিসংস্কার ঐ নবভাবগুলিকে অচিরে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। এইরূপ অশান্তচিত্তে শয়ন করিয়া এক রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন, পরমহংসদেব গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কি হইতেছে বুঝিবার পূর্বেই বিস্মিত সুরেশচন্দ্রকে অধিকমাত্রায় বিস্মিত করিয়া ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দীক্ষা দিলেন। শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে সুরেশবাবু অবনত-মস্তকে প্রণামান্তে তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু ঠাকুরকে আর দেখিতে পাইলেন না। ভোরের স্বপ্ন, বিশেষতঃ দেবস্বপ্ন মিথ্যা হয় না ; অতএব তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকট-লীলা সমাপ্ত হইলেও তাঁহার নিত্যলীলার আরম্ভ মাত্র ; কারণ তিনি যুগাবতার। ইহার পর লব্ধমন্ত্রাবলম্বনে তিনি সাধনায় অধিকতর মগ্ন হইলেন।

সুরেশবাবুর পরবর্তী জীবনও লোভশূন্যতা ও ভক্তিপরায়ণতায় ভরপুর। স্বাধীনচেতা তাঁহাকে প্রায়ই সততারক্ষার জন্য বেকার সাজিতে হইত। একবার কলিকাতায় ঐরূপ কর্মবিহীন অবস্থার কালে লিপ্‌টন কোম্পানি ঘোষণা করেন যে, চায়ের সম্বন্ধে যিনি ইংরেজীতে সর্বোত্তম প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। সুরেশবাবু যে প্রবন্ধ লিখিলেন লণ্ডনের বড় সাহেব উহাকে সর্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ২৫০৲ টাকা বেতনে চাকরিতে ভর্তি করিতে আদেশ দিলেন। তিনি চাকরি পাইলেন। কিন্তু কলিকাতার এক সাহেব চায়ের মিশ্রণে অসাধুতার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি সে কাজ পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বামীজীর নিকট দীক্ষালাভের পর একদিন মঠে ঠাকুরকে ভোগ দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজী এই বলিয়া

নিষেধ করিলেন যে, কলিকাতা হইতে জিনিসপত্র আনিয়া সময়মত ভোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সুরেশবাবু এই সংবাদ পাইয়া শরৎবাবুকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। পরদিন ভোররাত্রি চারিটার সময় শরৎবাবুকে লইয়া তিনি নূতন বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং পরিচিত লোকদের নিকট হইতে সমস্ত সংগ্রহান্তে প্রত্যুষে শরৎবাবুকে একখানি গাড়ি করিয়া আলমবাজার মঠে পাঠাইয়া দিলেন। সুরেশবাবুকে গাড়িতে উঠিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "না হে, আমি দই হাতে করে হেঁটে যাব; না হলে গাড়ির ঝাকুনিতে চলকাবে। ঠাকুরের ভোগে লাগবে কিনা!" সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎবাবুকে মঠে উপস্থিত এবং ঠাকুর যে-সব জিনিস পছন্দ করিতেন সেই সবই আসিয়াছে দেখিয়াই স্বামীজী সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই তোর কাজ নয়। কে বাজার করেছে বল তো?" শরৎবাবু সুরেশবাবুর নাম করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "তাঁকে আনলি না যে?" শরৎবাবু কারণ বলিলে স্বামীজীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল, আর তিনি আবেগভরে বলিলেন, "দেখলি, ঠাকুর যাদের ছুঁয়েছেন, তারা সোনা হয়ে গেছে।"

সুরেশবাবুর এই গুণাবলী লক্ষ্য করিয়াই ১৩১৯ সালের পৌষ মাসের 'উদ্বোধনে' লিখিত হইয়াছে—"সাধু দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় পঠদ্দশা হইতে সুরেশবাবুকে প্রিয় সহচররূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বহুকাল পর্যন্ত বিশেষভাবে জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন এবং আমাদের জনৈক বন্ধুর নিকটে সুরেশবাবুর সম্বন্ধে একসময় বলিয়াছিলেন যে, নিজ চরিত্র একেবারে সাদা (বিশুদ্ধ) রাখিতে তিনি সুরেশের ন্যায় বিরল ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন। নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেও সুরেশবাবু আপন স্বাভাবিক আভিজাত্য ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় সর্বদা প্রদান করিয়াছেন।...শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সঙ্গগুণে সুরেশবাবুর ভগবল্লাভেচ্ছা ও সাধনানুরাগ উত্তরকালে এত পরিবর্ধিত হইয়া উঠে যে, তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবারবর্গের

জন্য কয়েক মাসের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া সংসারের সকল কার্য হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক নির্জনে ঈশ্বরারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। চাকরী নাই, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, পাগল হইল ভাবিয়া আত্মীয়বর্গ নিরন্তর তাড়না করিতেছে; অথচ হৃষ্টচিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন—এরূপভাবে কাল কাটাইতেও আমরা সুরেশবাবুকে অনেক দিন দেখিয়াছি।··ঈশ্বরে নির্ভরশীল কর্মদক্ষ সুরেশবাবু ঈশ্বরারাধনায় কিছুকাল কাটাইবার জন্য অনেকবার স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন; পরে ঐ কালের অবসানে পরিবার-বর্গের অভাব দেখিয়া পুনরায় স্বল্পদিনেই অন্য চাকুরী জুটাইয়া লইয়াছেন। ঐরূপে মোটা ভাত-কাপড়মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কাম-কাঞ্চনময় সংসারের সাদরাহ্বান সবদা উপেক্ষা করিয়া এই গৃহী-উদাসীন নিজ জীবনের গতি সর্বদা ঈশ্বরাভিমুখে রাখিয়াছিলেন। লোকনয়নের অন্তরালে অনুষ্ঠিত তাঁহার এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন সাধনানুরাগ আজ সফলীকৃত হইয়া তাঁহাকে দিব্যধামে পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং নির্ভরশীল ভক্তি-বিশ্বাস-সমন্বিত নিষ্কাম কর্মজীবনের একটি জ্বলন্ত ছবি আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের জন্য ইহলোকে রাখিয়া দিয়া আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছে।"

# অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হলধর সেন এবং মাতার নাম বিধুমুখী। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় ইন্দাসের নিকটবর্তী রোলগোপালনগরে। এই পত্নী পনর বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুধীষ্ঠা গ্রামে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পক্ষে তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। 'পুঁথি'-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনকে শ্যামপুকুরে 'শাঁকচুন্নী মাস্টার' আখ্যা দেন—

"জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্যবিদিত হৈনু শাঁকচুন্নী নামে॥"

তাঁহার বর্ণ ছিল ঘনকৃষ্ণ এবং শরীর রুগ্ন ও মধ্যমাকৃতি—সমস্ত মিলিয়া প্রায় কদাকার বলিলেই হয়। স্বামীজী সম্ভবতঃ এইজন্যই রহস্যপূর্বক তাঁহাকে এই নাম দিয়াছিলেন। কলিকাতায় ঠাকুরদের বাড়িতে বালকদিগকে পড়াইতেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম ছিল 'অক্ষয় মাস্টার'। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' রচনা করিয়া ইনি অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়াছেন। এই 'পুঁথি'র প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ ছিলেন—"তাঁর কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শাঁকচুন্নী! ···আমি তাঁর পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলব! ···আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোরে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি, ভাই! ···শাঁকচুন্নী বাঙ্গলার জনসাধারণের ভাবী বার্তাবহ।"

অক্ষয়কুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু অপরের অনুগ্রহ ব্যতীত সহসা তাঁহার সন্নিধানে যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না।

অক্ষয়কুমার সেন

কালীপদ ঘোষ
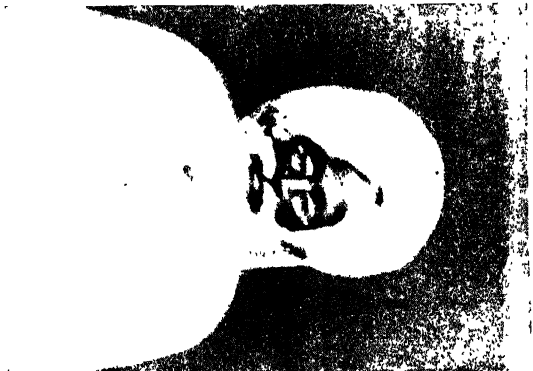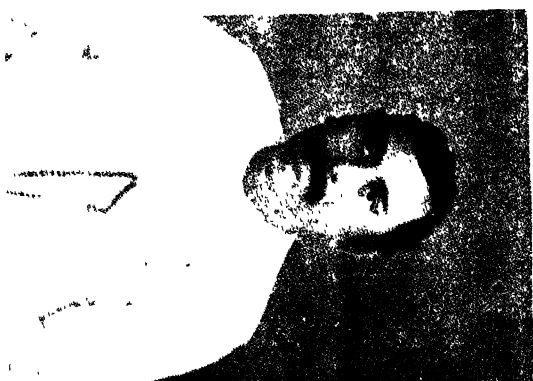
তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের বাটীতে তিনি কার্যোপলক্ষ্যে বাস করিতেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও তথায় নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবু স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে মধ্যস্থ ধরিয়া তিনি শ্রীপ্রভুর দর্শন পাইবেন; তাই তিনি মজুমদার মহাশয়ের অনুগ্রহলাভের জন্য তামাক সাজিয়া ও অন্যভাবে তাঁহার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে থাকিলেন। অবশেষে মহিম চক্রবর্তী মহাশয় একদিন কাশীপুরে স্বগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ উপলক্ষ্যে 'ঘটা ছটা' সহকারে মহোৎসবের আয়োজন করিলেন এবং ভক্তদিগকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদনুসারে শ্রীযুত দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ গাড়িতে চড়িয়া তথায় যাইতে উদ্যত হইলে অক্ষয়বাবুও সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন। পরে যথাস্থানে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দেবেন্দ্রাদির সহিত তাহার শ্রীপদপ্রান্তে প্রণতি জানাইয়া তিনি আসনগ্রহণ করিলে শ্রীপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। সেই—

"করুণ কটাক্ষপাতে জানি না কি আছে তাতে
বর্ণনায় নহে বর্ণিবার।
শ্রীমূর্তি নয়নদ্বারে প্রবেশি হৃদয়পুরে,
হৃদয় করিল অধিকার॥···
আপনে আপন-হারা বহিল নূতন-ধারা
সেই দেহে হইনু নূতন।··
কিছুই না পাই খুঁজে যেন কোন নবরাজ্যে
স্বপনে হয়েছি আগুয়ান॥"

—'পুঁথি', ৩৯৭ পৃঃ

শ্রীপ্রভুর লীলাসন্দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া অক্ষয়কুমার সেদিন গৃহে ফিরিলেন এবং অতঃপর পুনঃপুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে যাইতে লাগিলেন। মজুমদার মহাশয়ের কৃপায় এই দর্শনলাভ হইল বলিয়া এখন হইতে অক্ষয়বাবু

তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারই পরামর্শে তিনি 'পুঁথি'-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ কার্যে তাঁহার সাহায্যও পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বোক্তিতে আছে—

"প্রথমতঃ গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হৈল প্রভুদরশন॥
লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মেব মত বিকি তাঁর পায়॥"

—'পুঁথি', ৬২৬

কাশীপুরে 'কল্পতরু'-দিবসে সৌভাগ্যক্রমে অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কয়েকজন তখন গাছের ডালে বানর-বানর খেলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দিকে আসিলে ঝটিতি বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অক্ষয়কুমার দুইটি চম্পক পুষ্প হস্তে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর যেমন পথের উপর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন,

"পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে॥"

তারপর সাধারণ ভূমিতে নামিয়া ঠাকুর দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্বক "তোমাদের চৈতন্য হোক" বলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। 'কথামৃত'-পাঠে (৩।১৩।৪) যদিও জানা যায় যে, দেবেন্দ্রের গৃহে অক্ষয়বাবু শ্রীপ্রভুর পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তগোষ্ঠীতে ইহা বিদিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহাকে ঐ ভাবে শ্রীঅঙ্গস্পর্শের অধিকার সাধারণতঃ দিতেন না; বলিতেন, "মনের ময়লা কাটুক, তারপর হবে।" আলোচ্য দিবসে কল্পতরু-লীলাবসানে ঠাকুর যখন ঘরে ফিরিতেছিলেন, তখন অক্ষয়বাবুকে দূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া

"দূর থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিলা বক্ষের উপরে॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে॥"

—'পুঁথি', ৬০৭

সে অপ্রত্যাশিত, সুদুর্লভ ও সপ্রেম স্পর্শের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অক্ষয় মাস্টার মহাশয়ের দেহ বাঁকিয়া-চুরিয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যে-রাত্রে ঠাকুরের মহাসমাধি হয়, সে-রাত্রে অক্ষয়কুমার নরেন্দ্রনাথের আজ্ঞামত প্রভুর সেবার জন্য কাশীপুরে ছিলেন। অধিক রাত্রে ঠাকুর লীলাসংবরণে উদ্যত হওয়ায় তিনি কলিকাতায় গমনপূর্বক গিরিশচন্দ্র ও রামবাবুকে ডাকিয়া আনেন। এইরূপে শেষ দিনেও শ্রীপ্রভুর সেবার কিঞ্চিৎ অধিকার পাইয়া অক্ষয় মাস্টার মহাশয় চিরকৃতার্থ হইলেন।

'পুঁথি'-রচনাসম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন ( ৬২৫-৬ পৃঃ ) যে, গ্রন্থারম্ভ হইলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বরাহনগর মঠে আহ্বানপূর্বক বাল্যলীলা শ্রবণানন্তর সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিলেন, গ্রন্থ বৃহৎকলেবর হইবে। অধিকন্তু এই শুভকার্যে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভাশীর্বাদ আবশ্যক বোধ করিয়া তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা ও কবির সহিত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন। মা তখন বেলুড়ে ছিলেন; তিনি আশীর্বাদ করিলেন, 'পুঁথি' নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে। স্বামীজীর কৃপায় মায়ের শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার সহিত ঠাকুরের লীলালোচনা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ একবার কামারপুকুরে অবস্থানের সুযোগে শ্রীমা ঠাকুরের সময়কার সমস্ত গ্রামবাসীকে আহ্বানপূর্বক অক্ষয়ের দ্বারা 'পুঁথি' পড়াইয়া শুনাইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া সাফল্যকামনা

করিলেন। এতদ্ব্যতীত পুস্তক-রচনায় দেবেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, যোগানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী ও রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট উপাদানাদি পাইয়াছেন বলিয়া কবি স্বীয় গ্রন্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

পরিণত বয়সে তিনি 'বসুমতী' আফিসে কাজ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় ঐ কাজ ছাড়িয়া স্বগ্রামে চলিয়া যান এবং অবশিষ্ট জীবন প্রায় সেখানেই অতিবাহিত করেন। কেবল একবার ডাক্তার উমেশবাবু এবং আরও দুই-তিনজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহ লইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে ভক্তদের বাড়িতে সাত-আটমাস কাটাইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের এই সকল ভক্ত ছাড়া মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, দ্বারভাঙ্গা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মাঝে মাঝে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন।

দেশের বাড়িতে থাকাকালে তিনি সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে মন না দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ-মননেই দিন কাটাইতেন। প্রাতে উঠিয়া নিজহাতে ঠাকুরের বাসন মাজিতেন ও ফুল তুলিতেন। তারপর একতারা বাজাইয়া নামগান করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার স্বর বেশ মিষ্ট ছিল। ইহার পরে তিনি স্নান করিয়া ঠাকুরের পূজা করিতেন এবং পূজা হইয়া গেলে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করিতেন অথবা কিছু লিখিতেন। তখনও তাঁহার চক্ষের জ্যোতি অব্যাহত ছিল—চশমার প্রয়োজন হইত না। গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা ঠাকুরঘরে বসিয়া তিনি ঠাকুর ও মাকে বাতাস করিতেন। শেষ বয়সে তিনি হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন; তাই দুর্বল শরীরে এত কাজ করা সম্ভব হইত না বলিয়া পূজার পূর্বে চা পান করিতেন। দেহত্যাগের তিন-চারি বৎসর পূর্ব হইতে তাঁহাকে পূজার কাজে বিদায় লইতে হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অক্ষয়কুমারের অগাধ ভক্তি ছিল। 'পুঁথি'তে তিনি তাঁহাকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন—

"জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥"

শ্রীশ্রীমা দেশে থাকিলে অক্ষয়কুমার ছোট একখানি কাপড় পরিয়া, দীর্ঘ যষ্টি হস্তে লইয়া, নানাবিধ দ্রব্য স্বমস্তকে বহন করিয়া, খালি পায়ে হাঁটিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে পড়িয়া বৃদ্ধ বয়সের রোগ ও পারিবারিক অশান্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্য আকুল প্রার্থনা করিতেন। শ্রীশ্রীমাও তখন তাঁহাকে সময়োচিত সান্ত্বনা দিতেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি হাঁপানিতে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন; সঙ্গে পারিবারিক অশান্তিও ছিল। ঐ সময়ে একজন যুবক তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, "শ্রীমা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার শেষ বয়সে একটু ভোগ আছে।' সেই একটুতেই যা যন্ত্রণা! তিনি যদি আঙ্গুলটা আর একটু লম্বা করে দেখাতেন, তবে এ শরীরে আর সহ্য হত না।" দেহত্যাগের চারি দিন পূর্বে তাঁহার সামান্য জ্বর ও রক্ত-আমাশয় হইয়াছিল। চতুর্থ দিন (১৩৩০ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ শুক্রবার) প্রাতে বেলা নয়টার সময় তিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি বাঞ্ছিত লোকে চলিয়া যান। ঐ সময়ে তাঁহার ছোট ভাই তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণনাম শুনাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা চুপ কর, আমি ঠাকুর ও মাকে দেখতে পাচ্ছি।" চরম মুহূর্তে দেখা গেল, তাঁহার চক্ষু অর্ধনিমীলিত, আর আনন্দে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। এই বিমল আনন্দের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

# নবগোপাল ঘোষ

শ্রীযুত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার বেগমপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তিনি কলিকাতায় বাদুড়বাগানে বাস করিতেন এবং হেণ্ডারসন্ কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক তিন শতাধিক টাকা পাইতেন। তিনি বড়ই ভক্তিমান, উদার ও সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ভজন-কীর্তনাদিতে তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহার বর্ণ শ্যাম এবং চেহারা দোহারা, মুখ সদা হাস্যময় এবং স্বাস্থ্য উত্তম ছিল। দুইবার বিপত্নীক হইবার পর তিনি তৃতীয়বার যে ভাগ্যবতীকে গৃহের লক্ষ্মীরূপে পাইলেন, তিনি নিজে যেমন ভক্তিমতী, পরিবারের সকলের মধ্যেও তেমনি অচলা ভক্তির সঞ্চারপূর্বক উহাকে একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। কুলীন কায়স্থ নবগোপালবাবু পদমর্যাদা ও সদাশয়তার জন্য পল্লীবাসীর নিকট বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

নবগোপালবাবু প্রথম যেদিন সন্তানবৃন্দ ও পত্নীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-পদতলে উপস্থিত হন, সেদিন নাম ধাম ও কুশলপ্রশ্নাদি ব্যতীত বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই। তবে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, তিনি যেন নিত্য কীর্তন করেন। তদনুসারে তিনি প্রত্যহ পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে লইয়া খোল-করতালসহ কীর্তন করিতেন। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইলেও নবগোপালের আর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয় নাই। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাই একদিন ভক্ত কিশোরীকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ হে, তোমার সঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে যে একজন এসেছিল—বাদুড়বাগানে বাড়ি, আফিসে বড়

কাজ করে, আর গরীবদের বিনামূল্যে ঔষধ দেয়—সে কোথায়? তার সঙ্গে দেখা হলে অন্ততঃ একবার আসতে বলো তো।" কিশোরীর মুখে সে-সংবাদ পাইয়া নবগোপালের আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি ভাবিলেন, "ইনি সর্বজনসম্মানিত অবতাররূপে পূজিত হইয়াও আমার ন্যায় দীন ব্যক্তিকে এই দীর্ঘকাল স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।" সে অহেতুক দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইল। পরের রবিবারে সন্তানবৃন্দসহ সপত্নীক নবগোপাল প্রভুদর্শনে চলিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে পাইয়া এতদিন না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নবগোপাল জানাইলেন যে, তাঁহার উপদেশানুযায়ী এই তিন বৎসর নামকীর্তনে কাটিয়াছে। ঠাকুর সব শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে আর বৈধী সাধনামাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না। বার তিনেক শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে গমনাগমন করিলেই তিনি ভক্তির উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবেন।

এই মিলনের প্রভাব নবগোপালবাবুর জীবনে এমন এক আমূল আলোড়ন আনিয়া দিল, যাহার ফলে ইহার পরে তিনি সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং সুযোগ পাইলেই স্ত্রীপুত্রাদিসহ পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সকলের হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। রত্নগর্ভা নবগোপালপত্নীর প্রথম পুত্র সুরেশের বয়স তখন পাঁচ-ছয় বৎসর মাত্র। জন্মাবধি তাহার এমনই তালবোধ ছিল যে, অল্পবয়সেই কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজাইতে পারিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিশুটিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।[১]

তখন প্রায় প্রতি রবিবারে কোন-না-কোন ভক্তের বাড়িতে

---

১ নবগোপালবাবুর অন্যতম পুত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসব হইত। নবগোপালবাবুর মনেও একদিন মহোৎসব করিবার বাসনা জাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতিলাভান্তে যথাবিধি আয়োজন হইল এবং ভক্তবর্গ নবগোপালবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে আগমনপূর্বক ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ হইলে পাঠ বন্ধ হইল। পরে বনোয়ারী নামক একজন বৈষ্ণব আপনার দল লইয়া প্রাঙ্গণে পদাবলীকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিলেন; কীর্তনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সিংহবিক্রমে কীর্তনমধ্যে আসিয়া ত্রিভঙ্গমুরলীধারী হইয়া মহাভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নবগোপালবাবু পূর্ব হইতেই সুগন্ধি ফুলের বড় গড়ে মালা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন উহা ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন—মালা লম্বিত হইয়া চরণস্পর্শ করিল। ভক্তেরা যে যেখানে ছিলেন ক্রমে সেখানে সমবেত হইয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের কাহারও কাহারও ভাব হইল। ঠাকুরের দেহেও তখন ভাব, মহাভাবের উদ্দাম লীলা চলিতেছে। সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি আসনগ্রহণ করিলেন এবং নবগোপাল সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার ভুবনমোহন রূপসুধা পান করিতে থাকিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, ঠাকুরের লীলাদেহে যেন চাঁদের কিরণ খেলিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ভাবিলেন, ইহা হয়তো দৃষ্টির বিভ্রম; তাই অপর সকলের প্রতি নয়নপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদেরও বদন তুল্যরূপ সমুজ্জ্বল কিনা। কিন্তু সেরূপ জ্যোতি কোথাও ছিল না। তিনি মধ্যম ভ্রাতা জয়গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ প্রভুর চেহারায় বিশেষ কিছু দেখছ কি?" ভ্রাতা উত্তর দিলেন, "না। অন্য দিনের মতো সাফই দেখছি।" নবগোপাল তখনও জ্যোতি দেখিতেছেন; অথচ সন্দেহ দূর হইতেছে না। তাই তিনি শীতল জলে নয়নদ্বয় ধৌত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তখনও দেখেন, প্রভুর মুখমণ্ডলে পূর্বেরই মতো দীপ্তি রহিয়াছে।

অবশেষে তাঁহার সংশয় বিনষ্ট হইল এবং তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কেবল তাঁহারই প্রতি শ্রীপ্রভুর বিশেষ কৃপা।

এদিকে ভক্তিমতী ঘোষগৃহিণী দ্বিতলে ভোজনের সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রতিবেশিনীদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাই ঠাকুর আমন্ত্রিত হইয়া উপরে চলিলেন। তথায় মহিলাগণ প্রণাম করিতে থাকিলে ঠাকুর পদযুগল সঙ্কুচিত করিলেন এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। গৃহিণীর কিন্তু প্রাণের ইচ্ছা যে, তিনি চরণধূলি গ্রহণ করেন। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুমতি দিলেন। নবগোপাল-পত্নী মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন যে, তিনি নিজহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়াইবেন। ঠাকুর অমনি প্রশ্ন করিলেন, "কি, তুই আমাকে হাতে করে খাওয়াবি ?"—এই বলিয়া একটু স্থির হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, দে।" ঘোষজায়া ঠাকুরের মুখকমলে মিষ্টান্ন দিতে যাইয়া দেখেন, যেন তাঁহার ভিতর হইতে কি একটা বস্তু 'আঁক' করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া উহা গ্রহণ করিতেছে। দর্শনমাত্র মিষ্টান্ন শ্রীমুখে প্রদান করিয়া তিনি কম্পিত-কলেবরে নিরস্ত হইলেন। অতঃপর ঠাকুব স্বাভাবিকভাবে কিঞ্চিৎভক্ষণান্তে তাঁহাকে প্রসাদ লইতে বলিলেন। অপর সকলের পূর্বে তাঁহার উহা গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও ঠাকুরের আদেশে তিনি কিঞ্চিৎ স্বীকারপূর্বক সমস্ত প্রসাদ নীচে পাঠাইয়া দিলেন। প্রসাদ ও তৎসহ উপরের লীলার সংবাদ নীচে পৌঁছিবামাত্র সেখানে মহা রোল উঠিল—সকলে সাগ্রহে প্রসাদ লুটিয়া লইতে লাগিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া ঠাকুর ঘোষগৃহিণীকে বলিলেন, এই জন্যেই তিনি তাঁহাকে তখনই লইতে বলিয়াছিলেন। অবশেষে ঠাকুর নিম্নে অবতরণ করিলে আরও কীর্তন হইল। তাহার পর ভোজনান্তে সেদিনের মহোৎসব সমাপ্ত হইল।

একবার নবগোপালবাবু ৺গঙ্গাপূজার দিনে পান্‌সি ভাড়া করিয়া গিরিশবাবু প্রভৃতির সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। পথে, গঙ্গাস্নান করিবেন

কিনা, এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিচার উঠিল। গঙ্গার ঘাটে তখন খুব ভিড় এবং বৃষ্টিও হইতেছে, অতএব স্নানে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইল না। অধিকন্তু তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, ঠাকুরকে দর্শন করিলেই গঙ্গাস্নানের পুণ্য হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "সে কি গো—তোমরা নাইবে না? আজ দশহরা—আজকে গঙ্গাস্নান করতে হয়।" অগত্যা সকলেই গঙ্গাস্নান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে বিরাজ করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ ঐ কালে একটি বিড়াল শাবকসহ তাঁহার নিকট আশ্রয় লইলে তিনি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়েন। এমন সময় একদিন ঘোষপত্নী তথায় আসিলে ঠাকুর সঙ্কোচপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমায় একটা কথা বলব? দেখ, আমার এখানে একটা বেড়াল আছে; তার আবার কতকগুলি বাচ্চা হয়েছে। এখানে মাছ নেই, দুধ নেই; তাহাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তা বাপু, তোমায় যদি দিই, তুমি নিয়ে যাবে কি? তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?" ঘোষজায়া বলিলেন, "এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! আমি সাধারণতঃ বেড়াল ভালবাসি। আর আপনি দিচ্ছেন—এ আমার প্রতি আপনার কত অনুগ্রহ!" ঠাকুর আরও জানিয়া লইলেন যে, ইহাতে বাড়ির কর্তাদের অমত হইবে কিনা। সব জানিয়া যখন নিশ্চিন্ত হইলেন তখন ঘোষগৃহিণীকে উহাদিগকে লইয়া যাইতে বলিলেন এবং তিনিও সানন্দে তাহাই করিলেন। ঠাকুরের দান জানিয়া তিনি ইহাদিগকে সযত্নে পালন করিতেন এবং কাহাকেও প্রহারাদি করিতে দিতেন না।

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬), সেদিন অপর অনেকের[২] সহিত নবগোপালবাবুও উপস্থিত ছিলেন

২ শ্রীমৎ 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার এই কয়েকটি নাম স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলেন—গিরিশ,

এবং ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। ঐদিন কৃপামুগ্ধ রামবাবু নবগোপালবাবুকে সাগ্রহে বলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি কি করছেন—ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।" শুনিয়া নবগোপাল দ্রুতবেগে যথাস্থানে গমনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "প্রভু, আমার কি হবে?" ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "একটু ধ্যান-জপ করতে পারবে?" নবগোপাল উত্তর দিলেন, "আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক ; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?" ইহাতে ঠাকুর পুনর্বার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তা একটু-একটু জপ করতে পারবে না?" উত্তর—"তারই বা অবসর কোথায়?" "আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" উত্তর—"তা খুব পারব।" ঠাকুর তখন কহিলেন, "তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

নবগোপালের বয়স তখন পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পর তিনি যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণনামে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার আফিস হইতে ফিরিবার সময় একজন ভৃত্য বাতাসা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত এবং তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত বালক-বালিকারা উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে থাকিলে তাহাদিগকে বাতাসা দেওয়া হইত। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রত্যহ এইরূপ করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহার নাম দিয়াছিল 'জয় রামকৃষ্ণ'। ঐ নামে

---

অতুল, রাম, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী ( রায় ), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, মাষ্টার (?) ( দিব্যভাব, ৩৩৮ )। শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তে' (১৪৬ পৃঃ) অক্ষয়, নবগোপাল, উপেন্দ্র মজুমদার, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, গাঙ্গুলি ইত্যাদি এবং হরমোহন মিত্রের উল্লেখ আছে। 'তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'তোমার আজ থাক।"

তিনি পল্লীতে সুপরিচিত ছিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই ছেলেমেয়েরা বলিয়া উঠিত 'জয় রামকৃষ্ণ আসছে রে', আর বাতাসাদির জন্য রাস্তায় নামিয়া পড়িত।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন নবগোপালবাবু তাঁহার পুত্র নীরদের সহিত বৃন্দাবনে যান। ইঁহারা কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিতেন এবং অন্য কুঞ্জে প্রসাদ পাইতেন। ইঁহারা ফিরিবার সময় ব্রহ্মানন্দজীর সহিত প্রয়াগ ও বিন্ধ্যাচল হইয়া আসেন। বিন্ধ্যাচলে তাঁহারা যে বাটীতে উঠিলেন, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ের ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বাস করিতেন। ইঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, মাত্র তিন রাত্রি তথায় থাকেন; কিন্তু সেন মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাদিগকে পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন থাকিতে হইয়াছিল।

নবগোপালবাবু জীবনসন্ধ্যায় বাদুড়বাগানের বাটী ত্যাগ করিয়া হাওড়ার অন্তঃপাতী রামকৃষ্ণপুরে একটি বাড়িতে চলিয়া আসেন। ঠাকুরের নামের সহিত সাদৃশ্যবশতঃ নবগোপালবাবুর নিকট রামকৃষ্ণপুর নামের একটা আকর্ষণ ছিল। ঐ আকর্ষণের ফলেই তিনি ঐ বাড়ি কিনিলেন এবং উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি বসাইবার জন্য একটা নূতন অংশ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পরে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার আমন্ত্রণে ১৩০৪ সালের মাঘী পূর্ণিমায় (২৫শে মাঘ) নৌকাযোগে বেলুড় হইতে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে "দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরঘরে"—এই গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে কীর্তনসহ অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমে ৮১নং রামকৃষ্ণপুর লেনের নূতন কক্ষে পদার্পণ করিলেন। সেখানে স্বহস্তে ঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বহস্তে পূজা করিলেন। পরে নিরাজনান্তে পূজাগৃহে বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র রচনা করিয়া দিলেন—

"ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥"

ঐ দিনের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। গৃহিণী ঠাকুরানী যখন স্বামীজীর নিকট নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিলেন, তখন স্বামীজী রহস্যসহকারে বলিলেন, "তোমাদের ঠাকুর তো এমন মার্বেল-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেননি।··· এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি না থাকেন তো আর কোথায় থাকবেন!" যাহা হউক ঐ বাড়িতে আজও ঠাকুরের নিয়মিত পূজা হইয়া থাকে। ঐ দিনের স্মরণে বহুকাল যাবৎ ঘোষভবনে প্রতি বৎসর উৎসব ও সাধুভক্তের সমাগম হইত।

নবগোপালবাবু যেমন অতি ভক্তিমান ছিলেন, তাঁহার সহধর্মিণীও তেমনি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্না ছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বৃন্দাবনে ৺রাধারমণ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন—যেন নবগোপাল-বাবুর স্ত্রী ৺রাধারমণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছেন। ফিরিয়া তিনি যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, "যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এই রকম দেখলুম।"

অসুখের সময় অনেক সাধুই ঘোষ-জায়ার মাতৃহৃদয়ের স্নেহস্পর্শে মুগ্ধ হইতেন। অসুস্থ সাধুকে তিনি স্বগৃহে রাখিয়া ঔষধ, পথ্য ও সেবাদির দ্বারা অচিরে নিরাময় করিতেন।[৩]

রামকৃষ্ণপুরে আসা অবধি নবগোপালবাবু প্রত্যহ গঙ্গাস্নানান্তে কীর্তন করিয়া বাড়ি ফিরিতেন এবং যাহাকে পাইতেন বলিতেন, "বল, জয় রামকৃষ্ণ" এবং নিজেও "জয় রামকৃষ্ণ" উচ্চারণ করিয়া দোকান হইতে সংগৃহীত বাতাসা বিলাইয়া দিতেন। পরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসিয়া

৩ এই-সকল কথা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধা ঘোষজায়ার শেষ অসুখের সময় বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি ছিন্নমস্তার ভাবে ভাবিতা ছিলেন এবং অপবিত্র কাহারও স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না।

রোগীদিগকে ঔষধ দিতেন এবং সামর্থ্যহীনদিগের পথ্যেরও ব্যবস্থা করিতেন। তিনি প্রতিবেশীদের লইয়া নিত্য ভজন করিতেন এবং ঠাকুরের মহিমা, বাণী ও ভাবধারা প্রচার করিয়া সকলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রীতি জাগাইতেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ডাক্তার রামলাল ঘোষ, নগেন্দ্র ঘোষ, হারাণবাবু প্রভৃতি অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ নবগোপালবাবুর মন হইতে জাগতিক আকর্ষণ কতটা দূরীভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার এক বিবাহিতা কন্যার মৃত্যুকালে পাওয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে সকলেই যখন শোকে মুহ্যমান, তখন সদাপ্রসন্ন হাস্যময় নবগোপালবাবু তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "সবই তাঁর ইচ্ছা ; এতে দুঃখ করবার কিছু নেই।"

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে সাতাত্তর বৎসর বয়সে তিনি বাঞ্ছিত ধামে চলিয়া যান। মৃত্যুর কাল তিনি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়া সকলকে নিকটে ডাকিয়া ও আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা দুঃখ ক'রো না। দেহের নাশ আছেই। আমি কর্তা নই, ঠাকুরই কর্তা। আমরা তাঁর সন্তান—তিনি তোমাদের দেখবেন। তোমরা শোক ছেড়ে তাঁর নাম কর।" ইহার পর তিনি ঠাকুরের নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দেখা গেল, তাঁহার মুখ তখন এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—মৃত্যুর কালিমা তাহাতে নাই।

# হরমোহন মিত্র

শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্র মহাশয় পূজ্যপাদ স্বামীজীর সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। 'পুঁথি' হইতে ( ৩৬০ পৃঃ ) জানা যায় যে, তাঁহার চেহারা 'পরম সুন্দর' ছিল। 'কথামৃতে' তাঁহার একাধিকবার উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দকে সাঙ্গোপাঙ্গ ও দর্শক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া হরমোহনকে প্রথম দলে স্থান দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে অতি স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহের পর কতক ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথারই প্রকাশ পায়। একদিন ( ৩রা জুলাই, ১৮৭৪ ) বলরাম-ভবনে বসিয়া তিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "হরমোহন যখন প্রথমে ( দক্ষিণেশ্বরে ) গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল, দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৬।১৮ হবে। প্রায় ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামাদের বাড়িতে ছিল, বেশ ছিল, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা ক'রে পরিবারের রোজ বাজার করে [ সকলের হাস্য ]। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বললাম, 'যা, এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন কচ্ছে'" [ 'কথামৃত,' ৪।১৫।৩ ]।

হরমোহন দরিদ্রের সন্তান, তাই কলিকাতার সিমলা-অঞ্চলে মাতুল শ্রীযুক্ত রামগোপাল বসু মহাশয়ের গৃহে মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্যা হইয়াছিলেন। তিনি অতি ভক্তিমতী ছিলেন এবং পুত্রকে ঠাকুরের নিকট যাইতে উৎসাহ দিতেন। ফলতঃ বিবাহের পরও হরমোহন বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলেন।

কাশীপুরে 'কল্পতরু' দিবসে তিনি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, ঠাকুর সেদিন তাঁহাকে সম্পূর্ণ কৃপা করেন নাই; শুধু বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ থাক" ('পুঁথি', ৬০৭ পৃঃ)।

হরমোহনবাবু উত্তরকালে জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শের ফলে তাঁহার বহু অনুভূতি ও ভ্রূযুগলমধ্যে অনেক দেব-দেবী দর্শন ঘটিয়াছিল। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন-কালের কথা—যখন তিনি ঠাকুরের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তিনি ঈশ্বরানুরাগ, উদারস্বভাব ও মিষ্ট আলাপনের জন্য ভক্তসমাজে সুপরিচিত ছিলেন এবং স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া সময়ের কথা ভুলিয়া যাইতেন। অহর্নিশ শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা, তাঁহার দিব্য লীলার অনুধ্যান ও নামগুণগান করিতে করিতেই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং ঐ ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণপদে বিলীন হন।

স্বামীজী তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। বাল্যবন্ধু হিসাবে ইঁহারা পরস্পরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাব-প্রচারে হরমোহনবাবু বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-সম্বলিত যে পুস্তক মুদ্রিত করেন, তাহার প্রকাশক ছিলেন, হরমোহন বাবু—ইহা আমরা সুরেশ-প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হরমোহনবাবু উহা নিজব্যয়ে পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা ছাড়া উহাতে আলমবাজার মঠের উল্লেখ ছিল এবং উক্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যে গুরুস্তোত্রের আবৃত্তি হইত তাহাও মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে স্বামীজীর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতাও ছাপাইয়াছিলেন। ঐ সকলের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং আলমবাজার মঠের

পরিচয় থাকিত। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেন, উহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে পাদটীকারূপে নিজ মন্তব্য ও সমালোচনা সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন।

হৃদয়ে উৎসাহ থাকিলেও অর্থসামর্থ্যহীন হরমোহনবাবুর পক্ষে স্বামীজীর গ্রন্থ ভাল করিয়া ছাপানো সম্ভব ছিল না। ইহাতে এদেশীয় অনেক ভক্ত বিরক্ত হইতেন; স্বামীজীও ইহা পছন্দ করিতেন না, অথচ বন্ধুপ্রীতিবশতঃ নিজে বারণ করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার 'পত্রাবলী'তে আছে—"হরমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই তাকে আমার বক্তৃতাগুলি ছাপাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম; কারণ সে আমার পুরানো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গরীব;" "ঐ হরমোহনটা একটা মূর্খ; বইছাপানো বিষয়ে সে তোমাদের মান্দ্রাজীদের চেয়েও ঢিলে, আর তার ছাপা একেবারে কদর্য। বইগুলোর এভাবে শ্রাদ্ধ করার মানে কি? দুঃখের বিষয় যে, সে গরীব। আমার টাকা থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাপানো তো লোক-ঠকানো—যা করা উচিত নয়।" মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আদিযুগের কথা—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রচার যথেষ্ট না হওয়ায় অনেকেই ঐ বিষয়ক গ্রন্থ ছাপাইয়া অযথা পয়সা নষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবস্থায় ঐ আশাহীনতার মধ্যেও স্বামীজীর বন্ধুপ্রীতি এবং হরমোহনবাবুর অসীম সাহস নবযুগের বাণীকে এক বিশেষ ক্ষেত্রে জাগ্রত রাখিয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে আমরা হরমোহনবাবুর সাহসের উল্লেখ করিয়াছি। উহার আর একটু বিস্তার প্রয়োজন। তিনি প্রতাপবাবুর পুস্তিকায় সমালোচনাত্মক মন্তব্য যোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহার বিরুদ্ধ মত-খণ্ডনের স্পৃহা অন্যভাবেও প্রকাশ পাইত। আলবার্ট হলে ভগিনী নিবেদিতার ইংরেজীতে 'কালী দি মাদার' (কালী মাতা) শীর্ষক লিখিত

ভাষণের পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ওজস্বিনী ভাষায় প্রতিমাপূজার সমালোচনা করিলে উহার প্রতিবাদকল্পে হরমোহনবাবু সুললিত ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া এমন একটি বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ উহাতে মুগ্ধ হন। স্বামীজীর আমেরিকা হইতে কলিকাতায় পদাপণের পরে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে অক্সফোর্ড মিশন-হলে বক্তৃতায় এবং তাহাদের কাগজ 'এপিফেনি'তে হিন্দুধর্মের সমালোচনা আরম্ভ হয়। ঐরূপ এক বক্তৃতায় উপস্থিত হরমোহনবাবু ইংরেজীতে তেজোদৃপ্ত ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ ভাষার উপর তাঁহার বেশ দখল ছিল, যদিও বক্তা হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই; কারণ তিনি অন্য কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন—বক্তৃতা তিনি এইরূপ বিরল স্থলেই করিতেন।

তাঁহার প্রচারের আর একটি ধারা ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ও তাঁহার সম্বন্ধে পুস্তক বিক্রয় করা। ম্যাক্সমুলার-লিখিত ঠাকুরের জীবনী তিনিই এদেশে প্রচার করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীরা ছবি কিনিতে তাঁহারই নিকট যাইতেন এবং ঐ সূত্রে যুগাবতার ও তাঁহার পার্ষদবর্গের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতেন। অনেক ছাত্র এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় জজ বিহারীলাল সরকার মহাশয় ছাত্রজীবনে এই উপায়েই বেলুড় মঠের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মঠপ্রতিষ্ঠার দিনে বন্ধুবান্ধবসহ তথায় উপস্থিত থাকেন।

বই ও ছবি বিক্রয় করিলেও হরমোহনবাবুর অর্থের প্রতি লোভ ছিল না—তিনি ঐ কার্য ঠাকুরের সেবা হিসাবেই করিতেন। 'শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় লিখিতেছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ দীর্ঘ লিথো ছবি ইনি বিক্রয় করিতেন। স্বামী যোগানন্দের আদেশে কোন কিশোরবয়স্ক বালক হরমোহনবাবুর নিকট উক্ত লিথো ছবি কিনিতে যান। তখন ঠাকুরের ছবি বাজারে পাওয়া যাইত না। হরমোহনবাবু বিডন স্ট্রীটের

সন্নিকটে ৪০নং নয়নচাঁদ দত্তের স্ট্রীটে বাস করিতেন। বালক হরমোহন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে পরমহংসদেবের ছবি পাওয়া যায়? দাম কত?' হরমোহনবাবু বলেন, 'দাম ছয় পয়সা—এখানেই ছবি বিক্রয় হয়।' বালকটি পয়সা দিলে হরমোহনবাবু ছবি আনিয়া দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এখানকার ঠিকানা জানলেন কেমন করে?' বালক বলিল, 'যোগানন্দ স্বামীজী আমাকে এখানকার ঠিকানা দিয়ে ছবি কিনতে বলেছেন।' হরমোহনবাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'ও! তবে আপনি ভক্ত। দাঁড়ান, দাঁড়ান, ঠাকুরের প্রসাদ এনে দি।' ইহা বলিয়া প্রচুর মিষ্ট ও ফল আনিয়া দিলেন। তাহার দাম তখনকার দিনে কমপক্ষে আট আনা আন্দাজ হইবে। ইহা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা।" ইহার পরও হরমোহনবাবু ঐ বালকের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন এবং প্রায়ই তাহার বাড়িতে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনাইতেন।

আমরা অন্য সূত্রে অবগত আছি যে, হরমোহনবাবু এই ছবি- ও বই-বিক্রয় হইতে লব্ধ অনেক টাকা শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রাধুর বিবাহের পূর্বে কয়েকখানি গহনা তিনি ঐ টাকা হইতে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের হস্তে হোগলা-পাকের বালা থাকিত। উহা দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে ঘষিয়া যাওয়ায় হরমোহনবাবু অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া নূতন বালা গড়াইয়া দেন এবং মাস খানেকের মধ্যেই ঋণশোধ করেন।

# মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন, কৃষ্ণা একাদশী তিথি, বুধবার, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা গোঁসাইদাস গুপ্ত মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র গুপ্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন।

মণীন্দ্রকৃষ্ণের বাল্যকাল কলিকাতার বাহিরে ব্যয়িত হওয়ায় তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। অধিকন্তু স্বভাবতই তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন। এই ভাবুকতার ফলে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও বিদ্যালয়ের পাঠ অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

কৈশোরে এগার-বার বৎসর বয়সে তিনি যখন একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া ইয়ংমেন্স্ নেস্ট্ ( যুবকদের নীড় ) নাম দিয়া এক ধর্ম ও সদালোচনার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রকৃষ্ণও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা বিদ্যালয়ের ছুটিতে মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণও এই সূত্রে বজরা বা গাড়িতে কয়েকবার সেখানে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। অপক্কবুদ্ধি বালক তখন ঠাকুরের মহিমা বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং সে সাক্ষাৎকার পরিচয়ে পরিণত হয় নাই। তবে ঐ সময়েও তিনি ঠাকুরের সস্নেহ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব সদলবলে সাঁতার কাটিয়া ও অন্যভাবে আমোদপ্রমোদ করিয়া ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেই দেখিতেন, ঠাকুর তাঁহাদের জন্য প্রসাদী ফলমূল, মিষ্টান্ন, লেবুর রস ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। একদিনের

মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কথা মণীন্দ্রকৃষ্ণের মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। সেদিন অন্যান্য বারের মতো বাহিরে কপাটি খেলিয়া ও পরে গঙ্গাস্নান করিয়া অপর যুবক ও বালকগণ যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার কথামৃতপানে নিরত আছেন, তখন মণীন্দ্র কিশোরসুলভ অনুসন্ধিৎসাবশতঃ বাহির হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন ভিতরে কি হইতেছে। ঠাকুর তখন ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন এবং সম্মুখস্থ সকলকে হাত দিয়া দেখাইয়া স্নেহভরে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কেমন সব চাঁদের হাট বসেছে দেখ!" মণীন্দ্র ঠাকুরের সে প্রেমময় মূর্তি-দর্শনে আর কোন দিকে চোখ ফিরাইতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ যে তিনি ঐ ভাবে ছিলেন, তাঁহার স্মরণ নাই। পরে যখন বিদায়ের সাড়া পড়িল, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

ইহার পরে তিনি ভাগলপুরে পিতার কর্মস্থলে চলিয়া যান—বৎসর তিনেক আর ঠাকুরের দর্শন পান নাই। এই সময়ের পরে তিনি যখন আবার কলিকাতায় আসিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে আছেন। একদিন মণীন্দ্রকৃষ্ণের পূর্বপরিচিত সারদাবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে, এক জায়গায় যাবে?" দুই জনে ঐ ভাবে প্রায়ই বেড়াতে যান; সুতরাং মণীন্দ্র না ভাবিয়াই বলিলেন, "বেশ তো।" পরে সারদাবাবু জানাইলেন যে, তাঁহারা পরমহংসদেবের নিকট যাইতেছেন। উহা সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের শেষের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্যামপুকুরে আসিলেও শ্রীমা আসেন নাই এবং সেবাদির সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। মণীন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো রাজী হইলেন।

ইঁহারা উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইলে তিনি হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মণীন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া ও তাঁহার লক্ষণাদি দেখিয়া কানে কানে বলিলেন, "কাল একলা এসো, ওর সঙ্গে এসোনি।"

সেই একটু স্নেহস্পর্শেই মণীন্দ্রের মনে যেন কেমন একটা আলোড়ন আরম্ভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় ও তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বিনিদ্র রজনী কোন প্রকারে কাটাইয়া এবং পরদিনের কাজগুলি তাড়াতাড়ি সারিয়া দিবাশেষে তিনি আবার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে বসিবামাত্র ঠাকুর চিরপরিচিতের মতো তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলি ?" অতঃপর সাদরে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সমাধিস্থ হইলেন। মণীন্দ্র তখন পনর বৎসরের বালক। সমাধিভঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস ?" ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্যোপাসক মণীন্দ্র কিছুই না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এই জগতের সৌন্দর্য ও লোকের নানা ভাবের বিচিত্র চরিত্র দেখে নিজের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাই প্রকাশ করবার আমার বড় ইচ্ছা ও এইটেই আমার কামনা।" কথা শুনিয়া ঠাকুব একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে তো ভালই ! কিন্তু তাঁকে পেলেই তো সব হয় !" ইত্যবসরে মণীন্দ্রকৃষ্ণের দেহমন জুড়িয়া কি যেন এক ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। তিনি বোধ করিলেন, কি এক শক্তি অধোভাগ হইতে ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতেছে, যেন সমস্ত জগৎ কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে, আর সেই মহাশূন্যমধ্যে তাঁহার প্রাণ যেন কিসের সন্ধানে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। মণীন্দ্রের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে কান্না আর থামে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে তাঁহাকে অন্য কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও সেই ক্রন্দন থামিতে প্রায় আধঘণ্টা লাগিয়াছিল।

এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর মণীন্দ্রকৃষ্ণ ঘন ঘন শ্যামপুকুরে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ঠাকুরের সেবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া সেখানেই থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্যামপুকুরে স্থানাভাব ; বিশেষতঃ বালকের পক্ষে রাত্রি জাগরণ অনুচিত ভাবিয়া বয়স্কগণ তাঁহাকে শুধু দিবাভাগেই

সেবার সুযোগ দিতেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সেবার সুযোগে তিনি ঠাকুরকে আরও নিকটে পাইলেন্ এবং ভক্তদের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিল। এই পরিচয়-সূত্রগুলি তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তমণ্ডলীতে ইনি অল্প বয়সের জন্য 'খোকা' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মণীন্দ্রের এই সেবাব্রত কাশীপুরেও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিনের কথা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের পীড়ার সময় খোকা (মণীন্দ্র) ও পতু তাঁকে হাওয়া করছিল। সেদিন দোলে সবাই আবির নিয়ে খেলা করছে। ঠাকুর তাদের বারংবার যেতে বলছেন; কিন্তু ঠাকুরের সেবা ফেলে তারা গেল না। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আরে, এরাই আমার রামলালা!' "

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) খোকাকে খুব ভালবাসিতেন; মণীন্দ্রও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। নরেন্দ্র ও অপর ভক্তদের মুখে ভজনগান শুনিলেই মণীন্দ্র ভাবে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেন। ঠাকুর ভক্তদিগকে বলিতেন যে, মণীন্দ্রের প্রকৃতিভাব—সখীভাব। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি গুরু ও ইষ্টরূপেই জানিতেন। তবে তাঁহার দীক্ষার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিতেছেন—"আমি তাঁহাকে দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'একদিন ঠাকুরের কাছে বসে আছি, এমন সময়ে মহিম চক্রবর্তী এসে তাঁকে বললেন, গতকাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন একে (মণীকে) মন্ত্র দিচ্ছি আপনার আদেশে। ঠাকুর বললেন, কি মন্ত্র পেয়েছ আমায় শোনাও। মহিম চক্রবর্তী উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করামাত্রই ঠাকুর একেবারে সমাধিতে মগ্ন হলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ঐ মন্ত্র দিতে বললেন।' " শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর মণীন্দ্রবাবু মহিম চক্রবর্তীর আদেশে গেরুয়া পরিতেন

এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গেই থাকিতেন। তবে বরাহনগর মঠেও তাঁহার খুব যাতায়াত ছিল। পরে গৃহে ফিরিয়া তিনি বিবাহ করেন।

ভাগলপুরে অবস্থানকালে তিনি বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে লেখাপড়ায় আগ্রহ কমিতে থাকে। বিশেষতঃ কলিকাতায় আসিবার পর এই অবহেলা ও বিতৃষ্ণা অভিভাবকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ধীরে ধীরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মণীন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্নেহপাত্র ছিলেন। তিনি গৃহশিক্ষক রাখিয়া মণীন্দ্রকে পড়াইতে লাগিলেন। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই অধ্যয়ন চলিতে থাকে—মধ্যে কেবল বৎসর দেড়েক শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও মহিম চক্রবর্তীর সহিত অবস্থানকালে পাঠাভ্যাস বন্ধ ছিল। এই গৃহশিক্ষক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং ইঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনিচ্ছুক মণীন্দ্রও অনেক বিষয় শিখিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকাশিত ‘সংবাদপ্রভাকর’ দৈনিক কাগজখানি উত্তরাধিকারসূত্রে মণীন্দ্রের পিতার হস্তে আসে। মণীন্দ্রবাবু কোন চাকরি লইয়া জীবিকার্জন করিতে চাহেন না বলিয়া এই পত্রের সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইল। এই সুযোগে তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি অনেকেরই সহিত সুপরিচিত হইলেন। কিন্তু ‘সংবাদপ্রভাকরে’র উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতিই ঘটিতে থাকিল। মণীন্দ্রবাবু তখন অভিনয় করা ও নাটকরচনার দিকে খুবই ঝুঁকিয়াছেন এবং মনোমোহন পাঁড়ে, অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। এই-সব হুজুগে ‘সংবাদপ্রভাকর’ দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া গেল। এদিকে মণীন্দ্রের নাট্যপ্রতিভারও তেমন বিকাশ হইল না। তিনি নানা কারণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন

না, রচনাশক্তিরও উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি দেখা গেল না। কাজেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজী প্রথমবারে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে মণীন্দ্রবাবু যখন আলমবাজার মঠে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন স্বামীজী তাঁহার দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলেন। পরে স্বামী যোগানন্দজীর দ্বারা তাঁহাকে বলরাম-মন্দিরে ডাকাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর হাত দিয়া ১২০০৲ টাকা দেওয়াইলেন। ব্রহ্মানন্দজী একখানি খামে পুরিয়া ঐ টাকা তাঁহাকে দিলেন এবং ভিতরে কত আছে না জানাইয়া শুধু বলিলেন, "খোকা, তুই কষ্ট পাচ্ছিস জেনে স্বামীজী এই টাকা দিলেন।" এই সহৃদয়তায় তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না—কারণ তখন তাঁহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন পর্যন্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদিগের সহিত মণীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধ সর্বাবস্থায় সারাজীবন রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রথমাবস্থায় স্বামী যোগানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি অনেকে প্রায়ই তাঁহার গৃহে যাইতেন। তিনিও সুবিধা পাইলেই সাধ্যানুসারে ফলমিষ্ট ইত্যাদি লইয়া বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যাইতেন। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে তাঁহার গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের ভোগরাগ হইত এবং ভক্তগণও সে-সব উৎসবে যোগ দিতেন। তিনি সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ও কাঁকুড়গাছিতে কীর্তন করিতে যাইতেন। গিরিশচন্দ্র ও রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন এবং সাদরে গ্রহণ করিতেন। শ্রীমাতাঠাকুরানীরও তিনি স্নেহপাত্র ছিলেন। মণীন্দ্রেরই আগ্রহে তাঁহার পরিবারের অনেকে শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠ স্থাপনের পর তাঁহার দুরবস্থা চরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্বের ন্যায় আর তেমন যাইতে পারিতেন না। শেষ বয়সে পুত্রগণ উপার্জনক্ষম হইলে তাঁহার সচ্ছলতা ফিরিয়া আসে এবং তখন হইতে

তিনি আবার স্বামী সারদানন্দজী, শিবানন্দজী প্রভৃতির নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন। দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি স্বগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে মগ্ন থাকিতেন। ফলতঃ বহির্দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন বিফল হইলেও অন্তরের সম্পদে তিনি বঞ্চিত হন নাই এবং আধ্যাত্মিক আনন্দেরও তাঁহার ন্যূনতা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের কথায় তিনি মাতিয়া উঠিতেন এবং তাঁহার চক্ষু ছলছল করিত। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ৺মহালয়ার দিনে বেলা ২টা ১০ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

# উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার আহিরীটোলায় তখনকার ৩১ নম্বর নিমুগোস্বামীর লেনে মাতুলালয়ে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮), শুক্রবার, পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁহার পিতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতৃগৃহ ছিল হুগলী জেলার বলাগড়ে। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ (ফুলে মুখোটী) বলিয়া তিনি চাকদহে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু বিবাহ করিতেন; তাঁহাদের অনেক পত্নীরই জীবন পিতৃগৃহে অতিবাহিত হইত। উপেন্দ্র-জননীরও শ্বশুরগৃহবাস হয় নাই। উপেন্দ্রনাথের মাতুলের নাম শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ভাগিনেয়কে পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন। তিনি রাধাবাজারে এক ঘড়ির দোকানে চাকরি করিতেন; অবস্থা ভাল ছিল না।

উপেন্দ্রনাথ যদুপণ্ডিতের স্কুলে 'কথামালা' পর্যন্ত পড়িয়া লেখা-পড়া ছাড়িয়া দেন। মাতুল তখন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কোনও কাজ যোগাড় করিতে বলিলেন। দুই-এক দিন ঘুরিয়াই তিনি এক ঔষধালয়ে চাকরি পাইলেন; কাজ—ঔষধের শিশি-বোতল ধোওয়া, বোতলের গায়ে লেবেল লাগানো ইত্যাদি। কিছুদিন কাজ করিয়া উপেন্দ্রনাথ যখন বুঝিলেন যে, ডাক্তারের নৈতিক চরিত্র ভাল নহে, তখন তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিলেন। পরে আবার ঘোরাঘুরি করিয়া বটতলায় (আপার চিৎপুর রোড) বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কর্মসংগ্রহ করিলেন। এখানে কাজ ছিল দোকানঘর

---

১ সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবীর প্রদত্ত উপাদান-অবলম্বনে এই তারিখ স্থিরীকৃত হইল।

ঝাঁট দেওয়া, বই-সাজানো ও বিক্রয় করা। কিছুকাল পরে মালিক ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দোকান বিক্রয় করিতে চাহিলে উপেন্দ্রনাথ উহা কিনিতে উদ্যত হইলেন। দোকানের দাম মাত্র ৭৫৲ টাকা হইলেও মাতুল ঐ টাকা দিতে চাহিলেন না। অগত্যা মাতুলানীর সাহায্যে তিনি দোকানটি হাতে লইলেন এবং দুই-তিন মাসের মধ্যেই ধারের টাকা শোধ করিলেন। ঐ কালে এক পয়সা দুই পয়সার চুটকি বই বাহির হইত; তাহাতে নানা রকম ছড়া থাকিত। উপেন্দ্রনাথ ঐরূপ চুটকি বই অনেকগুলি একত্র করিয়া বড় বই ছাপাইলেন। ইহাতে বেশ আয় হইল। পরে আরও অনেক বই ছাপাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রকাশিত পুস্তকও বিক্রয় করিতে থাকিলেন। ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের অগ্রজ কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের তিনিই ছিলেন একমাত্র বিক্রেতা। এই সূত্রে দেবেন্দ্রনাথের সহিতও তাঁহাব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

আহিরীটোলায় তখন দেবেন্দ্রবাবু ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অধরলাল সেনও বাস করিতেন। ঐ সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় যাইতেন। সম্ভবতঃ এই ভাবেই উপেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ করেন এবং তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণও এই সুলক্ষণ যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উপেন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় দিলে ঠাকুর বলিলেন, "ও, তুমি ব্রাহ্মণ! তোমাদের বাড়িতে ঠাকুরসেবা আছে কি?" উপেন্দ্র-বাবু উত্তর দিলেন, "হাঁ, নারায়ণের নিত্যপূজা হয়।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "একদিন নারায়ণের প্রসাদ খাওয়াতে পার?" উপেন্দ্রবাবু স্বীকৃত হইয়া মাতুলালয়ে ফিরিলেন; কিন্তু কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, মাতুলানী এই অনুরোধ ভালভাবে গ্রহণ করিবেন কি? অনেক ভাবিয়া শেষে তাঁহাকে বলিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির একজন সদ্ব্রাহ্মণ

৺নারায়ণের প্রসাদ চাহিয়াছেন। মাতুলানী ব্রাহ্মণের আকাঙ্ক্ষা শুনিয়া সহজেই সম্মত হইলেন এবং উপেন্দ্রনাথও একদিন প্রসাদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তখন নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন যুবকভক্ত প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। উপেন্দ্রের হাতে নারায়ণের প্রসাদ দেখিয়া ঠাকুর সানন্দে উহা হইতে নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন এবং পরে সকলের পাতে দিতে বলিলেন।

এই ঘটনার পূর্বে উপেন্দ্রবাবুর দেখাদেখি পাড়ার ছেলেরা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলে অভিভাবকগণ জগবন্ধুবাবুর নিকট নালিশ করেন এবং মাতুলও উপেন্দ্রকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু মামীমার সাহায্যে দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদ লইয়া যাইবার পর হইতে ঐ বাধা দূরীভূত হয়। মামীমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর একদিনও প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বেশ ভাল রাঁধিতে পারিতেন।

অপর ভক্তদের ন্যায় উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কিছু দিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার মনে দুঃখ হয়—ইহা ভাবিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দুই পয়সার জিলিপি আনিতে বলিয়াছিলেন। এইজন্য পরে উপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে ঠাকুরের উৎসবে জিলিপিভোগ দেওয়া হইত। উপেন্দ্রবাবুর পত্নী শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী জানাইয়াছেন যে, উপেন্দ্র "বিবাহে সম্মত ছিলেন না; পরে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে তিনি বিবাহ করেন। মেয়েটি ঠাকুরের পূর্বপরিচিত ঘরের। তাহার নাম ঠাকুরের পছন্দ না হওয়ায় তিনি বলিলেন, 'ও নাম ভাল না, একটা ভাল নাম রাখ না কেন ?' মেয়ের নাম ঠাকুরকে দিতে বলিলে তিনি কহিলেন, 'উহার নাম হোক ভবতারিণী'। সেই নামেই ইনি এখন পরিচিতা। ভবতারিণী দেবীর বর্ণ কাল ছিল বলিয়া স্বামীজীর এই বিবাহে আপত্তি ছিল। ভবতারিণীর ইহা মনে ছিল। তাই পরে একদিন স্বামীজী তাঁহার ঘরে আসিলে তিনি স্বামীজীকে সুপারি দিতে অস্বীকৃতা হন। তখন স্বামীজী

বলেন, "উপেন-ঠাকুরের গলায় যখন ঝুলেছই তখন সুপারি কেন, তোমার হাতের রান্নাও খেতে হবে।" ইহার পর তাঁহার রাগ পড়িল।

ক্রমে উপেন্দ্রনাথ ভক্তমহলে সুপরিচিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত বিভিন্ন ভক্তগৃহে যাইতে ও উৎসবাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে যেদিন ঠাকুরের শুভাগমন হয় ( ৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ ), সেদিন উপেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের সহিত ঠাকুরের পদসংবাহনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'কার্যকারী ভক্তদের মধ্যে ভক্তবীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুস্তফী, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সকলে মিলিত হইয়া পরমহংস-দেবের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে মহোৎসব-কার্যটি আরম্ভ করিলেন।" ফলতঃ উপেন্দ্রনাথ দরিদ্র হইলেও পূর্ণোদ্যমে সমস্ত উৎসবাদিতে যোগ দিতেন, সাধ্যমত সমস্ত কার্য করিতেন এবং অবকাশ পাইলেই কলিকাতায় ও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া ধন্য হইতেন।

তথাপি দারিদ্র্য তাঁহার বুকে যেন একটা জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া থাকিয়া তাঁহার ভক্তিপ্রকাশ ও ভক্তিলাভের চেষ্টাকে প্রতিপদে বাধা দিতেছিল। অপর ভক্তেরা যেখানে অসঙ্কোচে ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ করেন, সেখানে উপেন্দ্র যেন হৃদয়ে তেমন স্বাধীনতা বোধ করিতে পারেন না। বাড়িতে মাতুলও সর্বদা তাহার অক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। ফলতঃ ভক্তিলাভের চেষ্টার সহিত এই দারিদ্র্যনাশের

চিন্তা সর্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকিত। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস ?" তখন স্বতই তাঁহার উত্তর আসিল, "অর্থ চাই।" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর এই যাচ্ঞার সার্থকতা বুঝিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "খুব হবে।" ঠাকুর ভক্তের এই ভক্তিপথের বাধা দূর করিলেও তাঁহাকে গৌণভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, অর্থস্পৃহা জীবনের কাম্য বা উচ্চতর ভক্তির সহগামী হইতে পারে না। পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজীর 'স্মৃতিকথা'য় তাই উল্লিখিত আছে—"সে (উপেন্দ্রবাবু) যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত তখন একদিন ঘর-ভরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলিনির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এই ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থকামনা ক'রে আসে যায়।'" শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আর এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "ভক্তসমাবেশে কোন ভক্ত একদিন দরিদ্র উপেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, আপনি তো উপেনের কিছু করলেন না।" তাহাতে ঠাকুর হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ও তো কিছু চায় না! ওর ইচ্ছা, ওর ছোট দুয়ারটি বড় হয়—তা হবে।" ঠাকুরের শুভেচ্ছা কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। কিন্তু পাঠক যদি মনে করেন যে, উপেন্দ্রনাথ শুধু অর্থার্থী ছিলেন, তবে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। ঠাকুরের সহিত মিলন ও পরবর্তী কালের ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে আমাদের বরং মনে হয় যে, অর্থিত্বের সহিত প্রকৃত ভক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া উপেন্দ্রনাথ কাশীপুরের শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিতাগ্নিনির্বাপণান্তে ভক্তগণ যখন কাশীপুরের ঘাটে অবগাহনাদির জন্য একে একে যাইতেছিলেন, তখন এক বিষধর সর্প উপেন্দ্রনাথের পদে দংশন করে। সর্পাঘাতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভক্তেরা তাঁহার পায়ের উপরিভাগ খুব জোরে বাঁধিয়া ক্ষতস্থানটি

তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা পোড়াইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার জীবনরক্ষা হইল; কিন্তু ক্ষতস্থানটি প্রায় চার-পাঁচ মাস নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া রহিল ('পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত', ১৫৩ পৃঃ)। সেই নীল দাগ আজীবন ছিল।

উপেন্দ্রনাথ যে যুগে পুস্তকের দোকান খোলেন, সে যুগের বাঙ্গালীদের তেমন উল্লেখযোগ্য পুস্তকব্যবসায় ছিল না, আর বটতলাই ছিল ঐ ব্যবসায়ের কেন্দ্র। ধীরে ধীরে তিনি একটি ছাপাখানা কিনিয়া প্রকাশকের কার্যে হাত দিলেন এবং 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক এক ক্ষুদ্র কাগজ ঐ মুদ্রণালয় হইতে বাহির করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর 'ইমিটেশন্ অব্ ক্রাইস্ট'-এর বঙ্গানুবাদ 'ঈশানুসরণ' ঐ পত্রে প্রকাশিত হইত। অকস্মাৎ তিনি 'রাজভাষা' নাম দিয়া ইংরেজী ভাষাশিক্ষার সহজ প্রণালীযুক্ত একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। এই পুস্তক বহুজনসমাদৃত ও বহুলপ্রচারিত হওয়ায় তাঁহার অর্থভাগ্য ফিরিল, ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ৩ নম্বর বিডন স্কোয়ারের একখানি দ্বিতলগৃহ ভাড়া লইয়া ব্যবসায়ের প্রসারে উদ্যত হইলেন। শীঘ্রই 'বসুমতী' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহার মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত হইল।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, উপেন্দ্রবাবু শুধু অর্থার্থী ছিলেন না; তিনি ব্যবসায়ী হইলেও মুখ্যতঃ ভক্ত ছিলেন। ইহার প্রমাণ এই সময়ের একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিতেছেন— "পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় আসিতেছেন—ইহা লইয়া কলিকাতায় তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল। কলিকাতা অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজনে স্বামীজীকে খিদিরপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপেন্দ্রবাবু পূর্বদিন কলিকাতা ও শহরতলীর প্রায় সর্বস্থানে প্লাকার্ড মারিয়া বড় বড় অক্ষরে স্বামীজীর

পৌঁছিবার স্থান ও কাল জানাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া স্বামীজীকে সংবর্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসী-দিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমস্তই উপেন্দ্রবাবুর নিজব্যয়ে। নবপ্রকাশিত 'বসুমতী'তে স্বামীজীর উপবিষ্ট ছবি এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মঙ্গলঘট দিয়া উহার নীচে স্বামীজীর আগমনোপলক্ষ্যে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচিত নূতন গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যার 'বসুমতী' হাজারে হাজারে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যাকালে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ এবং পরমভক্ত গিরিশবাবু ও পূর্ণবাবুর মধ্যে আলোচনা হইতেছিল যে, শীতকালে অতিপ্রত্যুষে স্পেশাল ট্রেন আসিবে, সুতরাং হয়তো শিয়ালদহে লোকের বেশী সমাগম হইবে না। এমন সময় সহসা উপেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশবাবু ও স্বামীজীদের সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'কাল স্বামীজীকে দর্শন করবার জন্য বহু সহস্র লোক যাবে। আমি সমস্ত কলকাতা, বরাহনগর, কাশীপুর, ভবানীপুর, আলিপুরে প্লাকার্ড লাগিয়েছি, পঞ্চাশ হাজার হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছি এবং দশ হাজার 'বসুমতী' বিতরণ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় খুব ভোরে, এমন কি, রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই লোকে লোকারণ্য হবে।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'ভাই, এটা যদি হয়, তবে তুই মস্ত একটা কাজ করলি।' উপেনবাবুর কথায় অনেকে সেদিনকার বৈঠকে আশ্বস্ত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; কারণ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপনের তেমন উদ্যম ছিল না—তাঁহারা সংবাদপত্রের স্তম্ভে শুধু তাঁহার আগমনসংবাদ ছাপাইয়া নিরস্ত ছিলেন।" স্বামীজীর জীবনীর সহিত পরিচিত সকলেই জানেন যে, উপেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

শীঘ্রই উপেন্দ্রবাবু ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিয়া

গ্রে স্ট্রীটের একটি সুবৃহৎ বাড়ি ভাড়া লইয়া মুদ্রণালয় প্রভৃতি তথায় লইয়া গেলেন। 'বসুমতী'র গ্রাহকসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায় ছাপাখানাও বাড়াইতে হইল এবং প্রথিতনামা সাহিত্য-মহারথীরা সম্পাদকশ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন। বিভিন্ন সময়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, সুরেশ সমাজপতি 'বসুমতী'র সম্পাদকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পুস্তকপ্রকাশন-বিভাগও অনুরূপ বর্ধিত হইতে লাগিল। 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, টেকচাঁদ, গিরিশচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অতি সুলভ সংস্করণ এবং সঞ্জীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশিত হইয়া অনেক দরিদ্র সাহিত্যামোদীর গৃহে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লোকের দৈনিক সংবাদ পাইবার আগ্রহ আছে জানিয়া উপেন্দ্রবাবু সান্ধ্য 'দৈনিক বসুমতী' প্রচার করেন। সমরসংবাদ-সম্বলিত এই পত্রিকাকে লোকে 'বসুমতী টেলিগ্রাফ' বলিত। প্রথমে উহাতে সংবাদই অধিক থাকিত; পরে উহা পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্রে পরিণত হয়। উপেন্দ্র-বাবুর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "উপেনের ব্যবসায়বুদ্ধি খুব।"

উপেন্দ্রনাথের অর্থার্জন-ক্ষমতা সমধিক বর্ধিত হইলেও তাঁহার ধর্মস্পৃহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা ঘটে নাই; বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী 'বসুমতী'র শিরোভূষারূপে সন্ন্যাসীদের অভিবাদনমন্ত্র 'নমো নারায়ণায়' নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং উপেনবাবু সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণীপ্রচারে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। তখনকার দিনে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'বসুমতী' এই কাজে অগ্রণী ছিল। উপেনবাবু 'স্বামি-শিষ্যসংবাদ'-প্রণেতা শরৎবাবু ও অপর একজনকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, স্বামীজীর বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া পাঠাইতে। ঐ-সকল তাঁহার

পত্রিকায় সাদরে মুদ্রিত হইত। তিনি প্রতি নভেম্বর মাসে তাঁহার আহিরীটোলার বাড়িতে যে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করিতেন, উহা ক্রমে একটি দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। কীর্তনভজন, ভক্তসমাগম ও প্রসাদবিতরণাদিতে সমস্ত বাটীটি সেদিন আনন্দমুখরিত থাকিত। বাড়ির ভিতরদিকে অনতিদীর্ঘ প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি নানাবিধ কুসুমে ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইত এবং ছবির সম্মুখে মঠের সাধুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত হইত। বহুবাজারে বাসস্থান ও ব্যবসায় স্থানান্তরিত হইবার পরও কর্মচারিবৃন্দকে লইয়া এই উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইত।

সাধু ও ভক্তসেবায় তাঁহার খুবই অনুরাগ ছিল। শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর 'স্মৃতিকথা'য় আছে—"ঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে স্বামীজীপ্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাই যখন··· কোন দিন কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত গিয়া···রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রের সেই ছোট্ট দোকানটিতে পৌছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙ্গারি নানা প্রকারের খাবার ও দোনা দোনা পান খাওয়াইয়া তাজা করিয়া দিত। বিডন স্কোয়ারের ধারে ছ্যাকড়া-গাড়ির আড্ডা ছিল। গাড়োয়ানরা 'বরাহনগর, কাশীপুর, চার পয়সা' বলিয়া হাঁকিত। ভাড়া দিয়া উপেন্দ্র আমাদের সেই গাড়িতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে সে আমাদের খাওয়াইয়া বরাহনগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, তাহা বলা যায় না। জ্ঞানানন্দ অবধূত ( নিত্যগোপাল ) তখন রাম দাদার ( দত্তের ) বাড়িতে থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে উপেন্দ্রের দোকানে আসিয়া ভিতরের অন্ধকার কুঠরিতে বসিয়া থাকিতেন এবং জলযোগ করিয়া একটু বেশী রাত্রে চলিয়া যাইতেন।" শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ( লাটু মহারাজ ) উপেন্দ্রবাবুর নিকট অশেষ সাহায্য পাইতেন এবং অনেক সময় 'বসুমতী' আফিসে বাস করিতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে

'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' শুধু সাহিত্যামোদীদেরই মিলনস্থান ছিল না, শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীদিগকেও প্রায়ই সেখানে দেখা যাইত। স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের পদধূলিলাভে উহা ধন্য হইয়াছিল। আবার দরিদ্র শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অনেকেই সেখানে নানাভাবে উপকৃত হইতেন। তাই 'বসুমতী'র একজন প্রিণ্টার রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন, "এটা বসুমতী আফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত" ('সাহিত্য', বৈশাখ, ১৩২৬)।

এই শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগের সহিত তাঁহার উদারহৃদয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরিদ্রের সন্তান হইলেও তাঁহার আচারব্যবহারে অর্থসম্বন্ধে অনুদারতার স্থলে গভীর সহৃদয়তাই প্রকাশ পাইত। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'সচিত্র মাসিক বসুমতী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে উপেন্দ্রনাথ ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি উহা ১২৯৭ বঙ্গাব্দের শেষে 'সাহিত্য' নামে নামান্তরিত করিয়া সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে সমুদায় স্বত্ব দান করেন।

'বসুমতী'র কর্মচারীরা আপদে-বিপদে তাঁহার সাহায্য পাইত। একবার সরকারী সংশোধনালয়ের দুইটি বালককে কাজ শিখিবার জন্য 'বসুমতী' সাহিত্যমন্দিরে পাঠানো হয়। তাহাদের একটি কয়েকখানি পুস্তক চুরি করিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু দয়ার্দ্র উপেন্দ্রনাথ পুলিস আদালতে গিয়া বলেন যে, ঐ বইগুলি তিনি বালককে উপহার দিয়াছেন। বিচারক অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দেন। একদিন আফিসে আসিয়া তিনি দেখিতে পান, কয়েকজন লোক একটি যুবককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সে ছাপাখানার হরফ চুরি করিয়াছে; তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিকটেই পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। উপেন্দ্রনাথ পুলিসকে বলিলেন যে, তিনি যুবককে ঐগুলি দান করিয়াছেন। পুলিস চলিয়া গেলে তিনি অপরাধীকে

বলিলেন, "বাপু, চলে যাও; অমন কাজ আর কখনো ক'রো না।" যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাঁহার কাগজ সরবরাহ করিত, একদিন সেখান হইতে পত্র আসিল যে, বহু টাকা বাকী পড়িয়াছে। উপেন্দ্রনাথ জানাইলেন যে, তিনি সমস্ত টাকাই উক্ত কোম্পানির কর্মচারীকে দিয়াছেন। তদনুযায়ী কোম্পানির লোক আসিয়া বসুমতী আফিসের হিসাব পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিল উপেন্দ্রনাথের কথাই ঠিক—কর্মচারী ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন উপেন্দ্রনাথ সমস্ত টাকা নিজে শোধ করিবার দায়িত্ব লইলেন এবং অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। এইরূপ দয়ার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তি এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতেন। একদিন কার্যক্ষেত্রে যাইবার পথে এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি সেদিনকার বিক্রয়লব্ধ টাকা তাহাকে দিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সন্ধ্যায় সেই ব্যক্তিকে ৩০০৲ টাকা দিয়া প্রতিজ্ঞামুক্ত হন।

উপেন্দ্রবাবু আদর্শ গৃহী ছিলেন। তিনি নিজে সদ্ভাবে অর্থ উপার্জন করিতেন এবং দশ জনকে ঐরূপ প্রেরণা দিতেন। সুরেশ সমাজপতি 'সাহিত্যে' লিখিয়াছিলেন—"বসুমতী-র প্রবর্তক হইতে নিম্নপর্যায়ের সেবক পর্যন্ত প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণভক্ত।" এই সাধুবৃত্তি তাঁহার পরিবারের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সতীশচন্দ্রের মনে একবার সন্ন্যাসগ্রহণের স্পৃহা জাগিয়াছিল। কিন্তু মঠকর্তৃপক্ষ তখন তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দেন।

উপেন্দ্রনাথের কার্যে সফলতার একটি প্রধান কারণ ছিল শ্রমশীলতা। দিনের পর দিন তিনি বসুমতী কার্যালয়ে সমস্ত কাজ মনোযোগ দিয়া দেখিতেন। প্রতিদিন যথাকালে আহিরীটোলার বাড়ি হইতে আসিয়া তিনি সারাদিন অফিসে থাকিয়া সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া যাইতেন।

গ্রে স্ট্রীটের বাড়ি হইতে বসুমতী-মুদ্রাযন্ত্র ও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

প্রভৃতি বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের বাড়িতে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমে বিপুলাকার ধারণ করে। সাহিত্যপ্রচারে উপেন্দ্রনাথ শীঘ্রই 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রনাথ ও 'হিতবাদী'র কাব্যবিশারদের সমকক্ষ হইয়া উঠেন। এই নূতন বাড়ি বাঙ্গালার দুইটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে 'কলিকাতা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল' স্থাপিত হয়। পরে এখানেই শ্রীঅরবিন্দের 'ন্যাশনাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবনে সাফাল্যলাভ করিলেও উপেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, এই সমস্তেরই মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আশীর্বাদ। আর ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীগুরু তাঁহাকে বিপথে যাইতে দিবেন না। ফলতঃ উপেন্দ্রবাবুর সমস্ত জীবনই গুরুবলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১৭ চৈত্র সোমবার সায়াহ্নে তিনি আহিরীটোলার মাতুলালয়ে দেহত্যাগ করেন ( ইং ৩১শে মার্চ, ১৯১৯ )।
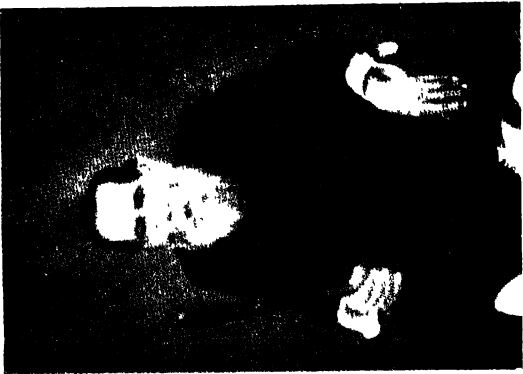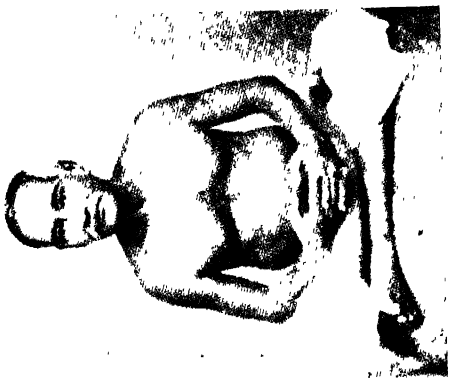
নবগোপাল ঘোষ

চুনীলাল বসু

# চুনীলাল্ বসু

শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু কলিকাতা মিউনিসিপাল অফিসে কাজ করিতেন এবং স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ অবসরকালে সাধুদর্শনের জন্য ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেন, কিংবা অন্ততঃ একবার গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া আসিতেন। একদিন জনৈক সহকর্মী তাঁহার মনোভাব জানিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "যদি সাধু দেখতে চাও তো রাসমণির কালীবাটীতে পরমহংসকে দেখে এসো।" কোথায় কালীমন্দির বা কিরূপে তথায় যাইতে হয়, তিনি জানিতেন না। তাই বন্ধুকে প্রশ্নপূর্বক শুধু এইটুকু জানিয়া লইলেন যে, উহা কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার উপরে অবস্থিত; আহিরীটোলা হইতে জোয়ারের সময় নৌকাযোগে যাওয়া চলে। দ্বিপ্রহরে গমন আবশ্যক এবং ঐ সময়ে অফিসের ছুটি ও জোয়ার উভয়ের সংযোগ হওয়া প্রয়োজন; সুতরাং সুসংবাদ পাইয়াও দক্ষিণেশ্বরে যাইতে দুই-তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পরে এক রবিবারে অবস্থা অনুকূল দেখিয়া তিনি আহারান্তে আহিরীটোলাঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং মাঝিদের সাদর আহ্বানে নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। অনিশ্চিত স্থানে যাইতেছেন, অধিকন্তু পূর্বে তিনি কখনও নৌকাযোগে কোথাও যান নাই; অতএব মনে বেশ একটু উদ্বেগ ছিল। এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেক্ষার পর উপযুক্ত আরোহী পাইয়া মাঝিরা জোয়ারে নৌকা ছাড়িয়া দিল। ক্রমে উহা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে আসিয়া উত্তরের ঘাটে থামিল। চুনীলাল পাঁচ পয়সা ভাড়া দিয়া নামিয়া পড়িলেন।

অপরিচিত উদ্যানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ ও পদচারণান্তে তিনি একখানি কুটীরে জনৈক ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই—ঔষধ?" চুনীলালবাবু উত্তরে জানাইলেন,

"না, আমি পরমহংসদেবের দর্শনে এসেছি।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক বলিলেন, "হাঁ, একজন পরমহংস ঐ কোণের ঘরে থাকেন।" তদনুসারে তিনি গৃহের উত্তরের বারান্দায় আসিয়া দ্বারপথে দেখিলেন, একজন কক্ষমধ্যে একা বসিয়া আছেন। ভিতরে প্রবেশপূর্বক প্রণাম করিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি জন্য এসেছ?" চুনীলাল বলিলেন, "দর্শন করতে।" পরমহংসদেব যে ছোট্ট খাটটির উপর বসিতেন, উহার উত্তর দিকে একখানি বেঞ্চি ছিল। তিনি চুনীলালকে উহাতে বসিতে বলিলেন এবং পরম আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার সংসারের খবর আদ্যোপান্ত শুনিয়া লইলেন; প্রেমভক্তি বা ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিষয় কোন প্রসঙ্গই সেদিন হইল না। বিদায়কালে ঠাকুর তাঁহাকে একটু মিছরি-প্রসাদ খাইতে দিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ঘটনা। ঐ সময়ে রামলাল-দাদা ব্যতীত আর কাহাকেও চুনীবাবু সেখানে দেখেন নাই।

ইহার পরের ঘটনা চুনীবাবু এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন, "মার্চ মাসের শেষে অফিসের মাহিনা পাইলে মনে কেমন প্রবল ইচ্ছা জাগে বাটী হইতে পলাইবার এবং কিছুদিন হৃষীকেশে বাস করিবার। মাহিনা ভিন্ন বাটী হইতে আরও ২০০৲ টাকা লইয়া অফিসের আর একজনের সহিত পলাইয়া যাই। সে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি অনেক স্থান দেখিয়াছে ও তাহার অনেক জানাশোনা আছে বলিয়া গল্প করিত। বাটীতে স্ত্রীপুত্রাদি রহিয়াছে, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কেবল অফিসে এক মাসের ছুটির জন্য একখানি দরখাস্ত রাখিয়া দুইজনে রওনা হই। পথে তাহার অনেক আলাপী লোকের সহিত দেখা হইতে থাকে এবং এখানে দুদিন, ওখানে একদিন—এই করিতে করিতে দশ-বার দিন কাটিয়া যায়। ক্রমাগত এইরূপ নানাস্থানে ঘোরাঘুরির জন্য বিরক্তি আসে এবং তাহাকে বলি যে, আমি আর তাহার সহিত যাইব না—আমার ইচ্ছা হৃষীকেশে গিয়া কিছুদিন থাকা; এভাবে ঘুরিতে আমি আসি নাই।

এই বলিয়া তাহার সহিত কানপুরের একস্থান হইতে পৃথক হইয়া হৃষীকেশে যাই। সেখানে যে কেবল সাধুরা বাস করে, জানিতাম না। কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া মর্কট বৈরাগ্যের অবসান হইল এবং এক মাস পূর্ণ হইবার কয়েকদিন পূর্বেই পত্র লিখিয়া বাটী ফিরিয়া আসি।"

আফিসে ফিরিলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ জানাইলেন যে, বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার চাকরি গিয়াছে। তিনি উহা ধরিয়াই লইয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শ্যাম বিশ্বাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করিয়া চুনীবাবুকে বিনা বেতনে একমাস ছুটি দিয়া কাজে বহাল করিলেন।

পরবর্তী ঘটনা তিনি এইরূপ বর্ণনা করেন—"ইহার কয়েকদিন পরেই আমি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাই এবং পরমহংসদেবের নিকট বলরাম-বাবুকে দেখিতে পাই। বলরামবাবু প্রায় এক বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়া রহিয়াছেন। বড়লোক—পার্শ্বের বাটীতে হইলেও আলাপ-পরিচয় হয় নাই। ঠাকুর বলরামবাবুকে বলিলেন, 'ইনি তোমার পাশেই থাকেন; তুমি যখন আসবে, এঁকে নিয়ে এসো।' অতঃপর যখনই বলরামবাবু দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, আমায় লইয়া যাইতেন। তবে রবিবার বা ছুটি না থাকিলে আমার যাওয়া ঘটিত না" বলরামবাবু প্রতি রবিবারে নৌকা ভাড়া করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। ইহাতে দরিদ্র ভক্তদের বিশেষ সুবিধা হইত। এইরূপে চুনীবাবুর সহিত বলরামের ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইয়াছিল এবং উভয়েই পরস্পরের খবরাখবর রাখিতেন। চুনীলালের অসুখ হইলে বলরাম চিকিৎসক ডাকিয়া আনিতেন এবং প্রতিদিন সংবাদ লইতেন। প্রতিবেশীরা অবশ্য এইজন্য চুনীবাবুকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, 'বড়লোকের গা-ঘেঁসা।' কিন্তু বন্ধুত্বের আকর যেখানে অন্যরূপ, সেখানে এরূপ উক্তিতে কেহ বিচলিত হয় না;

চুনীবাবুও সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। তাঁহার বাড়ি ছিল বলরামভবনের ঠিক পশ্চিমে ; তাই উভয়ের মিলনের সুযোগ ঘটিত প্রচুর।

চুনীবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদে আগমনের পূর্বে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিবসংহিতা-দর্শনে যোগাভ্যাসে রত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পরেও এই সাধনা চলিতেছিল। তিনি মাছ মাংস ছাড়িয়া সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে পুঁটে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে বসিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার হাঁপানিরোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন ঠাকুরকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। একটু সুস্থ হইয়া একদিন যখন তাঁহার নিকট গেলেন, তখন আর কেহ সেখানে ছিল না। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ও-সব কেন? তোমরা গৃহী মানুষ, ও-সব যোগটোগ তোমাদের জন্য নয়। ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস থাকলেই হ'ল। এখান থেকে ফেরবার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও। ও-সব কাজ আর ক'রো না।" চুনীবাবু শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন ; কারণ অপর কেহ তাঁহার যোগাভ্যাসের কথা কিংবা যোগাভ্যাস হইতেই যে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা জানিত না। তিনি আরও আশ্চর্য হইলেন যখন ঐ তিন মাত্রা ঔষধ-সেবনে তাঁহার রোগ সারিয়া গেল। ইহার পরে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, ঠাকুর অবতার।

চুনীবাবু অপরের ন্যায় সেবা করিতে উন্মুখ, অথচ দারিদ্র্যবশতঃ পারেন না বুঝিয়া ঠাকুর ভক্তের মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য বলেন যে, ধাতুপাত্রে তাঁহার জলপান সম্ভব হয় না ; অতএব চুনীলাল যেন তাঁহার জন্য একটা কাঁচের গ্লাস কিনিয়া আনেন। আবার অপরের ন্যায় প্রণবোচ্চারণে অনধিকারহেতু চুনীলাল মনঃকষ্টে আছেন জানিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, ভগবানের যে-কোন একটি নাম উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট ; প্রণবের

আবশ্যকতা নাই। তদবধি তিনি ঠাকুরের নির্দেশানুসারে জপধ্যান ও ঠাকুরের নামোচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই করিতেন না।

চুনীবাবু একবার তীর্থাদিভ্রমণের জন্য তিন মাসের ছুটি লইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহধর্মিণী অম্লরোগে ভুগিতেছিলেন; তাই তিনি স্থির করিলেন তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন। বলরামবাবু এই সংবাদ পাইয়া জানাইলেন যে, তিনিও শীঘ্রই তথায় যাইবেন; অতএব একসঙ্গে যাওয়াই উচিত। বলরামবাবুর স্বভাব ছিল এই যে, তিনি শীঘ্র কিছু করিতে পারিতেন না, আবার কোথাও যাইলে ছয় মাস কি এক বৎসর না থাকিয়া নড়িতেন না। বলরামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে দুই মাস বৃথা নষ্ট হইল দেখিয়া চুনীলাল আর বিলম্ব না করিয়া সস্ত্রীক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা মোট বিশ দিন ছিলেন। সে সময় বৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত তারক ( শিবানন্দজী ) ছিলেন; আর ছিলেন গৌরী-মা। গৌরী-মা খুব তেজস্বিনী ছিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন। কিছু পরেই শ্রীযুক্ত রাখালকে ( ব্রহ্মানন্দজীকে ) লইয়া বলরামবাবু সস্ত্রীক বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। চুনীবাবু ও অপর সকলেই বলরামবাবুদের 'কালাবাবুর কুঞ্জে' থাকিতেন এবং তথায় প্রসাদ পাইতেন। চুনীবাবু সহধর্মিণীকে বৃন্দাবনে রাখিয়া বলরামবাবুদের পূর্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে যান, সেদিনের কথা 'কথামৃতে' (২।১৪।১ ও ৪।১৭।১) বর্ণিত হইয়াছে। চুনীলালের আরও কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গমনের উল্লেখ আমরা ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার প্রতি ঠাকুরের কিরূপ উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা তাঁহার একদিনের শ্রীমুখের কথায় প্রকটিত হইয়াছে। ঠাকুর সেদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "চুনীতে আর তোমাতে আনা-গোনায় উদ্দীপন হয়েছে" (৪।৩১।২ )।

কল্পতরু ঠাকুর যেদিন ( ১লা জানুয়ারি, ১৮৮৬ খ্রীঃ ) কাশীপুরের বাগানে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া শয্যায় বিশ্রাম করিতে থাকেন এবং নিরঞ্জন দ্বারে অবস্থান করিয়া সকলকেই ভিতরে যাইতে বারণ করিতে থাকেন, সেদিন বিকালে চুনীলাল উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলেন যে, ঠাকুরের শরীর আর বেশী দিন থাকিবে না; সুতরাং চুনীলালের কিছু প্রার্থনীয় থাকিলে যেন এখনই নিবেদন করেন। কিন্তু দ্বারী নিরঞ্জনকে অতিক্রম করা অসম্ভব জানিয়া চুনীলাল বিমর্ষচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিরঞ্জন একটু সরিয়া যাইবামাত্র নরেন্দ্র ইঙ্গিত করিলেন এবং চুনীলাল ভিতরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" চুনীলাল কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন ঠাকুর নিজের দেহ দেখাইয়া বলিলেন, "এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো। তোমারও হবে।" বাহিরে আসিয়া চুনীলাল নরেন্দ্রনাথকে সব জানাইলে তিনি বলিলেন, "তবে আর আপনার ভয় কি?" চুনীলাল ঠাকুরের ঐ কথাটি জীবনের সম্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চুনীবাবু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাই স্বামীজী তাঁহার অভাবের কথা জানিতে পারিয়া আমেরিকা হইতে লিখিয়াছেন, "দুই-তিন মাসের মধ্যে আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিব।...বলরাম, সুরেশ, মাস্টার ও চুনীবাবু, এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।"

চুনীবাবুর দেহত্যাগের পর 'উদ্বোধনে' (আষাঢ়, ১৩৪৩ ) তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়—"গত ৩০শে মে ( ১৯৩৬, শনিবার, বেলা ১২টার সময় ) শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী শিষ্য চুনীলাল বসু মহাশয় ৫৮ বি, রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ তাঁহার নিজ বাটীতে মূত্রাবরোধরোগে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ

করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপদে লীন হইয়াছেন।··· চুনীলাল বসু মহাশয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ নিজ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্কুলে পাঠসমাপন করিয়া প্রায় ২২ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ৩৩ বৎসরকাল পেন্‌সন্ ভোগ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন। ···শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে তিনি সদাসর্বদা তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করেন। 'কথামৃত' এবং স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গে' তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। স্বামীজী তাঁহাকে আদর করিয়া 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। এই অসুখের সময় স্বামী ভাগবতানন্দজী তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জপ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বাগবাজার অঞ্চলে ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স্ক গৃহী ভক্ত ছিলেন।"

# কালীপদ ঘোষ

উত্তর কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরের ঘোষ বংশে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এক অমাবস্যার রাত্রে কালীপদর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গুরুপ্রসাদ ঘোষ। পিতা কালীভক্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার সামান্য পাটের ব্যবসায় ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কালীপদের বিদ্যাশিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে কাগজবিক্রেতা জন্ ডিকিন্সন কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। বিদ্যা অল্প হইলেও বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার ফলে কালীবাবু শীঘ্রই কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন; তখন তাঁহাকে কোম্পানির হর্তা-কর্তা-বিধাতা বলিলেই চলে। বিলাত হইতে কোম্পানির যে কাগজ আসিত তাহাতে অনেক সময় কালীবাবুর মূর্তি অঙ্কিত থাকিত; আর আফিসে স্থান খালি হইলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সেখানে চাকরি পাইতেন।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সহিত ইঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল। দুই জনকে অনেক সময়ই একত্রে দেখা যাইত; উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, এমন কি পানাদিও একসঙ্গে চলিত। ইঁহাদের চরিত্রগত সাদৃশ্য দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের কেহ কেহ ইঁহাদিগকে জগাই-মাধাই বলিতেন। গিরিশচন্দ্র এই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর নামে স্বরচিত 'শঙ্করাচার্য' উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে; কিন্তু আমার আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর।"

কালীপদবাবু গিরিশচন্দ্রের মতো সাহিত্যিক না হইলেও অনেকগুলি

সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ শ্রীযুত রামচন্দ্রের পরমহংসদেব-বিষয়ক বক্তৃতায় উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত' নামে পুস্তিকাকারে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন এবং বেহালা ও বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার বাঁশী শুনিয়া ঠাকুর একদিন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। রন্ধনবিদ্যারও তিনি পারদর্শী ছিলেন। এই জন্য ঠাকুরের ভক্তেরা তাঁহাকে গিন্নী বলিয়া পরিহাস করিতেন।

ইং ১৮৮৪ অব্দের প্রথমভাগে গিরিশচন্দ্রেরই সহিত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে প্রথম উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসে তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া জীবন ধন্য করেন। পরেও ঠাকুর কয়েকবার তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবারে কালীপদবাবুর "যে ঘরে তাঁহাকে উপবেশন করা হয় সেই ঘরে দেব-দেবীর কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের স্তবগান করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়। ইং ১৮৮৫ সালে ঠাকুর যখন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ের সেই স্মরণীয় ৺কালীপূজার দিনে কালীপদবাবুর বাটী হইতে প্রস্তুত সুজির পায়সই প্রভুর সেবার প্রধান উপকরণ হয় এবং ভগবান বুদ্ধ-কর্তৃক সুজাতা-নিবেদিত পরমান্নগ্রহণের ন্যায় ভক্তবৎসল ঠাকুরও সেই পায়স গ্রহণ করেন। উহার পুণ্যময় স্মৃতি আজও কালীবাবুর বংশধরগণ সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন" ('উদ্বোধন', পৌষ, ১৩২৯)।

স্বামীজী ইঁহাকে 'দানা' আখ্যা দিয়াছিলেন; তাই রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন 'দানা-কালী'। কালীবাবু বলিতেন, "জগাই-মাধাইয়ের মতো উচ্ছৃঙ্খল হইলেও আমাকে ঠাকুর নিজগুণে কৃতার্থ করিয়াছেন।"

তিনি স্থূলকায় এবং দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নয়নদ্বয় আয়ত এবং মুখ সদা প্রফুল্ল ছিল। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার যেমন বন্ধুত্ব ছিল, স্বভাবও সেইরূপ অদান্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমনের পূর্বে বারাঙ্গনাসক্তি ও সুরাপানাদিতে তাঁহার সমস্ত অর্জিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইত। ঠাকুরের মহিমাশ্রবণে তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর। কিন্তু এই আগমন ভক্তিপ্রসূত নহে, পরন্তু ঔৎসুক্যজনিত। হয়তো ইহার পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক আকর্ষণ ছিল; কারণ বহু পূর্বে একদা অনেক কুলললনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে সমাগতা কালীপদ-গৃহিণী প্রভুর চরণে প্রণামান্তে পতির কদাচারকাহিনী নিবেদন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কালী সেখানকারই লোক; সুতরাং একদিন মতিগতি অবশ্যই ফিরিবে এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ঐ ভক্তিমতীকে কৃপা করিয়াছিলেন। অধুনা ঠাকুরের শ্রীপদে উপনীত হইলেও দানা-কালী প্রণাম না করিয়াই আসনে বসিলেন এবং কিয়ৎকাল পরেই বিদায় লইলেন।

গৃহে প্রত্যাগত কালীপদর মনে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণচরিতশ্রবণ ও দক্ষিণেশ্বরে পুনর্গমনের এক অদম্য স্পৃহা জাগিতে লাগিল; সুতরাং তিনি শীঘ্রই নৌকাযোগে অপর ভক্তদের সহিত তথায় চলিলেন। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আগমনের অব্যবহিত পরেই শ্রীপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার কলিকাতা যাইবার বাসনা আছে। কালীবাবুও মহানন্দে জানাইলেন যে, তিনি লইয়া যাইতে প্রস্তুত—ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। অতএব লাটু ও কালীপদের সহিত ঠাকুর সেই নৌকায় উঠিলেন এবং পথে সাধনাদি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসাপূর্বক ঠাকুর ইহাও জানিয়া লইলেন যে, কালীপদ ৺কালীমাতার ভক্ত এবং তাঁহার দীক্ষা হয় নাই; কারণ তিনি সাধারণ গুরুতে বিশ্বাসী নহেন। তারপর

ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "জিব বের কর তো কেমন দেখি।" কালীপদ জিহ্বা বাহির করিলে ঠাকুর অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা উহাতে লিখিয়া দিলেন। এদিকে জাহ্নবী-বক্ষে তরী ধীরে ধীরে চলিয়া ঘাটে লাগিল; কিন্তু ঠাকুরের গমনের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহারই আলয়ে যাইবেন। অতএব গাড়ি করিয়া তিনি শ্রীপ্রভুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। এইরূপে স্বেচ্ছায় ভক্তকে কৃপা করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

কালীপদ অচিরেই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি যাঁহারা প্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন, সেই প্রবীণদের মধ্যে স্থান পাইয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব, কলিকাতায় মহোৎসব এবং পরে তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহার কর্মতৎপরতাদর্শনে তাঁহাকে 'ম্যানেজার' আখ্যা দিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হইল। ইহা শুনিয়া ঠাকুর একদিন ( ১৮৮৫ খ্রীঃ, ১৮ই অক্টোবর ) সানন্দে বলিলেন, "কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।" ঠাকুর তখন প্রবীণ ভক্তগণের পরামর্শে শ্যামপুকুরে আছেন। তাঁহার আজ্ঞায় কালীপদ ৺কালীপূজাদিবসে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য স্বগৃহ হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছেন। তিনি দীপাবলী প্রজ্বালনান্তে অর্চনার দ্রব্যসম্ভার নিকটে সাজাইয়া দিলে যথাকালে ঠাকুর পূজাসনে বসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন গিরিশাদি ভক্তের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহাদের পূজা লইবার জন্যই প্রভু ঐ ভাবে পূজাসনে বসিয়া আছেন। অতএব উপস্থিত সকলেই কালীমাতার ভাবাবিষ্ট বরাভয়কর প্রভুর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরে সামান্য প্রসাদ-গ্রহণান্তে শ্রীপ্রভুর আদেশে সকলে সুরেন্দ্রের গৃহে ৺কালীপূজার প্রসাদ গ্রহণ করিতে গেলেন।

তারপর শ্রীপ্রভু কাশীপুরে আসিয়াছেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর সকালে "প্রেমের ছড়াছড়ি"। ঠাকুর "কালীপদর বক্ষস্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'চৈতন্য হও!' আর চিবুক ধরিয়া তাঁহাকে আদর করিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।'" ('কথামৃত', ৪।৩১।১)

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর দেখা যাইত যে, গিরিশ ও কালীপদ তাঁহার ছবির সম্মুখে দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়া থাকিতেন, যেন তাঁহার দর্শনলাভের জন্য আকুলতাপূর্ণ মৌন প্রার্থনা জানাইতেছেন; আর মাঝে মাঝে অশ্রুভারাক্রান্ত-হৃদয়ে বলিতেন, "ঠাকুর, দেখা দাও।" পরে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কালীপদ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে যাতায়াত করিতে থাকেন এবং ক্রমে সেখানকার এক প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠেন। কাঁকুড়গাছির ভক্তেরা তাঁহার স্থূলদেহকে ঘিরিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাহিতেন, আর তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। একবার নবগোপালবাবুর বাড়ির বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত কালীবাবু সেখানে গিয়া কাঁকুড়গাছির কীর্তনিয়াদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় গিরিশচন্দ্র উপস্থিত হইবামাত্র ভক্তগণ উল্লসিত হইয়া খোলে চাঁটি দিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে করতালেও ঘা পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গিরিশ ও কালীপদ নগ্নগাত্রে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভক্তগণ এই নবযুগের 'জগাই-মাধাই'কে ঘিরিয়া নৃত্য ও সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। অমনি নবগোপাল দুই ছড়া প্রসাদী মালা আনিয়া ভক্তদ্বয়ের গলে পরাইয়া দিলেন। তাঁহারা তখন পরস্পরের হাত ধরিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—চক্ষু মুদ্রিত, শরীর অচঞ্চল, আর মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে নির্গত হইতেছে 'রামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ'। তাঁহাদের সে ভক্তিবিহ্বল গাম্ভীর্য কীর্তনিয়াদের মনে অসীম উৎসাহ জাগাইতে লাগিল। কে বলিবে ইঁহারাই একসময়ে কলিকাতার উচ্ছৃঙ্খল সমাজের অগ্রণী ছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণরূপ

পরশপাথর আজ লোহাকেও সোনা করিয়াছে—'জগাই-মাধাই' এখন ভক্তদের কীর্তনের মধ্যমণি।

পরবর্তী জীবনে কালীপদবাবু যখন জন্ ডিকিন্সন্ কোম্পানির কর্মোপলক্ষ্যে বোম্বাই নগরের প্যাখেল রোডে থাকিতেন তখন তীর্থাদি-দর্শনে নিরত ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ প্রায়ই তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন ; অথবা বোম্বাই আসিলে একবার তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, অভেদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী প্রভৃতি তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন।

সাংসারিক জীবনে কালীপদবাবুর সাফল্যের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় ভারতের বহু বড় বড় শহরে কোম্পানির শাখা খোলা হইয়াছিল। বিলাতী কোম্পানি হইলেও কালীবাবুর নির্দেশে এইসকল শাখা-আফিসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি শোভা পাইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন ও কার্যে উন্নতির মূলে ছিল শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তিনি আনন্দধামে গমন করেন।

# রানী রাসমণি

রানী রাসমণির নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারেতিহাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বুদ্ধিমতী এবং ধর্মপ্রাণা রানী সেই প্রারম্ভাবস্থায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিধির বিধানে তিনি ও তাঁহার জামাতা সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ-সৃজনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণপূর্বক যুগপ্রবর্তনকার্যের সহায়করূপে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। রানীর জীবনীর অনুসরণ করিলে স্বতই মনে হয়, সুযোগ-সুবিধা পাইলে বঙ্গললনা যে-কোনও ক্ষেত্রে আপন প্রতিভা ও কার্যক্ষমতা বিকাশ করিয়া দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থা হইতে পারেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রকৃতিগত ধর্মভাব উপযুক্ত আবেষ্টন পাইলে সহজেই শতধা প্রকটিত হইয়া থাকে। রানী ভবানী, রানী স্বর্ণময়ী, রানী হেমন্ত কুমারী প্রভৃতি দানশীলা বঙ্গনারীগণই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী হালিশহরের অদূরে কোনা নামক গ্রামে ১২০০ বঙ্গাব্দের (১৭৯৩ খ্রীঃ) ১১ই আশ্বিন, বুধবার প্রাতঃকালে মাহিষ্যবংশে রানী রাসমণির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস (হারু ঘরামী) এবং মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। রাসমণি দরিদ্রের কন্যা; তাঁহার পিতা গৃহনির্মাণ এবং কৃষিকার্যাদির দ্বারা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যবস্থা করিতেন। স্নেহময়ী জননী কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন 'রানী'; পরে তাহার নাম হয় রাসমণি। অতএব পল্লীবাসীর নিকট তিনি রানী রাসমণি নামে পরিচিতা হন।[১] অবস্থা মন্দ

১ 'দক্ষিণেশ্বর' গ্রন্থে (৭ পৃঃ) আছে—"দানমুগ্ধ জনসাধারণ কর্তৃক রানী নামে অভিহিতা হন", অর্থাৎ 'রানী' নামের প্রয়োগ অনেক পরে হয়। আমরা এখানে 'রানী রাসমণি' গ্রন্থের (২ পৃঃ) অনুসরণ করিতেছি।

রাণী রাসমণি

হইলেও হরেকৃষ্ণ সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন এবং রানীকেও শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে রাত্রে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পঠিত হইত এবং উহা শুনিবার জন্য গ্রামবাসীরা সমবেত হইত। অধিকন্তু কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ দাস-দম্পতি মালা-তিলকাদি ধারণ করিতেন; রানীও নিষ্ঠাসহকারে ঐরূপ করিতে শিখিয়াছিলেন। রানীর মাতা দীর্ঘজীবী ছিলেন না; কন্যা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে তিনি অষ্টাহব্যাপী জ্বরবিকারে ভুগিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

ক্রমে রানীর একাদশ বর্ষ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার বর্ণ গৌর, দেহের গঠন সুন্দর এবং কৃষ্ণকেশদাম দীর্ঘবিলম্বী। এক কথায় তাঁহার রূপ অনুপম না হইলেও তাঁহাকে সুন্দরী বলা চলে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সুলক্ষণা ছিলেন। এই সময়ে জানবাজারে ধনাঢ্য জমিদার শ্রীযুক্ত প্রীতরাম দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হইলে তাঁহার জন্য একটি পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে থাকে। রাজচন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। ঐ সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইলে সঙ্গিগণ কোনার ঘাটে রানীকে দেখিতে পায় এবং রাজচন্দ্রবাবুকেও দূর হইতে তাঁহাকে দেখায়। অতঃপর পুত্রের সম্মতি আছে বুঝিয়া প্রীতরামবাবু হরেকৃষ্ণ দাসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। শীঘ্রই হরেকৃষ্ণের সম্মতি আসিল এবং ১২১১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ শুভ পরিণয় হইয়া গেল। রাসমণি জমিদার-গৃহের বধূরূপে আসিয়া রানী নাম সার্থক করিলেন।

এখানে রানীর শ্বশুরকুলের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রীতরামের আদি গৃহ ছিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঘোষালপুর গ্রামে। তাঁহার পিতৃষ্বসা শ্রীযুক্তা বিন্দুবালা দাসী মান্না বাবুদের কুলবধূ ছিলেন। তখন বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গদেশ বিপর্যস্ত। সে দুর্দিনে গৃহবিচ্যুত প্রীতরাম অপর দুই বয়ঃ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামতনু ও কালীপ্রসাদকে লইয়া কলিকাতায়

আগমনপূর্বক পিতৃষ্বসার গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। অক্রূরচন্দ্র মান্না মহাশয় তখন ডন্‌কিন্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। প্রীতরামের পাঠ সমাপ্ত হইলে মান্নাবাবু তাঁহাকে সাহেবের বেলিয়াঘাটার লবণের কারবারে সামান্য বেতনে মুহুরির কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি তাঁহার সাহায্যে কিছুদিন ঢাকা শহরে চাকরি করেন এবং স্বীয় পারদর্শিতার ফলে নাটোরের রাজার দেওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ কার্য হইতে অবসরগ্রহণান্তে কলিকাতায় আসিয়া তিনি উনিশ হাজার টাকায় মকিমপুর তালুকটি নিলামে ক্রয় করেন এবং অর্জিত অর্থের দ্বারা বেলিয়াঘাটায় দুইটি আড়ত চালাইতে থাকেন—একটিতে বাঁশ ও অপরটিতে মকিমপুর পরগণা হইতে লব্ধ দ্রব্যসমূহ বিক্রয় হইত। অনেকগুলি বাঁশ একত্র বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া একস্থান হইতে অন্যত্র আনা হয়; ইহাকে বাঁশের মাড় বলে। তদনুসারে প্রীতরাম মাড় নামে পরিচিত হন। এই ব্যবসায়ের সহিত তিনি নিলামে দ্রব্য কিনিয়া সাহেবদের নিকট বিক্রয় করা এবং রসদ-যোগানোর কার্যও করিতে থাকেন। এই-সব কাজে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়।

স্বীয় উদ্যমে প্রীতরামের অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছে দেখিয়া শ্রীযুত অক্রূরচন্দ্রের ভ্রাতা যুগলকিশোর মান্না মহাশয় স্বীয় কন্যাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং যৌতুকস্বরূপ ষোল বিঘা জমি দান করিলেন। কালে ইহাতে প্রীতরামের আবাসবাটী নির্মিত হইল। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল—হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র। হরচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। রাজচন্দ্রের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্বশুরালয়ে আসিয়া সৌভাগ্যবতী রানী রাসমণি ধনগর্বে স্ফীত না হইয়া পূর্বেরই ন্যায় সর্বদা নানা গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন; শ্বশ্রূমাতা নিষেধ করিলেও শুনিতেন না। অধিকন্তু পূজাহ্নিকে তাঁহার বিশেষ

আগ্রহ দেখা যাইত এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর পাদোদক পান না করিয়া তিনি আহারে বসিতেন না। এই-সকল কারণে এবং তাঁহার আগমনের পর শ্বশুরবংশের আর্থিক উন্নতি হইতেছে দেখিয়া রানীকে সকলেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। রাজচন্দ্র প্রীতরামেরই ন্যায় কর্মকুশল ছিলেন; অধিকন্তু পরামর্শদাত্রীরূপে বুদ্ধিমতী ভার্যা রানীকে পাইয়া তিনি অধিকাধিক সাফল্যমণ্ডিত হইতে থাকিলেন। অবশেষে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সার্ধ ছয় লক্ষ মুদ্রা ও স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া প্রীতরাম দেহত্যাগ করিলে রাজচন্দ্র একমাত্র উত্তরাধিকারিরূপে সমস্ত কার্যভার স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন।

রাজচন্দ্র স্বীয় অমায়িকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বদান্যতার জন্য তদানীন্তন কলিকাতা-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, অক্রূর দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অধিকন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম অভিজাত অংশীদার জন বেব্ সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এই-সকল সদ্‌গুণের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

রাজচন্দ্র যেমন বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, দানও করিয়াছিলেন তেমনি প্রচুর; আর ইহাতে সহধর্মিণী রাসমণির উৎসাহ পাইয়াছিলেন যথেষ্ট। ইঁহাদের বহু সদনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২৩০ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে যে বন্যা হয়, তাহাতে বহু পরিবার বিপন্ন ও সহায়-সম্বলহীন হওয়ায় রানী তাহাদের পানভোজন ও আশ্রয়াদির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ঐ বৎসরই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রানী চতুর্থী করিবার জন্য গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন যে, ঘাট পঙ্কিল, বন্ধুর ও বিপজ্জনক; পথও তদনুরূপ অব্যবহার্য। অতএব কার্যসমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়া তিনি রাজচন্দ্রবাবুকে ঘাট ও রাস্তা

বাঁধাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কিছুকাল পরে কোম্পানির অনুমতিক্রমে রাজচন্দ্রের অর্থে 'বাবু-ঘাট' (১৮৩০ খ্রীঃ) ও পরে 'বাবুরোড' নির্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত মাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য রাজচন্দ্র আহিরীটোলার গঙ্গায় এক ঘাট প্রস্তুত করেন। নিমতলায় মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদের জন্য গৃহনির্মাণ এবং উহাতে চিকিৎসক ও দ্বারবান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। মেট্‌কাফ হলে গভর্নমেণ্টের পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য তিনি ১০,০০০৲ টাকা দান করেন। বেলিয়াঘাটার খালের জন্য তিনি নিজ জমি গবর্নমেন্টকে দান করেন এবং উহার বিনিময়ে বিনা ব্যয়ে সাধারণের পারাপারের অনুমতিলাভ করেন। তাঁহার অপর কীর্তি সাধারণের জন্য চানকের তালপুকুর-খনন। সত্যবাদিতা ও অঙ্গীকার রক্ষার জন্যও রাজচন্দ্র সুপরিচিত ছিলেন। হুক্ ডেভিড্‌সন্ এণ্ড কোম্পানির মুৎসদ্দী রামরতনবাবু তাঁহার বন্ধু ছিলেন। উক্ত ভদ্রমহোদয়ের অনুরোধে তিনি একবার ঐ কোম্পানির মালিককে এক লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সম্মত হন। পরদিনই প্রকাশ পায় যে, সাহেব দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। রাজচন্দ্র তথাপি পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে ঋণ দিয়াছিলেন।

১২১৩ সালে এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির পদ্মমণি নামে একটি কন্যা জাত হয়। ১২১৮ সালে দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীর, ১২২৩ অব্দে তৃতীয়া কন্যা করুণার এবং ১২৩০ সালে কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার জন্ম হয়। জগদম্বার জন্মের চারিবৎসর পূর্বে রানী একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। এযাবৎ ইঁহারা ৭১ নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের দ্বিতল বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তারপর রাজচন্দ্র বর্তমান বাটী নির্মাণ করেন। সাত মহলে বিভক্ত এই বাটীতে তখন অন্যূন তিন শত ঘর ছিল। ১২২০ সালে আরব্ধ হইয়া উহা ১২২৮ সালে সমাপ্ত হয় এবং উহাতে ব্যয় হয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা। ইহাই 'রানী রাসমণি কুঠি' নামে অভিহিত। এইরূপে

সর্ববিষয়ে সফলকাম এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও রাজচন্দ্র স্বল্পায়ু ছিলেন। ১২৪৩ সালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস রোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ছিল অনুমান ৮০ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই রাজচন্দ্রের স্বোপার্জিত।

এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও রাসমণি স্বামীর মৃত্যুতে শোকে অধীর হইয়া তিন দিবস তিন রাত্রি অনশনে কাটাইলেন। তারপর অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধাদি করাইলেন। যথারীতি ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া গেলে তুলাদণ্ডে উঠিয়া রানী নিজের দেহের পরিমিত ৬০১৭ টাকা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। অবশেষে বিষয়কর্মে মন দিতে হইল। কিন্তু রানী তখনও ব্রহ্মচারিণীরই ন্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে তিনি গৃহদেবতা ৺রঘুনাথজীউকে প্রণাম করিতেন ও তাহার পর স্ফটিকের মালা লইয়া জপে বসিতেন। গলায় তিনি তুলসীর মালা ধারণ করিতেন এবং উহার নিম্নে একগাছি সোনার হার শোভা পাইত। সারাদিন কার্যপরিচালনা ও বিশ্রামাদির পর সন্ধ্যার সময় তিনি আবার দেবার্চনায় বসিতেন। শাস্ত্রব্যাখ্যা, পুরাণাদিপাঠ এবং কথকতা প্রভৃতি শ্রবণেও তাঁহার যথেষ্ট সময় কাটিত।

রাজচন্দ্রের পরলোকগমনের পর অনেকেরই মনে সন্দেহ উঠিল যে, রানী এই অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা। এমন কি, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিন প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু রানী স্বীয় জামাতা মথুরামোহনের দ্বারা বলিয়া দিলেন যে, প্রিন্সের ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তিকে এইরূপ কার্যে নিয়োগ করা অশোভন ; সামান্য যে বিষয়কর্ম আছে তাহা রানীই উপযুক্ত জামাতাদের সাহায্যে চালাইতে পারিবেন। এবংবিধ আত্মবিশ্বাস লইয়াই তিনি কার্যে অগ্রসর হইলেন।

রানীর তিন জামাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণিকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আটা, মধ্যমা কুমারীকে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী এবং তৃতীয়া করুণাময়ীকে শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করা হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে করুণা পরলোকে গমন করিলে মথুরামোহনের সহিত কনিষ্ঠা জগদম্বার বিবাহ দেওয়া হয়। বিশ্বাসী, কর্মকুশল, ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ, প্রতিভাবান ও স্বধর্মনিষ্ঠ মথুরামোহন রানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। রানীর নির্দেশে তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন; প্রয়োজনস্থলে আবশ্যকীয় আদেশপত্র, হিসাব ও দলিলাদিতে রানী স্বাক্ষর করিতেন।

বিষয়-কর্মে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হইলেও রানীর দেবভক্তির কোন ন্যূনতা ছিল না। দৈনিক পূজারাধনা ব্যতীতও তিনি মহাসমারোহে উৎসবাদি করিতেন। সাধারণের রুচি ও রানীর অবস্থানুযায়ী উহাতে রাজসিক ধুমধামের প্রাচুর্য লক্ষিত হইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে তাঁহার নিজস্ব সাত্ত্বিক ভাবের ব্যতিক্রম হইত না। ১২৪৫ বঙ্গাব্দে রথযাত্রার পূর্বে তাঁহার বাসনা জাগিল যে, রৌপ্যময় রথে বসাইয়া দেবতাকে কলিকাতার রাস্তায় ভ্রমণ করাইতে হইবে। রানীর ইচ্ছা-পালনে সর্বদা তৎপর মথুরামোহন অমনি বিখ্যাত জহুরী হ্যামিল্টন কোম্পানিকে কার্যভার দিতে চাহিলেন। কিন্তু রানী বলিলেন যে, দেশী কারিগর থাকিতে বিদেশীকে আহ্বান করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। অতএব দেশী কারিগর ডাকা হইল এবং যথাসময়ে রথ প্রস্তুত হইয়া গেল। অতঃপর আড়ম্বর-সহকারে স্নানযাত্রার দিনে রথ প্রতিষ্ঠা হইল। মোট ব্যয় পড়িল ১,২২, ১১৫৲ টাকা। রথের দিনে রানীর জামাতারা নগ্নপদে রথের পুরোভাগে চলিলেন এবং রানীর দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণও বিবিধ যানে আরোহণপূর্বক রথের পশ্চাতে চলিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে চলিল বিরাট শোভাযাত্রা। দুর্গোৎসবেও তিনি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা খরচ করিতেন এবং ব্রাহ্মণ-বিদায়,

সধবাদিগকে শাঁখা-সিন্দূর ও বস্ত্রাদিদান এবং আহূত ও রবাহূতদিগের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকিত।

এক বৎসর ষষ্ঠীর দিন প্রত্যুষে বাদ্যোদ্যমসহকারে দিগন্ত কম্পিত করিয়া যখন নবপত্রিকা স্নানের জন্য ব্রাহ্মণগণ ভাগীরথীতীরে যাইতেছিলেন, তখন বাবু-রোডের পার্শ্ববর্তী কোন শ্বেতাঙ্গের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া উহা বন্ধ করিতে চাহিলেন। সংবাদ পাইয়া রানীর অনুচরগণ পরদিবস আরও বাদ্যাদির আয়োজন করিল। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে রানীর নিকট নিষেধাজ্ঞা আসিল এবং ক্রমে মকদ্দমা বাধিল। উহাতে রানীর পরাজয় ও ৫০৲ জরিমানা হইল। তিনি জরিমানা দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরান কাঠের দ্বারা জানবাজার হইতে বাবুঘাট পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটি বন্ধ করিয়া দিলেন। সরকার হইতে আপত্তি আসিলে তিনি জানাইলেন, উহা তাঁহার খাসের জমি—ইহার ব্যবস্থা তিনি ইচ্ছানুরূপ করিতে পারেন। অবশেষে সরকারের অনুরোধে রাস্তা খোলা হইল এবং জরিমানার টাকাও ফেরত দেওয়া হইল।

রানী রাসমণির বাড়িতে দোল ও রাসোৎসবেও প্রচুর ব্যয় হইত। গৃহদেবতা ৺রঘুনাথজীউকে কেন্দ্র করিয়া সে-সব দিনে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা আনন্দে মত্ত হইতেন। ব্রাহ্মণভোজনাদিতেও অজস্র ব্যয় হইত। এতদ্ব্যতীত বাসন্তী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা ও কার্তিকপূজা প্রভৃতিও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত।

১২৫৭ বঙ্গাব্দে রানী নৌকারোহণে পুরুষোত্তমদর্শনে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গার মোহনায় তাঁহার নৌকা অপর নৌকাগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন ও ঝড়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তিনি তীরবর্তী এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করেন এবং যাইবার সময়ে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনার্থে ব্রাহ্মণকে ১০০৲ টাকা দান করেন। জগন্নাথক্ষেত্রাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া

রানী দেখিতে পান যে, সুবর্ণরেখার পরপার হইতে পথ প্রায় অব্যবহার্য। এই হেতু তিনি নিজব্যয়ে সুবর্ণরেখা হইতে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া তিনি ৺জগন্নাথ, ৺বলরাম ও ৺সুভদ্রার জন্য ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে তিনটি হীরক-খচিত মুকুট দান করেন। অধিকন্তু পাণ্ডাদিগকেও প্রচুর অর্থ দিয়া আপ্যায়িত করেন।

পর বৎসর তিনি সাগরসঙ্গমে স্নান করিতে যান। সেই বৎসরই ত্রিবেণীস্নান এবং নবদ্বীপদর্শন করেন। ফিরিবার পথে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং দ্বাদশ সহস্র মুদ্রাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করেন। রানীর সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইয়াছিল। ইতোমধ্যে তিনি একবার স্বীয় জন্মভূমি কোনা গ্রাম দেখিয়া আসেন এবং মিষ্ট আলাপ ও অর্থাদিদানে দরিদ্র পল্লীবাসীদিগকে তৃপ্ত করেন। তাঁহার পিত্রালয়ের নিকটে গঙ্গার ঘাট ছিল না। তাই গ্রামবাসীর অনুরোধে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে তথায় ঘাট নির্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত রানীর অর্থে হুগলীতে একটি এবং বাবুগঞ্জে আর একটি ঘাট প্রস্তুত হয়।

কোনা গ্রাম হইতে তিনি বংশবাটীতে ৺হংসেশ্বরীদর্শনে যান এবং রাজা নৃসিংহদেবের স্ত্রী রানী শঙ্করীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, তিনি বংশবাটীর ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দক্ষিণা দিবেন। কিন্তু রানী শঙ্করী বলেন যে, রাসমণি সেখানে দান করিলে শঙ্করীর দানের স্থান থাকিবে না। অগত্যা রাসমণি ঐ কার্যে বিরত হন। ইহার পরে রানী রাসমণি দ্বিতীয়বার নবদ্বীপদর্শন ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে দানের জন্য সাত দিনে ২০ হাজার টাকা খরচ করেন। এই দীর্ঘ চারিবৎসরব্যাপী তীর্থদর্শনাদিতে তাঁহার মোট প্রায় চারি-পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রানীর অন্যতম কীর্তি গঙ্গার জলকর বন্ধ করা। গভর্ণমেণ্ট একসময়ে গঙ্গায় মৎস্য ধরার জন্য কর নির্ধারিত করিলে ধীবরগণ অনন্যোপায় হইয়া রাসমণির নিকট উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি দশ

হাজার টাকা দিয়া ঘুস্থড়ি হইতে মেটিয়াবুরুজের সীমা পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা লইলেন এবং রজ্জু ও বংশদণ্ডসহায়ে (‘লীলাপ্রসঙ্গ’-মতে গঙ্গাকে শৃঙ্খলিতা করিয়া) জাহাজ ও নৌকাদির চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। সরকার আপত্তি জানাইলে রানী বলিলেন যে, নদীতে বাষ্পীয় পোত চলিলে মৎস্য অন্যত্র পলাইয়া যাইবে এবং তাঁহার ও মৎস্যজীবীদের ক্ষতি হইবে; এই কারণে সরকার হইতে লব্ধ অধিকারসূত্রে তিনি তাহা বন্ধ করিয়াছেন। অবশেষে সরকার রানীকে তাঁহার টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন এবং জলকর তুলিয়া দিলেন; গঙ্গাও শৃঙ্খলবিমুক্ত হইলেন। বিজয়িনী রানীর সংবর্ধনার্থে বাঙ্গালী গান গাহিল—

ধন্য রানী রাসমণি রমণীর মণি।
বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি॥
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে জননী।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্য বাঁচালে পরাণী॥

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রানীর দূরদৃষ্টি বিশেষ পরীক্ষিত হইয়াছিল। পরামর্শদাতৃগণ তাঁহাকে টলটলায়মান ইংরেজ সরকারের কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বলিলেও তিনি তাহা করেন নাই; অধিকন্তু গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অনেক গোরা সৈন্য ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে থাকিত এবং পথচারী ও প্রতিবেশীদের উপর অত্যাচার করিত। একদিন ঐরূপ অত্যাচারী গোরাদের কয়েকজনকে দ্বারবানগণ প্রহার করে। ইহার প্রতিশোধ কল্পে গোরারা দলবদ্ধ হইয়া রাসমণির বাটী আক্রমণপূর্বক দ্রব্যাদি ভঙ্গ ও গৃহপালিত পশুপক্ষীকে হত্যা করিতে থাকিলে প্রাণভয়ে ও রানীর পরামর্শে সকলে পলাইয়া যান; শুধু রানী খড়্গহস্তে ৺রঘুনাথজীউর মন্দির-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া অসীম সাহস ও দেবভক্তি প্রদর্শন করেন। সৌভাগ্যক্রমে গোরারা সেদিকে যায় নাই। ইহার পর পল্টনের উর্ধ্বতন কর্মচারীরা গোরাদের এই তাণ্ডবলীলা

বন্ধ করেন এবং রানীর বাড়িতে গোরা সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত হয়।

রানী তাঁহার জমিদারির প্রজাদিগকে অপত্যনির্বিশেষে পালন করিতেন। মকিমপুর পরগণার জনৈক নীলকর সাহেব উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে রানীর হস্তক্ষেপের ফলে উহা অচিরে নিবারিত হয়। জগন্নাথপুর তালুকের প্রজাদের উপর পার্শ্ববর্তী অপর জমিদারের অত্যাচার হইতে থাকিলে কাছারীর কর্মচারী পাল্টা আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হন। সংবাদ পাইয়া রানী বলিয়া পাঠান যে, প্রজাদিগকে রক্ষা করাই কর্মচারীর কর্তব্য; আক্রমণ যেন করা না হয়। যাহা হউক, আয়োজন দেখিয়াই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ নিরস্ত হওয়ায় এই অপ্রিয় ব্যাপার অধিকদূর গড়ায় নাই। বস্তুতঃ এপ্রকার বলপ্রয়োগাদির ক্ষেত্রে রানী আনন্দ পাইতেন না; তাঁহার মাতৃহৃদয় গঠনকার্যেই তৃপ্তিলাভ করিত। তাই দেখিতে পাই যে, তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে 'টোনার খাল' খনন করাইয়া মধুমতী নদীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগসাধন করেন এবং সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাটে ঘাট-নির্মাণ করিয়া তিনি প্রভূত যশের অধিকারিণী হন।

রানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরস্থাপন। ইহাই তাঁহাকে বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া করিয়াছে। এই বিষয়ক ঘটনাবলীর সম্বন্ধে কিঞ্চিত মতভেদ আছে। আমরা প্রধানতঃ 'লীলাপ্রসঙ্গো'ক্ত বিবরণেরই অনুসরণ করিব।

১২৫৪ বঙ্গাব্দে রানীর ৺বিশ্বেশ্বরদর্শনের অভিলাষ হইল। তখনও রেলপথ সর্বত্র প্রসারিত হয় নাই; অতএব রানীর দাস-দাসী, খাদ্যসম্ভার এবং আত্মীয়-স্বজনকে জলপথে কাশীধামে লইয়া যাইবার জন্য পঁচিশখানি বজরা প্রস্তুত হইল। অশেষগুণশালিনী রানীর শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে অসীম ভক্তি ছিল। "জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত

করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—'কালীপদ-অভিলাষিণী রানী রাসমণি' ('লীলাপ্রসঙ্গ')। কাশীধামে গমনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে যাত্রার পূর্বরাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেবীর প্রত্যাদেশ পাইলেন,[১] "কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথী-তীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্যপূজা গ্রহণ করিব" (ঐ)। এই দৈবনির্দেশলাভান্তে রানী সংগৃহীত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বলিলেন এবং তীর্থযাত্রার জন্য সঞ্চিত অর্থ ভূমিক্রয় ও মন্দিরনির্মাণের ব্যয় করিতে আদেশ দিলেন। 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী-সমতুল'—এই প্রবাদবাক্য-স্মরণে মথুরানাথ প্রথমে পশ্চিম তীরেই জমির অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার পূবতীরবর্তী সরকারী বারুদখানার দক্ষিণে ষাট বিঘা ভূমি ও তাহাতে অবস্থিত একটি কুঠি পঞ্চান্ন হাজার টাকায় ক্রয় করিলেন। স্থানটি হেস্টি নামক কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের একজন এটর্নীর ছিল। উহা দেখিতে কূর্মপৃষ্ঠ; উহার একাংশে কুঠির এবং অপরাংশে মুসলমানদের কবরডাঙ্গা ও গাজী সাহেবের দরগা ছিল। শক্তিপীঠস্থাপনের পক্ষে এইরূপ কূর্মপৃষ্ঠ শ্মশান অতি প্রশস্ত। ভূমিসংগ্রহান্তে প্রথমে গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাট প্রস্তুত হয়; কিন্তু প্রবল বানের আঘাতে উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাওয়ায় মেকিন্টশ কোম্পানিকে উহা পুনর্নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। অতঃপর মন্দিরাদির কার্য আরম্ভ হইয়া ১২৬১ বঙ্গাব্দে (১৮৫৪ ইং) প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু রানীর ভয় হইল যে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা শীঘ্র সমাপ্ত না হইলে তাঁহার জীবনকালে উহা নাও হইতে পারে। অধিকন্তু

১ "কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া রানী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নৌকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন (ঐ)।"

দেবীমূর্তি নির্মাণের পর ভগ্ন হইবার ভয়ে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ; এই সময়ে ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠিল এবং দেবী স্বপ্নে রানীকে বলিলেন, "আমাকে আর কত দিন ঐভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি। আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে ; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।" কিন্তু নিকটে কোনও সুদিন ছিল না ; অতএব ১৮৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে বৃহস্পতিবার) প্রতিষ্ঠার দিন অবধারিত হইল। কিন্তু ইহার পূর্বের একটি ঘটনার ফলস্বরূপে ক্রমে যথাসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইল।

রানীর বাসনা ছিল যে, মন্দিরে দেবীর অন্নভোগ হইবে ; অথচ সামাজিক প্রথানুসারে উক্ত মন্দিরে কোন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পূজারী-পদে ব্রতী হইতে চাহিলেন না। রানী এই বিষয়ে প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমার বিধান দিলেন, "রানী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ঐ মন্দিরে প্রসাদগ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না" (ঐ)। তদনুসারে রানী নিজের গুরুর নামে দেবালয় অর্পণান্তে অন্য উপযুক্ত পূজকের অভাবে শ্রীযুক্ত রামকুমারকেই দেবীর পূজকপদে বরণ করিলেন।

নির্দিষ্ট স্নানযাত্রার দিনে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস আনন্দমুখরিত হইতে লাগিল। রানী অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দূরদেশাগত ব্রাহ্মণ ও অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত করিলেন। "দেবালয়-নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রানী প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,০০০৲ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের

নিকট হইতে দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগণা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন" ( ঐ )।

রানীর ঐ সময়ের সাত্ত্বিকভাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'লীলা-প্রসঙ্গ'কার লিখিয়াছেন, "দেবীমূর্তিনির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রানী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্নভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপপূজাদি করিতেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে ভ্রাতার অনুরোধসত্ত্বেও কালীবাড়িতে বাস ও অন্নপ্রসাদগ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু দৈববিধানে পরে উহাতে স্বীকৃত হন; অধিকন্তু মথুরানাথের বিশেষ অনুরোধে দেবীর পূজকপদেও ব্রতী হন। এই সূত্রে রানীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে এবং উভয়ে পরস্পরের গুণগ্রামে মুগ্ধ হন। ইহার পর ১২৬২ সালের ভাদ্র মাসে নন্দোৎসবের দিনে ৺গোবিন্দজীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় পূজক ক্ষেত্রনাথ ভূপতিত হইলেন এবং বিগ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সমস্যা দাঁড়াইল, নূতন মূর্তি গড়াইতে হইবে অথবা ভগ্নপদের সংস্কার করিলেই চলিবে! রাসমণির আহ্বানে পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া বিধান দিলেন যে ভগ্নমূর্তি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত এবং তৎস্থলে নূতন বিগ্রহ নির্মিত হওয়া উচিত। তদনুসারে নূতনমূর্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু সভাভঙ্গ হইলে মথুরবাবু রানীমাতাকে বলিলেন, "ছোট ভট্চাজকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা তো হয়নি! তিনি কি বলেন জানতে হবে।" মথুরানাথ পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবৎপ্রেমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলিলেন, "রানীর জামাইদের কেউ যদি প'ড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে এনে তার জায়গায় বসানো হ'ত, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ত? এখানেও সেইরকম করা হোক— মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা করা হচ্ছে তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ

করতে হবে কিসের জন্য ?" রানী এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিগঠনে অভিজ্ঞ জানিয়া জামাতা মথুরানাথের পরামর্শে তাঁহাকেই সংস্কারের ভার দিলেন। নিপুণহস্তে সংস্কারকার্য এমন সুসম্পন্ন হইল যে, পরীক্ষা করিয়াও ভগ্ন স্থান ধরিতে পারা যাইত না। অতঃপর ক্ষেত্রনাথ কার্যচ্যুত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে ৺রাধাগোবিন্দ-মন্দিরের পূজাভার গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময়ে বিভিন্ন কালে ৺কালীমন্দিরেও শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-সব বিবিধ ভাবের পূজা চলিতেছিল মন্দিরের কর্মচারিগণ তাহাকে অনাচার-আখ্যা দিলেও গুণগ্রাহী, বুদ্ধিমান মথুরানাথের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, এই পূজারীর ঐকান্তিক ভক্তির ফলে দেবী জাগ্রতা হইবেন এবং রানীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। রাসমণি পূর্বেই ঠাকুরের মুখে ভক্তিমাখা সঙ্গীত-শ্রবণে পুলকিত হইয়াছিলেন। এই গানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা, তারা কি তোর এমনি কারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল এমনি করে॥

সম্প্রতি শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের সংস্কারের পূর্বে ঠাকুরের ভাবাবেশ ও ভক্তিপূত সিদ্ধান্তের পরিচয়লাভে সে প্রীতি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। তথাপি অল্পকাল পরে যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, রানীর নিজমনে সাধনাসম্ভূত অতি উচ্চ ভক্তিভাব না থাকিলে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সেদিন ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। রানী সেদিন "মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিবার কালে তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্মসম্পর্কীয় একটি মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন ঐ স্থানে বসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট

ঠাকুর তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া 'এখানেও ঐ চিন্তা' বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাতপূর্বক ঐ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষা-প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্রী সাধিকা রানী উহাতে নিজমনের দুর্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল" ('লীলাপ্রসঙ্গ')। এদিকে রানীর উপর প্রহার হইতে দেখিয়া মন্দিরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; এমন কি, ভট্টাচার্য মহাশয়কে শাস্তি দিবার জন্য কর্মচারীরা শশব্যস্তে তথায় সমবেত হইল। কিন্তু রানী গম্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন, "ভট্টাচার্য মশায়ের কোন দোষ নেই; তোমরা তাকে কেউ কিছু ব'লো না।" মথুরবাবুও সমস্ত শুনিয়া শ্বশ্রূঠাকুরানীর আদেশই বহাল রাখিলেন।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার (১৮৫৫, মে) পর রানী রাসমণি দীর্ঘকাল ইহধামে ছিলেন না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। তখনও দক্ষিণেশ্বরের জন্য ক্রীত দিনাজপুরের জমিদারি দেবোত্তর করা হয় নাই। এখন উহা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে তখন কেবল শ্রীমতি পদ্মমণি ও শ্রীমতি জগদম্বা বাঁচিয়া ছিলেন। ভবিষ্যতে সম্পত্তির অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য রোগশয্যা-শায়িতা রানী উভয় কন্যাকে দেবোত্তর করিবার সম্মতিযুক্ত একখানি ভিন্ন একরারনামা লিখিয়া দিতে বলিলেন। জগদম্বা উহাতে সম্মতা হইলেও পদ্মমণি সহি দিলেন না। তাই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রানী শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অগত্যা ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি দেবোত্তর-দানপত্রে সহি করিলেন এবং ঐ কার্য সমাধা করিবার পরদিন (মঙ্গলবার) রাত্রিকালে শরীরত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

"শরীরত্যাগের কিছু পূর্বে রানী রাসমণি কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে

গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা রহিয়াছে দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ওসব রোশনাই আর ভাল লাগছে না; এখন আমার মা আসছেন! তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে।' কিছুক্ষণ পরে 'মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে, মা!' ···কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রানী শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে" ( ঐ )।

এইরূপ ভক্তিমতী নারীর জীবনীর পূর্ণ তাৎপর্য লৌকিক দৃষ্টিতে নির্ণয় করা অসম্ভব; ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ধারণায় আনিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরই অনুধ্যান করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "রানী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজাপ্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন। ···রানীর প্রতিকার্যেই জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।"

গোপালের মা

# গোপালের মা

আনুমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্তা অঘোরমণি দেবী কলিকাতা মহানগরীর প্রায় সাত মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তী কামারহাটী গ্রামে ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য (ঘোষাল) মহাশয়ের দরিদ্রগৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। নয় বৎসর বয়সে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত পাইগহাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। সেই একবার মাত্র স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর পিতৃগৃহে অবস্থানকালেই তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিধবা হন। বালবিধবা অঘোরমণি পিতামাতার জীবদ্দশায় মস্তক মুণ্ডিত করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহার পর পূর্ণ বৈধব্যের বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহ ছিল কিঞ্চিৎ খর্ব, সুস্থ ও সুগঠিত; বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সর্বশরীরে ছিল পবিত্রতার এক অলৌকিক আভা। শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসরের বড় ছিলেন এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পরেও প্রায় বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

কামারহাটীতে অঘোরমণির পিতৃগৃহের নিকটেই কলিকাতার পটলডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাটী ছিল। দত্ত মহাশয় কামারহাটীতে গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাসমারোহে সেবাপূজাদি চালাইতে থাকেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় যখন পূজার ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা ঘটে, তখন দত্তগৃহিণী ঠাকুর-বাটীতে অবস্থানপূর্বক পূজাদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা হন। ধর্মপ্রাণা গৃহিণী কঠোরব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানপূর্বক ভূমিতে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, একসন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, উপবাস ও শ্রীবিগ্রহের পূজা ইত্যাদি লইয়া থাকিতেন। ঐ সময়ে দত্তবংশের পুরোহিতকুলের শ্রীনীলমাধব ভট্টাচার্য-ঐ মন্দিরের পূজক ছিলেন; তিনি অঘোরমণির ভ্রাতা। ঐ সূত্রে

এবং স্বভাবগত ও আচারগত সাদৃশ্যবশতঃ দত্তগৃহিণী ও অঘোরমণির মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্যের উদয় হয়। অঘোরমণি শ্বশুরকুলের গুরুদেবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দত্তগৃহিণীর ঠাকুরবাড়িতেই আসিয়া মেয়েমহলের একটি ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। পিত্রালয়ে মাত্র দিনে দুই-একবার যাইতেন।

দত্তদের ঠাকুরবাটীর দক্ষিণপ্রান্তে যে কক্ষে বালতপস্বিনী অঘোরমণি বাস করিতেন উহার দক্ষিণের তিনটি জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গা দর্শন হইত। উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দরজা ছিল। ঐ ঘরে তিনি দিবারাত্র জপে মগ্ন থাকিতেন। জপের সময় কেহ কাছে থাকে, ইহা তাঁহার মনঃপূত ছিল না; কাজেই ঐ ঘরে আর কেহ থাকিতে পাইত না। তিনি খুব আচারী ছিলেন। নিত্য দুই বেলা স্নান করিতেন—সকালে গঙ্গায়, বিকালে পুষ্করিণীতে। গঙ্গাস্নানান্তে তটবর্তী বিল্বমূলে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতেন; বিকালে ৺রাধাকৃষ্ণের দালানে বসিয়া জপাদি করিতেন। আম্রবৃক্ষের বিপরীত দিকে তাঁহার যে রন্ধনশালা ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। তথায় স্বহস্তে রন্ধনান্তে কদলীপত্রে গোপালের ভোগ সাজাইয়া সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন পাতিয়া ও ক্ষুদ্র পানপাত্রে গঙ্গাজল রাখিয়া দেবতাকে আহ্বানপূর্বক আহার করাইতেন; পরে স্বয়ং প্রসাদ পাইতেন। আলু-উচ্ছে ও মুগের ডাল ভাতে ছিল তাঁহার প্রায় নিত্যকার আহার। রাত্রে জলখাবার ছিল মাত্র বাগানের নারিকেলে প্রস্তুত নাড়ু ও একটু দুধ। বাগানে শুষ্ক পত্র ও ভগ্ন শাখাদি কুড়াইয়া তিনি রন্ধন করিতেন। শ্বশুরকুল হইতে লব্ধ ধানজমি ও স্ত্রীধনাদি বিক্রয় করিয়া যে পাঁচ-সাত শত টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা দত্তগৃহিণীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যে সামান্য আয় হইত, উহা দ্বারাই ব্যয়সংকুলান করিতেন। ছয় মাসের মসলা, চাল-ডাল ইত্যাদি দ্রব্য কয়েকটি হাঁড়ির মধ্যে মেজেতেই থাকিত। তরিতরকারি

কামারহাটীর কলের ধারে হপ্তার বাজার হইতে কিনিতেন। কুলা, শিল-নোড়া ইত্যাদি সব একই ঘরে থাকিত। একটি শিকায় মুড়ি, বাতাসা, নারিকেল নাড়ু প্রভৃতি আহার্য থাকিত। একটি তোরঙ্গে সামান্য বস্ত্রাদিও রক্ষিত ছিল। দাঁত শেষ পর্যন্ত দুই-চারিটি ছিল—গুল দিয়া দাঁত মাজিতেন। আহারের পর জোয়ান, ধনের চাল ইত্যাদি কিঞ্চিৎ মুখে দিতেন। পান নিজে না খাইলেও গোপালকে ভোগ দিতেন, অথবা কেহ ছেঁচিয়া দিলে একটু-আধটু প্রসাদ পাইতেন।

দত্তগৃহিণীর সহিত প্রীতি এবং নিজ স্বাভাবিক ভক্তির প্রেরণায় ৺রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে কিঞ্চিত কার্যও তিনি করিতেন; এতদ্ব্যতীত গৃহিণীর সহিত বসিয়া ভোগের জন্য তরকারিও কুটিতেন। তুষ্ণীভাবে একান্তে বাস করাই ছিল তাঁহার রীতি। রাত্রি দুইটায় উঠিয়া শৌচাদি-সমাপনান্তে তিনটা হইতে সকাল আটটা পর্যন্ত তিনি জপে মগ্ন থাকিতেন। পরে মন্দির পরিষ্কার করা, বাসন-মাজা, ফুল-তোলা, মালা-গাঁথা, চন্দন-বাটা ইত্যাদিতে কিছুকাল ব্যয়িত করিয়া শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদির পর স্বপাক আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেন। অতঃপর আবার জপারাধনায় বসিতেন। সন্ধ্যাসমাগমে মন্দিরে আরাত্রিকদর্শনানন্তর আবার সাধনা চলিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে প্রায় ত্রিশ বৎসর ঐরূপে এই ক্ষুদ্র কক্ষেই সাধনার একটানা স্রোত চলিয়াছিল। সম্ভবতঃ একবারমাত্র তিনি এই তপস্যা ভঙ্গ করিয়া দত্তগৃহিণীর সহিত রেলযোগে কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন ও প্রয়াগাদি কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পড়িতে পারিতেন কিনা বলা কঠিন। তবে কামারহাটী ত্যাগের পর তাঁহার গৃহে চশমা সহ গৈরিকবস্ত্রাবৃত একখানি কাশীদাসী মহাভারত, একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একখানি গীতা এবং রামচন্দ্র দত্তের দেওয়া একখানি সঙ্গীত-পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল।

অঘোরমণি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভদিনে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম তখন সুবিদিত। দত্তগৃহিণী সেই নামশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া সে দিবস তাঁহার দর্শনার্থে অঘোরমণির সহিত নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগকে সাদরে নিজের ঘরে বসাইলেন এবং ভক্তিতত্ত্বের অনেক উপদেশ দিয়া ও ভজন শুনাইয়া পুনর্বার আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। দত্তগৃহিণীও তাঁহাকে একদিন কামারহাটীর ঠাকুরবাড়িতে যাইবার জন্য সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইলেন। ঠাকুর উহা গ্রহণ করিলেন এবং পরে একদিন তথায় গমনপূর্বক শ্রীবিগ্রহের জীবন্ত প্রকাশের সম্মুখে সংকীর্তন ও নৃত্যাদি করিলেন এবং প্রসাদগ্রহনান্তে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া 'আসিলেন।

ইতোমধ্যে অঘোরমণির জীবনে এক মহা পরিবর্তনের পূর্বাভাস দৃষ্ট হইল। প্রথম দর্শনের দিনেই ঠাকুরের প্রতি তিনি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিলেন; মনে হইল "ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধুভক্ত এবং ইঁহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব।" অতএব অল্পদিন পরেই জপ করিতে করিতে অঘোরমণির প্রাণের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গমনের অভিলাষ উদিত হওয়ামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া তিনি একাকিনী পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইলেন। অমনি ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ? আমার জন্য কি এনেছ দাও।" অঘোরমণি তো ভাবিয়া অজ্ঞান, "কেমন করে সে 'রোঘো' (খারাপ) সন্দেশ বার করি? এঁকে কত লোক কত ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে—আবার তাও ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!" সলজ্জভাবে সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলে ঠাকুর উহা সানন্দে খাইতে খাইতে বলিলেন, "তুমি পয়সা খরচ ক'রে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয় যা তুমি নিজের হাতে

রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চরি, আলুবেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-খাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।” ধর্মকর্মের কথা না হইয়া এইরূপে কেবল খাবার কথাই হইতেছে দেখিয়া অঘোরমণি ভাবিলেন, “ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাই খাই! আমি গরীব কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক্, আর আসব না।” কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে দেখেন, মন কিছুতেই দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের বহির্দ্বার অতিক্রম করিতে চায় না; অনেক বলপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে কামারহাটীতে লইয়া আসিতে হইল। ইহারই কয়েকদিন পর কামারহাটীতে ব্রাহ্মণী চচ্চরি রান্না করিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উহা চাহিয়া খাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, “আহা, কি রান্না! যেন সুধা, সুধা!” সে আনন্দে ব্রাহ্মণীর চক্ষে জল আসিল—ভাবিলেন, তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন। তিন-চারি মাস এইরূপেই ঘন ঘন যাতায়াত চলিতে লাগিল—আর সেই খাই খাই! কেবল “এটা এনো, ওটা এনো”—ইত্যাদির জ্বালায় অস্থির হইয়া বৃদ্ধা ভাবেন, “গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হ’ল? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আসব না!” কিন্তু সে কি বিষম আকর্ষণ—দূরে গেলেই আবার টানিয়া আনে!

ক্রমে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত আসিয়া পড়িল। রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়া জপসমাপনান্তে ব্রাহ্মণী জপসমর্পণের পূর্বে প্রাণায়াম আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বামে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি মুষ্টিবদ্ধপ্রায় আর মুখে মৃদু হাস্য—ঠিক যেমন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়াছেন তেমনি। ভাবিলেন, “একি! এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন ক’রে এলেন?” অবাক্ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেমন সাহস করিয়া স্বীয় বাম হস্তে ঠাকুরের বাম হস্তটি ধরিলেন, অমনি সে মূর্তি

অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকার গোপাল। সে হামা দিয়া এক হাত তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "মা, ননী দাও।" ব্রাহ্মণী তো দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত—এ কি কাণ্ড! তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা?" সে অদ্ভুত গোপালের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই—সে খাইবেই। তখন শিকা হইতে নারিকেল নাড়ু দিয়া বলিলেন, "বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম ব'লে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।" জপ সেদিন আর হইল না—চলিতে লাগিল গোপালের অপূর্ব লীলা! সে ক্রোড়ে বসে, মালা কাড়িয়া লয়, স্কন্ধে বসে, ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়! যেমন সকাল হইল অমনি গোপালের মা পাগলিনীর ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন; গোপালকে বুকে লইয়া চলিতে চলিতে দেখিতে লাগিলেন, গোপালের লাল টুকটুকে পা-দুখানি বুকের উপর ঝুলিতেছে।

সকাল প্রায় সাতটার সময় আলুথালু বেশে 'গোপাল, গোপাল' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গোপালের মা ঠাকুরের কক্ষে পূর্বদিকের দ্বারপথে ঢুকিলেন। তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, আঁচল ভূমিতে লুটাইতেছে—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়া ঠাকুরের পার্শ্বে বসিলেন, ভাবাবিষ্ট ঠাকুরও তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। সাশ্রুনয়নে গোপালের মা নিজের সহিত আনীত ক্ষীর, সর, ননী গোপালরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব-সংবরণ করিয়া ঠাকুর আপনার চৌকিতে বসিলেন। গোপালের মার কিন্তু ভাব আর থামে না—সারাক্ষণ তিনি নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে শিব"—ইত্যাদি। এই দেবদুর্লভ দৃশ্যে মুগ্ধা গৃহসম্মার্জনরতা অপর ভক্তমহিলা ভাবিতে লাগিলেন —যে ঠাকুর স্ত্রীজাতির স্পর্শমাত্র সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার আজ এ

কীদৃশ আচরণ! একদিকে দ্বিষষ্টিবর্ষাতীতা বৃদ্ধার অনুপম মাতৃস্নেহ, অপরদিকে অষ্টচত্বারিংশৎ বয়স্ক প্রৌঢ়ের গোপালভাব! শোনা যায় বটে যে, যশোদাভাবে আত্মহারা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ক্রোড় কখন কখন তাঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইত; কিন্তু উহা অতীতের শোনা কথা আর ইহা প্রত্যক্ষ! ভাবসংবরণান্তে গোপালের মার সে-আনন্দ দেখিয়া উপস্থিত অপর মহিলাটিকে ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "দেখ দেখ, আনন্দে ভরে গেছে—ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে!" ভাবের আধিক্যে অঘোরমণি সেদিন ঠাকুরকে কত কথাই না বলিতে লাগিলেন, "এই যে গোপাল আমার কোলে, ঐ যে তোমার ভেতর ঢুকে গেল; ঐ আবার বেরিয়ে এল: আয় বাবা, দুঃখিনী মার কাছে আয়"—ইত্যাদি। গোপাল এইরূপে কখন ঠাকুরের সহিত মিশিয়া এবং কখন বাল্যলীলার তরঙ্গ তুলিয়া একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকেই গোপালরূপে প্রত্যক্ষ করাইল, অপরদিকে তেমনি গোপালের মাকে আত্মহারা করিল। অঘোরমণি আজ হইতে বাস্তবিকই গোপালের মা হইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবপ্রশমনের জন্য ঠাকুর সেদিন বহু প্রকারে যত্ন করিতে লাগিলেন—তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন, তাঁহাকে ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী খাওয়াইলেন এবং সমস্ত দিন নিকটে রাখিয়া স্নানাহার করাইলেন। খাইতে খাইতে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন, "বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ-জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতা করে বেচে দিন কাটিয়েছে—তাই বুঝি এত যত্ন আজ করছ?"

সন্ধ্যায় ঠাকুর যখন গোপালের মাকে বিদায় দিয়া কামারহাটী পাঠাইলেন, তখন গোপালও ক্রোড়ে উঠিয়া চলিল এবং গৃহে পৌঁছিয়া নানা রঙ্গ, আবদার ইত্যাদিতে মায়ের জপভঙ্গ করিতে লাগিল। অবশেষে গোপালের মা জপ ছাড়িয়া তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইলেন।

তক্তাপোশের উপর মাদুর পাতা—নরম বিছানা বা বালিশ তাঁহার নাই—তাই গোপাল খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। অগত্যা ব্রাহ্মণী স্বীয় বাম বাহুতে তাহার মস্তক রাখিয়া বলিলেন, "বাবা, আজ এই রকমে শোও, রাত পোহালেই কাল কলকাতা গিয়ে তোমায় নরম বালিশ করিয়ে দেব।" পরদিন সকালে প্রত্যক্ষ গোপালের রান্নার জন্য বাগান হইতে কাঠ কুড়াইতে গেলে গোপালও সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কাঠ আনিয়া রান্নাঘরে রাখিতে লাগিল। রন্ধনকালেও দুরন্ত শিশু কাছে বসিয়া বা পিঠে পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল ও আবদার করিতে থাকিল। ব্রাহ্মণী তাহাকে কখনও মিষ্ট কথায় ভুলাইতে লাগিলেন, কখনও বা বকিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত আলাপনান্তে নহবতে জপে বসিলেন। জপশেষে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, এমন সময় পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুর তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখনও এত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েছে।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?" ঠাকুর—"সব হয়েছে।" গোপালের মা—"সব হয়েছে?" ঠাকুর—"হাঁ, সব হয়েছে।" গোপালের মা—"বল কি? সব হয়েছে?" ঠাকুর—"হাঁ, তোমার আপনার জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে। তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাকবে ব'লে ইচ্ছা হয়তো করতে পার।" গোপালের মা—"তবে এখন থেকে যা কিছু করব সব তোমার, তোমার, তোমার।" ইহার পরে তিনি মালার থলি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক দিন পরে ভাবিলেন, "একটা কিছু তো করতে হবে, চব্বিশ ঘন্টা করি কি?" অতএব গোপালের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণে মালা ফিরাইতে লাগিলেন।[১]

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণও যে আপনাকে গোপাল মনে করিতেন এবং অঘোরমণির ভিতরে অধিষ্ঠিত গোপাল খাইলেই তাঁহার খাওয়া হইত, এই বিষয়ে একটি ঘটনা যোগানন্দ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ('লীলাপ্রসঙ্গ'—গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ৩০২-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অঘোরমণি বালবিধবা ছিলেন বলিয়া অত্যধিক আচারনিষ্ঠা পালন করিতেন। প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট আগমনকালে একদিন তিনি যখন রন্ধনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের পাতে বোকনা হইতে ভাত পরিবেশন কবিতেছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতর্কিতে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সেদিন আর খাওয়া হইল না। তিনি যেদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রন্ধন করিয়া খাইতেন, সেদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য ঝোল-ভাত রান্নার পর গোবর গঙ্গাজল প্রভৃতির দ্বারা উনুন পাড়িয়া দিতেন ; তবে ব্রাহ্মণীর বোকনা চাপিত। কিন্তু গোপালের সাক্ষাৎকারের পরে সেই মহাভাবতরঙ্গে নিষ্ঠাদিও কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোপাল যখন যাহা চায় তখনই খাইতে দিতে হয় ; আবার খাইতে খাইতে সে মায়ের মুখে গুঁজিয়া দেয়। তাহা ফেলা চলে না—ফেলিলে গোপাল কাঁদে। ব্রাহ্মণী মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণেরই লীলা। ইহার পর এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ায় তাঁহার আহারাদি সম্বন্ধে আর আপত্তি রহিল না।

একদিন ব্রাহ্মণী এক পয়সার বাতাসা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ধনী ভক্তেরা অনেক মূল্যবান দ্রব্য আনিয়াছেন, তাই ঠাকুর তাঁহার নিকট খাবার চাহিলেও লজ্জায় উহা বাহির করিতে পারিলেন না। তবু ঠাকুর ভাবাবস্থায় উহার দুই-একটি তুলিয়া লইয়া খাইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে গোপালের মা অবশিষ্ট বাতাসাগুলি লইয়া আসিলেন এবং উহাতে প্রসাদবুদ্ধি থাকিলেও পথে যাতায়াতের ফলে অশুচি হইয়াছে মনে করিয়া উহা বাগানের মালীকে খাইতে দিলেন। তারপর এক দিবস খড়দহে শ্যামসুন্দরদর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনকালে একজন পূজারী তাঁহাকে প্রসাদ দিলে তিনি উহা লইয়া অগ্রসর হইবেন, এমন সময় কে একজন ব্রাহ্মণ মন্দিরের সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইয়া পরিচিত-কণ্ঠে বলিলেন, "কি গো, খাবি তো? না আবার মালীকে দিবি?" চমকিতা ব্রাহ্মণী

শুনিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরব, যদিও আকৃতিটি ভিন্ন। অমনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আমি অপরাধ করেছি, আমার কি হবে?" চিরশিশু রামকৃষ্ণ সেই ঘটনা শুনিয়া কেবল হাসিলেন।

অঘোরমণি অবিরাম দুইমাস কাল বাৎসল্যরতির প্রবলতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়াছিলেন এবং বালগোপালকে কোলেপিঠে লইয়া বাস করিয়াছিলেন। এইরূপ দীর্ঘকাল চিন্ময়-নাম, চিন্ময়-ধাম ও চিন্ময়-শ্যামের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অতি অল্প মহাভাগ্যবানেরই সম্ভবে। দুই মাস পরে ভাবের আতিশয্য মন্দীভূত হইলেও অঘোরমণি একান্তমনে একটু চিন্তা করিলেই গোপালের দর্শন পাইতেন। তাঁহার পরবর্তী জীবন এই লীলাখেলারই ইতিহাস।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের উলটা রথের দিনে ঠাকুর বলরামমন্দিরে আগমনপূর্বক দুই দিন ও দুই রাত্রি তথায় যে আনন্দের তুফান তুলিয়াছিলেন, তাহার আবেগে প্রায় প্রত্যেক ভক্তই তৎসকাশে আগমন করিলেও গোপালের মাকে না দেখিয়া ঠাকুর জলযোগকালে গৃহের স্ত্রীভক্তদিগকে তাঁহার সৌভাগ্যের কথা শুনাইলেন এবং বলিলেন, "তাকে এখানে আনতে পাঠাও না।" সংবাদ পাইয়া বলবাম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যাকালে ঠাকুর দ্বিতলে হল-ঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় তিনি অকস্মাৎ বালগোপাল-মূর্তির ন্যায় দুই জানু ও এক হাতে ভূমিতে হামা দেওয়ার মতো অবস্থানপূর্বক এক হাত তুলিয়া উধ্বর্মুখে সতৃষ্ণ-নয়নে যেন কাহার দিকে তাকাইয়া কি চাহিতে লাগিলেন—ভাবপ্রাবল্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছবিতে আঁকা গোপালবৎ নিশ্চল এবং চক্ষু দুইটি অর্ধনিমীলিত হইল। ঠিক তখনি গোপালের মা উপরে আসিয়া ঠাকুরকে স্বীয় ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে গোপালের মার সম্মান ও সংবর্ধনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহার ভক্তিপ্রভাবেই ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপালরূপ

ধারণ করিলেন। গোপালের মা কহিলেন, "আমি কিন্তু, বাবু, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে, খেলবে, বেড়াবে, দৌড়ুবে—ও মা, ওকি, একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নাই!" বাস্তবিকই ঠাকুর যেদিন প্রথম কামারহাটীতে যান, সেদিন তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া অঘোরমণি ভয়ে কাতর হইয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলিয়াছিলেন, "ও বাবা, তুমি অমন হলে কেন?"

গোপালের অবিরাম দর্শন যখন প্রথম বন্ধ হইয়া যায়, তখন গোপালের মা ভীত হইয়া সাশ্রুনয়নে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন, "গোপাল, তুমি আমায় কি করলে, আমার কি অপরাধ হ'ল, কেন আর আমি তোমায় আগেকার মতো (গোপালরূপে) দেখতে পাই না?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "ওরূপ সদাসর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকে না। একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে তারপর শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ে যায়।" গোপালের দর্শন বিরল হওয়ায় আর এক বিপরীত অবস্থা ঘটিল। বায়ুপ্রধান ধাতে ব্যাকুলতাবৃদ্ধির ফলে বুকে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল; তাই ঠাকুরকে বলিলেন, "বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দিয়ে চিরছে।" ঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন, "ও তোমার হরি-বাই। ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো? ও থাকা ভাল। যখন বেশী কষ্ট হবে, তখন কিছু খেয়ো।" এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সেদিন অনেক ভাল জিনিস খাওয়াইলেন।

ঠাকুর সকাম ব্যক্তিদের আনীত দ্রব্যাদি ভক্তদিগকে খাইতে দিতেন না। শুধু নরেন্দ্রের বেলা ইহার ব্যতিক্রম হইত। তাদৃশ জীবন্মুক্তি-লাভের পর গোপালের মার সম্বন্ধেও ঠাকুরের অনুরূপ আচরণই লক্ষিত হইল। একদিন এরূপ অনেক সকাম ভক্ত নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গোপালের মা উপস্থিত

হইলে শিশু যেমন মাতাকে পাইয়া আদর করে, তেমনি ঠাকুরও তাঁহার মস্তক হইতে চরণ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোপালের মার শরীর দেখাইয়া সকলকে বলিলেন, "এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে ভরা—হরিময় শরীর!" গোপালের মা তখন নির্বিকার—ঠাকুর পদস্পর্শ করিলেও কোন প্রতিবাদ নাই। পরে ঘরে যত কিছু উত্তম জিনিস ছিল সব আনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর ঐভাবে খাওয়াইতেন বলিয়া তিনি একদিন প্রশ্ন করিলেন, "গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছ।" গোপালের মা—"আগে কবে খাইয়েছি?" ঠাকুর—"জন্মান্তরে।" আলোচ্য দিবসে সর্বক্ষণ দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া গোপালের মা যখন সন্ধ্যায় কামারহাটী ফিরিবেন, তখন ঠাকুর ভক্তদের আনীত সমস্ত মিছরি তাঁহাকে দিলেন। গোপালের মা যখন ইহাতে আপত্তি তুলিলেন, তখন ঠাকুর তাঁহার চিবুক ধরিয়া সাদরে বলিলেন, "ওগো, ছিলে গুড়, হলে চিনি, তার পরে হলে মিছরি! এখন মিছরি হয়েছ, মিছরি খাও আর আনন্দ কর।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে—গোপালের মার আচরণের প্রতি ঠাকুরের সতর্ক দৃষ্টি। বলরাম-ভবনে পূর্বোক্ত উলটা-রথের পর ঠাকুর যে নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন তাহাতে দুই-একজন বালকভক্ত ও গোলাপ-মার সহিত গোপালের মাও একটি বড় পুঁটুলি লইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণীকে দরিদ্র জানিয়া বলরামবাবুর পরিবারবর্গ তাঁহাকে বস্ত্রাদি বহু আবশ্যকীয় দ্রব্য দিয়াছিলেন। যে ঠাকুর গোপালের মার সহিত এযাবৎ অতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতেছিলেন, তিনি ঐ পুঁটুলিটি দেখিয়া যেন অন্য লোক হইয়া গেলেন। ভাবস্রোত বাধা পাইয়া বিপরীত মুখে চলিল। গোপালের মার সহিত তিনি কথা বলেন না, অপরের নিকট বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে ঐ পুটুলির দিকে চাহেন—

এই-সকল দেখিয়া গোপালের মা মরমে মরিয়া গেলেন; তাঁহার মনে হইল, পুঁটুলিটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওয়াই উচিত। তাহার পর দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে বলিলেন, "ও বউমা, গোপাল এই-সব জিনিসের পুঁটুলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? —তা এ-সব আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই!" বুড়ীর কাতরতা দেখিয়া করুণাময়ী মা বলিলেন, "উনি বলুন গে। তোমায় দেবার তো কেউ নেই, তা তুমি কি করবে, মা?—দরকার বলেই তো এনেছ!" গোপালের মা তথাপি কয়েকটি দ্রব্য বিলাইয়া দিলেন এবং সভয়ে দুই-একটি তরকারি রাঁধিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতে গেলেন। বৃদ্ধাকে অনুতপ্ত দেখিয়া ঠাকুর তখন প্রসন্ন হইয়াছেন; অতএব আশ্বস্তা হইয়া গোপালের মা কামারহাটীতে ফিরিলেন।

অশেষরহস্যময় ঠাকুর একদিন বৃদ্ধাকে কহিলেন, তিনি যেন তাঁহার দর্শনাদির কথা নরেন্দ্রকে বলেন। ইহার পূর্বে যখন যাহা কিছু দর্শন হইত, গোপালের মা সমস্তই ঠাকুরকে বলিতেন। তাহাতে ঠাকুর সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, দর্শনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই— এমন কি, তাঁহাকেও না; বলিলে দর্শন আর হয় না। তাই আজ অন্যরূপ আদেশ পাইয়া গোপালের মা প্রশ্ন করিলেন, "তাতে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল?"

ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে, হইবে না। তখন গোপালের মা নরেন্দ্রকে আনুপূর্বিক সমস্ত বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান; আমি দুঃখী কাঙ্গালী—কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তোমরা বল, আমার এ-সব তো মিথ্যা নয়?" বৃদ্ধার ভক্তি, প্রেম, ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির বিবরণ শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না; তাই সাশ্রুনয়নে উত্তর দিলেন, "না মা, তুমি যা দেখেছ সব সত্য।"

এই সময়ে একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে লইয়া কামারহাটীতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা আহ্লাদে আটখানা হইয়া যথাসাধ্য জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন এবং ঠাকুর ও রাখালকে দত্তবাবুদের বৈঠকখানায় বিছানা পাতিয়া বসাইয়া রন্ধনে মন দিলেন। তারপর ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া মেয়েমহলের দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে আপনার লেপখানির উপর ধোপদস্ত চাদর পাতিয়া ঠাকুরকে বিশ্রাম করিতে দিলেন। রাখালও পার্শ্বে শয়ন করিলেন। এমন সময় ঠাকুর একটি দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন এবং ঘরের কোণে তাকাইয়া দেখিলেন, দুইটি কঙ্কালময় প্রেতমূর্তি সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অনুনয় করিতেছে, "আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন; রাখালও সঙ্গে গেলেন। কিন্তু গোপালের মাকে ঠাকুর কিছুই বলিলেন না; কারণ বৃদ্ধাকে সেখানে বাস করিতে হইবে। রাখালকে পরে সব বলিলেন।

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর শোকে ম্রিয়মাণা ও সর্বদা গোপাল-চিন্তায় নিমগ্না গোপালের মা বহুবার সর্বভূতে গোপালের সাক্ষাৎকার পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবার মাহেশের রথযাত্রায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন রথ, রথের উপর জগন্নাথদেব, যাহারা রথ টানিতেছে এবং দর্শনার্থী অপার জনসঙ্ঘ—সকলেই গোপালের বিভিন্ন রূপ। ঐ অনুভব সম্বন্ধে তিনি জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন, "তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না—নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম।" আর একদিন তিনি আহারের সময় ভাবে গদ্‌গদ হইয়া গোপালবুদ্ধিতে উপস্থিত স্ত্রীভক্তদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

দর্শনাদির ফলে গোপালের মার মন এতই উদার হইয়াছিল যে, ঠাকুরের লীলাকালে দক্ষিণেশ্বরে একদিন নরেন্দ্র একবাটি মহাপ্রসাদ খাইয়া

উঠিয়া গেলে ঠাকুর যখন জনৈকা স্ত্রীভক্তকে স্থানটি পরিষ্কার করিতে বলিলেন, তখন গোপালের মা স্বতই অগ্রসর হইয়া ঐ কাজ করিলেন। উহা দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে বলিলেন, "দেখ দেখ, দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে!" স্বামীজী বিদেশ হইতে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যবৃন্দ-সহ ফিরিয়া একদিন গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, "আমার সব সাহেব-মেম চেলা আছে, তাদের কি তুমি কাছে আসতে দেবে, না তোমার আবার জাত যাবে?" তাহাতে তিনি উত্তর দেন, "সেকি, বাবা? তারা তোমার সন্তান, তাদের আমি আদর ক'রে নাতি-নাতনী ব'লে কোলে নেব গো। তোমার ও-ভয় আর নাই।" সত্যই দেখা গেল যে, গোপালের মা নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম স্বামী সদানন্দের সহিত বাগবাজারের রাস্তায় দেখিতে পাইলেন, সেদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও গুপ্ত, এটি কেরে? একি নরেনের মেয়ে—যে তার সঙ্গে এসেছে?" অনুমান সত্য জানিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার ডান হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্তা সারা বুল, শ্রীমতী ম্যাক্‌লাউড ও ভগিনী নিবেদিতা একদিন নৌকাযোগে কামারহাটীতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা তাঁহাদিগকে সাদরে আপনার বিছানায় বসাইলেন, তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন এবং মুড়ি ও নারিকেল নাড়ু খাইতে দিলেন। বিদেশিনীরা উহা তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করিলেন এবং আনন্দে ভরপুর হইয়া ফিরিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের মুখে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতের মহান্ আদর্শ দেখে এসেছ! উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপবাস ও জাগরণ, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যা-ময় ভারত বিদায় নিচ্ছে—আর সে ফিরবে না!"

ঠাকুরের প্রকটলীলা-সমাপনের পরে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে বলরামবাবুর বাটীতে বাস করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে কখন কখন খাবারের দোকানে যাইতে দেখা যাইত। তখন নারীরা সন্তান ক্রোড়ে

লইয়া যেরূপ বাঁকিয়া চলে, তিনি সেইরূপ ভাবেই চলিতেন এবং অপরের অদৃশ্য দুষ্ট গোপালের সহিত প্রকাশ্যে কথা বলিতেন, "খাবি, খাবি? খা, খা—কত খাবি, খা। আমি কিনতে কোথা পাব?" অঘোরমণির একটি প্রিয় বিড়াল ছিল; তাহার মধ্যেও তিনি গোপালের দর্শন পাইতেন। একদিন ১৭ নং বসুপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার ঘাড়ে বিড়ালটি শুইয়া আছে—নিবেদিতা নির্বিকার! কিন্তু সেবিকা উহাকে তাড়াইয়া দিতে গেলে গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন, "কি করলি মা, কি করলি? গোপাল গেল্ রে, গোপাল গেল।" গোপালভাবে ভাবিতা অঘোরমণির দেহত্যাগের কিছু পূর্বে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি "আমি খাব", "আমি শোব" ইত্যাদি না বলিয়া বলিতেন, "গোপাল খাবে", "গোপাল শোবে"।

শুধু তাহাই নহে, গোপালই ছিল তাঁহার সমস্ত জ্ঞানের আকর। ১৮৮৭-এর শেষভাগে তাঁহার বলরাম-গৃহে অবস্থানকালে এক সায়াহ্নে অনেক ভক্ত তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "ওগো, আমি যে মেয়েমানুষ! বুড়ো মানুষ! আমি কি তোমাদের শাস্ত্রের কথা জানি? তোমরা শরৎ, তারক, যোগেনকে জিজ্ঞাসা করগে, যাও না।" জিজ্ঞাসুরা জিদ্ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "তবে দাঁড়াও বাপু, গোপালকে জিজ্ঞাসা করি। ও গোপাল, গোপাল, ওরে, এরা কি বলছে, আমি কি ছাই কিছু বুঝতে পারি? তুই বাপু, এদের একবার বলে দে না।" অতঃপর প্রশ্ন চলিতে লাগিল, আর উত্তরও আসিতে লাগিল, "ওগো, গোপাল এই বলছে।" মধ্যে মধ্যে অলক্ষিত কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছেন! এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর গোপালের মা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ও গোপাল, গোপাল, তুই চলে যাচ্ছিস কেন? ওদের কথার জবাব দিবিনি?" গোপাল চলিয়া গেল—আর প্রশ্নের উত্তর মিলিল না।

মাঝে মাঝে তিনি ত্যাগী ভক্তদের মঠে গমন করিয়া ও সাধুদের অনুরোধে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। সাধুদের প্রতি তাঁহার মন অনুপম মাতৃস্নেহে পূর্ণ ছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের কথা যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি কামারহাটীর নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সংবাদ শুনিয়াই তাঁহার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। "এঁ্যা, নরেন নেই?" বলিয়া তিনি অকস্মাৎ ভূপতিত হইলেন। ঐ পতনের ফলে কনুইয়ের কাছটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কিছুকাল বাড় বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

স্বামীজীর অনুরোধে তিনি একবার দুইজন মহিলাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। মহিলাদ্বয় দীক্ষা চাহিলেও গোপালের মা সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তুমি কি যে-সে? তুমি জপে সিদ্ধা। তুমি দিতে পারবে না তো কে পারবে? বলি কিছু না পার, তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও—তাতেই ওদের কাজ হবে। তোমার আর কি হবে?" দীক্ষার পর স্পৃহাশূন্যা গোপালের মা গুরুদক্ষিণা কিছুই লইবেন না দেখিয়া বলরামবাবু বলিলেন, "কিছু না নাও, অন্ততঃ ষোল আনা ক'রে নাও"। শিষ্যাদের পাছে ক্ষোভ হয় তাই একটি একটি করিয়া টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি উপদেশ দিলেন, "ওগো, মনপ্রাণ যে দেবার কথা! টাকা তো তুচ্ছ! ...নাম নেওয়া হেলনা-ফেলনা জিনিস নয়। অন্ততঃ দশ হাজার জপের পর আসন ত্যাগ করবে।"

কামারহাটীর বাগানে ভূতের উৎপাত ছিল। দত্তগৃহিণীর আমলে যে পাহারার ব্যবস্থা ছিল, উহা রহিত হওয়ায় স্বামী সারদানন্দ নিজব্যয়ে তথায় একটি মালী নিযুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত আর কেহ বাগানে থাকিত না। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদে পড়িয়া গিয়া যখন গোপালের মার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, তখন একজন সেবিকার তথায় থাকার

ব্যবস্থা হয়। গোপালের মা যেন তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচেন, এমনি ভাবে বলিতেন, "কখন যাবি? এঁ্যা, থাকবি নাকি? মতলব কি? একথা বলছি ব'লে কিছু মনে করিসনি।" ইহার পূর্বে (১৯০১) তাঁহার আমাশয় হইলে কন্যাস্থানীয়া একজন সেবিকা সেখানে ছিলেন, আর এক ব্রহ্মচারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া আসিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ ও নিবেদিতা প্রভৃতি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। স্বামীজীও একবার গিয়াছিলেন। সেবিকাকে দেখিয়াই অঘোরমণি বলিয়াছিলেন, "কেন এখানে এলি? কষ্ট পাবি। আমার তো গোপাল আছে। কোথায় শুবি? একটা ঘর ঠিক কর! সব ঘরে চাবি। পূজারী বামুনকে বল—একটা খুলে দেবে। ছাখ, যখন শব্দ-টব্দ পাবি, তখন খুব জপ করবি—গোড়া থেকেই বাপু ব'লে রাখছি। এখানে নানান রকম আছে।" রাত্রে সেবিকার অগ্নি-পরীক্ষা চলিল—ছাদে দুড় দুড় শব্দ, জানালায় আওয়াজ, আর একটা ছমছম ভাব। অথচ জানিয়া শুনিয়া ইহারই মধ্যে গোপালের মার দীর্ঘজীবন যাপিত হইল!

ঠাকুরের শিক্ষাগুণে অপরিগ্রহে প্রতিষ্ঠাতা অঘোরমণিকে কেহ কিছু দিতে আসিলেও তিনি গ্রহণ করিতেন না। একবার একটি মশারির প্রয়োজন হইলে তিনি অল্পমূল্যে ছোট একটি কিনিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু জনৈক ভক্ত এক বৃহৎ মশারি উপস্থিত করিলে তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। পরে অপর একজনের ছোট মশারির সহিত উহা বদল করিয়া তবে শান্তি পাইলেন। শিষ্যা তাঁহাকে কিছু দিতে চাহিলে বলিলেন, "তোরা আর কি দিবি? গোপাল আমার সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছে। শুকনো উচ্ছে চারটি আনবি যখন আসবি। ব্যস, তা হলেই তোদের হবে।" এই পরিবেশের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াই হয়তো তিনি বিদায় লইতেন; কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার

রোগবৃদ্ধি হইলে রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় বলরামবাবুর বাটীতে লইয়া আসিলেন।

তাঁহার শেষবারে কামারহাটী পরিত্যাগের পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে একটি ভক্ত বালক কলিকাতা হইতে কিছু দ্রব্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধার অনুমতিক্রমে তাঁহারই গৃহে শয়ন করিল। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সে ভক্তটি শুনিতে লাগিল, মাতাপুত্রে তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। পুত্র অন্ধকার থাকিতেই গঙ্গায় ঝাঁপাই ঝুড়িতে চাহিতেছে। মা বলিতেছেন, "রোস রোস, কাক কোকিল এখনও ডাকেনি। লক্ষ্মী-ধন আমার, ফরসা হোক, তখন নাইবি।" সকালে ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?" তিনি সরলভাবে উত্তর দিলেন, "জানিস না বুঝি?—গোপাল যে আমার কাছে থাকে। তারই বেয়াড়া রকমের দুরন্তপনা সায়েস্তা করছিলুম।" বলরামবাবুর বাড়ির নিকটে অপর একটি ছেলের বাড়িতে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং দুধ মুড়কি সন্দেশ দিয়া ফলার করিতেন—উহারা কায়স্থ। ১৯০১ অব্দে ব্রাহ্মণীর আমাশয়ের সময় স্বামীজীর আদেশে ঐ ছেলেটি এক মাস কামারহাটীতে থাকে এবং স্নেহময়ী গোপালের মা তাহাকে আপন কক্ষেই শয়ন করিতে দেন। সে দেখিত যে, বৃদ্ধা চলচ্ছক্তিহীনা হইলেও এই কষ্টদায়ক পীড়ার মধ্যেই দুই বেলা বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া দীর্ঘকাল মালা জপ করিতেন! অন্য সময় শুইয়া সর্বদা হাতে জপ করিতেন। শায়িত অবস্থায়ও তাঁহার মুখে উচ্চৈঃস্বরে রামকৃষ্ণ-নাম শোনা যাইত।

বলরাম-ভবনে আসিয়া কিয়ৎকাল বাসের পরেই নিবেদিতা তাঁহাকে স্বগৃহে আনিতে চাহিলে উদারমনা ব্রাহ্মণী সানন্দে তাঁহার ১৭নং বসুপাড়া লেনের বাড়িতে গমন করিলেন এবং স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতাও মাতৃনির্বিশেষে সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারের ব্যবস্থা নিকটবর্তী এক ব্রাহ্মণের বাটীতে করিয়া দেওয়া হইল। যতদিন চলচ্ছক্তি

ছিল ততদিন বৃদ্ধা এক বেলা সেই গৃহে গিয়া আহার করিয়া আসিতেন। রাত্রে ঐ পরিবারের কেহ লুচি প্রভৃতি তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন। পরে দুই বেলাই আহার তাঁহার ঘরে আসিত; দুপুরে নিরামিষ ঝোল-ভাত, আলু-উচ্ছে, দুটো-একটা তরকারি এবং রাত্রে মাত্র চারখানি লুচি, একটু তরকারি, ভাজা ও দুধ। গোপালের মার তখন বালিকার স্বভাব। কোন দিন হয়তো দুপুরে খাইলেনই না। বিকালে সেবিকা আসিয়া দেখিলেন, খাবার যেমন পাঠানো হইয়াছিল তেমনি পড়িয়া আছে; সেবিকা দেখিয়া অনুযোগ করিলেন, "আজ কেন গোপালের এত বেলা পড়ে গেল? খাওয়া-দাওয়া হ'ল না? আসনে ব'সে একবার দুষ্ট গোপালকে চোখ বুজে ডাকুন তো?" তাহাই হইল। পরে চোখ চাহিয়া গোপালের মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গোপাল বলছে, আজ আর নিজে খাবে না।" অগত্যা ছোট বালিকাকে খাওয়াইবার মতো সেবিকা তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। রাত্রেও অনেক সময়ে এই ভাবে সামান্য কিছু মুখে দিয়াই গোপালের মা শুইয়া পড়িতেন। আহার ভিন্ন অন্য সময়ে নিবেদিতা নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন এবং একটি ঝিও রাখিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। বৃদ্ধার বাক্ রুদ্ধ হইবার কিছুকাল পূর্বে শ্রীশ্রীমা আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিলে অঘোরমণি জানিতে পারিয়া বলিলেন, "গোপাল এসেছ? এস, এস; ভাখ, এতদিন তুমি আমার কোলে বসেছিলে, আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।" অঘোরমণির মস্তক মায়ের ক্রোড়ে তুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি স্নেহভরে উহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশে রক্তিমচ্ছটা বিচ্ছুরণের ন্যায় গমনোদ্যতা অঘোরমণির ম্লান মুখে একটা পরম শান্তির শ্রী ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবার কি একটা পাইবার জন্য যেন হাত বাড়াইতে লাগিলেন।

শ্রীমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন সেবিকা বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি শ্রীমাকে গোপাল, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দেখিয়া তাঁহার পদধূলি চাহিতেছেন, তারপর তিনি বস্ত্রাঞ্চলে শ্রীশ্রীমায়ের পদরেণু লইয়া অঘোরমণির সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। মা আজ নির্বিকার! অঘোরমণি তাঁহার নিকট শাশুড়ীর সম্মান পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে ভোজননিরতা শ্রীশ্রীমাকে গোপালের মা একদিন বলিয়াছিলেন, "বউমা, কি খাচ্ছিস, একটু দেনা!" শ্রীশ্রীমা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "বাপরে, আপনাকে দিতে পারব না।" আজ বৃদ্ধার অন্তিম কাল আগতপ্রায়—আজ আর সে আপত্তি নাই! মা তখন ধ্যানস্থা; বাহ্যজ্ঞানই নাই তো বাধা দিবে কে?

অঘোরমণির গঙ্গাকূলে জন্ম ও বাস, গঙ্গাবারিতে রন্ধন ও পিপাসা-নিবারণ, গঙ্গাতটে তপস্যা ও গোপাল-লাভ—গঙ্গার সহিত তাঁহার সমস্ত জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্তিমকালে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। নিবেদিতা স্বয়ং নগ্নপদে সঙ্গে যাইয়া পুষ্পচন্দন ও মাল্যাদি দ্বারা স্বহস্তে তাঁহার শয্যারচনা করিয়া দিলেন এবং গোপালের মার জীবনের অবশিষ্ট দুই দিন তাঁহারই পার্শ্বে রহিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই (১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ়) উদীয়মান সূর্যের রক্তিমাভায় যখন পূর্বগগন রঞ্জিত, সেই সময় গোপালের মার শরীর শোভাবাজারের রাজাদের গঙ্গাযাত্রার ঘাটে গঙ্গাতরঙ্গে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় স্থাপিত হইল। তখন তাঁহার হাত দুইখানি বক্ষে জপমুদ্রায় বিন্যস্ত, মুখশ্রী জ্যোতি বিকিরণ করিতেছে; আর ভক্তগণের কণ্ঠে ভবভয়হারী তারকব্রহ্মনাম উত্থিত হইয়া জাহ্নবীর স্রোতোধ্বনির সহিত মিলিত হইতেছে। অঘোরমণি গঙ্গাগর্ভে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্ব হইতে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসিনী

বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সর্বদা গৈরিক বসনই ধারণ করিতেন" ('লীলাপ্রসঙ্গ')। কৃষ্ণলাল মহারাজের একখানি গৈরিক দশহাতি কাপড় তিনি একবার বাগবাজার হইতে লইয়া যান এবং পরে বলেন, "গ্যাখ, তোমার এই কাপড়খানি প'রে বসলে আমার বেশ জপ হয়।" তাঁহার দেহত্যাগের পর নিবেদিতা তাঁহার জপমালা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোখানি বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে রক্ষিত হয়।
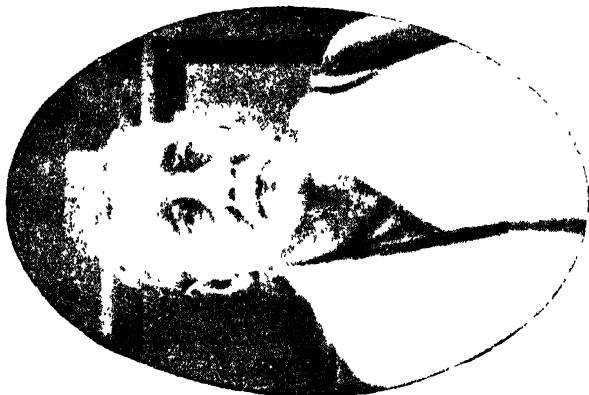
গোলাপ মা

যোগীন মা

# যোগীন-মা

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতির সহিত যোগীন-মা ও গোলাপ-মার স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। শ্রীশ্রীমা একসময়ে বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনে যা-সব হয়েছে, এই গোলাপ, যোগেন এরা সব জানে।" আর একসময়ে বলিয়াছিলেন, "মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী," এবং পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখপূর্বক জানাইয়াছিলেন, "যোগেন আমার জয়া—আমার সখী, সহচরী, সাথী।" জগদম্বার সহচরীরা যেমন জগদম্বাকে জানিতেন, জগদম্বাও তেমনি সহচরীদ্বয়ের তত্ত্ব বিদিত ছিলেন; তাই স্ত্রীভক্তদিগকে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "যোগেন গোলাপ, এরা সব কত ধ্যান-জপ করেছে, সে-সব আলোচনা করা ভাল—এতে কল্যাণ হবে।" যোগীন-মাকে শ্রীশ্রীমা মেয়ে-যোগেন নামে উল্লেখ করিতেন; সেজন্য কোন কোন গ্রন্থে যোগেন-মা নামেরও প্রয়োগ আছে। আমরা যোগীন-মা নামটিই গ্রহণ করিব।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে ৬টার সময় শ্রীমতী যোগীন্দ্রমোহিনী কলিকাতার ৫৯।১ নং বাগবাজার স্ট্রীটের পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া উত্তর কলিকাতায় 'ধাই-পেসন্ন' নামে পরিচিত হন এবং ঐ সূত্রে প্রভূত অর্থ অর্জন করেন। পিতার উদ্যান, প্রাঙ্গণ ও শিবালয়সুশোভিত বৃহৎ বাটীতেই যোগীন-মার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয়া কন্যা ছিলেন। আদরের দুলালী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিবে এই আশায় প্রসন্নবাবু দুহিতাকে খড়দহের বিখ্যাত ও সুসমৃদ্ধ বিশ্বাস-বংশের পোষ্যপুত্র অম্বিকাচরণের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিশ্বাসদের পূর্বপুরুষগণ শাক্ত এবং

দানধ্যানাদির জন্য বঙ্গ দেশে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহাদেরই আনুকূল্যে 'প্রাণতোষিণী' তন্ত্রখানি প্রচারিত হয়। লক্ষশালগ্রাম-সমন্বিত এক রত্নবেদী-নির্মাণের অভিপ্রায়ও তাঁহাদের ছিল; কিন্তু আশীহাজার সংগ্রহের পর ঐ সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। বিশ্বাসদের কুলদেবতা ছিলেন বিষ্ণু-দামোদর। পোষ্যপুত্র অম্বিকাচরণ বংশমর্যাদা অথবা সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না—ভ্রষ্টচরিত্র ও পানাসক্ত হইয়া তিনি অচিরে গৃহহীন ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। সাধ্বী যোগীন-মার শত প্রচেষ্টাও এই বিপথগামীকে ফিরাইতে পারিল না দেখিয়া তিনি স্বামীর চরম অবনতির পূর্বেই এই পাপস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন তাঁহার একমাত্র কন্যা 'গণু'। একটি পুত্র ইতঃপূর্বেই জন্মলাভের ছয়মাস পরে গতাসু হইয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখিবার জন্য প্রসন্নবাবু বাঁচিয়া ছিলেন না। যোগীন-মার জননী দুহিতা ও দৌহিত্রীকে সাদরে গৃহে তুলিয়া লইলেন।

বলরামবাবুদের সহিত বিশ্বাসবংশের দূর আত্মীয়তা ছিল, বলরামবাবু ছিলেন যোগীন-মার মামা-শ্বশুর। এই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা যোগীন-মার অবিদিত ছিল না। তাঁহার মাতামহীও একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন; যদিও ঠাকুরের পরিচয়লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। বৃদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার সাধুসুলভ বেশভূষা না দেখিয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "পরমহংস কোথায়?" আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছাবশতই হউক অথবা 'পরমহংসাভিমান', হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার জন্যই হউক, ঠাকুর উত্তর দিলেন, "খুঁজে দেখ।" প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় যোগীন-মাও এক বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের একদিবস বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হইলে যোগীন-মা নিমন্ত্রণ পাইয়া তথায় আসিলেন। দ্বিতলের বৃহৎ কক্ষের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান ঠাকুর তখন ভাবে মাতোয়ারা—চলিতে চরণ

টলিতেছে। যোগীন-মা স্বীয় জীবনের সর্বোত্তম অংশ এক মন্তপের ক্লেশকর সাহচর্যে কাটাইয়া এরকম মত্ততার উপর খড়্গাহস্ত ছিলেন। অতএব বিপরীত মনোভাব লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভাবিলেন, ইনি সুরাসক্ত শক্তি-সাধকদেরই অন্যতম হইবেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া তিনি পরিচিতা স্ত্রীভক্তদের সহিত দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন-মানসে যাতায়াত করিতে থাকিলেন এবং এইরূপ পুনঃপুনঃ সাক্ষাৎকারের ফলে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আবাল্যকল্পনা যে সর্বোত্তমচরিত্র মহাপুরুষকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে, ইনি শুধু তদনুরূপই নহেন, ইনি সেই গুণাবলীকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য মহিমায় সদা অধিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলেন এবং ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীমায়েরও তিনি স্নেহের অধিকারিণী হইলেন। যোগীন-মার তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহার ইঙ্গিত 'কথামৃতে' বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনায় পাই ( ৩।১৯।২ )।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই রাত্রি প্রায় আটটার সময় গোলাপ-মার বাটী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'গণুর-মার' আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় একতলার বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপবিষ্ট হইলে ঐক্যতানবাদ্য ও "কেশব কুরু করুণা-দীনে," "এস মা জীবন-উমা" ইত্যাদি সঙ্গীত চলিতে লাগিল। পরে জলখাবারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "এইখানেই এনে দাও।" কিন্তু ইহাতে গোলাপ-মা কহিলেন, "গণুর-মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধূলা দিন, তা হ'লে ঘর কাশী হয়ে থাকবে—ঘরে ম'রে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বহু "গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও

উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের” অভ্যুদয় হইবে। গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সেই মহীয়সীদিগেরই অগ্রবর্তিনী। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী স্বল্পই সংরক্ষিত হইয়াছে। যোগীন-মার সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গে' যে কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা জীবৎকালে প্রকাশিত হওয়ায় 'জনৈক স্ত্রীভক্ত' প্রভৃতি গুপ্ত পরিচয়ের পশ্চাতে চিরকালের মতো অবিদিত রহিয়া গিয়াছে। তথাপি 'লীলাপ্রসঙ্গ' ( গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ২৩৭-২৪৬ পৃঃ ) অবলম্বনে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার পরে ঠাকুর যখন বলরাম-মন্দির হইতে সকাল আটটা-নয়টায় দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন, তখন স্ত্রীভক্তেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্দরের পূর্বদিকে রন্ধনশালার সম্মুখে ছাদের শেষ পর্যন্ত আসিয়া বিষণ্ণমনে ফিরিয়া যাইলেন। সকলে এইরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও যোগীন-মা যেন আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের চকমিলানো বারান্দা অবধি আসিলেন—বাহিরে যে অপরিচিত পুরুষেরা আছেন, সে বিষয়ে যেন হুঁশ নাই। ঠাকুরও তখন গোঁ ভরে চলিয়াছেন; কাজেই কে ফিরিয়া গেল, বা কে আসিল—সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। এইরূপে চলিতে চলিতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখেন, যোগীন-মা সঙ্গে চলিয়াছেন; দেখিয়াই "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। যোগীন-মাও শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চ'না গো, মা, চ'না!" যাঁহাকে বলিলেন তিনি গাড়িপালকি ব্যতীত পদব্রজে প্রকাশ্য রাজপথে চলিতে অভ্যস্ত নহেন। অথচ ঠাকুরের সে আহ্বানে এমন একটি মোহিনীশক্তি ছিল যে, তিনি আর কিছু না ভাবিয়াই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন—শুধু ভিতরে যাইয়া বলরামবাবুর গৃহিণীকে বলিয়া আসিলেন, "আমি ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চললুম।" তাঁহাকে যাইতে

দেখিয়া অপর এক স্ত্রীভক্তও সঙ্গে চলিলেন। এদিকে যাইতে বলিয়াই ঠাকুর অপেক্ষা না করিয়া বালকভক্তদের সহিত নৌকায় আসিয়া বসিয়াছেন; অতএব স্ত্রীভক্তদ্বয় ছুটাছুটি করিয়া নৌকায় উঠিয়া পাটাতনের উপর বসিলেন—নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকায় যোগীন-মা জানাইলেন যে, ভগবানে ষোল-আনা মন দিতে চাহিলেও মন কিছুতেই বাগ মানে না। ঠাকুর উপদেশ দিলেন, "তাঁর উপব ভার দিয়ে থাক না গো! ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাকতে হয়।" ইত্যাদি কথার মধ্যে নৌকা ঘাটে লাগিলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতখানায় শ্রীশ্রীমাকে ও ৺কালীমাতাকে প্রণাম করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে সমবেত হইলেন। ঠাকুর তখন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ঘরে কিছু তরিতরকারি আছে কিনা। কিছুই নাই জানিয়া তাঁহার ভাবনার অন্ত নাই—কে এখন বাজারে যায়? বাজার হইতে কিছু না আনিলে আগত ভক্তেরা খাইবে কি দিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগীন-মা ও অপর স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "বাজার করতে যেতে পারবে?" তাঁহারাও বলিলেন, "পারব" এবং বাজারে যাইয়া দুইটি বড় বেগুন, কিছু আলু ও শাক কিনিয়া আনিলেন। শ্রীশ্রীমা রন্ধন করিলেন; কালীমন্দির হইতেও ঠাকুরের বরাদ্দ-প্রসাদের থালা আসিল। পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে ভক্তেরা প্রসাদ পাইলেন। ইহার পর সমস্ত দিন ঠাকুরের সহিত সৎপ্রসঙ্গান্তে সন্ধ্যাসমাগমে যোগীন-মা সঙ্গিনীসহ পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে কুলবধূদের ঈদৃশ অসঙ্কোচ ব্যবহারের ব্যাখ্যাকল্পে স্ত্রীভক্তেরা বলিয়াছেন, "ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ ব'লেই অনেক সময় মনে হ'ত না; মনে হত, যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকট আমাদের যেমন লজ্জা-সঙ্কোচ আসে, ঠাকুরের নিকট তার কিছুই আসত না। যদি বা কখন আসত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলে যেতুম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলে বলতুম" (ঐ, ৩২ পৃঃ)।

দক্ষিণেশ্বরে দুই-চারিবার গমনাগমনের পর যোগীন-মা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সুপরিচিতা হন। উভয়ে প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন; অধিকন্তু স্নেহপ্রবণা মাতাঠাকুরানী শুদ্ধসত্ত্বা যোগীন-মাকে সহজেই বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন। যোগীন-মা সাত-আট দিন পর পর দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন; সেখানে রাত্রিযাপন করিতে হইলে নহবতেই আশ্রয় লইতেন। মা তখন নহবতের নীচ তলায় থাকেন এবং বাহিরের রোয়াকে রন্ধন করেন। স্ত্রীভক্ত কেহ আসিলে নহবতের উপরে স্থান পাইতেন। তদনুসারে যোগীন-মাও পৃথক্ শয়ন করিতে চাহিলে মা কিছুতেই ছাড়িতেন না, কাছে টানিয়া শোওয়াইতেন। যোগীন-মার সহিত মা সর্ববিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং ব্যক্তিগত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ চাহিতেন। যোগীন-মা তাঁহার কেশবন্ধন করিয়া দিতেন এবং উহা মা এত পছন্দ করিতেন যে, তিন-চারি দিন পরেও স্নানকালে খুলিতেন না; বলিতেন, "ও যোগেনের বাঁধা চুল; সে আবার আসলে সেই দিন খুলব।" প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরেই মা যখন নৌকাযোগে পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, তখন যতক্ষণ নৌকাখানি দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করিল ততক্ষণ যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনয়নে উহা দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর বিষাদে অবসন্নহৃদয়ে নহবতে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকিলেন। পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিবার পথে ঠাকুর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় কক্ষে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, "ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে?" এই বলিয়া সান্ত্বনাদানের জন্য স্বীয় সাধকজীবনের অনেক ঘটনা তাঁহাকে শুনাইলেন। এক বৎসর কিংবা দেড় বৎসর পরে মা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া মাকে বলিলেন, "সেই যে ডাগর-ডাগর-চোখ মেয়েটি আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে—তুমি যাবার দিন নহবতে বসে খুব কাঁদছিল।"

যোগীন-মা পূর্বেই শ্বশুরবংশের কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহাতে জীবনী-শক্তি ছিল না এবং সে-জপেও আনন্দ ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইবার পর যোগীন-মার জীবনে এক নবীন আনন্দের সঞ্চার হইল এবং স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া তিনি আত্মীয়-স্বজনকেও সেই রসাস্বাদনে আহ্বান করিলেন; এইরূপে তাঁহার কন্যা গণু প্রভৃতি অনেকেই আসিলেন। জামাতাও আসিলেন; কিন্তু ধনদৌলতে গর্বিত যুবককে ঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি করিতে অক্ষম দেখিয়া যোগীন-মা আর দ্বিতীয়বার তাঁহাকে ডাকিলেন না। স্বামী অম্বিকাচরণ বিশ্বাসও যোগীন-মার ঐকান্তিক আকর্ষণে শুধু যে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন তাহাই নহে, তিনি সৎপথে চলিতেও সচেষ্ট হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন যে, স্বামী উন্মার্গগামী হইলেও সতীর পতির প্রতি একটা অপরিহার্য কর্তব্য আছে। তদনুসারে যোগীন-মা সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নকেও সুখময় বাস্তবে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকার দিন তখন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাই যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে থাকিলেন, তথাপি শীঘ্রই ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং কিছুদিন জ্বরাদিতে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। যোগীন-মা শেষ কয়দিন পতিকে নিজ সকাশে রাখিয়া সাধ্যমত তাঁহার সেবাদি করিয়াছিলেন।

ঠাকুর যোগীন-মাকে নিজের দেহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "ত্যাখ, তোমার যে ইষ্ট, তা এর ভেতরেই আছে। একে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়বে।" যোগীন-মাও পরে দেখিয়াছিলেন যে, ধ্যান করিতে বসিলেই ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেন। ঠাকুরের নিকট তিনি জপের বিধিও শিখিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ডানহাতের আঙ্গুলগুলি পাশাপাশি একেবারে জুড়িয়া রাখিতে হয়, নতুবা আঙ্গুলের ফাঁকে জপের ফল বাহির হইয়া যায়।

বিবাহের পূর্বে এক গুরু-মার নিকট যোগীন-মার সামান্য বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে বলিলেন, তখন তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্যচরিতামৃতাদি এরূপ অভিনিবেশ-সহকারে আয়ত্ত করিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি মুখস্থ বলিতে পারিতেন। আখ্যায়িকাগুলির সহিতও তাঁহার এমন নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছিল যে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার 'Cradle Tales of Hinduism' (হিন্দু-শিশুদেব আখ্যায়িকা) রচনাকালে তাঁহার নিকট অশেষ সাহায্য পাইয়া গ্রন্থের ভূমিকায় উহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে সাধিকা যোগীন-মার দিবস অতিবাহিত হইত। স্ত্রীধনরূপে যে সামান্য অর্থ তাঁর ছিল, তাহা হইতে তাঁহার বৈধব্যজীবনের ব্যয়সঙ্কুলান হইত এবং উহারই সাহায্যে তিনি কেদারনাথ হইতে কন্যাকুমারী এবং কামাখ্যা হইতে দ্বারকা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সব প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণকালে তিনি বৃন্দাবনে বলরামবাবুদের ঠাকুরবাড়ি 'কালাবাবুর কুঞ্জে' বাস করিতেছিলেন। অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে গমন করেন এবং যোগীন-মার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া "ও যোগেন গো" বলিয়া বিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে থাকেন। অতঃপর ঠাকুরের আদর্শজনিত শোকনিবারণের জন্য যোগীন-মার তপস্যার বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্বভাবতই এরূপ তপস্যাপ্রবণ ছিলেন যে, ইহা লক্ষ্য করিয়া এবং পাছে উহাতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই ভয়ে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের আর কি বাকী গো? (নিজ দেহ দেখাইয়া) তোমরা দেখলে, খাওয়ালে, সেবা করলে!" যাহা হউক, বৃন্দাবনে তিনি ভগবদ্ধ্যানে এমন আত্মহারা হইতেন যে, অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কালাবাবুর ঠাকুর-বাটীতে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পরে ধ্যানে বসিতেন। এক সন্ধ্যায়

ধ্যানকালে তিনি সমাধিমগ্না হইলেন। আরাত্রিক শেষ হইয়াছে, যাত্রিগণ চলিয়া গিয়াছে, এমন কি, মন্দিরের বহির্দ্বার রুদ্ধ হইবে, তথাপি তাঁহাকে একই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া সেবায়েতগণ বলিতে লাগিল, "ও মায়ি, ওঠ ;" কিন্তু তবু কোন সাড়া নাই। এদিকে এত রাত্রেও তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা যোগীন মহারাজকে আলোকহস্তে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। কোথায় তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, তাহা জানাই ছিল, তাই তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনাইয়া সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন। ঐ সময়ের অনুভূতিবিষয়ে যোগীন-মা পরে বলিয়াছিলেন, "তখন···জগৎ আছে কি নাই, এও যেন আমার ভুল হয়ে গেছিল। ···যখন যেদিকে চাই সর্বত্রই ইষ্টদর্শন। তিন দিন অমন ছিল।"

যোগীন-মার সমাধি এই প্রথম নহে ; পিতৃগৃহে আর একবার ঐরূপ হইয়াছিল এবং উহা জানিতে পারিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যোগীন-মা, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে। যার একবারও সমাধি হয়, দেহত্যাগের সময় তার সেই স্মৃতি আবার আসে।" এই প্রকার সমাধির সঙ্গে ছিল আবার অলৌকিক দর্শনাদি। সাধনার ফলে সূক্ষ্মরাজ্যে উপনীত তাঁহার মন দিব্য শব্দাদি উপলব্ধি করিত এবং ভবিষ্যতের আভাসও পাইত। এইরূপে কলিকাতায় বসিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কাশীধামে তাঁহার একটি দৌহিত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তিনি অন্তরের সহিত দুইটি বালগোপাল মূর্তির পূজা করিতেন। ঐ ঐকান্তিকতার ফলে তাঁহার যে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা নিজমুখে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, "একদিন পূজাকালে ধ্যান করতে করতে দেখি কি, দুটি অনুপম সুন্দর বালক হাসতে হাসতে এসে আমায় জড়িয়ে ধ'রে পিঠ চাপড়িয়ে বলছে, 'আমরা কে চেন ?' বললুম, 'তোমাদের আবার চিনি না? এই তুমি বীর বলরাম, আর তুমি

কৃষ্ণ।' ছোটটি (কৃষ্ণ) বললে, 'তোমার মনে থাকবে না।' 'কেন ?' 'ঐ ওদের জন্য'—এই ব'লে আমার নাতিদের দেখালে।" বাস্তবিক যোগীন-মার একমাত্র কন্যা গণুর মৃত্যুর পর দৌহিত্র তিনটিকে লইয়া তিনি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং তৎকালে ধ্যানের গভীরতাও হ্রাস পায়।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে শ্রীশ্রীমা যখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে বাস করিতেন, তখন যোগীন-মাও সঙ্গে ছিলেন। বস্তুতঃ এখন হইতে সম্ভবস্থলে যোগীন-মা প্রায় সর্বত্রই মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। ঐ উদ্যানবাটীতে চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া প্রখর সূর্যকিরণে অনাবৃত মস্তকে উপবিষ্টা মা যখন পঞ্চতপা সাধন করেন তখন যোগীন-মাও তাঁহার সহিত ঐ কঠোর ব্রতে যোগদান করেন। যোগীন-মার অবিরাম তপশ্চর্যার আরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। একবার তিনি জলপান ত্যাগ করিয়া ছয় মাস যাবৎ কেবল দুগ্ধপান করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে প্রয়াগে শীতকালে একমাস কল্পবাস করিয়াছিলেন। হিন্দু বিধবার জন্য নির্দিষ্ট তিথ্যাদিতে তিনি ব্রত উপবাস করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার জপধ্যানে অনুরাগ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হইত। শত কোলাহলাদি সত্ত্বেও তিনি প্রত্যহ নিয়মিত কাল নির্দিষ্ট সংখ্যক জপে অতিবাহিত করিতেন; গঙ্গাস্নানের পরও ঘাটে দুই ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা জপে নিরত থাকিতেন—শীত-বর্ষাদিতে পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হইত না। ধ্যানকালে তাঁহার শরীরবোধ এমনই লুপ্ত হইত যে নয়নকোণে মাছি বসিয়া থাকিলেও তাঁহার চক্ষু অচঞ্চল থাকিত। আবার বৈধী পূজার্চনায় তাঁহার নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা এতই অধিক ছিল যে, তাহা পুরুষদের মধ্যেও অল্প দৃষ্ট হয়। এই-সকল কারণে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "যোগেন খুব তপস্বিনী—এখনও কত ব্রত উপবাস করে।" চিরাভ্যস্ত এই জপারাধনাদি তাঁহার এতই অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল

যে, শেষ অসুখের সময় যখন তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, তখনও নিয়মিত জপাদির জন্য তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইতে হইত। আর ঐরূপ উত্থানশক্তি রহিত হইয়াও তিনি 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'ভাগবত' প্রভৃতি পাঠ শুনিতেন।

ফলতঃ সিদ্ধিলাভে ধন্য হইলেও তিনি আমরণ সাধনাতেই রত ছিলেন। তাঁহার খর্ব অথচ সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, অপূব বুদ্ধিমত্তা এবং সুবিবেচনাপূর্ণ আলাপ-ব্যবহারেব সহিত অন্তরের এই সৌন্দর্য মিশ্রিত হইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতীব গম্ভীব অথচ চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপ্রদ করিয়াছিল। তাঁহার ধীরস্থির গতি ও বাক্যালাপের সম্মুখে সবপ্রকার চপলতা এককালে শান্ত হইয়া যাইত। তাঁহার ধীমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ-প্রদর্শনের জন্য যেন শ্রীশ্রীমা অনেক সময় তাঁহার সহিত দীক্ষাথাদের মন্ত্রাদিসম্বন্ধে আলোচনা কবিতেন। নিবেদিতা, ক্রিস্টীন ও দেবমাতা প্রভৃতি বিদেশী মহিলা তাঁহার প্রশংসায় শতমুখ ছিলেন। ঠাকুরেব অন্তরঙ্গদের সহিত, বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত যোগীন-মার সম্বন্ধ ছিল অতীব প্রীতিপূর্ণ। নৌকাযোগে মঠ হইতে আগত স্বামীজী হয়তো বাগবাজারেব ঘাটে অবতরণ করিয়াই যোগীন-মাকে দেখিলেন; অমনি বলিয়া উঠিলেন, "যোগীন-মা, আজ তোমার ওখানে দুটি খাব গো! পুঁইশাক চচ্চড়ি করো।" যোগীন-মা একবার যখন কাশীতে ছিলেন, তখন স্বামীজী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "যোগীন-মা, এই তোমার বিশ্বনাথ এল গো!" আর যোগীন-মার রান্নায় তাঁহার এত তৃপ্তি ছিল যে, আবদার করিয়া বলিলেন, "আজ আমার জন্মতিথি গো! আমায় ভাল করে খাওয়াও; পায়েস করো।" ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী যোগীন-মার তথায় গমনের আয়োজন করিয়া লিখিয়াছিলেন, "যোগেন-মার জন্য ডাণ্ডী হইবে; কিন্তু বাকী সকলকে পায়ে হাঁটিতে হইবে।" স্বামীজীর বিশ্বাস

ছিল যে, যোগীন-মা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া ঠাকুরের ভাবরাশি স্ত্রীজাতির মধ্যে অনুস্যূত হইবে। তিনি তাঁহার পরিকল্পিত স্ত্রীমঠের অধিনেত্রীপদে ইঁহাদিগকে অধিষ্ঠিতা করিবার আশা পোষণ করিতেন।

শ্রীমায়ের প্রতি যোগীন-মার অনুরাগের পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। ঐ প্রীতি শুধু মায়ের লীলাবিগ্রহে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও গৃহাদির প্রতিও প্রসারিত হইযাছিল। কিন্তু এই শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শরণাপত্তি একদিনে হয় নাই। তাঁহার মনে একবার সন্দেহ জাগিয়াছিল, "ঠাকুরকে দেখেছি এমন ত্যাগী ; কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর সংসারী।" তারপর একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া জপকালে ভাবচক্ষে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি ভেসে যাচ্ছে।" যোগীন-মা দেখিলেন, এক সদ্যোজাত, নাড়ীনালবেষ্টিত, রক্তাক্ত শিশু ভাসিয়া চলিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, "গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয়? ওকেও (শ্রীমাকেও) তেমনি ভাববে। ওকে আর একে (নিজদেহকে) অভিন্ন জানবে।" তদবধি যোগীন-মা সন্দেহমুক্ত হইলেন এবং তিনি শ্রীমায়ের প্রতি অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন। তিনি মায়ের প্রকট লীলাকালে বহুবার জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি জয়রামবাটীতে যাইয়া পূজা ও উৎসবের সর্ববিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তিনি সন্দেহাদি-ভঞ্জন বা নূতন আলোকলাভের আশায় মাতাঠাকুরানীর দ্বারস্থ হইতেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতেন। মায়ের অনুপস্থিতিকালে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা সারদানন্দের নিকট স্বীয় সমস্যা লইয়া উপস্থিত হইতেন।

স্ত্রীভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ ও ব্যবহারাদির ইতিহাস তাঁহার স্মৃতিশক্তিবলে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এবং প্রয়োজনস্থলে হুবহু পুনরুজ্জীবিত হইত। এই সব কথা অন্য গ্রন্থ বা অপর

কাহার নিকট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; এইজন্য 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচনাকালে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার নিকট অশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। গ্রন্থের বহু স্থলে তাঁহার বর্ণনা, এমন কি, ভাষা পর্যন্ত অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ঐ-সকল স্থলে যোগীন-মার নামোল্লেখ না থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, তিনি যেন আমাদের সম্মুখে দেহপরিগ্রহপূর্বক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রতিমাসে 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যোগীন-মাকে উহা শুনাইয়া তাঁহার মতামত লওয়া হইত এবং নিরভিমান গ্রন্থকার তদনুযায়ী উহার পরিবর্তনাদি করিয়া দিতেন।

যোগীন-মার দৈনন্দিন জীবন বড়ই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি স্নানাহ্নিকান্তে নিত্য 'মায়ের-বাটী'তে আসিয়া ঠাকুরের দুই বেলার ভোগের জন্য তরকারি কুটিতেন এবং অন্যান্য কার্যসমাপনান্তে অদূরবর্তী স্বগৃহে গমনপূর্বক রন্ধন করিয়া উহা গৃহদেবতার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদন করিতেন। পরে স্বীয় জননী ও অন্যান্য সকলকে খাওয়াইয়া ও স্বয়ং আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও পুরাণাদি শ্রবণান্তর পুনর্বার শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সাধ্যমত তাঁহার সেবাদি করিতেন। অবশেষে মায়ের বাটীতে রাত্রের ভোগ সমাপ্ত হইলে তিনি স্বগৃহে ফিরিতেন। বস্তুতঃ শ্রীমায়ের এইরূপ সেবা যোগীন-মার জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীমাও তাঁহার এবং গোলাপ-মার এই সেবায় তুষ্ট হইয়া এক সময় বলিয়াছিলেন, "গোলাপ-যোগীন না থাকলে কলকাতা থাকা হবে না।"

যোগীন-মার একটি সদ্গুণ ছিল দীনদুঃখীদের প্রতি অসীম হৃদয়বত্তা। মায়ের বাটীতে ভিখারী আসিয়া রিক্তহস্তে ফিরিত না; তাই গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন, "যোগীন পয়সা দিয়ে দিয়ে এমন করেছে যে, এখন ভিখারী এলেই পয়সা চায়—বলে, 'মা, এখানে আমরা একটি করে পয়সা পেয়ে থাকি।" তীর্থাদিতে তিনি যথেষ্ট অর্থ বিতরণ করিতেন ও লোকজনদের

খাওয়াইতেন। জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানে মায়ের জনগণের সেবাদিতেও তিনি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতেন।

যোগীন-মা গৃহে বাস করিলেও তন্ত্রসাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট কৌলসন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক তান্ত্রিক দেবীপূজার গুহ্য তত্ত্ব শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং নিষ্ঠাসহকারে তদনুরূপ সাধনও করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার গৃহে প্রতি বৎসর ৺জগদ্ধাত্রীপূজায় আগমন করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণও সানন্দে যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা যোগীন-মার দেবীভক্তির সহিত একটি অতি মনোহর উদারভাবও মিশ্রিত ছিল। তাঁহার শয়নকক্ষের দেওয়ালে বহু দেবদেবী ও সাধুর ছবি শোভা পাইত। শীতলা, ষষ্ঠী, গোপাল প্রভৃতি অনেক দেবতাই তাঁহার পূজা পাইতেন। তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার_পরিণতিস্বরূপে তিনি স্বামী সারদানন্দের নিকট বৈদিক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; ঐ অনুষ্ঠানে স্বামী প্রেমানন্দও উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও তিনি অপরের নিকট উহা প্রকটিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তাই গেরুয়া পরিধান করিতেন শুধু পূজাকালে—অন্য সময়ে শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে একদা বলিয়াছিলেন, "ও কুঁড়ি—ফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে! ও যে সহস্রদল পদ্ম! ধীরে ধীরে ফুটবে।" এই মহাবাণী যোগীন-মার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছিল।

সাধনজগতের আনন্দের কথা ছাড়িয়া দিলে যোগীন-মার শৈশব ভিন্ন সমস্ত জীবনই দুঃখময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কন্যা গণু বিধবা হইলেন। তিন বৎসর পরে একটি দৌহিত্রের মৃত্যুর পর যোগীন-মা কাশীধামে উপস্থিত হইয়া কন্যাটিরও কাশীপ্রাপ্তি স্বচক্ষে দেখিলেন, এবং অনাথ দৌহিত্রত্রয়কে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। এই অসহায় বালকদের আত্মীয়স্বজন থাকিলেও তাঁহাদের দ্বারা উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাদীক্ষা অসম্ভব জানিয়া যোগীন-মা স্বামী সারদানন্দের

সাহায্যে ইহাদের প্রতিপালনের ভার স্বহস্তে লইলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহাদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও তিনি কখনও তাহাদিগকে বলপূর্বক রামকৃষ্ণভাবে প্রভাবান্বিত করার বৃথা চেষ্টা করিতেন না। তথাপি তাঁহার দেহত্যাগের ছয় মাস পূর্বে সবকনিষ্ঠ দৌহিত্রটি তাঁহাকে জানায় যে, সে সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক। তখন তিনি তাহাকে সন্ন্যাসজীবনের দুঃখকষ্টের কথা সমস্ত খুলিয়া বলেন; কিন্তু ইহাতেও সে নিরস্ত না হইলে তাহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করেন। ১৯১৪ অব্দে যোগীন-মার মাতা গঙ্গালাভ করেন। যোগীন-মাই ছিলেন বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাঁহার এই দারুণ শোকের অবধি ছিল না।

দেহত্যাগের পূর্বে যোগীন-মা দুই বৎসর বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি প্রায় প্রত্যহ সুমধুর কণ্ঠে 'গোপাল, গোপাল' উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এই যুগে গোপালভাবে সাধনা বিশেষ ফলদায়ক; তাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেও যোগীন-মার জীবনে এই অপূর্ব পরিণতি ঘটিয়াছিল। শেষ দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই তিনি ভগবান ব্যতীত আর সমস্তই যেন ক্রমে ভুলিতে থাকিলেন —শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গগণের স্মৃতি কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সদা জাজ্বল্যমান রহিল। দু-তিন দিন বাক্যালাপ বন্ধ আছে এবং তরল খাদ্যগ্রহণেও তাঁহার সম্পূর্ণ অসম্মতি রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসককে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন, ইহা রোগজনিত আচ্ছন্নতা কিনা। ডাক্তার বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া জানাইলেন যে, তিনি ঐরূপ কোনও লক্ষণ দেখিতেছেন না। তখন স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত সকলকে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, "ব্যাকুল হয়ো না গো! মরণকালে

তোমার সহস্রদল পদ্ম বিকশিত হয়ে তোমায় পরম জ্ঞান দান করবে।" অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন, বুধবার ঠাকুরের নৈশ ভোগাদির পরে যখন সকলে কর্তব্যমুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত, তখন শেষ মুহূর্ত আগত দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ তাঁহার মস্তকপার্শে বসিয়া গম্ভীর স্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন। তদবস্থায় যোগীন-মা রাত্রি ১০-২৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মিলিত হইলেন।

# গোলাপ-মা

শোক, এমন কি, মর্মন্তুদ শোক সকলের জীবনেই আছে। কিন্তু যে শোক আর্ত ব্যক্তিকে সাধুসঙ্গপ্রাপ্তি করাইয়া ক্রমে ভগবদ্ভক্তি আস্বাদন করায় তাহা অধিকারীরই আধ্যাত্মিক মাধুর্যের দ্যোতক। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী'—এই ছদ্ম নামেই 'কথামৃতে' গোলাপ-মার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; অথচ একটু মনোযোগসহকারে এই পূত জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদে ভূষিতা এক মহীয়সী মহিলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

কুলীন ব্রাহ্মণবংশে সমর্পিতা শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবীর অবস্থা সচ্ছল ছিল না; বিশেষতঃ একটি পুত্র ও চণ্ডী নাম্নী একটি কন্যা রাখিয়া স্বামী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তিনি বিশেষ বিপন্না হইলেন। পুত্রটি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে আরও দুঃখে নিমগ্না করিল। অতঃপর কন্যাটি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার জীবন সুখময় করিবার আশায় তিনি কুলমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার লোকপ্রথিত ঠাকুরবংশের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রিয় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। দুহিতাটি সুশ্রী ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিল; কিন্তু ভবিতব্যকে কে সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করিতে পারে? তাই গোলাপ-মার সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া এই কন্যারত্ন অকালে তাঁহার নিকট হইতে চিরবিদায় লইল। শোকাতুরা ব্রাহ্মণী তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

গোলাপ-মা পূর্ব হইতেই সমপল্লীবাসিনী শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিতা শ্রীমতী যোগীন-মার সহিত সুপরিচিতা ছিলেন। এরূপ শোকের শান্তি শুধু দক্ষিণেশ্বরেই হইতে পারে, এই বিশ্বাসে যোগীন-মা একদিন তাঁহাকে

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে উপস্থিত করিলেন। যোগীন-মার আশা সফল হইল—ঠাকুরের দিব্যালাপ-শ্রবণে গোলাপ-মার শোক প্রশমিত হইতে থাকিল। একদিনের কথা—সেদিন (১৩ই জুন, ১৮৮৫) শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন; শোকাতুরা ব্রাহ্মণী উত্তরের দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উপদেশামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর ক্রমে তাঁহার বাল্যসখা শ্রীরাম মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু ও তজ্জন্য শ্রীরামের শোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জন্ম-মৃত্যু এ-সব ভেলকির মতো; এই আছে, এই নাই। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। ...তাঁর উপর কি ক'রে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন ক'রে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর—শোক ক'রে কি হবে?" কথাগুলি শোকাতুরা ব্রাহ্মণীকে প্রত্যক্ষভাবে না বলিলেও, ইহার তাৎপর্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যদি এইরূপ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে উহা ব্রাহ্মণীর কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ করিত কিনা সন্দেহ। তিনি হয়তো ভাবিতেন, "আবাল্য সংসার-সম্পর্কহীন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মুখে এইরূপ বৈরাগ্যের বাণী শোভা পাইলেও, আমার ন্যায় শোকতাপগ্রস্ত সংসারীর পক্ষে উহা আকাশের চাঁদ পাওয়ার কল্পনার মতোই।" কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইল। উপদেশের সহিত মানবসুলভ হৃদয়ের বিকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী সেদিন মুগ্ধ হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব হইলে সকলেই যখন চুপ করিয়া আছেন, তখন সে ব্যথাপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শোকার্তা বলিলেন, "তবে আমি আসি!" অমনি দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ সস্নেহে বলিলেন, "তুমি এখন যাবে? বড় দূর!—কেন, এদের সঙ্গে গাড়ি ক'রে যাবে।" সেদিন জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি—বেলা তিনটা।

আর একদিনের কথা (২৮শে জুলাই, ১৮৮৫)। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন শ্রীযুত নন্দবসু মহাশয়ের বাড়ি হইয়া ব্রাহ্মণীর

গৃহে পদার্পণ করিবেন; তাই ব্রাহ্মণী সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছেন। যথাসময়ে সংবাদ আসিল, ঠাকুর নন্দবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। শুনিয়া ব্যাকুল-চিত্তে ব্রাহ্মণী ঘর-বাহির করিতেছেন—বুঝি বা এখনই আসিবেন। আবার দেরি হইতেছে দেখিয়া বুক সন্দেহে কাঁপিয়া উঠিতেছে—হয়তো তিনি আসিবেন না। বাড়িটি ইষ্টকনির্মিত হইলেও পুরাতন। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী—উভয়েই বিধবা। একই বাটীতে ভ্রাতারাও সপরিবারে বাস করেন। বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণী নন্দবসুর বাটীতে সংবাদ লইতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তথায় আসিয়া সহাস্যবদনে ভক্তগণসহ ছাদে আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার ভগিনী উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামান্তে কি করিবেন, কিরূপে প্রাণের আবেগ জানাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো! ...ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সেপাই-সান্ত্রী সঙ্গে ক'রে, ...তখন যে এত আহ্লাদ হয় নি গো! ওগো, চণ্ডীর শোক একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্লুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব, আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না; যেখানে আসবেন, একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব, দেখে চলে আসব। যাই—সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা ... ওগো, (স্ফূর্তি) খেলাতে একটি টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল; সে যাই শুনলে একলাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে গিছল। ওগো, আমার যে তাই হ'ল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব" ('কথামৃত', ৩।১৯।১)।

ব্রাহ্মণীর আর্তিদর্শনে মুগ্ধ জনৈক ভক্ত তাঁহার পদধূলি লইলেন, ব্রাহ্মণীও প্রতি-প্রণাম করিলেন। এইরূপ উচ্ছ্বাস চলিতেছে, এদিকে রন্ধননিরতা ভগিনী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন, "দিদি, এস না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয়? নীচে এস—আমরা কি একলা পারি?" আনন্দে আত্মহারা ব্রাহ্মণী তখন সংসার ভুলিয়া ঠাকুর ও ভক্তদিগকে দেখিতেছেন। এই বিহ্বলতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্রাহ্মণী অতি ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন কবিলেন; ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া মিষ্টমুখ করিলেন। রাত্রি আটটার সময় ঠাকুরের বিদায়গ্রহণকালে ব্রাহ্মণী বাড়ির সকলকে ডাকিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করাইলেন। ঠাকুর এখান হইতে 'গণুর মা'র বাটীতে উপস্থিত হইলেন; ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেখানে সামান্য জলযোগেব পর ঠাকুর বলরামের বাটী যাইলে ব্রাহ্মণীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অবশেষে সকলে বিদায় লইলে ব্রাহ্মণীর কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, "আহা, এদের কি আহ্লাদ!" মাস্টার অমনি কহিলেন, "কি আশ্চর্য! যীশুখ্রীষ্টের সময়েও ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারাও দুটি বোন—মেরি আর মার্থা।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের গল্প শুনিতে উৎসুক হওয়ায় মাস্টার বাইবেল-অবলম্বনে তাঁহাদের অপূর্ব কাহিনী শুনাইলেন—যীশু ভগিনীদ্বয়ের গৃহে সমাগত হইলে এক ভগিনী ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া যীশুর পদপ্রান্তেই বসিয়া রহিলেন; আর অপর ভগিনী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রভুর আহারাদির উদ্যোগ করিতে করিতে অভিযোগ করিলেন, "প্রভু, দেখুন তো, দিদির কি অন্যায়। উনি এখানে চুপ ক'রে বসে আছেন, আর আমায় একলা সব করতে হচ্ছে!" যীশু উত্তর দিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি শত চিন্তা ও শত ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছ; কিন্তু জীবনে একটা জিনিসের তবু অভাব আছে। মেরি সেই শ্রেয়ঃটিকেই বেছে নিয়েছে, যা তাকে কোনদিন হারাতে হবে না" (লুক, ১০।৩৮-৪২)

এই ব্যথিত অথচ ভগবদেকশরণ হৃদয়টিতে ঠাকুর কত ভাবেই না শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি ওকে খুব পেট ভ'রে খেতে দেবে—পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে;" "তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন করো; এ-ই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।" আর গোলাপ-মাকে তিনি শ্রীমায়েব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" তাই প্রথম হইতেই গোলাপ-মা মাঝে মাঝে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের স্নেহাশীর্বাদের সহিত মায়েরও মমতাস্পর্শে ধন্য হইলেন। নহবতে বাসকালে গোলাপ-মা ঠাকুরের সহিত সুদীর্ঘ আলাপের সুযোগ পাইতেন; শ্রীশ্রীমাও ঐরূপ অবকাশদানেরই জন্য যেন আহার্য-সামগ্রী ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য গোলাপ-মার হাতে দিতেন। একদিন ভাতের থালা সম্মুখে স্থাপনপূর্বক গোলাপ-মা নিকটে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরের আহার নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিতেছেন, তখনই ভিতর হইতে কে যেন সাপের মতো ছোবল মারিয়া উহা গিলিয়া ফেলিতেছে। দেখিয়া তিনি তো হাসিয়া আকুল। ঠাকুর অমনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো? বল দেখি, আমি খাচ্ছি, না কে খাচ্ছে?" গোলাপ-মা যাহা দেখিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিলে ঠাকুর খুশী হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। তুমি ব'লে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ"—ইহা বলিয়া গোলাপ-মাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন, "সর্পাকারা কুণ্ডলিনীর আহুতিগ্রহণ বলে না? এ তাই দেখেছিলুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে আনা হইলে তাঁহারও ও সেবক ভক্তদের রন্ধনাদির বিষয়ে গোলাপ-মা সাহায্য

করিতেন। পরে মাতাঠাকুরানী আসিয়া ঐ কার্যভার লইলে গোলাপ-মা তাঁহারও সহায় হইতেন। কাশীপুরেও তিনি মাঝে মাঝে ঐরূপ করিতেন। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবাকেই জীবনের প্রধান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করায় কোনরূপ অপমানাদিতে তিনি বিচলিত হইতেন না। ঐ সময়ে কেহ কেহ স্বীয় প্রকৃতিবশে হয়তো অদোষদর্শী ঠাকুরের নিকট গোলাপ-মার বিরুদ্ধে বলিতেন। ঠাকুর শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু গোলাপ-মা স্বপ্নযোগে সব জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য! সেই সময় কেউ ঠাকুরের কাছে আমার নামে কোন কথা লাগালে স্বপ্নে দেখতুম, ঠাকুর সে-সব আমাকে বলে দিচ্ছেন, 'ওগো, তোমার বিরুদ্ধে এই-সব কথা বলেছে। তুমি বল, অমুক (জনৈক স্ত্রীলোকের নাম করিয়া) তোমাকে খুব ভালবাসে, সেও এই-সব বলেছে।' সমস্ত রাত্রি ঠাকুরকেই স্বপ্নে দেখতুম।" এই-সব জানিয়াও তাঁহার মন নির্বিকার থাকিত। বস্তুতঃ এই সহনশীলতা তাঁহার জীবনে সর্বদাই পরিলক্ষিত হইত। উত্তরকালে বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁহাকে অনেক অল্পবয়স্ক সাধুর তত্ত্বাবধান করিতে হইত, তখন তাঁহার কঠোর শাসনের প্রতিবাদে বয়সোচিত অবিবেচনাবশতঃ কোন যুবক হয়তো এমন রুক্ষ কথাও বলিয়া ফেলিতেন যাহাতে গোলাপ-মাকে অশ্রুবিসর্জন করিতে হইত; তথাপি 'সতের রাগ জলের দাগ'—গোলাপ-মা সেই স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া পুনর্বার সকলের সহিত মাতৃবৎ আচরণ করিতেন।

ইহার সঙ্গে ছিল তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ—নিজের দোষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা। শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর একদিন সকালে চা-পানের সময় অল্পবয়স্ক সাধুদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "মা কাল দেখা দিয়ে বললেন, 'তুমি ওদের আর ব'কো না।' এই সন্দেশগুলো তোমরা খাও।" সাধুরা গোলাপ-মার শাসনকে অনেকটা দিদিমার ভর্ৎসনা

হিসাবেই গ্রহণ করিতেন; তাই সেদিনকার স্নেহমিশ্রিত দুঃখপ্রকাশের উত্তরে সোৎসাহে বলিলেন, "গোলাপ-মা, রোজ যদি সন্দেশ খাওয়ান তো রোজই আমাদের বকুন—তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না।"

তবে গোলাপ-মার একটি বিশেষত্ব ভুক্তভোগীর নিকট দোষরূপেই প্রতিভাত হইত—তিনি ছিলেন বড় স্পষ্টবক্তা। তাঁহার বেপরোয়া সত্যবাদিতায় সন্ত্রস্তা হইয়া শ্রীশ্রীমা কখন কখন বলিয়া উঠিতেন, "ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার? 'অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়।" মা বলিতেন, "গোলাপের সত্য কথা বলতে গিয়ে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেছে।" বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সত্যবাদিতার আদর শুধু নিজ প্রিয়জনের মধ্যেই হইতে পারে—অপরে অতটা সহ্য করিবে কেন? কাজেই যথার্থ কথা বলিতে গিয়া তাঁহাকে যে অনেক ক্ষেত্রে অপরের অপ্রিয়ভাজন হইতে হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তবে ঠাকুর ও মায়ের কথা আলাদা। ঠাকুর শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া শ্যামপুকুরে চলিয়া গেলে গোলাপ-মা অপরের যুক্তিতে বিশ্বাস করিয়া বসিলেন যে, মায়ের উপর রাগ করিয়াই ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট এই মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া শ্রীমা শ্যামপুকুরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহাকে এ-সব কাল্পনিক কথা গ্রাহ্য না করিতে বলিয়া ও সান্ত্বনা দিয়া দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন এবং গোলাপ-মা পুনরায় আসিলে তাঁহাকে ভর্ৎসনান্তে শ্রীমায়ের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। গোলাপ-মা তদনুসারে মায়ের নিকট ক্ষমা চাহিতেই মা "গোলাপ গো" বলিয়া তাঁহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন। ইহাতেই গোলাপ-মার ক্ষোভ বিদূরিত হইল।

ফলতঃ ইঁহাদের সম্বন্ধ কোন বাহ্য ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, দৈবনির্দেশেই ইঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন। এইরূপ অবিবেচনার সহিত গোলাপ-মার আপ্রাণ মাতৃসেবার কথা ভাবিলেই কথাটির যাথার্থ্য

হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে শ্রীমা যখন অতিদুঃখে কামারপুকুরে নিঃস্ব জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন লোক-পরম্পরায় ঐ সংবাদ পাইয়া গোলাপ-মা অগ্রণী হইয়া ভক্তদের সাহায্যে তাঁহাকে কলিকাতায় আনান এবং তদবধি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের তীর্থদর্শন বা কলিকাতায় অবস্থানকালে গোলাপ-মা তাঁহার পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় ঘুরিতেন, এমন কি, জয়রামবাটীতেও বহুবার তাঁহার সহিত বাস করিয়াছিলেন। এই-সব সময়ে গোলাপ-মা সানন্দে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন এবং পরে বহু ভক্তাদির যাতায়াত আরম্ভ হইলে তিনি মায়ের বিশাল পরিবারে প্রকৃত গৃহিণীর আসন অধিকার করিলেন। অবিবেচক ভাবপ্রবণ ভক্তদের আবদার হইতে স্পষ্টবাদিনী গোলাপ-মাই শ্রীমাকে রক্ষা করিতে পারিতেন। একবার জনৈক ভক্ত ধূপধুনা জ্বালিয়া মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদিসহ ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পূজা ও স্তব করিতে থাকিলে তিনি ঘর্মক্লিষ্ট হইয়াও সঙ্কোচে কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় গোলাপ-মা কার্যান্তর হইতে তথায় আসিয়া সমস্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিয়াই দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমরা কি কাঠ-পাথরের ঠাকুর পেয়েছ গা?" বলিয়া ভক্তকে সরাইয়া দিলেন। গোলাপ-মার এই সেবা ও প্রীতিপূর্ণ দৃঢ়তা শ্রীশ্রীমাকে অন্যক্ষেত্রেও রক্ষা করিত এবং নানাভাবে সাহায্য করিত বলিয়া মা কোথাও যাইতে হইলে গোলাপ-মাকে সঙ্গে লইতেন; বলিতেন, "গোলাপ না গেলে কি আমি যেতে পারি? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা।" ইহা যে শুধু মায়িক সম্বন্ধ নহে তাহা শ্রীশ্রীমা স্বমুখেই বলিয়াছিলেন, "এই গোলাপ, যোগেন কত ধ্যানজপ করেছে! গোলাপ জপে সিদ্ধ;" "যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।"

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত গোলাপ-মা বৃন্দাবন, পুরী, কোঠার, কৈলোয়ার, কাশী, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু স্থানে গিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল অবস্থানও

করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও বেলুড়ের ভাড়াবাড়িগুলিতেও তিনি মায়ের সহচারিণী ছিলেন; অতঃপর বাগবাজারে মায়ের জন্য স্থায়ী বাটী নির্মিত হইলে তথায় গোলাপ-মার অবশিষ্ট জীবন ব্যয়িত হয়। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, মা ও ভক্তদের আহারাদিব ব্যবস্থা করাই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য। বয়স্ক ভক্তদের প্রণামের সময় লজ্জাপটাবৃতা মাতাঠাকুরানী অনুচ্চ স্বরে যে কুশলপ্রশ্ন বা আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেন, গোলাপ-মা তাহা স্পষ্টভাবে তাঁহাদের শ্রুতিগোচর করাইতেন। কোথাও যাতায়াতের সময় দেখা যাইত যে, মা গোলাপ-মার হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামিতেছেন বা নববধূর ন্যায় গোলাপ-মার আঁচলটি ধরিয়া চলিয়াছেন।

গোলাপ-মাব ব্যক্তিগত জীবন ছিল তপোময়, অথচ কর্মবহুল। বাগবাজারে মায়েব বাটীতে অবস্থানকালে দেখা যাইত যে, তিনি রাত্রি চারি ঘটিকার পূর্বেই শয্যাত্যাগান্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্বগৃহে জপারাধনায় বসিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা এইভাবে অতিবাহিত হইলে ঠাকুরঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীকে প্রণামানন্তর তিনি নীচে নামিয়া আসিতেন ও দৈনিক রন্ধনের দ্রব্যসম্ভার ভাণ্ডার হইতে বাহিব করিয়া তরকারি কুটিতে বসিতেন। ঐ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই শ্রীশ্রীমাকে গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইতে হইত। স্নানান্তে তিনি পূজার জন্য গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী আনিয়া ঠাকুরঘরে রাখিতেন এবং আবার তরকারী কুটিতে বসিতেন। পরে পান সাজিতেন। তখন ঐ বাটীতে পানখরচ হইত প্রচুর; অতএব গোলাপ-মাকেও ঐ কার্যে বেশ কিছুক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে হইত। ঠাকুরের নিত্যপূজা হইবার পর তিনি সকলকে প্রসাদ-বিতরণ করিয়া দিতেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর একটু বিশ্রামান্তে তিনি গীতা, মহাভারত বা স্বামীজীর গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অথবা রাত্রের রান্নার জন্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, কিংবা সাধুদের ছিন্ন মশারি প্রভৃতি সেলাই করিতেন। সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীশ্রীমা প্রভৃতির সহিত সদালাপ

করিতেন ও জপ করিতেন। সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হইলে পুনর্বার ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে রাত্রি নয়টা সাড়ে নয়টা পর্যন্ত জপাদিতে নিমগ্ন থাকিতেন। রাত্রেও আহারকালে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত, সকলে সকল জিনিস এবং প্রত্যেকের রুচির অনুরূপ দ্রব্যাদি পাইল কিনা। কেহ হয়তো কার্যানুরোধে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই; সেদিন ঠাকুরের ভোগের জন্য বিশেষ কিছু আসিয়া থাকিলে গোলাপ-মা অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভাগটি তুলিয়া রাখিতেন।

ভক্ত-ভগবানের সেবারাধনায় নিবেদিতপ্রাণা গোলাপ-মা গৃহের সমস্ত দ্রব্যসম্ভারের তত্ত্বাবধান করিতেন ও হিসাব রাখিতেন। বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সাধু-ব্রহ্মচারী অনবধানতাবশতঃ যথাতথা অপরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ফেলিয়া রাখিলে তিনি তাহা পরিষ্কার করাইয়া গুছাইয়া রাখিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা ছিল—"অপচয় করতে নেই, অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন।" তাই তিনি ভাঙ্গা অব্যবহার্য পাত্রাদি বদলাইয়া নূতন বাসন আনিতেন। ভক্তদের আহারের পর পাত্রে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কিংবা তরকারির খোসা রাস্তার গরুকে দিতেন; এমন কি কমলালেবুর খোসা কিংবা আকের ছিবড়া শুকাইয়া রাখিতেন—উনুন ধরাইতে প্রয়োজন হইবে বলিয়া। পান-সাজা হইয়া গেলে বোঁটাগুলি গিনিপিগদের খাইতে দিতেন। ইহার কারণ ঐগুলির প্রতি তাঁহার ভালবাসা নহে, কিন্তু উহারা পানের বোঁটা ভালবাসে, তাই ঐ ভাবে উহার সদ্ব্যবহার করিতেন।

পাঠক যেন মনে করিবেন না, ইহা তো প্রতি গৃহস্থ-ঘরের বৃদ্ধারাই করিয়া থাকেন—ধর্মজীবনের অনুধ্যানকালে এই-সবের অবতারণা কেন? ইহার উত্তরে আমরা তাঁহাকে একবার স্মরণ করিতে বলি—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকার্য কিরূপ সুশৃঙ্খল ছিল এবং ভক্তদের সুখসুবিধার প্রতি তাঁহার

কতখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিত ; আর তাঁহাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি—স্বামীজীর শিক্ষাগুণে বর্তমান যুগে কর্ম কিরূপে সেবা ও পূজায় পরিণত হইয়াছে। গোপাল-মা অন্তরে অন্তরে জানিতেন, তিনি যে-কার্যে নিযুক্ত আছেন, উহা তাঁহার নহে, উহা ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের। অতএব কোনও কার্যের সহিত স্বার্থ বিজড়িত না থাকায় উহা তাঁহাকে বিমল আনন্দের অধিকারী করিত।

দানে ছিলেন তিনি মুক্তহস্তা। তাঁহার দৌহিত্র তাঁহাকে মাসিক যে দশটি টাকা দিতেন, উহার অর্ধাংশ স্বীয় আহারাদির জন্য তিনি মায়ের বাটীতে দিতেন ; বাকী অর্ধাংশ দীন-দুঃখীর অভাবমোচনেই ব্যয়িত হইত। অভাবগ্রস্তেরা জানিত যে, গোলাপ-মার নিকট উপস্থিত হইলে একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইবে না—'মা' বলিয়া ডাকিলেই উপর হইতে কিছু পড়িবে। এক পাগলী ছিল—সে আসিয়াই হাঁকিত, "গোলাপের মা, আমি এসেছি।" তাহার আগমনের সময়াসময় ছিল না ; কখন বা রাত্রে সকলের শয্যাগ্রহণের পর আসিয়া উপস্থিত! সম্মুখের দরজায় সুবিধা হইল না দেখিয়া পশ্চাতের দরজায় গিয়া ডাক শুরু করিল, "গোলাপের মা।" গোলাপ-মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এত রাতে তোকে কি দিই?" শেষ পর্যন্ত দিলেন কিন্তু কিছু, আর বলিলেন, "আহা, পাগল অনাথ, দোরে দোরে মেগে খায় ; সময় হোক অসময় হোক, এলে একমুঠো দিতে হয়!" এমনও দেখা গিয়াছে, অপরের অভাব দূর করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। আবার অন্যকেও তিনি এরূপ সেবায় আহ্বান করিতেন ; এইরূপে দরিদ্র প্রতিবেশীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকাইয়া আনিতেন। অথচ নিতান্ত অসমর্থ না হইলে স্বয়ং কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না।

সিদ্ধির উচ্চস্তরে আরূঢ়া বিধবা ব্রাহ্মণী গোলাপ-মা অর্থহীন কিংবা উচ্চাবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন বহু সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগপূর্বক এক অপূর্ব

উদারভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ অসুখের পর অরুচি-দূরীকরণার্থে শ্রীশ্রীমা একদিন সেবককে একটু ডাঁটা-চচ্চড়ি আনিয়া দিতে বলিলেন। অব্রাহ্মণ সেবক মায়ের আদেশে চুপি চুপি উহা আনিয়া দিলেন। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে গোলাপ-মা আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "শূদ্রের হাতের সকড়ি জিনিস খাচ্ছ কি ক'রে, মা ?" মা বুঝাইয়া দিলেন, "ভক্তের আবার জাত আছে ?" পরক্ষণেই মায়ের মুখের প্রসাদী ডাঁটা মুখে পুরিয়া গোলাপ-মা নীরবে বিদায় লইলেন।

গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত পায়খানা পরিষ্কার করিয়া হয়তো পরমুহূর্তেই ঠাকুর-ঘরের কার্যে যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী একদিন মায়ের নিকট অভিযোগ জানাইলেন, "গোলাপ-দিদি পায়খানা সাফ ক'রে এসে আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল ; আমি বললুম, 'ও কি গোলাপ-দিদি; গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস।' গোলাপ-দিদি বললে, 'তোর ইচ্ছা হয় তুই যা না !' সমস্ত শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "গোলাপের মন কত শুদ্ধ—কত উঁচু মন ! তাই ওর অত শুচি-অশুচির বিচার নেই—অত শুচিবাই-টাইয়ের ধার ধারে না। ওর এই শেষ জন্ম। তোদের অমন মন হ'তে আলাদা দেহ দরকার।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাই রামপ্রসাদ-বিরচিত গানটি গাহিতেন—

"শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি ?
(তাদের) দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।"

গোলাপ-মার শুদ্ধ মন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন— "বৃন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে আমরা দর্শন করতে গেছি—সঙ্গে ছেলে যোগেন এরা সব। কাদের ছেলে মেয়ে যেন নোংরা ক'রে দিয়ে গেছে। সবাই নাক সিটকুচ্ছে, কিন্তু কেউ পরিষ্কারের চেষ্টা কচ্ছে না। গোলাপ তা দেখে অমনি নিজের নূতন মকমলের ধুতি ছিঁড়ে পরিষ্কার করলে।

মাগীগুলো দেখে বলছে, 'এ যখন ফেলেছে, তবে এরই ছেলে নোংরা করেছে রে।' আমি মনে মনে বলছি, 'মাধব, দেখ দেখ, কি বলছে!' কেউ বা বলছে, 'এঁরা সাধুলোক, এঁদের আবার ছেলে পিলে কি? এঁরা ফেলছেন সব্বায়ের দর্শনের অসুবিধা হচ্ছে—মন্দিরে ময়লা রয়েছে এজন্য।' এই গঙ্গার ঘাটেই যদি কোন ময়লা দেখে তো গোলাপ হেথা-সেথা থেকে ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কার ক'রে ঘটিঘটি জল ঢেলে ধুয়ে দিলে। এতে দশজনের সুবিধা হ'ল। তারা যে শান্তি পেলে ওতে গোলাপেরও মঙ্গল হবে—তাদের শান্তিতে এরও শান্তি হবে। অনেক সাধন-তপস্যা করলে, পূর্বজন্মের বহু তপস্যা থাকলে তবে এজন্মে মনটি শুদ্ধ হয়।"

আর গোলাপ-মার ছিল অপূর্ব গঙ্গাভক্তি। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যষ্টিসাহায্যে নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন। দেহত্যাগের জন্য তিনি প্রস্তুতই ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই স্ত্রীভক্তদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "যোগেন যাবে শুক্লপক্ষে আর আমি যাব কৃষ্ণপক্ষে।" ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪), কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অপরাহ্ণ চারিটার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একনিষ্ঠ সেবিকা প্রায় ষাট বৎসর বয়সে বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করিলেন।

# গৌরী-মা

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে প্রশ্ন করিতেছেন, "গৌর-মা কোথা? এক হাজার গৌর-মার দরকার—ঐ noble stirring spirit (মহতী ও চেতনাদায়িনী শক্তি)।" গৌরী-মার ইহা অতি উত্তম পরিচয়। গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা নানাভাবে অভিহিত হইতেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি ছিলেন 'গৌরদাসী'। স্বামীজীর পত্রাবলীতে ইহারই রূপান্তর 'গৌর-মা' নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভক্তমহলে ইহাই ছিল তাঁহার মধ্যম বয়সের প্রচলিত নাম। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নাম হয় 'গৌরীপুরী' তাই জনসাধারণের নিকট তিনি পরে 'গৌরী-মা' বলিয়াই পরিচিত হন। স্বীয় ভক্তদের তিনি ছিলেন 'মাতাজী'; আবার পিতৃগৃহে তাঁহার নাম ছিল 'মৃড়ানী' বা 'রুদ্রাণী'।

মৃড়ানীর জন্ম হয় ভবানীপুরে মাতুলগৃহে। তাঁহার পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে বাস করিতেন এবং প্রত্যহ পূজার্চনান্তে সেখান হইতে খিদিরপুরে এক সওদাগরী অফিসে কার্য করিতে যাইতেন। নিষ্ঠাবান পার্বতীচরণের কপালে চন্দন দেখিয়া আফিসের সাহেব উপহাস করিলেও তিনি স্বধর্মচিহ্ন ত্যাগ করিতেন না। পার্বতীচরণের সহধর্মিণী গিরিবালা পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় পিতৃগৃহেই থাকিতেন। পার্বতীচরণেরও সপ্তাহে দুই-এক দিন শ্বশুর বাড়িতেই কাটিত। মৃড়ানী ছিলেন এই দম্পতির চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয়া কন্যা।

মাতা গিরিবালা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু স্তব ও ধর্মসঙ্গীত রচনাপূর্বক 'নামসার' ও

গৌরী মা

লক্ষ্মী দিদি

'বৈরাগ্য-সঙ্গীতমালা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার সুকণ্ঠোত্থিত স্বরচিত সঙ্গীতে ধর্মপিপাসুর মনে ভক্তির উদ্রেক হইত। এতদ্ব্যতীত তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক-অনুভূতিসম্পন্না সাধিকা। আবার বিষয়কর্মেও ছিল তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও দক্ষতা। শান্তপ্রকৃতি পার্বতীচরণ সহধর্মিণীকে বলিতেন, "এত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি? আমাদের তো কিছুর অভাব নেই। এ-সব আপদ ছেড়ে চল কাশী গিয়ে বাকী কটা দিন শান্তিতে কাটাই।" অমনি কালী-সাধিকা গিরিবালা সদর্পে বলিয়া উঠিতেন, "অন্যায়-অত্যাচার আমি নীরবে সইব কেন? মা অসুরনাশিনী আমার সহায়—আমার অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না, দেখে নিও।" পিতা ও মাতার এই ধর্মানুপ্রাণিত কুসুমকোমল ও বজ্রদৃঢ় স্বভাবের মিশ্রণে মৃড়ানীর চরিত্র বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মাতৃধ্যানে নিমগ্না গিরিবালা এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, মহামায়া যেন এক জ্যোতির্ময়ী রূপলাবণ্যসম্পন্না দেবকন্যাকে তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতেছেন। ইহারই পরে মৃড়ানী ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জন্মকাল অনিশ্চিত। তবে সম্ভবতঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৬৪ বঙ্গাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। মাস বা তিথিও অজ্ঞাত। তবে একসময়ে ভক্তগণ তাঁহার জন্মোৎসব করিতে আগ্রহান্বিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জন্মোৎসব তোরা যদি নিতান্তই করবি, তবে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথিতেই করিস।" ইহা তাঁহার জন্মতিথির পরিচায়ক না হইয়া সম্ভবতঃ তাঁহার নিরভিমানতারই দ্যোতক।

বাল্যকাল হইতেই মৃড়ানীর জীবনে ধর্মস্পৃহা ও বৈরাগ্যের আভাস পাওয়া যাইত। বালিকা আপনমনে দেবপূজাদিতে রত থাকিত, ক্রন্দনকালে দেবতার নাম শুনিয়া শান্ত হইত, আর ভিক্ষুককে কিছু না দিয়া ক্ষান্ত হইত না। আশৈশব সে নিরামিষাশী। তাহার বেশভূষায় মন ছিল না এবং কোন বিষয়ে যাচ্ঞাও ছিল না। একদিন অগ্রজের

সহিত নৌকাভ্রমণকালে তাহার মনে হইল, "অলঙ্কার তো বৃথা। এ-সব না থাকলে আমার কষ্ট হবে কি?" অমনি সোনার বালা খুলিয়া চিবাইয়া দেখিল উহাতে কোন স্বাদ আছে কিনা। তারপর অপরের অলক্ষিতে উহা জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। পাড়ার 'চণ্ডীমামা' জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি বালিকার হাত দেখিয়া বলিলেন, "এ মেয়ে যোগিনী হবে।" চণ্ডীমামার নিকট মৃড়ানী তাঁহার তীর্থভ্রমণের কথা তন্ময় হইয়া শুনিত এবং তাদৃশ পটভূমিকায় স্বীয় ভাবী জীবনের পরিকল্পনা রচনা করিত।

মৃড়ানীর জীবনের ভবিষ্যৎ পরিণতির একটা প্রত্যক্ষ পূর্বাভাসও পাইতে বিলম্ব হইল না। বালিকা যখন মাত্র দশমবর্ষীয়া, তখন সে এক সকালে ক্রীড়ারতা অপর সমবয়স্কাদের সহিত মিলিত না হইয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে নীরবে উপবিষ্ট ছিল; এমন সময় যদৃচ্ছাক্রমে আগত আজানুলম্বিতবাহু উদারদৃষ্টি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবাই খেলছে, আর তুমি যে বড় একলাটি চুপচাপ বসে আছ?" বালিকা ব্রাহ্মণচরণে প্রণাম করিয়া উত্তর দিল, "ওসব খেলা আমার ভাল লাগে না।" ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিলেন, "কৃষ্ণে ভক্তি হোক!" বালিকা তাঁহার ঠিকানা জানিয়া লইল ও কিছুদিন পরে অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের সহিত বরাহনগরে মাতৃষ্বসা বগলা দেবীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণের সন্ধান করিতে থাকিল এবং অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী নিমতে-ঘোলার এক কদলীবনে সেই ব্রাহ্মণকে ধ্যাননিরত দেখিতে পাইল। ধ্যানভঙ্গে সাধক তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এসেছিস?" তারপর এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং পরদিন গঙ্গাস্নানান্তে পুনর্বার উপস্থিত হইলে তাহাকে দীক্ষা দিলেন। সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা। এদিকে পরিবারের লোক বালিকাকে গৃহে না দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর

অবিনাশচন্দ্র নিমতে-ঘোলার সাধকসমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সাধক বলিলেন, "দেখ বাবা, ও ছেলেমানুষ, ওকে যেন কেউ বকো না। হলদে পাখী ধরে রাখা দায়।" বালিকা সাধকের ইঙ্গিতে গৃহে ফিরিল।

মৃড়ানী বাল্যকাল হইতেই ৺কালীভক্ত ছিলেন; তিনি নিত্য দেবীর পূজার্চনা করিতেন এবং নিদ্রাভঙ্গে দেবীর নাম লইতেন। এদিকে চণ্ডীমামার নিকট গৌরাঙ্গদেবের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার প্রতিও বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত মৃড়ানী একদিন মৃত্তিকানির্মিত শালগ্রাম-পূজায় রত হইলেন; তাদৃশ প্রতীকে পূজা করিতে নাই জানিয়াও নিবৃত্ত হইলেন না। নিমতে-ঘোলার সাধকের নিকট দীক্ষালাভের কিয়ৎকাল পরেই এক অপরিচিতা ব্রজরমণী মৃড়ানীর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে বালিকার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। ব্রজরমণী 'দামু', 'দামোদর' বা 'রাধা-দামোদর' নামীয় এক নারায়ণশিলাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজাদি করিতেন এবং তাঁহার সহিত অনুরূপ আচরণও করিতেন। বিদায়কালে তিনি সেই শিলা মৃড়ানীর হস্তে সমর্পণপূর্বক বলিলেন, "এই শিলা আমার ইহকালের ও পরকালের সর্বস্ব, বড় জাগ্রত ঠাকুর ইনি। তোমার প্রেমে ইনি মজেছেন।" তদবধি ব্রজরমণীর অনুকরণে মৃড়ানী দামোদরের পূজায় নিরত হইলেন, আর তাঁহার স্থির সঙ্কল্প হইল যে, এই ঠাকুরটিকেই জীবনমন অর্পণপূর্বক ধন্য হইবেন, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যপতি বরণ করিবেন না।

এই সময়ে (১৮৬৮ খ্রীঃ) কুমারী ফ্রান্সিস মেরিয়া মিলম্যানের কর্তৃত্বাধীনে উচ্চবর্ণের হিন্দুবালিকাদের জন্য ভবানীপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে মৃড়ানী উহাতে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই বিদ্যালয়ে সর্ববিষয়ে উত্তম ছাত্রী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় একটি স্বর্ণপেটিকা

পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুদারতানিবন্ধন অপর অনেক বালিকার সহিত তাঁহাকে অচিরে ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত অপর হিন্দুবিদ্যালয়ে যোগ দিতে হইল। অতঃপর মিশনরীরা বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন বটে; কিন্তু মৃড়ানীর আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হইল না। কারণ বিবাদের অবসান হইলেও হিন্দুসমাজ তখনও বালিকাদের অধ্যয়নসম্বন্ধে বড়ই সঙ্কীর্ণ ভাব পোষণ করিত। তথাপি ইতোমধ্যেই মৃড়ানী চণ্ডী, গীতা, বহু দেবদেবীর স্তোত্র, রামায়ণ, মহাভারত এবং মুগ্ধবোধব্যাকরণের অনেক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন।

বালিকার বয়স বাড়িতেছে, অতএব বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। পরন্তু বালিকার ধনুর্ভঙ্গপণ—তিনি "তেমন বরকেই বিবাহ করিবেন, যাহার মৃত্যু নাই।" পাত্রী দেখিতে আসিয়া পাত্র-পক্ষীয়গণ কন্যার রূপাদির প্রশংসা করিলেন; কিন্তু তাহার সৃষ্টিছাড়া কথা শুনিয়া গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা স্থির হইল যে, বালিকার ভগিনীপতি পানিহাটী-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের হস্তেই ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া মৃড়ানীকে অর্পণ করা হইবে। মৃড়ানী অমনি রুদ্রাণী সাজিলেন এবং বিবাহের রাত্রে আত্মরক্ষার জন্য একটি অর্গলবদ্ধ কক্ষে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক সর্বপ্রকার অনুনয়-বিনয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অবশেষে ইহাতেও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া জননীর সাহায্যে এক মাসীমার বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। আত্মীয়গণ তথাপি প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, ভগিনীপতির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে!

গৃহে প্রত্যাগতা মৃড়ানী পূজারাধনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে চণ্ডীমামার বর্ণিত তীর্থগুলি তাঁহাকে মৌন আহ্বান জানাইতেছিল; তাই প্রত্যুষে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু অনভ্যস্ত থাকায় বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই স্বজনবর্গের দৃষ্টিপথে পড়িয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া নজরবন্দী হইতে হইল। এই মুক্তিকামী

বালিকাকে গৃহে ধরিয়া রাখিতে হইলে অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি ও সাধু-দর্শনের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় অতঃপর তাঁহাকে কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবেই একদিন ভগিনী বগলা ও ভগিনীপতি প্রভৃতির সহিত তিনি সাগরসঙ্গমে চলিলেন—তাঁহার বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর। মেলার জনসমাগমের মধ্যে সুযোগ পাইয়া তৃতীয় দিবসে মৃড়ানী আত্মগোপন করিলেন। এদিকে বহু চেষ্টাতেও আত্মীয়গণ তাঁহার সন্ধান না পাইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে মৃড়ানী গুপ্তস্থান হইতে নির্গত হইয়া উত্তর-পশ্চিমদেশীয় একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সহিত পার্বত্যাঞ্চল-বাসিনীর বেশে হরিদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সাধুসঙ্ঘে তিনি 'গৌরী-মায়ী' নামে পরিচিতা হইলেন। ক্রমে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থানান্তে গৌরী-মা হিমালয়পাদমূলে হৃষীকেশে গমন করিলেন। স্থানটি তপস্যার অনুকূল; সুতরাং তিনি তথায় কৃচ্ছ্রসাধনায় রত হইলেন। পরে তাঁহার মন ৺কেদারবদরী প্রভৃতি দর্শনে ধাবিত হইল। উত্তরাখণ্ডের বহুজনবিশ্রুত ঐসকল তীর্থ দেখিয়া তিনি ৺অমরনাথ ও জ্বালামুখী প্রভৃতিও দর্শন করিলেন। ইহারই মধ্যে একবার তিনি যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রীও দর্শন করিয়াছিলেন।

গলায় দামোদর-শিলা ঝুলাইয়া গৈরিক-পরিহিতা সন্ন্যাসিনী তখন চলিয়াছেন—পদব্রজে—এক দুর্গম তীর্থ হইতে দুর্গমতর তীর্থান্তরে। তাঁহার ঝোলাতে আছে মা কালী ও গৌরাঙ্গদেবের পট, চণ্ডী, ভাগবত ও নিত্যব্যবহার্য সামান্য দ্রব্য। লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি কেশকর্তন করিয়া অঙ্গে ভস্ম কিংবা মৃত্তিকা মাখেন এবং কখন পাগলিনীর ন্যায় ব্যবহার করেন। কখন বা আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিয়া পুরুষদের বেশে চলেন; বাক্যালাপ বিশেষ করেন না এবং ভিক্ষাদির জন্যও লোকালয়ে গমনের তেমন প্রয়োজন বোধ করেন না। অবহেলায়

দুর্বল শরীর মধ্যে মধ্যে শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞা হারায়, আর পার্বত্য নারীদের শুশ্রূষায় পুনঃ চেতনাপ্রাপ্ত হয়। আবার উহারই মধ্যে চলে স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রতা বা উদয়াস্ত জপ। সে এক চমৎকার চিত্র ![১]

কয়েক বৎসর এইভাবে পরিভ্রমণের পর তিনি যখন বৃন্দাবন ও রাধা-কৃষ্ণের অন্যান্য লীলাভূমিসন্দর্শনে নিরত আছেন, তখন শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক মথুরাবাসী তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় কাকা তাঁহাকে অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া বলপূর্বক স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং কলিকাতায় সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু গৌরী-মা এই কৌশল বুঝিতে পারিয়া মথুরা হইতে পলাইয়া গেলেন ও রাজপুতানার তীর্থাদিদর্শনান্তে সৌরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন। এই যাত্রায় জয়পুর, পুষ্কর, প্রভাস, দ্বারকা ইত্যাদি বহু তীর্থ তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। সুদামাপুরীর নিকটে কোন গ্রামে চিকিৎসা ও সেবার অভাবে বিসূচিকারোগে অনেকের প্রাণনাশ হইতেছে জানিয়া গৌরী-মার মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি প্রান্তীয় সরকার ও জনসাধারণের সাহায্যে ইহার যথাসাধ্য প্রতিকার করিলেন। দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে জপ করিতে করিতে বালকবেশী শ্যামসুন্দরের তিনি দর্শন পাইলেন। এইভাবে বিভিন্নস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে পাইবার অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গৌরী-মা পুনর্বার বৃন্দাবনে আসিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত থাকিয়া তিনি আত্মবিসর্জনোদ্দেশ্যে নিশাকালে ললিতাকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন; পরন্তু সেখানে এক অভূতপূর্ব দর্শনলাভ করিয়া বিপুল আনন্দসাগরে নিমগ্না

---

১. আমরা এই প্রবন্ধরচনার জন্য প্রধানতঃ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'গৌরী-মা' গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছি। গৌরী-মার তীর্থভ্রমণ ও তপস্যার কাহিনী উহা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পত্রে গৌরী-মার কিছুকাল গার্হস্থ্য-জীবনযাপনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হইলেন—পূর্বের ইচ্ছা আর কার্যে পরিণত হইল না। ইতোমধ্যে শ্যামাচরণ কাকাও তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়াছিলেন ; সুতরাং পূর্বসংকল্প অনুসারে গৌরী-মাকে গৃহে আনিলেন এবং সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেলেন। দীর্ঘকাল পরে গৃহে প্রত্যাগতা মৃড়ানী আত্মীয়স্বজনের প্রাণঢালা স্নেহমমতা পাইলেন এবং সমুৎসুক সকলকে তীর্থভ্রমণাদির গল্প শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর পক্ষে ঐভাবে দীর্ঘকাল যাপন করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, এই আশা দিয়া ৺পুরুষোত্তম-দর্শনে চলিলেন।

গৌরী-মার গভীর নিষ্ঠাভক্তি ও পাণ্ডিত্য ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া ৺জগন্নাথের পুরোহিতগণ তাঁহার ইচ্ছামত দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে তিনি কোঠারের জমিদার ও ভক্ত রাধারমণ বসু মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে বসু মহাশয়ের সহিত গৌরী-মার প্রথম পরিচয় হয়। ভক্তি, বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রসঙ্গে বসু মহাশয় বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কলিকাতাস্থ নিজ বাটীতে ও বৃন্দাবনে 'কালাবাবুর কুঞ্জে' আহ্বান করিয়া রাখিতেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিত বলরাম বসু ইঁহারই পুত্র। বলরামবাবুর সহিত গৌরী-মার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল।

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে গৌরী-মা নবদ্বীপ যান। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলানিকেতন এই নবদ্বীপ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল ; তিনি বলিতেন, "নদে আমার শ্বশুরবাড়ি।" ইহাই ছিল নবদ্বীপচন্দ্রের সহিত তাঁহার চিরসম্বন্ধ। নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি নয়নগোচর হইলে তিনি ভাসুরবোধে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া তিনি পুনর্বার বৃন্দাবনে গেলেন। এই সময়ে বলরামবাবু বৃন্দাবনে ছিলেন এবং তৎপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি গৌরী-মাকে জানাইলেন, "দিদি, দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি—সনক-সনাতনের মতো তাঁর

ভাব। ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতেই সমাধি হয়। তুমি একবার অবশ্য তাঁকে দেখে আসবে।" গৌরী-মা শুনিয়া গেলেন মাত্র। কিন্তু তখনই কলিকাতার দিকে যাত্রা না করিয়া অকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে হৃষীকেশে উপস্থিত হইলেন—অভিপ্রায়, আবার কেদার-বদরীদর্শনে যান। কিন্তু খবর পাইলেন যে, তাঁহার মাতা অসুস্থ; অতএব মথুরা হইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। সেখানে মাতাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। এখানেও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামক এক বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন, "মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম এক অসাধারণ মানুষ—অপরূপ রূপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢলঢল, ঘন ঘন সমাধি।" শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যখন বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লইলেন, তখনও বসু মহাশয় তাঁহাকে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে সাধুদর্শনে যাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু গৌরী-মা তখনও কোন আকর্ষণ অনুভব না করায় সহাস্যে জানাইলেন, "জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে, দাদা, নতুন কোন সাধুদর্শনের সাধ আমার নেই। তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান—তার আগে আমি যাচ্ছিনে।"

টান একদিন অপ্রত্যাশিতরূপে আসিল। সেদিন গৌরী-মা অভিষেকান্তে দামোদরকে সিংহাসনে রাখিতে গিয়া দেখেন, সেখানে মানুষের দুইখানি জীবন্ত চরণ, অথচ দেহের অন্য অবয়ব নাই। অভিনিবেশসহকারে দেখিয়া বুঝিলেন, নয়নের ভ্রম হয় নাই। দামোদরকে তুলসী দিলেন—তুলসী গিয়া পড়িল ঐ চরণযুগলে। গৌরী-মা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বসুপত্নী অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সাড়া না পাইয়া দরজা ফাঁক করিয়া দেখিলেন তিনি ভূলুণ্ঠিতা ও জ্ঞানশূন্যা। তিন-চার ঘণ্টা পরে জ্ঞানলাভ করিয়াও তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না—শুধু বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার হৃদয়কে সুতায়

বাঁধিয়া টানিতেছে। দিন-রাত্রি এইভাবেই কাটিয়া গেল। প্রত্যূষের পূর্বেই তিনি বহির্দ্বারে আসিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন। দ্বারী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবেন?" গৌরী-মার কিন্তু উত্তর নাই। ইতোমধ্যে বসু মহাশয় আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দিদি, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কাছে যাবে?" গৌরী-মা নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাকেই সম্মতিজ্ঞানে গাড়ি ডাকাইয়া স্বপত্নী ও আর দুই-একজন মহিলাসহ গৌরী-মাকে লইয়া বসু মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। আগত ভক্তগণ দেখিলেন, দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ স্বকক্ষে বসিয়া আপন মনে সুতা জড়াইতেছেন আর গাহিতেছেন,

"যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি শ্যামা?
একবার নাচ গো শ্যামা!" ইত্যাদি

ভক্তগণের কক্ষপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সুতা-জড়ানো শেষ হইল। গৌরী-মা বুঝিলেন, তাঁহার সেই অব্যক্ত বেদনার উৎস কোথায়, আর সবিস্ময়ে দেখিলেন—এই তো সেই পূর্বদৃষ্ট সজীব চরণযুগল! শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না! তিনি বলরামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া গৌরী-মার পরিচয় পাইলেন এবং অনেকক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গ করিলেন। বিদায়কালে গৌরী-মাকে বলিলেন, "আবার এসো, মা।" ইহা ১২৮৯ বঙ্গাব্দের কথা—গৌরী-মার বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ।

পরদিবস প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে দুইখানি পরিধেয় বস্ত্র ও বক্ষে দামোদরকে লইয়া গৌরী-মা পুনর্বার একাকী দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তোর কথাই ভাবছিলুম।" গৌরী-মাও ভাবে গদ্গদ হইয়া নিজজীবনের অনেক কাহিনী ও দামোদরের সিংহাসনে তাঁহারই পাদপদ্মদর্শনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিলেন,

"তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগে তো তা বুঝতে পারিনি, বাবা!" উত্তরে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে এত সাধনভজন কি ক'রে হ'ত?"—অবশেষে নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে—এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।" তদবধি কিছুকাল গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুরানীর অবর্তমানে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। দূরে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনস্পৃহা তাঁহার মনে মধ্যে মধ্যে এতই প্রবল হইত যে, তিনি একদিন আহারান্তে হস্তপ্রক্ষালনাদির পূর্বেই ঐরূপ আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিবেন এমন সময় মনে পড়িল যে, হাত অপবিত্র—লজ্জিত হইয়া হাত ধুইতে চলিলেন।

গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য ও সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, গৌরী-মা অনেক সময় নিজহস্তে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পরমযত্নে তাঁহাকে খাওয়াইতেন এবং নহবতে মধুরকণ্ঠে ঠাকুরকে উচ্চ উচ্চ ভাবের গান এবং কীর্তনাদি শুনাইয়া সমাধিস্থ করিয়া দিতেন। আরও লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর গৌরী-মাকে মহাতপস্বিনী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। গৌরাঙ্গলীলায় আকণ্ঠমগ্না গৌরী-মার মনে শ্রীরামকৃষ্ণাবতারেও তুল্যরূপ মহাভাবে মত্ততা ও ভূপতনাদি-নিরীক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জাগিত এবং তখনই ঠাকুরের দেহাবলম্বনে ঐরূপ লীলা প্রকটিত হইত। ইহাতে গৌরী-মা একদিকে যেমন পুলকিতা হইতেন, অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের দৈহিক কষ্ট দেখিয়া ঐরূপ বাসনাদমনে যত্নবতী হইতেন। গৌরী-মার জননী গিরিবালাও কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর গৌরী-মাকে কত উচ্চাধিকারিণী মনে করিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় খ্রীষ্টান ভক্ত উইলিয়ম সাহেবকে ঠাকুরের সহিত পরিচিত করিয়া দিলে তিনি সাহেবকে বলরামগৃহে গৌরী-মার সহিত দেখা করিতে বলেন। যথাসময়ে সাক্ষাৎ হইলে সাহেব গৌরী-মাকে 'মাদার মেরী' বলিয়া সম্বোধনপূর্বক্ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন এবং ভগবানে ভক্তিলাভের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ইহারই একসময়ে ঠাকুরের সান্নিধ্যের ফলে গৌরী-মা সর্ববিষয়ে উদারদৃষ্টিসম্পন্না হইয়াছিলেন। একবার রামনবমীর উপবাসদিবসে ঠাকুর জলযোগকালে অর্ধভুক্ত মিষ্টান্ন গৌরী-মাকে দিলে তিনি অম্লানবদনে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখনই রামনবমীর কথা স্মরণ হওয়ায় ঠাকুর কহিলেন, "এই রে! আজ যে রামনবমীর উপবাস!" গৌরী-মা অমনি উত্তর দিলেন, "তোমার উপরেও কি আবার বিধিনিষেধ?" গৌরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ণ অবতার ও মাতাঠাকুরানীকে স্বয়ং ভগবতী বলিয়াই জানিয়াছিলেন। কেহ অন্যরূপ বলিলে তিনি প্রাণে আঘাত পাইতেন। গৌরাঙ্গগতপ্রাণা যে গৌরী-মার চক্ষে মহাপ্রভুর নামে অশ্রু ঝরিত, তিনিই এককালে বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য—এই দুয়ে অভেদ।" শ্রোতা যখন আপত্তি করিলেন যে, মানুষ ও দেবতা এক হইতে পারেন না, তখন গৌরী-মা সদর্পে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ"—ইহা বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি গৌরী-মার অনুরাগের আধিক্য দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "তুই কাকে বেশী ভালবাসিস?" গান গাহিয়া সুকণ্ঠী গৌরী-মা উত্তর দিলেন—

"রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী;
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।"

গান শুনিয়া মাতাঠাকুরানী কুণ্ঠায় গৌরী-মার হাত চাপিয়া ধরিলেন, ঠাকুরও হার মানিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতার জননীকুলের জন্য ঠাকুরের প্রাণ কাঁদিত; তাই তিনি গৌরী-মাকে প্রেরণা দিতেন, যাহাতে তিনি মায়েদের নিকট ভগবানের কথা বলিয়া তাঁহাদের ভক্তি উদ্দীপিত করেন। একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "যদু মল্লিকের বাড়ির মেয়েরা তোকে দেখতে চেয়েছে—একদিন যাস ওখানে।" অনুযোগ করিয়া গৌরী-মা বলিলেন, "তোমার ঐ কাণ্ড! তুমি লোকের কাছে আমার এত প্রশংসা কর কেন?" ঠাকুর আর একদিন উষাকালে বামহস্তে নহবতের নিকটবর্তী বকুলবৃক্ষের শাখা ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তে পাত্র হইতে জল ঢালিতে ঢালিতে পুষ্পচয়নরতা গৌরী-মাকে বলিলেন, "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা।" গৌরী-মা সবিস্ময়ে কহিলেন, "এখানে কাদা কোথায় যে চট্‌কাব? সবই যে কাঁকর!" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু—তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" গৌরী-মার সাধনপ্রবণ ও নির্জনতাপ্রিয় মন যদিও তখন বলিয়াছিল, "সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না—হইহই আমার ধাতে সয় না। আমার সঙ্গে কতকগুলো মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি," তথাপি ঠাকুর হাত নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধনভজন ঢের হয়েছে—এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট!" গৌরী-মাকে পরে তাহাই করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি ঐজন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

দক্ষিণেশ্বরের এই দিনগুলি গৌরী-মার জীবনে অতি আনন্দপ্রদ ও ফলপ্রসূ হইলেও তখনও তাঁহার মনে তপস্যার প্রবল আকর্ষণ থাকায় এবং উদয়াস্ত একাসনে বসিয়া নয়মাস সাধনা করার সঙ্কল্প প্রবল হওয়ায় তিনি

বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও লীলাসংবরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গৌরী-মার উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রেরিত হইলেও তাহা যথাকালে তাঁহার নিকট পৌছিল না। শেষ পর্যন্ত গৌরী-মাকে না দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না— আমার ভেতরটা যেন বিল্লীতে আঁচড়াচ্ছে।" পরে শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে গেলেন, তখন তিনি তপস্যানিরতা গৌরী-মাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং জানাইলেন যে, ঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন দিয়া বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আর গৌরী-মার নিকট এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি শুনিয়া লইতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা গৌরী-মাও শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধারপূর্বক কহিলেন, "ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সধবার বেশ পরিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।"[২] শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবনত্যাগের কিছুকাল পরে গৌরী-মা হিমালয়ভ্রমণে গমন করেন। এইরূপে বৃন্দাবন ও হিমালয়ে দশ বৎসর যাপনান্তে তিনি কলিকাতায় ফিরেন। ইহার পর তাঁহার একবার বিসূচিকা ও একবার জ্বর হয়। তখন তাঁহার ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের পরিবারে থাকিয়া সেবাদিগ্রহণ করায় তাঁহার মনে হইল, হয়তো তিনি মায়ার বন্ধনে পড়িতেছেন। অতএব আরোগ্যান্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অকস্মাৎ ৺রামেশ্বরদর্শনে বহির্গত হইলেন!

দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থদর্শনান্তে তিনি রামেশ্বর উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আনীত গঙ্গোত্রীর জলে ৺রামেশ্বরকে স্নান করাইলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ৺বালাজী গোবিন্দকে দর্শন করিলেন এবং পরে

---

২ "শ্রীশ্রীমায়ের কথা"য় (২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ) কিন্তু দেখিতে পাই যে, শ্রীমায়ের নিজের মতে ইহা বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে কামারপুকুরে সংঘটিত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা 'গৌরী-মার' অনুসরণ করিলাম, যদিও আমাদের বিশ্বাস যে, অন্য বিবরণই নির্ভরযোগ্য।

দক্ষিণদেশের অপরাপর তীর্থ এবং মধ্য ভারতের কয়েকটি তীর্থ দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। এইবারে তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল—এই সময়ে মাতৃজাতির কল্যাণকামনা তাঁহার হৃদয়ে ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করিতে থাকিল।

প্রথমে তিনি রামপ্রসাদের সাধনভূমির নিকটে গঙ্গাতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর অনুরাগিবৃন্দের আহ্বানে এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে ১৩০১ বঙ্গাব্দে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এই আশ্রমনামীয় পর্ণকুটীরে একে একে প্রায় পঁচিশজন কুমারী, সধবা এবং বিধবা আগমনপূর্বক গৌরী-মার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। অভাব সেখানে যথেষ্ট ছিল; কিন্তু এই অসচ্ছলতার মধ্যেও একটা অপূর্ব তৃপ্তি ছিল এবং উহাই আশ্রমবাসিনীদিগকে আকৃষ্ট করিত। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ, গঙ্গাস্নান, গৃহকর্ম ও পাঠাভ্যাসে দিনগুলি বড়ই মধুময় মনে হইত। গৌরী-মা একদিকে যেমন শিক্ষা দিতেন, অন্যদিকে তেমনি ছোট ছোট বালিকাদের সহিত স্নেহময়ী মাতার ন্যায় ক্রীড়াও করিতেন। কোমল কঠোরের সে এক অপূর্ব সংমিশ্রণ; ভারতের প্রাচীন আদর্শ এখানে মূর্তিলাভ করিতেছে দেখিয়া অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই আশ্রম-দর্শনে আসিতে লাগিলেন। বেলুড় মঠের প্রাচীন সাধুরাও সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় একটি 'মাতৃসভার' অনুষ্ঠান করিয়া গৌরী-মা হিন্দুনারীর আদর্শাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এইরূপে ক্রমে বাগ্মিতার জন্যও তিনি সুনাম অর্জন করিতে থাকেন। কিন্তু আদর্শপ্রচার, আশ্রমগঠন ইত্যাদি কার্যকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেও গৌরী-মার প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জীবন গঠনের প্রতি; বিশেষতঃ তিনি বুঝিয়াছিলেন, একান্তভাবে মাতৃ-জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে এইরূপ একটি সন্ন্যাসিনীসঙ্ঘ

গড়িয়া তুলিতে না পারিলে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। সুতরাং এই সময় হইতে তিনি ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং উপযুক্ত আধার পাইলেই তাহাকে সর্বতোভাবে তজ্জন্য প্রস্তুত করিতে থাকিলেন। ইহাদের অনেকে তাঁহার প্রেরণায় মন্দিরের দেবতাকেই পতিরূপে গ্রহণ করিয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক যথাকালে সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল।

কার্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মা বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতা মহানগরীর সহিত আরও ঘনিষ্ঠতর সংযোগ রাখা আবশ্যক। তদনুসারে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে গোয়াবাগান লেনের একটি ভাড়াবাড়িতে আশ্রমের কার্য আরম্ভ হইল। সেখানে দশ-বার জন কুমারী ও বিধবা বাস করিতেন এবং প্রায় ৬০জন বালিকা নিত্য পড়িতে আসিত। কাজের প্রসার ও অন্যান্য কারণে আশ্রম অতঃপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এভাবে কার্য দৃঢ়মূল হয় না জানিয়া গৌরী-মা জমির সন্ধান করিতে থাকিলেন এবং অবশেষে ২৬নং মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে বর্তমান আশ্রমভূমির কিয়দংশ ( চারি কাঠা ) ক্রয় করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে কয়েক বৎসর গৃহনির্মাণ সম্ভব হইল না। অনন্তর ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জগদ্ধাত্রীপূজাদিবসে গৌরী-মা উহার ভিত্তিস্থাপন করিলেন এবং পরবৎসর ২৭শে অগ্রহায়ণ দেবতাসহ নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। নূতন বাটিতে আগমনের পর ক্রমে আশ্রমবাসিনীদিগের সংখ্যা পঞ্চাশ ও দৈনিক ছাত্রীদের সংখ্যা তিন শত হইল। সহায়-সম্পদহীনা সন্ন্যাসিনীর পক্ষে এইরূপ সাফল্যলাভ সহজ ছিল না; কিন্তু ভগবচ্ছক্তিতে একান্ত বিশ্বাসভরে তিনি বলিতেন, "যিনি কাজে নাবিয়েছেন তিনিই চালিয়ে নেবেন। এতে বাধাবিঘ্ন এলেও আমার কোন দুঃখু নেই, প্রশংসা পেলেও তাতে আমার নিজের কিছু কেরামতি নেই।"

কার্যের বিস্তারদর্শনে গৌরী-মার মনে হইল যে, দায়িত্ব তাঁহার একার স্কন্ধে রাখা সমীচীন নহে। এইজন্য বিখ্যাত জননেতাদিগকে লইয়া একটি 'পরামর্শ-সভা' গঠিত হইল এবং শিক্ষিতা মহিলাদিগকে একটি 'মহিলা-সমিতি'র অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন মহিলাকে লইয়া একটি 'কার্যনির্বাহক সমিতি' এবং ব্রতধারিণী আশ্রমসেবিকাদের লইয়া 'মাতৃসঙ্ঘ' গঠিত হইল। প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে গৌরী-মা আশ্রমের প্রধান-পরিচালিকা ও মাতৃসঙ্ঘের সভানেত্রী হইলেন।

প্রথম হইতেই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, আশ্রমজীবনে যাহাতে প্রাচীন হিন্দুনারীর আদর্শ রূপপরিগ্রহ করে। এই আশ্রমের শিক্ষা-প্রণালীর বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "পুরুষের এবং নারীর শিক্ষা যে একই আদর্শে, একই পথে চলিতে পারে না, বিজাতীয় শিক্ষা যে হিন্দুর অন্তঃপুর-বাসিনীগণের পক্ষে উপযোগী নহে, তাহা অনেকেই মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষা যখন হিন্দুর কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমনই সময়ে আসিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, আসিলেন গৌরী-মা। এই তপঃসিদ্ধা দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী প্রাচীন ভারতীয় জাতীয় আদর্শের সঙ্গে আধুনিকযুগোপযোগী শিক্ষার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া তাঁহার গুরুপত্নীর পবিত্র নামে ··· আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, যাহাতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী, আদর্শ সাধিকা ও আচার্যা গড়িয়া উঠিতে পারেন—হিন্দুর সমাজকে সুশিক্ষার মধ্য দিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারেন।"

নিজের ভিতর অমৃত সঞ্চিত থাকিলেই মাত্র উহা বিতরণ করিতে অগ্রসর হওয়া শোভা পায়, নতুবা অন্ধকে পরিচালনের জন্য অন্ধের অগ্রসর হওয়ার ন্যায় সে প্রচেষ্টা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, গৌরী-মা সাধনাবলে তাদৃশ কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। এইরূপ

গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালেও তাঁহার সে সাধনার বিরাম ছিল না—তখনও চলিয়াছিল নিয়মিত জপ-ধ্যান-পূজা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়া জনগণকে চমৎকৃত করিতেছিল। দামোদরকে তিনি চেতন দেবতা ও চিরজীবনের পতি বলিয়া জানিতেন। একদিন তিনি সকল কার্যসমাপনান্তে দ্বিপ্রহরে শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু কেন যেন স্থির হইতে পারিতেছেন না। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, কত্তার যে দুধ খাওয়া অভ্যেস—দুধ খাওয়া তো আজ হয়নি, তাই কত্তার ঘুম আসছে না।" অমনি দামোদরকে দুধ নিবেদন করিতে চলিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই দুধটুকু খেয়ে ঘুম এল।" আর এক রাত্রে গৌরী-মার শরীর তেমন সুস্থ না থাকায় রন্ধন হইল না, কিছু ফলমিষ্টান্ন দিয়া দামোদরের ভোগ হইল। কিন্তু দ্বিপ্রহর রাত্রে দেখা গেল, রন্ধনশালায় আগুন জ্বলিতেছে—গৌরী-মা লুচি ভাজিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "এক ঘুমের পর কত্তা বললেন, তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে ; তাই এ ব্যবস্থা।" এক রাত্রে ভোগনিবেদনান্তে গৌরী-মা গান ধরিলেন,

"মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥"

ধীরে কপাট খুলিয়া জনৈকা আশ্রমবাসিনী দেখিলেন, গৌরী-মা দামোদরকে বুকে ধরিয়া চোখের জলে তাঁহাকে স্নান করাইতেছেন। শ্রীশ্রীমা তাই ভক্তদের নিকট বলিতেন, "পাথরের একটা নুড়ি নিয়ে গৌরদাসী কি ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিলে !"

এই দামোদর-বিগ্রহের প্রীতির সহিত তাঁহার ছিল জীবরূপী দামোদর-প্রীতি। সে হৃদয়বত্তা তাঁহাকে আত্মহারা করিত। এক প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, একটি মেয়ে গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া

চলিয়াছে, অথচ তীরের লোকগুলি কিছু না করিয়া বৃথা 'হায় হায়' করিতেছে। গৌরী-মা গর্জিয়া উঠিলেন, "একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে, আর মরদগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে!" বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোমরে আঁচল বাঁধিয়া গঙ্গায় নামিয়া পড়িলেন—হৃদয়াবেগে ভুলিয়া গেলেন যে, তিনি সাঁতার জানেন না। যাহা হউক, অপরেরা তখন বালিকাটিকে উদ্ধার করিলেন। এক রাত্রে গৌরী-মা আশ্রম-বাসিনীদিগকে পুরাণের গল্প শুনাইতেছেন, এমন সময়ে অদূরবর্তী এক গৃহ হইতে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ উত্থিত হওয়ায় তিনি একটি যষ্টি হস্তে লইয়া সেই নির্যাতিতার উদ্ধারসাধনে চলিলেন। আশ্রমবাসিনীরা তাঁহাকে এইভাবে পরগৃহে যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্য—একটি বধূকে নিগ্রহ করা হইতেছে। তিনি গৃহের কর্তৃপক্ষকে আইন-আদালতের ভয় দেখাইয়া বধূটিকে উদ্ধার করিলেন। এবং পুলিসের সাহায্যে তাহাকে তাহার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। পরে শ্বশুর-গৃহের লোকেরা গৌরী-মারই মধ্যস্থতায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বধূকে যখন পুনর্বার গৃহে আনিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, "পরের মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে এনেছ, তাকেও নিজের মেয়ের মতোই আদরযত্ন করবে।" গয়াধামে একবার কয়েকজন মহিলা-যাত্রীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া পাণ্ডাগণ অর্থ-আদায়ের চেষ্টা করিতেছে জানিয়া তিনি পুলিসের সাহায্যে কৌশলে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইতরপ্রাণীর দুঃখেও তিনি ব্যথা পাইতেন। একসময়ে কয়েকটা বাঁদর একটা কুকুরশাবককে কিভাবে এক গৃহের ছাদের উপর আনিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে। গৌরী-মা দেখিলেন শাবকের মৃত্যু অনিবার্য, অথচ ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই। অগত্যা যষ্টিহস্তে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এবং বাঁদরগুলার মুখভঙ্গিতে বিচলিতা না হইয়া অপর বাড়ির ভাঙ্গা প্রাচীর

অবলম্বনে কোন প্রকারে সেই ছাদে উপস্থিত হইলেন এবং শাবকটিকে আঁচলে বাঁধিয়া নামাইলেন। আশ্রমের গরু-ঘোড়া প্রভৃতির প্রতি তাঁহার তুল্যরূপ সহানুভূতি ছিল। চাকর উপস্থিত না থাকিলে তিনি স্বয়ং যথা-সময়ে তাহাদিগকে খাদ্য পৌঁছাইয়া দিতেন, ঘোড়ার ডলাই-মলাই ঠিক ঠিক হইল কিনা অনুসন্ধান করিতেন এবং গাভীকে দেবীজ্ঞানে সেবা করিতেন।

বেশভূষায় তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না—সব বিষয়ে যেন একটা উদাসীনতা লক্ষিত হইত। যে-কিছু সাজসজ্জা বা ভোগ-রাগের ব্যবস্থা হইত, তাহা শুধু দামোদরের জন্য। তাঁহার নিজের প্রয়োজন বলিতে ছিল মাত্র সাধারণ রকমের চওড়া লালপাড় শাড়ি ও দুই-গাছি শাখা। ভক্তগণ মূল্যবান্ বস্ত্রাদি দিলে তিনি আপত্তি করিতেন, অথবা একান্ত পীড়াপীড়ি করিলে গ্রহণপূর্বক পুঁটুলি বাঁধিয়া ভাণ্ডারে ফেলিয়া রাখিতেন। আদরের বস্তুর সেরূপ গতি দেখিয়া ভক্তগণ ভবিষ্যতে সাবধান হইতেন।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিতেন এবং নানা উপচারসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতেন। মায়ের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি আদেশ হিসাবে গ্রহণ করিতেন। নিজের যেমন তাঁহাতে দেবীজ্ঞান ছিল, অপরেও যাহাতে ঐরূপ বোধ করে, তদ্বিষয়ে তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। একবার বিষ্ণুপুর স্টেশনে দর্শনোৎসুক পশ্চিমা কুলিদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ জানকীমায়ী, এবং তাহারাও সরল বিশ্বাসে প্রণামাদি করিয়া বিদায়কালে 'জানকীমায়ী কী জয়' রবে ঐ স্থান মুখরিত করিয়াছিল। জয়রামবাটীতে গৌরী-মা বহুবার গিয়াছিলেন এবং তিনি মায়ের স্বজনগণের প্রতি বিশেষ স্নেহসম্পন্ন ছিলেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থিনী হইলে তিনি তাহাকে মায়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন এবং বলিতেন, "গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যন্ত যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।"

গৌরী-মার কার্যক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। একদিন সারদেশ্বরী আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহির হইবার পূর্বে স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে আসিলে কথাপ্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, "মাতাজী মেয়েমানুষ হয়ে যা করলেন, তা সত্যি আশ্চর্য। তিনি প্রথম যখন আমাকে জমি কেনার কথা বলেন, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, আশ্রম শেষটায় এত বড় হবে।" কথাটিতে আরও জোর দিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "মেয়েমানুষ কি বলছেন, মশায়, কটা পুরুষ-মানুষ একা অমন কাজ করতে পেরেছে?" মনে রাখিতে হইবে যে, সেপ্রকাব কর্মদক্ষতা যখন বঙ্গসমাজকে অবাক করিতেছে, তখন বঙ্গ নারীগণ 'পুরমহিলা', 'অন্তঃপুরচারিণী', 'অবলা', ইত্যাদি শব্দেই উল্লিখিত হইতেন।

অতঃপর শেষের কথা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মার স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছিল এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু গিরিডি প্রভৃতি স্থানে যাইতে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন; বলিতেন, "এ বুড়ো বয়সে তীর্থস্থান ছাড়া কোন গঙ্গাহীন দেশে আমি যাব না।" তাই তাঁহাকে বৈদ্যনাথ ও নবদ্বীপে লইয়া যাওয়া হয়। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি দুর্বলতাবশতঃ ক্রমে স্বকক্ষত্যাগে অক্ষম হইয়া পড়িতে থাকিলেন। ঐ অবস্থায়ও ডাক্তারী ঔষধ তিনি সেবন করিতেন না, কবিরাজী ঔষধ কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শেষ পর্যন্ত বার্ধক্যজনিত ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ছাড়া তাঁহার আর কোনও উল্লেখযোগ্য পীড়া ছিল না। দীক্ষিত ভক্তদিগের প্রতি কৃপায় তখনও তাঁহার মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। পুরুষভক্তগণ উপরে যাইয়া দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া তিনি কখন কখন নিষেধ না মানিয়া অপরের সাহায্যে নিম্নে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন।

জীবনের শেষ কয়দিন যেন ভাবরাজ্যে সর্বদা দামোদরের সহিতই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত—কখন কথা বলিতেছেন, কখন ফুল ছুড়িতেছেন, কখন ভাবাবেশে মুখে দিব্যশ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের (১৯৩৮ খ্রীঃ) ১৬ই ফাল্গুন শিব-চতুর্দশীর দিনে তিনি জানাইলেন, "ঠাকুর সুতো টানছেন।" একবার সেই টানে গৌরী-মা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই বারের টান যে নিত্যমিলনেরই পূর্বাভাস, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। অপরাহ্ণে তিনি বলিলেন, "আমায় ভাল ক'রে সাজিয়ে দে।" সাজানো হইলে বলিলেন, "কি সুন্দর সেজেছি, ত্থাখ! আমার রথ আসছে। শেষরাত্রে দামোদরকে আনাইয়া সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিলেন। পরে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে দামোদরের ভার অপরের উপর অর্পণ করিয়া গৌরী-মা দায়মুক্ত হইলেন। পরের দিন মঙ্গলবার ভালভাবেই কাটিয়া গেল; আশ্রমবাসিনীরা যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু রাত্রিসমাগমে মন্দিরের ভোগরাগাদি সম্পন্ন হওয়ার পর আশ্রমবাসিনীগণের মনে যখন শান্তি নামিয়া আসিয়াছে, তখন রাত্রি আটটা পনর মিনিটের সময় গৌরী-মা চিরশান্তিতে নিমগ্না হইলেন।

# লক্ষ্মী-দিদি

ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "যে সকল মহিলা এই সময়ে প্রায় সর্বদা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বাড়িতে বাস করিতেন, তাঁদের মধ্যে গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মী-দিদি ও অপর কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই বিধবা—তন্মধ্যে প্রথমা ও শেষোক্তা বাল-বিধবা। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে ৺কালীবাটীতে ছিলেন, তখন ইঁহারা সকলেই শিষ্যারূপে গৃহীতা হন ; লক্ষ্মী-দিদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং তখনও তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা। ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষালাভের জন্য অনেকে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে এবং সঙ্গিনী হিসাবে তিনি অশেষ গুণসম্পন্না ও আনন্দপ্রদায়িনী। তিনি যখন পালা-গান বা যাত্রা-পুস্তক হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিয়া যান, কখন বা পৌরাণিক মূকাভিনয়ে একা বিভিন্ন অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নীরব কক্ষে মৃদু আনন্দলহরী তুলেন। তিনি কখন কালী সাজেন, কখন সরস্বতী, কখন জগদ্ধাত্রী, আবার কখন বা কদম্বতলবাসী শ্রীকৃষ্ণ ; অথচ অভিনয়োপযোগী প্রায় কোন পোশাক ব্যতীতই তিনি যথোচিত বাস্তবতার অবতারণ করেন" ('The Master As I Saw Him', P. 191 )।

এইরূপ একটি মহিলা-সংসদে নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গোলাপ-মা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ি হইতে নানারূপ পিতলের অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি আনিয়া লক্ষ্মী-দিদিকে সাজাইয়া দিলে তিনি বৃন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পালা গান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল দেবীসদৃশ, স্বর অতি মিষ্ট, স্মরণ-শক্তি অদ্ভুত এবং সর্বোপরি হুবহু অপরের নকল করার ক্ষমতা। এইভাবে তিনি

দুই-তিন ঘন্টা গাহিয়া শ্রোত্রীবৃন্দকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। সেদিনও শ্রীশ্রীমা ও আর সকলে ঐ ভাবেই সেই আসরে বসিয়া রহিলেন। পরে নিবেদিতার অভিপ্রায়ানুসারে লক্ষ্মী-দিদি রামপ্রসাদের গান গাহিলেন। সর্বশেষে নিবেদিতা সিংহ সাজিয়া লক্ষ্মী-দিদিকে জগদ্ধাত্রীরূপে স্বীয় পৃষ্ঠে বসাইলেন এবং তর্জন গর্জন সহকারে চতুষ্পদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকলে হাসিয়া কুটপাট!

আরও পূর্বের কথা—সেবার কামারপুকুরে লাহাবাবুদের বাড়ির ছাদে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মহিলাসংসদ বসিয়াছে এবং লক্ষ্মী-দিদির কীর্তন চলিতেছে। গৃহের পুরুষগণ ডাকাডাকি করিয়াও অন্যমনস্কা পুরস্ত্রীদের প্রত্যুত্তর না পাইয়া বাহির হইতে দ্বারে শিকল ও তালা দিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে কীর্তন সমাপ্ত হইলে মহিলারা যখন নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন নিরুপায় হইয়া একে একে নীচের ছাইয়ের গাদায় লাফাইয়া পড়িয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। পরে পুরুষরা আসিয়া দেখেন, তাঁহারা সর্বথা অকৃতকার্য হইয়াছেন।

ভাবময়ী লক্ষ্মী-দিদি আবার বলরামের আবেশে বিভোর হইয়া মালকোঁচা বাঁধিয়া উদ্দাম অথচ মধুর নৃত্য করিতেন! ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা যে সময়ের ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি, সে সময়ে লক্ষ্মী-দিদি গুরুপদে অধিষ্ঠিতা ও দক্ষিণেশ্বরের মৃন্ময় কুটিরে থাকেন। সকালে বিপিন নামধেয় জনৈক অনুরক্ত শিষ্য তাঁহার গলায় মল্লিকার মালা পরাইয়া দিলেন, ফল মিষ্টান্ন আহার করাইলেন এবং পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিলেন। অমনি বলরামের ভাবে আবিষ্টা লক্ষ্মী-দিদি বক্ষে একখানি লাল গামছা ফেলিয়া এবং কেশদাম বক্ষের উভয় পার্শ্বে আলুলায়িত করিয়া গান ধরিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এমন লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিলেন যে, সেই অপূর্ব নৃত্যদর্শনার্থে পল্লীর স্ত্রী-পুরুষে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বস্তুতঃ কীর্তনাদিতে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার একটা প্রকৃতিগত

ঝোঁক ছিল। তাই একবার আপসোস করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, কি করি? বেটাছেলে হ'লে দেখাতাম—কীর্তন কি রকম!" এইরূপ ভাববিলাস কিন্তু ভক্তমহলে কিংবা বিশেষ বিশেষ গৃহেই হইত। লক্ষ্মী-দিদি ভক্তদের নিকট নিঃসঙ্কোচ হইলেও সাধারণের নিকট নির্লজ্জ ছিলেন না।

দেবদেবীর দর্শন ও ভাবসমাধি লক্ষ্মী-দিদির প্রায়ই হইত। কখনও জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া দেখিতেন জগন্নাথের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান; আর তাঁহার অনুভূতি হইত যে, ঠাকুর ও জগন্নাথ অভিন্ন। কোন দিন তিনি ভাবে বৈকুণ্ঠে বা শ্রীরামকৃষ্ণলোকে উপনীত হইতেন, আবার কোন দিন বা সূক্ষ্মশরীরে ঠাকুর, শ্রীমা ও শিবদুর্গার সহিত মিলিত হইতেন। কোন দিন শিবভাবে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যাদের পূজা গ্রহণ করিতেন, কোন দিন বা অর্ধবাহ্যদশায় ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন। একবার পুরীতে স্বর্গদ্বারে একাকী সমুদ্রস্নানে যাইয়া তিনি বাহির-টানে চক্রতীর্থ পর্যন্ত ভাসিয়া যান। তখন অকস্মাৎ গোপবেশী এক হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কয়েক ঘন্টা পরে পদব্রজে গৃহে ফিরিয়া তিনি যখন ৺জগন্নাথদর্শনে গেলেন, তখন দেখেন যে, বলরামের স্থলে সেই গোপবালক দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে।

দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মী-দিদি যখন শ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন, তখন ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কোন্ ঠাকুর ভাল লাগে?" দিদি বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণ।" ঠাকুর ঐ বীজ ও নাম তাঁহার জিহ্বায় লিখিয়া মুখেও উহা উচ্চারণ করিলেন; লক্ষ্মী-দিদির রাধাশ্যাম-মন্ত্রে দীক্ষা হইয়া গেল।[১] ইহার পূর্বে উত্তরদেশীয় সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মী-দিদির শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। সে কথা শ্রীমা-

১ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দীক্ষাপ্রদান ঠাকুরের জীবনে অবিদিতপ্রায় হইলেও আমরা এখানে 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থের ( ৫৮ পৃঃ ) অনুসরণ করিলাম।

পরে ঠাকুরকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "তাহা হোক, লক্ষ্মীকে আমি ঠিকই দিয়েছি।" গোঘাটের যে গোস্বামিবংশে লক্ষ্মী-দিদির বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাও বৈষ্ণব ছিলেন; তাই কামারপুকুরে দিদিকে কেহ কেহ গোসাঁই-মা বলিয়া ডাকিত। কামারপুকুরেও তখন বৈষ্ণবদের বিশেষ প্রভাব ছিল। লক্ষ্মী-দিদিকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার গৃহে আসিয়া কীর্তনাদি শুনিতেন। এই-সব সাধন, অনুভূতি ও সমাধি প্রভৃতি মিলিয়া লক্ষ্মী-দিদির জীবনকে এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল, যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থের প্রণেতা ও লক্ষ্মী-দিদির আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাই লিখিয়াছেন, "মার (লক্ষ্মী-দিদির) রাধাকৃষ্ণ-ভজন-পূজন দেখিয়া কেহ কেহ ভাবেন যে, তিনি হয়তো এই রামকৃষ্ণ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্তা নহেন; কিন্তু দুঃখের কথা, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ঠাকুর সর্বদেবময় এবং তিনিই মাকে যথার্থ বৈষ্ণবরূপে নিজ হাতে গড়িয়াছিলেন।" (২৪১ পৃঃ)

লক্ষ্মী-দিদির উপদেশাবলী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসম্পদে পূর্ণ থাকিত এবং তিনি সর্বদা তাঁহার নামোল্লেখ করিতেন। অবশ্য তিনি প্রথমাবধিই শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই পুরীতে-লক্ষ্মীনিকেতনে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণে যখন তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল, তখন পদপ্রান্তে উপবিষ্ট জনৈক শিষ্য তাঁহার সহিত ঠাকুরের তুলনা করিতে থাকিলে দিদি ভর্ৎসনামিশ্রিত অনুশোচনার সুরে বলিয়াছিলেন, "কিসে আর কিসে? তখন যদি এত জানতে পারতুম!" পরে কিন্তু তিনি ঠাকুরকে অবতার বলিয়াই জানিয়াছিলেন এবং স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের উপাসিকা হইলেও ঠাকুরের উদারভাব অবলম্বনে বহু প্রার্থীকে অন্যান্য মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কামারপুকুর, কলিকাতা ও পুরীতে তাঁহার শিষ্য-শিষ্যা-সংখ্যা বিদিধিক একশত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত ছিলেন। লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই কাঁকুড়গাছি

যোগোদ্যানে যাইতেন অথবা বেলুড় মঠ প্রভৃতিতে যাইয়া ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অল্পবয়স্ক সাধুরাও তাঁহার নিকট যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিতেন। তবে ইহাও ঠিক যে স্বামীজীর প্রবর্তিত সেবা ও লক্ষ্মী-দিদির অনুসৃত বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল, যাহা দিদি নিজেও জানিতেন।

এই দৈবসম্পদসম্পন্না, কামারপুকুরের চট্টোপাধ্যায়কুলসম্ভবা লক্ষ্মীমণি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের কন্যা। রামলাল তাঁহার অগ্রজ ও শিবরাম তাঁহার অনুজ সহোদর। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই সম্পর্কবশতঃ ঠাকুরের সন্তানবৃন্দের নিকট তিনি ছিলেন লক্ষ্মী-দিদি; এইভাবে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সকলেরই দিদি। ১২৭০ সালের ১লা ফাল্গুন (১৮৬৪ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারি) বুধবার সরস্বতী-পূজার দিন বেলা বারটার সময় লক্ষ্মী-দিদি পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি গৃহদেবতা ৺শীতলা ও রঘুবীরের পূজাদিতে আনন্দ পাইতেন। নীরব থাকাই ছিল তাঁহার স্বভাব। এমন কি, বাড়ির লোক ভিন্ন অপরের সহিত তিনি কথা বলিতেন না। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শরৎ ভাণ্ডারী নামক একটি একাদশবর্ষ বয়স্ক বালক তাঁহাকে দ্বিতীয় ভাগ অবধি পড়াইয়া দিয়াছিল। লক্ষ্মী-দিদির বাল্যকালেই পিতা রামেশ্বর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্থির করিয়া যান যে, গোঘাটের উত্তরপাড়ায় রামলালের এবং দক্ষিণপাড়ায় লক্ষ্মীর বিবাহ হইবে। তদনুসারে পিতার মৃত্যুর স্বল্প পরেই একাদশ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। এই সংবাদ দক্ষিণেশ্বরে রামলালের মুখে শ্রবণান্তে ভাবসমাধিতে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সে বিধবা হবে।" পার্শ্বোপবিষ্ট হৃদয় ইহাতে আপত্তি করিলে ঠাকুর কহিলেন, "মা বলালেন, কি করব? ...লক্ষ্মী মা শীতলার

অংশ। সে ভারী রোখা দেবী—আর যার সঙ্গে বিয়ে হ'ল সে সামান্য জীব। সামান্য জীবের ভোগে লক্ষ্মী আসতে পারে না। ...সে তো বিধবা হবেই।" ইহার পূর্বেও কামারপুকুরে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মী যদি বিধবা হয় তো ভাল হয়। তাহলে বাড়ির দেবতাদের সেবাদি করতে পারবে।" বিবাহের দুই-এক মাস পরেই লক্ষ্মীমণির স্বামী শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ ঘটক একবার একদিনের জন্য কামারপুকুরে আসেন এবং তথা হইতে কর্মের সন্ধানে নির্গত হন। তারপর তিনি আর গৃহে ফিরেন নাই। দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষান্তেও যখন কোন সংবাদ আসিল না তখন শ্বশুরগৃহের আহ্বানে লক্ষ্মীমণি তথায় গমনপূর্বক কুশপুত্তলিকাদাহ ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্বামীর সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। শ্বশুরগৃহেও তাঁহার বাস করা হয় নাই; কারণ উহাতে ঠাকুরের অমত ছিল। ঠাকুরের দেহাবসানে একবার মাত্র তিনি সেখানে গিয়াছিলেন।

লক্ষ্মী-দিদির প্রথম জীবন কষ্টের সংসারে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন খুব অল্প তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরে অবস্থানকালে একদিন গৃহে অন্ন না থাকায় লক্ষ্মী-দিদির মাতা কন্যার খুঁটে আট আনা পয়সা বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে মুকুন্দপুরে অন্নসংগ্রহ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। লক্ষ্মী রিক্তহস্তে ফিরিবার কালে ঠাকুরের দৃষ্টিতে পড়িয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সজলনয়নে সবই বলিয়া ফেলিলেন। অবস্থা বুঝিয়া ঠাকুর তখনই গঙ্গাবিষ্ণুর সাহায্যে কামারপুকুরে ডোমপাড়ায় এক বিঘা ও হৃদয়ের সাহায্যে শিওড়ে চৌদ্দ বিঘা জমি ক্রয় করাইলেন। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের পরলোকগমনান্তে (১২৮০ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ) পরিবারের অধিকতর দুরবস্থা হইলে লাহাবাবুদের স্বনামধন্যা কন্যা প্রসন্নময়ী পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহাতে বাবুদের দৈনিক অতিথিসেবার সময়ে রামলাল থালা লইয়া উপস্থিত

থাকেন এবং প্রসাদবণ্টনকালে থালাগুলি আগাইয়া দেন।* অধিকন্তু চট্টোপাধ্যায়বংশের গৃহদেবতার সেবার জন্যও লাহাবাবুরা সিধা পাঠাইতেন। এইভাবেই সেই দুর্দিনে চট্টোপাধ্যায়-পরিবার প্রতিপালিত হইয়াছিল।

১৮৭২ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। তখন শ্রীমা ও দিদিকে ঠাকুর রহস্যপূর্বক শুক-সারী বলিয়া উল্লেখ করিতেন; কারণ তাঁহারা পিঞ্জরপ্রায় নহবতে বাস করিতেন। এই সময় ঠাকুরের নিকট দিদির শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ঠাকুরের সেবার জন্য শ্রীমায়ের শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে থাকা কালে লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিরোভাবের প্রাক্কালে ঠাকুর শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীকে একটু নজরে রেখো। সে ক'রে খাবে—তোমাদের উপর ভার হবে না।" অতঃপর বৃন্দাবন ও পুরী গমনকালে শ্রীমা দিদিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে শ্রীমার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; সম্ভবস্থলে লক্ষ্মী-দিদি তাঁহার সহিত থাকিতেন, অথবা কামারপুকুরে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত রামলালের স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি ভগিনীকে দক্ষিণেশ্বরস্থ নিজকুটিরে আনিয়া রাখেন। এই গৃহে দিদির প্রায় দশ বৎসর অতীত হয়। এই স্থানে তিনি দীক্ষাদি দ্বারা শিষ্যমণ্ডলী গড়িতে থাকেন এবং ক্রমে শিষ্যগণ তাঁহার জন্য ইষ্টকনির্মিত দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেন। এই গৃহে আরও দশ বৎসর বাসের পর তিনি পুরীধামে চলিয়া যান।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর লক্ষ্মী-দিদিকে খুব সাধন-ভজনের উপদেশ দিতেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তিনি ঝাউতলায় যাইবার পথে লক্ষ্মী-দিদি ও শ্রীমাকে শয্যাত্যাগের জন্য আহ্বান জানাইতেন; তাঁহারা উঠেন নাই বুঝিতে পারিলে দ্বারে জল ঢালিয়া দিতেন। উহাতে বিছানা ভিজিয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা ত্বরান্বিতা হইয়া শয্যাত্যাগ করিতেন; কোন দিন বা একটু ভিজিয়াও যাইত। তাঁহারা নহবতের ঝাঁপে অঙ্গুলিপ্রমাণ ছিদ্রের

মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাস সন্দর্শন করিতেন। ঠাকুর লক্ষ্মীমণিকে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর-দেবতাকে যদি মনে না পড়ে তো আমায় ভাববি—তা হলেই হবে।" লক্ষ্মী-দিদি ঠাকুরকে গুরু বলিয়া জানিতেন এবং গুরু ও ইষ্টে অভিন্ন বুদ্ধি রাখিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, ঠাকুর 'অবতারী'। মা শীতলা একদিন স্বপ্নযোগে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আমি একরূপে ঘটে, আররূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমাকে খাওয়ানো হবে।" কাশীপুরে তিনি লক্ষ্মী-দিদিকে দুইবার শীতলা-জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীকে মিষ্টিটিষ্টি একদিন খাইও—তাহলে মা শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। তাঁরই অংশ!" একবার ঠাকুরের সাধ হইয়াছিল যে, লক্ষ্মীকে বালা ও হার পরাইবেন; কিন্তু তিনি উহা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভক্তগণ পরে উহা জানিতে পারিয়া ঐগুলি গড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ত্যাগে সুপ্রতিষ্ঠিতা দিদি একদিন মাত্র পরিয়া বালা-জোড়া অপরকে দিয়াছিলেন এবং হারও কিছুদিন পরেই স্বগলচ্যুত করিয়াছিলেন। সংসারে আজন্ম বিতৃষ্ণাবশতঃ তিনি একবার পুনর্জন্মবিষয়ে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আমায় তামাক-কাটা করলেও আর আসছি না।" ঠাকুর ইহার উত্তরে স্বীয় লীলার কথা স্মরণ করাইয়া বলিয়াছিলেন, "যাবি কোথায়? কলমির দল—টানলেই আসতে হবে।" দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে লক্ষ্মী-দিদি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিতেন এবং গান গাহিয়া শ্রীমাকে শুনাইতেন। কাশীপুরে অবস্থানের সময় ঠাকুর একবার তাঁহাকে ও মাস্টার মহাশয়ের সহধর্মিণীকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর লক্ষ্মী-দিদি অনেক তীর্থে গিয়াছিলেন। শ্রীমায়ের সহিত তাঁহার বৃন্দাবন ও পুরীধামে গমনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পরেও তিনি কয়েকবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার

অপেক্ষা অধিকবয়স্ক এক ভক্ত ও কামারপুকুরে রুক্মিণী নাম্নী জনৈকা শিষ্যার সহিত তিনি যেবারে বৃন্দাবনে যান, সেবারে ভক্তটি লু লাগায় বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন। চিতাগ্নি নির্বাপিত হইবার পূর্বেই দিদি রুক্মিণীকে আবাসস্থল-সংস্কারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। রুক্মিণী এই অবকাশে বাক্স ভাঙ্গিয়া দুইশত টাকা লইয়া পলায়ন করিল। দিদি গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন যে, কয়েক আনা পয়সা ব্যতীত তিনি অকস্মাৎ সম্পূর্ণ সম্বলহীন। পূর্বে এক ব্রজবাসী তাঁহার দানে পুষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি এখন দিদিকে মাথা গুঁজিবার স্থান দিতেও সম্মত হইলেন না। নিরুপায় দিদি সাহায্যের জন্য দেশে পত্র লিখিয়া দিন কয়েক বাসী রুটি অল্পমূল্যে কিনিয়া তদ্দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। ছয়-সাত দিন পরে এক শিষ্য কামারপুকুর হইতে আসিয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া গেল। এদিকে রুক্মিণী শীঘ্রই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া দিদির নিকট অপরাধ স্বীকার করিল এবং জানাইল যে, অর্থ প্রত্যর্পণ করা অসম্ভব ; কারণ সে উহা তাহার ভাইদের দিয়াছে। সে লক্ষ্মী-দিদির নিকট ক্ষমা ও প্রসাদ চাহিল ; তিনিও অম্লানবদনে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

পুরীধামেও তিনি কয়েকবার গিয়াছিলেন ; এতদ্ব্যতীত গয়া, কাশী, গঙ্গাসাগর প্রভৃতিও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। পুরীধামের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। ভক্তগণ সেখানে তাঁহার জন্য একখানি ইষ্টকময় গৃহ নির্মাণপূর্বক এক প্রস্তরফলকে উহার নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন 'লক্ষ্মীনিকেতন' এবং ঐ ফলকের শিরোদেশে অঙ্কিত ছিল 'জয় প্রভু রামকৃষ্ণ'। দক্ষিণেশ্বর হইতে সদলবলে পুরীধামে যাইয়া লক্ষ্মী-দিদি ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন প্রধানতঃ সেখানেই যাপনান্তে ১৩৩২ সালের ১২ই ফাল্গুন ( ইং ১৯২৬-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি ) বুধবার ঐ গৃহে মহাসমাধিতে লীন হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী-দিদির গঙ্গাভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দোতলার ছাদ হইতে

গঙ্গাদর্শন করিবার আশায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতল গৃহ নির্মাণপূর্বক উপরে ঠাকুরঘর করিতে বলিয়াছিলেন। উহা ব্যয়সাধ্য বলিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত স্বল্পায়তন মৃত্তিকাগৃহেই দীর্ঘকাল কাটাইয়াছিলেন। শেষবারে ঐ গৃহ ছাড়িয়া পুরীধামে গমনকালে মা-ভবতারিণী ও গঙ্গাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, যেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পুরীতে সময় আসন্ন জানিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু নানা কারণে সে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

লক্ষ্মী-দিদির দৈনন্দিন জীবন একটানা সাধনায় পূর্ণ ছিল। পুরীতে লক্ষ্মীনিকেতনে বাসকালে তিনি প্রত্যহ ভোর তিনটায় উঠিয়া শৌচাদি-সমাপনান্তে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণের স্মরণপূর্বক দীর্ঘকাল জপ করিতেন। পরে সামান্য প্রসাদ গ্রহণানন্তর নয়টা বা দশটাব সময় স্নান করিয়া পুনর্বার এগারটা বারটা পর্যন্ত জপ করিতেন। বৈকালে তিনি আর একবার মালা লইয়া বসিতেন এবং সন্ধ্যাসমাগমে দুই ঘন্টা পুনরায় জপ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম-কীর্তনও চলিত। অবশেষে রাত্রি আটটার সময় রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া প্রসাদগ্রহণান্তে তিনি শয়ন করিতেন।

তাঁহার রাধাকৃষ্ণপ্রেম এতই সুগভীর ছিল যে একবার ভোর চারিটা হইতে রাত্রি নয়টা অবধি অবিরাম রাধাকৃষ্ণকথার পরও তাঁহার বিরামের লক্ষণ না দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহার মুখে হস্তার্পণপূবক উহা বন্ধ করিয়া-ছিলেন। বৃন্দাবনসম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আমি বৃন্দাবনের লোক" অথবা কহিতেন, "আমি গোপবালা।" বৈষ্ণবভাবে ভাবিতা লক্ষ্মী-দিদি প্রয়োজন-স্থলে স্বীয় ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য অসীম সাহসপ্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। একবার উপেন্দ্র লাহা মহাশয় কামারপুকুরে চট্টোপাধ্যায়-বংশের কুলদেবতা ৺শীতলার সম্মুখে ছাগবলি দিতে উদ্যত হইলে দিদি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও লাহা মহাশয়ের সঙ্কল্পত্যাগের

লক্ষণ না দেখিয়া দিদি প্রাণপণে বাধা দিতে থাকেন। অগত্যা উপেন্দ্র-বাবু নিরস্ত হন। তদবধি আর কেহ তথায় বলিপ্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই।

সাধনসিদ্ধা লক্ষ্মী-দিদির শেষ বয়সে অন্যান্য অশেষ গুণাবলীর সহিত এমন একটা সর্বজনীন উদার স্বভাব প্রকটিত হইয়াছিল যে, একদা জয়দেব গোস্বামীর উৎসব উপলক্ষে কেন্দুবিল্ব গ্রামে গমন করিয়া তিনি ভক্তির আতিশয্যে জাতিবিচার অতিক্রমপূর্বক গোস্বামীজীর স্বকুলোদ্ভব যুগীজাতীয় বৈষ্ণবদের পক্ক অন্নগ্রহণেও সঙ্কুচিত হন নাই। বৈষ্ণবভক্তিও তাঁহার তুল্যরূপ ছিল। প্রার্থী বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষাপূরণার্থে তিনি নিজের বহুমূল্য শীতবস্ত্রাদিও অকাতরে তাঁহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেন। অথচ ত্যাগীদের জীবনে বিন্দুমাত্র স্খলনের আভাস পাইলে তিনি অগ্নিমূর্তি হইতেন। একবার জনৈক সাধুকে মাত্রাতিক্রমপূর্বক মেয়েমহলে মিশিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ছি ছি! মেয়েমানুষের পেছু পেছু ছোটা! দাদা, তুমি সিংহের শাবক হয়ে শৃগালের আচরণ করছ!" শেষ বয়সে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া কিরূপ বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। তাঁহার সমস্ত হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ ভক্তিতে পূর্ণ ছিল।[১] তিনি বলিতেন, "আমি যা কিছু জেনেছি বা শিখেছি, সবই ঠাকুর হতে।" কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ঠাকুর এই অশেষ স্নেহপাত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে কতভাবেই না শিক্ষা দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লক্ষ্মী-দিদির জীবনী আলোচনান্তে পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজীর সহিত স্বতই বলিতে ইচ্ছা হয়, "লক্ষ্মীদেবীর জীবনীমধ্যে হিন্দু বৈধব্য-জীবনের নিষ্ঠা, ভক্তি ও ভাবরাজ্যের অপার আনন্দ এবং দৈবীসম্পদের স্ফুরণ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা ও উক্তিসমূহের অক্ষুণ্ণ সত্যতাই জ্ঞাপন করে" (শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবীর মুখবন্ধ)।

---

১ প্রধানতঃ 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী' গ্রন্থ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইল।